বিভূতি-রচনাবলী

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বাদশ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

—চৌদ্দ টাকা—

উপদেষ্টা পরিষদ :

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রী কালিদাস রায়

ডঃ সুকুমার সেন

শ্রী প্রমথনাথ বিশী

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :

শ্রী গজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রী চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় : শ্রী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও শ্রীজয়ন্ত বাক্‌চি কর্তৃক পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

সম্পাদকের নিবেদন

'বিভূতি-রচনাবলী' সম্পাদনার কার্য্যে নানা সময়ে নানা ব্যক্তির নিকট হইতে অযাচিত ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া গিয়াছে। বিভূতিভূষণের প্রতি অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধাই ইহার মূল কারণ। তবুও শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নকুল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অসিত রায়চৌধুরী ও শ্রীমতী বাণী রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত সবিতেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত মণীশ চক্রবর্ত্তীর ঋণ শোধ হইবার নয়। তাঁহারা সম্পাদনা ও রচনাবলী প্রকাশনার প্রতিটি স্তরে অকুণ্ঠিত ভাবে উপদেশ ও নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। রচনাবলীর প্রতিটি খণ্ড সুমুদ্রিত ও দ্রুত প্রকাশিত করার কাজে মেসার্স পি. এম. বাক্‌চি য্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড-এর ডাইরেক্টর শ্রীতরুণ বাক্‌চি ও প্রেস ম্যানেজার শ্রীমণীন্দ্র-কুমার সরকার সহায়তা করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তাঁহাদের ধন্যবাদ দিয়া খাটো করিব না। বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত রচনা এখনও আরও কিছু রহিয়া গেল। সুযোগ সুবিধামত সেগুলি সংগৃহীত হইলে একটি-দুটি খণ্ড প্রকাশ করা যাইতে পারে। অসংখ্য সাময়িক পত্র এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহে তাঁহার গল্প, দিনলিপি ও পত্রাদি বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়াইয়া আছে। এই রচনাগুলি একত্র করিয়া মুদ্রিত করা দুরূহ কার্য্য। কিছু সময় লাগিবে। আশা করা যায় বিভূতি-সাহিত্য-রসিকদের সহযোগিতায় একদিন ঐগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে।

বিভূতিভূষণকে যেমন দেখেছি

বিভূতিভূষণ আমার দশ বছরের জ্যেষ্ঠ। কিন্তু বলতে গেলে একই সময়ে আমরা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করি। 'প্রবাসী'তে স্থান পায় আমার টলস্টয় থেকে তর্জমা 'তিনটি প্রশ্ন'। তার মাস কয়েক বাদে তাঁর মৌলিক রচনা 'উপেক্ষিতা'। কী চমৎকার গল্প! প্রথম দর্শনেই আমি আকৃষ্ট হই। বহুদিন পরে 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় আমার 'পথে প্রবাসে' ও কিছুদিন বাদে তাঁর 'পথের পাঁচালী'। মাসের পর মাস পাশাপাশি অবস্থান করে আমাদের দু'জনের দুই জাতের রচনা। কিন্তু দুটিরই আদিকথা পথ। দু'জনেই আমরা পথের প্রেমিক। একই সময় একসঙ্গে আমরা সাহিত্যের আসরে নামি ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্য-গুরুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে শুনেছি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন তাঁর 'বিচিত্রা'-সম্পাদনা সার্থক। তিনি আমাদের দু'জনকে সাহিত্যে এনে দিয়েছেন।

বিভূতিভূষণের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে কবে কেমন করে তা মনে পড়ে না। বোধহয় একদিন আমাদের দু'জনের প্রিয় বন্ধু মণীন্দ্রলাল বসুর পার্ক-সার্কাসের বাড়ীতে। কলকাতার বাইরেই আমার বদলির চাকরি। দেখা হয় কদাচিৎ। শেষবার কলকাতায় তিনি আমার বাসায় এসেছিলেন। একটি চেরী গাছ ছিল সেখানে। তাঁর খুব ভালো লেগেছিল সেটিকে। কথায় কথায় বলেন তিনি বছরে চারখানা উপন্যাস ও দু'খানা ভ্রমণকাহিনী লিখে সংসার চালাবেন ভেবেছেন। আমি তাঁকে অত বেশী লিখতে মানা করি। তখনি লক্ষ্য করি তাঁর মন চলে গেছে পরপারে। আমি ওঁকে বারণ করি ও বিষয়ে ভাবতে। বলি পরপারে যখন যাব তখন পরপারের কথা ভাবব। আপাতত এপারের কথাই ভাবা যাক। আর ওপারের সমাচার কি এপারে বসে পাওয়া যায়। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। স্নেহের সঙ্গেই বলেন, "মানুষ ইচ্ছা করলে স্বয়ং ভগবানকেও জানতে পারে। পরকাল তো তার তুলনায় কিছুই নয়। আমার 'দেবযান' পড়েছ! পড়ে দেখো।"

এর পরে একদিন কলকাতা বেতার কেন্দ্রে কী একটা পার্টিতে চায়ের নিমন্ত্রণ। হঠাৎ ডাইরেকটার এসে বলেন, "শুনেছেন? দারুণ দুঃসংবাদ! কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর নেই!" আমি শোকে স্তব্ধ হয়ে যাই। সেই অবস্থাতেই আমাকে অনুরোধ করা হলো তাঁর উপর কিছু লিখে রেকর্ড করতে। রাখলুম সে অনুরোধ। মন কেমন করছিল। জানতুম না যে এমন অকালে তাঁকে আমরা হারাব। দেশের লোক তাঁকে অন্তর থেকে ভালোবাসতেন। সকলেই শোকাকুল।

বিভূতিভূষণ একজন দুর্লভ শিল্পী। একজন দুর্লভ মানুষ। তারাশঙ্কর একবার তাঁর প্রসঙ্গে আমাকে যা বলেছিলেন তা আমি কোনোদিন ভুলব না। কিন্তু তেমন হৃদয়গ্রাহী রূপে বর্ণনা করতেও পারব না। তাঁরা দুই বন্ধুতে এক ট্রেনে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন।

জ্যোৎস্নায় দশদিক আলো হয়ে রয়েছে। বিভূতির চোখে ঘুম নেই! তিনি জানালার বাইরে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। অনেক রাত্রে হঠাৎ এক সময় বিভূতির অপূর্ব এক উপলব্ধি হয়। রূপসীর অবগুণ্ঠন খুলে যায়। উন্মোচিত হয় তাঁর নয়নে বিশ্ব-প্রকৃতির গোপনতম রহস্য।

এমন প্রকৃতি-পাগল সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে বিরল। প্রকৃতিকে চোখে দেখে ভালো লাগে না কার? কিন্তু তাকে ভালোবেসে তার গভীরে অবগাহন করা অন্য জিনিস। বিভূতিকে সেইজন্যে বছরে কয়েক মাস অরণ্যবাস করতে হতো। আর কয়েক মাস পল্লীর কোলে কাটাতে হতো। ইছামতী নদীর কূলে। তাঁর জীবনের যুগল মেরু ছিল অরণ্য ও পল্লী। কলকাতাকে বলা যেতে পারত বিষুবরেখা। সেই পথ দিয়ে তাঁর উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। শহরে থাকলেও তিনি শহুরে ছিলেন না। কোনোদিন হতে চাননি। নাগরিক সভ্যতা তাকে বশ করতে পারেনি। তাঁর পোশাকে আশাকে নাগরিকতার লেশ ছিল না। বৈঠকখানায় তিনি বেমানান। চিড়িয়াখানায় যেমন চিড়িয়া।

"সিঁদুরচরণ" বলে তাঁর সেই প্রখ্যাত গল্পটি আমার মনে আছে। সেটি বোধহয় তাঁরই প্রতীকী কাহিনী। ছোট মাপের একটি 'অডিসি'। ও রকম একটি সহজ গল্প লেখা সহজ কর্ম নয়। বিভূতির অনেকগুলি গল্পই দেখতে সহজ, কিন্তু আসলে কঠিন। ইংরেজীতে যাকে বলে আর্টলেস আর্ট। বহু সাধনার ফলে তিনি সারাৎসারটুকু গ্রহণ করেছেন, অনাবশ্যক খুঁটিনাটি বর্জন করেছেন।

কিন্তু উপন্যাসের বেলা সেই তীর্থে তিনি পৌঁছেছিলেন কি? এর উত্তর আমি নিজে দিতে পারছিনে। ভাবীকাল দেবে। তাঁর শেষ উপন্যাস এক প্রকার কামনাপূরণ। বহুকালের কামনা জীবনে ও শিল্পে পরিপূর্ণ হয়। বৃদ্ধ বয়সে সংসার প্রবেশ ও পুত্রলাভ। সে এক পরম উপলব্ধি। সাহিত্যে তাকে তিনি পাকা ফসলের মতো গোলায় তুলে রেখেছেন। তা ছাড়া ইছামতী নদীকে নিয়ে এপিক উপন্যাস লেখা তাঁর সারাজীবনের সাধ। নদী এখানে জীবনপ্রবাহের প্রতীক। কালপ্রবাহের প্রতীক। তিনি তার শরিক আর সাক্ষী। ভবানী বাঁড়ুয্যের পারমার্থিক জীবন বিভূতি বাঁড়ুয্যেরও। তা ছাড়া 'ইছামতী' আর-একখানি 'নীলদর্পণ'। এর সাহেব চরিত্রগুলিও দরদের সঙ্গে আঁকা।

বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমার একটি আত্মিক সম্পর্ক ছিল। তাঁর সঙ্গ সেইজন্য আমার এত ভালো লাগত। তাঁর লেখাও সেই কারণে আমার এত ভাল লাগে। সেই আত্মিক সম্পর্ক এখনো রয়েছে। তাঁর মুখ মনে পড়লে আমার আত্মা প্রসন্ন হয়।

অন্নদাশঙ্কর রায়

ভূমিকা

যশোর জেলার ভূমি-প্রকৃতির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন সেখানের ফসল—ফল কন্দ সব্‌জী যেমন সরস ও পুষ্ট—আগাছার জঙ্গলও তেমনি নিবিড় ও সজীব। আসলে সেখানের মাটিই অত্যন্ত সরস, অসংখ্য নদী সেখানের মাটিকে অফুরন্ত প্রাণশক্তি যোগায়। তার সৃষ্টিশক্তিতে ক্লান্তি বা রিক্ততা আসার কোন সম্ভাবনাই থাকতে দেয় না।

ইছামতীও তেমনি একটি নদী, নদীয়া যশোরের মধ্যে দিয়ে বয়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেছে, অত্যন্ত ঘরোয়া, অত্যন্ত আপন, অন্তরঙ্গ। পল্লীবধূর মতোই শান্ত ও অকৃত্রিম তার রূপ, তার নির্মল স্বচ্ছ জলে কখনও দু'পারের ঘন বনানীর শ্যামশোভা প্রতিবিম্বিত হয়ে তাকে শ্যামলী ক'রে তোলে, কখনও বা কালবৈশাখীর ঘন-কৃষ্ণ মেঘের ছায়া বুকে ক'রে সে কৃষ্ণা, আবার শুক্লপক্ষের রাতে যখন উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোক এসে পড়ে তখন সে রজতরূপা, রূপসী। বিভূতি-ভূষণের সর্বশেষ উপন্যাস ইছামতীতে এই ইছামতী নদীই নায়িকা। সহিষ্ণু সর্বংসহা পল্লী-জননীর মতোই যে তার সন্তানদের সুখ দুঃখ, আঘাত সংঘাত, উৎসব সমারোহের অসংখ্য ইতিহাস বুকে ক'রে নীরবে তার সাধ্যমতো প্রাণধারা যুগিয়ে যাচ্ছে, নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে—শতাব্দীর পর শতাব্দী। অনেক দেখেছে সে, অনেক ইতিহাসের সাক্ষী, অনেক অত্যাচার বর্বরতারও—কিন্তু তার জন্য তার কোন জ্বালা নেই, অতৃপ্তি ক্ষোভ অসূয়া জিঘাংসা কি জুগুপ্সা নেই, সে কল্যাণময়ী নিয়ত যেন তার সন্তানদের মঙ্গলচিন্তাই ক'রে যাচ্ছে—যতদূর সম্ভব মাধুর্যে ভরিয়ে দিচ্ছে তাদের নিঃস্ব রিক্ত বুকগুলি, জীবনযুদ্ধের ক্ষতে দিচ্ছে অমৃতের প্রলেপ বুলিয়ে। তার নীরবতার মধ্যেই মানুষ খুঁজে পাচ্ছে বিগত দিনের দুঃখে সান্ত্বনা, পাচ্ছে আগামী দিনের জন্য আশ্বাসের পাথেয়।

বিভূতিভূষণ এই ইছামতী-তীরেরই একটি অখ্যাত ন' া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের পারিবারিক জীবনও ছিল এই গ্রামের অধিকাংশ দরিদ্র অধিবাসীদের মতোই—বহিরঙ্গ প্রাচুর্যের অভাব ছিল বলেই তাঁকে অন্তর ভরাতে হয়েছে প্রকৃতির অনন্ত ঐশ্বর্যে। হয়ত বাল্যকালে সেটা তত বুঝতে পারেন নি। ভাল লেগেছে তখনই, কিন্তু কত ভাল লেগেছে সেটা বুঝেছেন কৈশোরে গ্রাম ছাড়ার পর—যখন শিক্ষা ও পরবর্তীকালে উদরান্নের জন্য গ্রামের বাইরেই কাটাতে হয়েছে বেশির ভাগ সময়। ফলে একটা প্রবল 'নস্ট্যালজিয়া' অনুভব করেছেন, যখনই দুদণ্ডের অবসর পেয়েছেন দেশে যাবার— এমন কি লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে দেশ দেখাতে যাওয়ার অছিলায় সত্যিই দু-এক ঘণ্টার জন্য গিয়েও—প্রাণভরে সেই পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্য পান করেছেন—কুঠীর মাঠে, বাঁওড়ের ধারে—অর্থাৎ ইছামতীরই কূলে। আর সেই সময়ই বার বার সঙ্কল্প করেছেন এই মাতৃঋণ শোধের—ইছামতীকে কেন্দ্র ক'রে উপন্যাস রচনার। ভাগলপুর এলাকার অরণ্য এবং প্রাক্তন যশোর জেলার—অধুনা পূর্ব-উত্তর চব্বিশ পরগণার ইছামতী তীরের আগাছার ঝোপই তাঁকে প্রধানত প্রকৃতি-প্রেমিক—কারও কারও মতে প্রকৃতিপাগল ক'রে তুলেছিল। তার

মধ্যে অরণ্যের ঋণ প্রায় সবই শোধ করেছেন 'আরণ্যক' উপন্যাসে—কিন্তু ইছামতীর বৃহত্তর ঋণ আরও ভাল ক'রে শোধ করার জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছেন—মনে মনে বারবার খসড়া করেছেন ও আবার মনে মনেই বাতিল করেছেন—বোধ করি কোনোটাকেই নদীজননীর উপযুক্ত মনে হয় নি। আরও ভাল পরিকল্পনার জন্য যত্ন ক'রে মনের কুলুঙ্গিতে তুলে রেখেছেন সে সঙ্কল্পকে।

একেবারে তাঁর পরমায়ুর শেষপ্রান্তে (বার্ধক্য নয়—তাঁর যা স্বাস্থ্য এবং সৃজনীশক্তি ছিল তাতে সে-সময়টা তাঁর শক্তির মধ্যাহ্ন, মধ্যবয়স বলাই উচিত) যখন শ্রীমান গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য একটি সাময়িক পত্রের জন্য ধারাবাহিক উপন্যাসের কথা বলে, তখন বর্তমান নিবন্ধ-লেখকই অনুরোধ করে তাঁর বহু-সঙ্কল্পিত ইছামতী-গাথা লেখার জন্য। তিনিও উৎসাহিত হয়ে ওঠেন সঙ্গে সঙ্গেই। ইছামতী রচনার এইটেই পূর্ব ইতিহাস।

ইছামতী যে রূপে বেরিয়েছে সে ভাবে বই শেষ করার পরিকল্পনা ছিল না তাঁর। ইছামতীর পৃষ্ঠপটে একশত বৎসর ব্যাপী সমাজজীবনের ইতিহাস রচনা করবেন এই রকমই স্থির ছিল। এ নিয়ে আমাদের সঙ্গে অনেকদিন অনেক আলোচনাও হয়েছে। তাঁর সঙ্কল্প ছিল তিন অথবা চার খণ্ডে এই 'এপিক' উপন্যাস শেষ হবে, তার প্রত্যেকটিই হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত'র মতো। বড় ক্যান্‌ভাসে তিনি কিছু লেখেন নি, এরকম অনুযোগ যে কোন কোন মহলে তাঁর সম্বন্ধে উঠেছে, ওঠে—সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তিনি। তাঁর ইচ্ছা ছিল এই সুবৃহৎ উপন্যাস লিখে তার উপযুক্ত জবাব দেবেন। কাল অকস্মাৎ নিষ্ঠুর-ভাবে তাঁকে বঙ্গ-সরস্বতীর কোল থেকে ছিনিয়ে না নিলে, অন্তত আর দুটো বছর বাঁচলেও এই উপন্যাস এবং 'কাজল' লেখা শেষ হ'ত।

কাজলও এই নিবন্ধ-লেখকের অনুরোধেই লিখতে শুরু করেছিলেন, মনে মনে একটা ছক্ কেটেও নিয়েছিলেন, কিন্তু তার কৈফিয়ৎটুকু ছাড়া আর কিছু লেখার সময় পান নি। এই প্রসঙ্গে অনশ্বরের উল্লেখ করলে খুব একটা অবান্তর হবে না বোধ হয়। ইস্‌মাইলপুর আজমাবাদের জঙ্গল তাঁর দ্বারাই বিনষ্ট হয়েছে—এ সম্বন্ধে তাঁর একটা সুগভীর বেদনাবোধ ছিল—তাঁর কল্পিত নায়ক সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবে—এই রকম একটা কল্পনা নিয়েই অনশ্বর শুরু করেন। সৃষ্টির আদিমতম চিহ্ন এখনও যা আছে—তা হ'ল গাছ। অতিকায় প্রাণীর দল অবলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু অতিকায় গাছ এখনও আছে কোথাও কোথাও, কয়েক হাজার বছরের গাছ, এই কথা ভেবেই প্রধানত বোধ হয় 'অনশ্বর' নাম দেওয়া হয়েছিল। সেই জঙ্গলের জন্য বাঙ্গালীর ছেলে নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিল, টাকার জন্য প্রকৃতির বিপুল সম্পদ নষ্ট করতে রাজী হ'ল না—এই রকমই একটা কাহিনীর আব্‌ছা ধারণা নিয়ে ঐ উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কী হ'ত তা কেউ জানে না, হয়ত তিনি নিজেও জানতেন না। কোন শিল্পীই বোধহয় কোন মহৎ শিল্প রচনার প্রাক্কালে কল্পনা করতে পারেন না—তাঁর সৃষ্টি শেষ পর্যন্ত কী রূপ নেবে।

ইছামতী তীরের পল্লীপ্রকৃতি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল বলেই বোধ হয় সেখানের মানুষগুলোকে তিনি ভালবেসেছিলেন। তবে সবাইকে সমান নয়—তথাকথিত ব্রাত্য পতিত যারা, সমাজের নিচুস্তরের হতদরিদ্র মানুষগুলিই তাঁর সমধিক প্রিয় ছিল। পল্লীগ্রামের লোক মাত্রেই সরল—এমন ভ্রান্ত ধারণা তাঁর থাকবার কথা নয়, ছিলও না। অলস, খণ্ডাংশে-পরিণত-সামান্য-পৈতৃক-সম্পত্তির-আয়-সম্বল উচ্চবর্ণের বা মধ্যবিত্ত লোকদের ভণ্ডামি, চরিত্রদোষ, কর্মবিমুখতা, মিথ্যাচার, সর্বোপরি অকারণ ও অপরিমাণ পরশ্রীকাতরতা তাঁর চোখ এড়ায় নি। তাদের যথাযথ ভাবেই অঙ্কিত করেছেন।

তবে এদের সম্বন্ধেও তাঁর মনে কোন তিক্ততা ছিল না। বরং ভালবাসাই ছিল। সবাইকেই ভালবাসতেন—কম আর বেশী। ভালবাসতেন বলেই কোথাও অতিরিক্ত বর্ণপ্রয়োগ করেন নি, যেমনটি ঠিক তেমনিভাবেই দেখেছেন, দেখিয়েছেন। অতিভাষণ বা অতিরঞ্জন ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। Emphasis প্রয়োগ—বাংলা সাহিত্যে যেটা তারাশঙ্কর থেকে শুরু হয়েছে (তারাশঙ্কর যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই দিতেন—এখন সে মাত্রাজ্ঞানের অভাব হয়ে পড়েছে)—বর্তমান বাংলা কথাসাহিত্যে যা প্রধান লক্ষণীয়—বিভূতিভূষণের মধ্যে তা একেবারেই ছিল না। তাঁর তুলি জাপানী চিত্রকরদের মতোই লঘু বর্ণপ্রয়োগ ক'রে গেছে—অনেকে সেজন্যে তাঁকে তখন ঈষৎ করুণার চোখে দেখতেন। সৌভাগ্যের কথা—এ অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য, সুমহৎ স্রষ্টার সূক্ষ্ম কারুকলা—বাঙালী পাঠকসাধারণের চোখ এড়ায় নি, তারা তাঁর যথার্থ মূল্যই দিয়েছে।

সেইজন্যে, মানুষ যেমন হয়, দোষগুণে মিলিয়েই তাদের এঁকেছেন তিনি—কোথাও দোষের ওপর জোর দেন নি। বরং, সাধারণ ভাবে মানুষকে ভালবাসতেন বলেই যেন দোষের মধ্যে থেকে গুণও কিছু খুঁজে বার করেছেন। এদিক দিয়ে তিনি ডিকেন্স্ ও শরৎচন্দ্রের সগোত্র। তবে সমান বলছি না। আমার পক্ষে ধৃষ্টতা প্রকাশ হচ্ছে কিনা ' .নি না—আমার ধারণা কোন কোন ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ মহত্তর শিল্পী।

এ উপন্যাসে কাদের কথা লিখবেন তা পূর্বাহ্ণেই বলেছেন—ইছামতীর প্রাক্‌কথনে:

"সবুজ চরভূমির তৃণক্ষেত্রে যখন সুমুখ জ্যোৎস্নারাত্রির জোৎস্না পড়বে, গ্রীষ্মদিনে সাদা থোকা থোকা আকন্দফুল ফুটে থাকবে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলবে নিকটবর্তী বনঝোপ থেকে নদীর মৃদু বাতাসে, তখন নদীপথযাত্রীরা দেখতে পাবে নদীর ধারে পুরনো পোড়ো ভিটের ঈষদুচ্চ পোতা, বর্তমানে হয়ত আকন্দ ঝোপে ঢেকে ফেলেছে তাদের বেশি অংশটা। হয়ত দুএকটা উইয়ের ঢিবি গজিয়েছে কোনো কোনো ভিটের পোতায়। এই সব ভিটে দেখে তুমি স্বপ্ন দেখবে অতীত দিনগুলির, স্বপ্ন দেখবে সেই সব মা ও ছেলের, ভাই ও বোনের—যাদের জীবন ছিল একদিন এইসব বাস্তু ভিটের সঙ্গে জড়িয়ে। কত সুখদুঃখের অলিখিত ইতিহাস বর্ষাকালে জলধারাঙ্কিত ক্ষীণরেখার মতো আঁকা হয় শতাব্দীতে শতাব্দীতে এদের বুকে। সূর্য আলো দেয়, হেমন্তের আকাশ শিশির বর্ষণ করে, জ্যোৎস্না-পক্ষের চাঁদ জোৎস্না ঢালে এদের বুকে।...

সেই সব বাণী সেই সব ইতিহাস আমাদের আসল জাতীয় ইতিহাস।"

লেখকের এই ইঙ্গিত যদি সত্য হয়—ইছামতীও ঐতিহাসিক উপন্যাস। "মূক জনগণের ইতিহাস, রাজা-রাজড়াদের বিজয়-কাহিনী নয়"—বলেছেন লেখক। রাজা-রাজড়াদের বিজয়-কাহিনী যে উপন্যাসের উপজীব্য, তাতে একটা সুবিধা (বা অসুবিধা) আছে এই যে, তার চরিত্রগুলির মোটামুটি আদলটা পাওয়াই যায়। লেখক মাটি চড়ান রঙ ধরান ঠিকই—কিন্তু কাঠামোর বাইরে যেতে পারেন না। কিন্তু যাদের কথা পুঁথিতে লেখা নেই, সেই সব মা ও ছেলের, ভাই ও বোনের, বধূর ও বঁধুর অলিখিত ইতিহাস নিয়ে কাহিনী রচনা করতে গেলে স্বপ্ন দেখা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু স্বপ্ন বাস্তবকে একেবারে বাদ দিতে পারে না, চোখে দেখা মানুষকেই লোকে স্বপ্ন দেখে—কদাচিৎ কখনও হয়ত শোনা মানুষকেও। ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখকও ইতিহাসের বাইরে যে সব চরিত্র অঙ্কিত করেন—তার পরিবেশে অতীত-দিনের আবহাওয়া থাকলেও চরিত্রের মূল মানুষগুলো লেখকের জানা ও শোনা অভিজ্ঞতা দেখেই রূপ পরিগ্রহ করে। অনেক সময় ঐতিহাসিক রাজারাজড়ারাও হয়ে পড়েন সেকালের পোশাক পরা একালের মানুষই। সেই কারণেই ইমলি বেগমের বা ভীমসিংহের আলমগীর-অন্তঃপুরে ঢুকতে বাধা থাকে না। তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই—চিরকালীন মানুষের বাইরের চেহারাটাই যুগে যুগে পাল্টাচ্ছে—তার মানসসত্তা চিরকালই এক।

বিভূতিবাবুও তাঁর এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক আমলের অর্থাৎ যেদিনকার কথা দিয়ে তিনি শুরু করেছেন (১২৭০* সাল—রচনাকাল ধরলে একশ বছরের কিছু কমই হয়,—৮৫ বছর আগেকার কথা), পরিবেশ যেমনভাবেই রচনা করুন—কথায়-বার্তায়, পোশাকে-আশাকে, খাদ্য-খাবারে এবং কিছু কিছু ঐতিহাসিক চরিত্রেও (যেমন হলা পেকে বা তিতুমীর)—উপন্যাসের মানুষগুলির উপাদান সংগৃহীত হয়েছে তাঁর প্রত্যক্ষ ও শ্রুতজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকেই।

তবে, তাও হয়ত সবটা নয়। সাধারণ চরিত্রগুলিই এসেছে এইভাবে, প্রধান চরিত্ররা নয়। অনেকেই অবশ্য তা স্বীকার করবেন না। তাঁরা বলবেন সব চরিত্রই লেখকের দেখা ও জানা, প্রধান চরিত্র তো আরও বেশী। এক কথায় তাঁরা বলেন, নায়ক ভবানী বাঁড়ুয্যে লেখক স্বয়ং। কিন্তু তাই কি? এ চরিত্রের সবটাই কি লেখক? না, যেমন অপু, তেমনি ভবানী বাঁড়ুয্যেও—সবটা তিনি নন। আমাদের বিশ্বাস ভবানী বাঁড়ুয্যে তাঁর ভাবমূর্তি মাত্র। তিনি যা হতে চেয়েছিলেন—তাঁর সাধনা ও অনুভূতি তাঁর মানসতাকে যে স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল, তাতে তিনি যেমন হতে পারতেন—সেই চেহারাটাই ফুটিয়েছেন ভবানীকে দিয়ে, বলা যায় তাকে দিয়ে সাধ মিটিয়েছেন।

তেমনি কেউ যদি মনে করেন যে, তিলু বিলু নিলুর মধ্যে তাঁর স্ত্রী বা আত্মীয়া বা অপর কোন পরিচিত মানুষের প্রত্যক্ষ বা স্পষ্ট ছাপ আছে, তিনিও ভুল করবেন। কিছুটা সাদৃশ্য

---

*সম্ভবত এখানে লেখকের হিসাবে বা প্রথম ছাপায় কিছু ভুল ছিল। লেখক আমাদের সঙ্গে আলোচনাকালে বারবারই বলেছেন যে রচনাকাল থেকে একশ বছর আগে কাহিনীর শুরু হবে।

থাকা বিচিত্র নয়—আবছা আদল একটা, তবে সে সামান্যই। আমাদের মনে হয় নারীর যে তিনটি রূপ তাঁর ভাল লাগত, গৃহিণী প্রেয়সী ও সখী, নর্ম-সহচরী, মর্ম সহচরী ও বয়স্যা—যে তিনটি রূপই তিনি চেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর মধ্যে—হয়ত এক দেহে তা সম্ভব নয় বুঝেই—তিনটি মেয়েকেই তাঁর আপন ভাবমূর্তি ভবানী বাঁড়ুয্যের স্ত্রী রূপে কল্পনা করেছেন। কে জানে হয়ত তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও এই তিন ধরনের স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে এসে আকর্ষণ বোধ করেছেন, এক এক সময় এই এক এক রূপ তাঁকে মুগ্ধ করেছে, সে সময় সেইভাবেই কল্পনা করেছেন নিজের স্ত্রীকে। সেই গোপন ঈপ্সাই কোথায় কোন বেদনার মঞ্জুষায় রক্ষিত ছিল মনের মধ্যে, এই-খানে, জীবনসায়াহ্নে নিজের মানসমূর্তির বিবাহ দিতে গিয়ে সেই তিনটি মেয়েকে টেনে এনেছেন।

বিশেষ, তাঁর গৃহিণী বা প্রেয়সী কোন স্তরে পৌঁছে তাঁর যথার্থ জীবনসঙ্গিনী বা সহধর্মিণী হতে পারে সম্ভবত সে সম্বন্ধেও একটা উচ্চ আদর্শ ছিল তাঁর মনে—প্রধানা স্ত্রী তিলুকে তেমনি ভাবেই আঁকতে চেয়েছেন। প্রেয়সীকে প্রিয় শিষ্যা রূপে ভাবতে ভাল লেগেছে তাঁর। নিজের বিদ্যার ও চিন্তা এবং ভাবনার অংশ দিয়ে শিক্ষিতা, নিজের উপযুক্ত করে তুলবেন স্ত্রীকে, যার সঙ্গে তাঁর কথা বলে সুখ হবে—এক সুরে যার বুকের তারটি বাজবে। এ মেয়েকে সংসারে কোথাও পাওয়া যাবে না তা তিনি জানতেন, তাকে গড়ে নিতে হবে। সেই চিন্তাটাই বোধ হয় মনের মধ্যে ইদানীং প্রধান হয়ে উঠেছিল—সেই কল্পনাকেই তাই তিলুর মধ্যে রূপদান করেছেন। 'যাবার বেলায় দেব কারে, বুকের কাছে বাজল যে বীণ্' এই ধরনের প্রশ্নই হয়ত ঐ সময় তাঁকে ভেতরে ভেতরে পীড়া দিত, ধন-সম্পদ নয়—চিন্তার যে ঐশ্বর্যে তাঁর মন শেষের দিকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, যাতে তিনি পরমানন্দের স্বাদ পেয়েছিলেন, সেই মানসিক সম্পদের উত্তরাধিকার যে তাঁর পরিণত বয়সে সদ্যপ্রাপ্ত পুত্রকে দিয়ে যাওয়া যাবে না তা ভবানী ও তাঁর স্রষ্টা জানতেন—তাই প্রিয়া ও জায়াকে প্রিয়শিষ্যা করে তাঁকেই সেই চিন্তাভাবনার অংশভাগিনী করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন যথার্থ সহধর্মিণী ও সহমর্মিণী করতে।

এ গ্রন্থের উপনায়িকা গয়া মেম বিভূতিভূষণের এক আশ্চর্য সৃষ্টি। বাগ্দিঘরের অশিক্ষিত মেয়ে শুধু কি তার রূপেই ইংরেজ সাহেবকে ভুলিয়েছিল, সেই কারণেই তাকে তিনি গৃহিণীর আসনে বসিয়েছিলেন? তা সম্ভব নয়। এখানেও সেই চিরকালীন নারীকেই লেখক কল্পনা করেছেন—সে নারী যে ঘরেই জন্মাক, সহজ বুদ্ধিতে বহু জিনিস আয়ত্ত করতে পারে—তার জন্যে ইস্কুল-কলেজে পড়ার দরকার হয় না—সযত্ন সেবা ও যথার্থ মমতায় সে পুরুষকে বশ করতে পারে। চিরকালীন নারীর মমতাতেই সে প্রসন্ন আমীনের মতো প্রৌঢ় নারীদেহলোলুপকে একেবারে ত্যাগ করতে পারে নি, তিরস্কার করেছে, ধিক্কার দিয়েছে, খেলিয়েছেও কিছু—সেই সঙ্গে তার যথার্থ কল্যাণচিন্তাও করেছে। সস্নেহ প্রশ্রয়—শেষ পর্যন্ত আশ্রয়ও দিয়েছে।

আরও একটি স্মরণীয় চরিত্র দেওয়ান রাজারাম। সেকালে এই ধরনের ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না, এদিকে পরম সাত্ত্বিক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—ওদিকে ইংরেজদের চাকরিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে

চুরি-জুচ্চরি, লাঠিবাজী পরপীড়ন খুন দাঙ্গা—কোন কুকর্মেই যে পশ্চাদপদ নয়। সেদিক দিয়েও এ চরিত্র নিখুঁত হয়ে ফুটেছে বলা যায়—এবং বিভূতিভূষণের নিজস্ব শক্তিতে সে এমন একটি রূপ নিয়েছে—যাতে ঘোর পাপী ও অত্যাচারী জেনেও তার প্রতি একটা শ্রদ্ধা ও সপ্রীতি আকর্ষণ বোধ না ক'রে থাকতে পারে না পাঠক।

ইছামতী-তীরের গ্রামজীবন যে শুধু নীলকুঠীর সাহেব, তার রক্ষিতা, দেওয়ান, আমীন এবং তাদের ঘরের জামাইকে নিয়েই ছিল না, লেখক সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। সেই কারণেই আখ্যায়িকা আরম্ভ করেছেন তিনি জনৈক উচ্চাভিলাষী দরিদ্র যুবক নালু পালকে দিয়ে। ইংরেজ শাসকদের প্রভাবে কৃষিনির্ভর বাঙ্গালীর মধ্যে ধীরে ধীরে যে বাণিজ্য-সচেতনতা জাগছিল—নালু পাল যেন তার প্রতীক। নালু পাল ও তার স্ত্রী তুলসী সেই আমলের সংস্কৃতির প্রতীকও। ধনবান হয়েও তারা পূর্ব অবস্থা ভোলে নি ; ব্রাহ্মণদের কাছে সদা-বিনত, আত্মীয়-পরিজনদের সম্বন্ধে প্রশ্রয়শীল ও বিবেচক, তাদের অন্যায় অনুযোগেও যারা ক্রুদ্ধ হয় না, বরং বড়কে যে অনেক ঝড় সহ্য করতে হয় এই মন্ত্রই উচ্চারণ করে মনে মনে সর্বদা এটাকে কর্তব্য বলেই জানে।

ইংরেজ শাসনেরই আর একটি অবশ্যম্ভাবী ফল নারীজাগরণের সূচনা, আর তার ভূমিকা হিসেবে প্রচলিত সংস্কার প্রথা, তথা প্রচলিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শুরু। নিস্তারিণী যেন সেই নবীনাদেরই প্রতীক। এই প্রসঙ্গে আশাপূর্ণা দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস 'প্রথম-প্রতিশ্রুতি'র নায়িকা সত্যবতীও স্মরণীয়। সত্যবতীর কালে পৃথিবী আর একটু এগিয়ে এসেছে—বিদ্রোহেও সে পরিবর্তন লক্ষণীয়। নিস্তারিণীর কালে এতটা স্বাধীনতাও ছিল না, সে ঘরও তার নয়। সেই কালে ও পারিপার্শ্বিকে যেটুকু বিদ্রোহ সম্ভব, সেইটুকুই দেখিয়েছেন বিভূতিবাবু। তার যে স্বল্পস্থায়ী গোপন প্রণয়—তাও সেই কালেরই মাপে—সেদিকেও লেখকের হিসাবে ভুল হয় নি কোথাও।

রামকানাই কবিরাজকে হয়ত বাস্তবে কোথাও পাওয়া যায় না, হয়ত সম্পূর্ণ রূপেই লেখকের মানস-সন্তান তিনি। 'এই রকম হলে ভাল হত'—লেখকের এই ধরনের একটা চিন্তা ছিল, এ চরিত্র সেই কল্পনারই ফল। কিন্তু বড়ই মধুর, বড় সুন্দর মানুষটি, এঁর কথা পড়তে পড়তে পাঠকদের মনেও সেই কথাটিরই প্রতিধ্বনি জাগে—'এই রকম হলে ভারী ভাল হত।'

॥ ২ ॥

ক্ষণভঙ্গুরের 'সিঁদুরচরণ' গল্পটির সঙ্গে একটি সকৌতুক ইতিহাস জড়িত আছে। বর্তমান নিবন্ধ-লেখকও সেই কাহিনীর অন্যতম নায়ক। আশা করি এখানে তার অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গল্পটি আমার মারফৎই এক বিখ্যাত মাসিক পত্রে প্রেরিত হয়েছিল। ছাপার পর সেই কাগজের স্বর্গত সম্পাদক (তিনি নিজেও একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক—ভাষার জাদুকর ছিলেন, জীবনীলেখক ও অনুবাদক হিসেবেই তিনি সমধিক খ্যাত) আর একটি গল্পের প্রার্থী হয়ে এসে আমাকে বলেছিলেন, 'বিভূতি কিন্তু আজকাল বড্ড ফাঁকি দিচ্ছে। ঐ কি, একটা

গল্প হয়েছে! হেলাফেলা ক'রে যেমন-তেমন করে দু'পাতা লিখে ছেড়ে দিয়েছে। আমরা তো টাকা কম দিই না। ওকে ব'লো এবার ভাল দেখে যেন একটা গল্প দেয়।'

এতে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হবারই কথা, আমিও হয়েছিলাম। তার কারণ গল্পটি প্রথম শ্রেণীর শুধু নয়—অসাধারণ রচনা। তার ওপর ওঁরা টাকাও মাত্র ত্রিশটি দিয়েছিলেন, তখনই বহু পত্র-পত্রিকা গল্পের জন্য পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছেন, কেউ কেউ বা আরও বেশী। তবে টাকার প্রশ্নটাও বড় নয়, এত উৎকৃষ্ট রচনার প্রতি এই অবিচারের জন্যই উষ্মাটা বোধ হয়েছিল। ফলে তার পর দেখা হওয়ামাত্র কথাটা বিভূতিবাবুকে জানিয়ে বলেছিলাম, 'আর কখনও ও কাগজে লেখা দেবেন না। ওরা আপনার লেখা ছাপার অযোগ্য।' বিভূতিবাবু কিন্তু শুনে একটুও বিচলিত বা ক্রুদ্ধ হলেন না, বরং বেশ যেন একটা মজার কথাই শুনলেন, এইভাবেই হাসতে হাসতে বললেন, 'ও, বলেছে বুঝি —টা এই কথা!…চ্যান করুক গে যাক—কী বোঝে ওটা লেখার! আপনিও যেমন!' ব্যস, সম্পূর্ণ মন থেকে উড়িয়ে দিলেন প্রসঙ্গটা।

ক্ষণভঙ্গুরের গল্পগুলি বিভূতিবাবুর পরিণত বয়সের পাকা হাতের লেখা। শুধু 'সিঁদুরচরণ'ই নয়—'একটি কোঠাবাড়ির ইতিহাস' 'বুধোর মায়ের মৃত্যু' 'রামতারণ চাটুয্যে—অথর' প্রতিটি গল্পই বাংলাসাহিত্যে অবিস্মরণীয় রচনা হিসেবে গণ্য হবে। 'রামতারণ চাটুয্যে—অথর' গল্পের যে মূল বক্তব্য তা নিয়ে আরও দু'একটি গল্প তিনি লিখেছেন তবে তাতে এ গল্পের রসাস্বাদে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না। এর মধ্যে বিশেষ করে 'সিঁদুরচরণ' ও 'একটি কোঠাবাড়ির ইতিহাস' —বিভূতিভূষণ ছাড়া আর কেউ লিখতে পারতেন না, হয়ত আর কেউ পারবেও না। কত অনায়াসে কত অসামান্য রচনা লিখতে পারতেন তিনি এই দুটি গল্পই তার একটি নমুনা। অসংখ্য তথ্য বাদ দিয়ে সামান্য দু'একটি রেখায় মহান চিত্র অঙ্কন করতে পারেন কোন কোন আশ্চর্য শিল্পী, লেখক বিভূতিভূষণ তাঁদেরই সগোত্র।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ইছামতী

ইছামতী একটি ছোট নদী। অন্ততঃ যশোর জেলার মধ্য দিয়ে এর যে অংশ প্রবাহিত, সেটুকু। দক্ষিণে ইছামতী কুমীর-কামট-হাঙর সঙ্কুল বিরাট নোনা গাঙে পরিণত হয়ে কোথায় কোন্ সুন্দরবনে সুঁদরি-গরান গাছের জঙ্গলের আড়ালে বঙ্গোপসাগরে মিশে গিয়েচে, সে খবর যশোর জেলার গ্রাম্য অঞ্চলের কোন লোকই রাখে না।

ইছামতীর যে অংশ নদীয়া ও যশোর জেলার মধ্যে অবস্থিত, সে অংশটুকুর রূপ সত্যিই এত চমৎকার, যাঁরা দেখবার সুযোগ পেয়েচেন তাঁরা জানেন। কিন্তু তাঁরাই সবচেয়ে ভালো করে উপলব্ধি করবেন, যাঁরা অনেকদিন ধরে বাস করচেন এ অঞ্চলে। ভগবানের একটি অপূর্ব্ব শিল্প এর দুই তীর, বনবনানীতে সবুজ, পক্ষী-কাকলীতে মুখর।

মড়িঘাটা কি বাজিতপুরের ঘাট থেকে নৌকো করে চলে যেও চাঁদুড়িয়ার ঘাট পর্যন্ত—দেখতে পাবে দুধারে পলতে মাদার গাছের লাল ফুল, জলজ বন্যেবুড়োর ঝোপ, টোপাপানার দাম, বুনো তিৎপল্লা লতার হলদে ফুলের শোভা, কোথাও উঁচু পাড়ে প্রাচীন বট-অশ্বত্থের ছায়াভরা উলুটি-বাচড়া-বৈঁচ ঝোপ, বাঁশঝাড়, গাঙশালিখের গর্ত, সুকুমার লতাবিতান। গাঙের পাড়ে লোকের বসতি কম, শুধুই দূর্ব্বাঘাসের সবুজ চরভূমি, শুধুই চখা বালির ঘাট, বন-কুসুমে ভরা ঝোপ, বিহঙ্গ-কাকলী-মুখর বনান্তস্থলী। গ্রামের ঘাটে কোথাও দু'দশখানা ডিঙি নৌকো বাঁধা রয়েছে। খুব উঁচু শিমুল গাছের আঁকাবাঁকা শুকনো ডালে শকুনি বসে আছে সমাধিস্থ অবস্থায়—ঠিক যেন চীনা চিত্রকরের অঙ্কিত ছবি। কোনো ঘাটে মেয়েরা নাইচে, কাঁখে কলসী ভরে জল নিয়ে ডাঙায় উঠে, স্নানরতা সঙ্গিনীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইচে। এক-আধ জায়গায় গাঙের উঁচু পাড়ের কিনারায় মাঠের মধ্যে কোনো গ্রামের প্রাইমারী ইস্কুল; লম্বা ধরনের চালাঘর, দরমার কিংবা কঞ্চির বেড়ার ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা: আসবাবপত্রের মধ্যে দেখা যাবে ভাঙা নড়-বড়ে একখানা চেয়ার দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা, আর খানকতক বেঞ্চি।

সবুজ চরভূমির তৃণক্ষেত্রে যখন সুমুখ জ্যোৎস্নারাত্রির জ্যোৎস্না পড়বে, গ্রীষ্মদিনে সাদা থোকা থোকা আকন্দফুল ফুটে থাকবে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলবে নিকটবর্ত্তী বনঝোপ থেকে নদীর মৃদু বাতাসে, তখন নদীপথ-যাত্রীরা দেখতে পাবে নদীর ধারে পুরোনো পোড়ো ভিটের ঈষদুচ্চ পোতা, বর্ত্তমানে হয়তো আকন্দঝোপে ঢেকে ফেলেচে তাদের বেশি অংশটা, হয়তো দু-একটা উইয়ের ঢিপি গজিয়েচে কোনো কোনো ভিটের পোতায়। এই সব ভিটে দেখে তুমি স্বপ্ন দেখবে অতীত দিনগুলির, স্বপ্ন দেখবে সেই সব মা ও ছেলের, ভাই ও বোনের, যাদের জীবন ছিল একদিন এই সব বাস্তুভিটের সঙ্গে জড়িয়ে। কত সুখদুঃখের অলিখিত ইতিহাস বর্ষাকালে জলধারাঙ্কিত ক্ষীণ রেখার মত আঁকা হয় শতাব্দীতে শতাব্দীতে এদের বুকে। সূর্য্য আলো দেয়, হেমন্তের আকাশ শিশির বর্ষণ করে, জ্যোৎস্না-পক্ষের চাঁদ জ্যোৎস্না ঢালে এদের বুকে।

সেই সব বাণী, সেই সব ইতিহাস আমাদের আসল জাতীয় ইতিহাস। মূক-জনগণের ইতিহাস, রাজা-রাজড়াদের বিজয়কাহিনী নয়।

১২৭০ সালের বন্যার জল সরে গিয়েচে সবে।

পথঘাটে তখনও কাদা, মাঠে মাঠে জল জমে আছে। বিকেলবেলা ফিঙে পাখী বসে আছে বাব্‌লা গাছের ফুলে-ভর্ত্তি ডালে।

নালু পাল মোল্লাহাটির হাটে যাবে পান-সুপুরি নিয়ে মাথায় করে। মোল্লাহাটি যেতে নীলকুঠির আমলের সাহেবদের বটগাছের ঘন ছায়া পথে পথে। শ্রান্ত নালু পাল মোট নামিয়ে একটা বটতলায় বসে গামছা ঘুরিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলো।

নালুর বয়স কুড়ি-একুশ হবে। কালো রোগা চেহারা। মাথার চুল বাবরি-করা, কাঁধে রঙিন্ রাঙা গামছা—তখনকার দিনের শৌখিন বেশভূষা পাড়াগাঁয়ের। এখনো বিয়ে করে নি, কারণ মামাদের আশ্রয়ে এতদিন মানুষ হ'চ্ছিল, হাতেও ছিল না কানাকড়ি। সম্প্রতি আজ বছর-খানেক হোল নালু পাল মোট মাথায় করে পান-সুপুরি বিক্রি করে হাটে হাটে। সতেরো টাকা মূলধন তার এক মাসীমা দিয়েছিলেন যুগিয়ে। এক বছরে এই সতেরো টাকা দাঁড়িয়েছে সাতান্ন টাকায়। খেয়ে দেয়ে। নিট্ লাভের টাকা।

নালুর মন এজন্যে খুশি আছে খুব। মামার বাড়ীর অনাদরের ভাত গলা দিয়ে ইদানীং আর নামতো না। একুশ বছর বয়সের পুরুষমানুষের শোভা পায় না অপরের গলগ্রহ হওয়া। মামীমার সে কি মুখনাড়া একপলা তেল বেশী মাথায় মাখবার জন্যে সেদিন।

মুখনাড়া দিয়ে বললেন—তেল জুটবে কোথেকে অত ? আবার বাবরি চুল রাখা হয়েচে, ছেলের শখ কত—অত শখ থাকলে পয়সা রোজগার করতে হয় নিজে।

নালু পাল হয়তো ঘুমিয়ে পড়তো বটগাছের ছায়ায়, এখনো হাট বসবার অনেক দেরি, একটু বিশ্রাম করে নিতে সে পারে অনায়াসে—কিন্তু এই সময় ঘোড়ায় চড়ে একজন লোক যেতে যেতে ওর সামনে থামলো।

নালু পাল সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—রায় মশায়, ভালো আছেন ? প্রাতোপেন্নাম—

—কল্যাণ হোক। নালু যে, হাটে চললে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—একটু সোজা হয়ে বোসো। শিপ্‌টন্ সাহেব ইদিকে আসচে—

—বাবু, রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে যাবো ? বড্ড মারে শুনিচি।

—না না, মারবে কেন ? ও সব বাজে। বোসো এখানে।

—ঘোড়ায় যাবেন ?

—না, বোধ হয় টম্‌টমে্। আমি দাঁড়াবো না।

মোল্লাহাটি নীলকুঠির বড় সাহেব শিপ্‌টন্‌কে এ অঞ্চলে বাঘের মত ভয় করে লোকে। লম্বাচওড়া চেহারা, বাঘের মত গোল মুখখানা, হাতে সর্ব্বদাই চাবুক থাকে। এ অঞ্চলের লোক চাবুকের নাম রেখেছে 'শ্যামচাঁদ'। কখন কার পিঠে 'শ্যামচাঁদ' অবতীর্ণ হবে তার কোন স্থিরতা না থাকাতে সাহেব রাস্তায় বেরুলে সবাই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে।

এমন সময়ে আর একজন হাটুরে দোকানদার সতীশ কলু, মাথায় সর্ষে তেলের বড় ভাঁড় চ্যাঙারিতে বসিয়ে সেখানে এসে পড়লো। রাস্তার ধারে নালুকে দেখে বললে—চলো, যাবা না?

—বোসো। তামাক খাও।

—তামাক নেই।

—আমার আছে। দাঁড়াও, শিপ্‌টন্‌ সাহেব চলে যাক আগে।

—সায়েব আসচে কেডা বললে?

—রায় মশায় বলে গ্যালেন—বোসো—

হঠাৎ সতীশ কলু সামনের দিকে সভয়ে চেয়ে দেখে ষাঁড়া আর শেওড়া ঝোপের পাশ দিয়ে নিচের ধানের ক্ষেতের মধ্যে নেমে গেল। যেতে যেতে বললে—চলে এসো, সায়েব বেরিয়েচে—

নালু পাল পানের মোট গাছতলায় ফেলে রেখেই সতীশ কলুর অনুসরণ করলে। দূরে ঝুমঝুম্‌ শব্দ শোনা গেল টম্‌টমের ঘোড়ার। একটু পরে সামনের রাস্তা কাঁপিয়ে সাহেবের টম্‌টম্‌ কাছাকাছি এসে পড়লো এবং থাম্‌বি তো থাম্‌ একেবারে নালু পালের আশ্রয়স্থল ওদের বটতলার ওদের সামনে।

বটতলায় পানের মোট মালিকহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সাহেব হেঁকে বললে—এই! মোট কাহার আছে?

নালু পাল ও সতীশ কলু ধানগাছের আড়ালে কাঠ হয়ে গিয়েচে ততক্ষণ। কেউ উত্তর দেয় না।

টম্‌টমের পেছন থেকে নফর মুচি আরদালি হাঁকল—কার মোট পড়ে রে গাছতলায়?

সাহেব বললে—উট্টর ডাও—কে আছে?

নালু পাল কাঁচুমাচু মুখে জোড় হাতে রাস্তায় উঠে আসতে আসতে বললে—সায়েব, আমার।

সাহেব ওর দিকে চেয়ে চুপ করে রইল। কোনো কথা বললে না।

নফর মুচি বললে—তোমার মোট?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি করছিলে ধানক্ষেতে?

—আজ্ঞে—আজ্ঞে—

সাহেব বললে—আমি জানে। আমাকে ডেখে সব লুকায়। আমি সাপ আছি না বাঘ আছি। হ্যাঁ?

প্রশ্নটা নালু পালের মুখের দিকে তাকিয়েই, সুতরাং নালু পাল ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলে—না সাহেব।

—ঠিক। মোট কিসের আছে?

—পানের, সাহেব।

—মোল্লাহাটির হাটে নিয়ে যাচ্ছে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি নাম আছে টোমার ?

—আজ্ঞে, শ্রীনালমোহন পাল।

—মাথায় করো। ভবিষ্যতে আমায় ডেখে লুকাবে না। আমি বাঘ নই, মানুষ খাই না। যাও—বুঝলে।

—আজ্ঞে—

সাহেবের টম্‌টম্ চলে গেল। নালু পালের বুক তখনো ঢিপ্‌ঢিপ্ করচে। বাবাঃ, এক ধাক্কা সামলানো গেল বটে আজ। সে শিস দিতে দিতে ডাকলো—ও সতীশ খুড়ো।

সতীশ কলু ধানগাছের আড়ালে আড়ালে রাস্তা থেকে আরও দূরে চলে গিয়েছিল। ফিরে কাছে আসতে আসতে বললে—যাই।

—বাবাঃ, কতদূর পালিয়েছিলে ? আমায় ডাকতে দেখে বুঝি দৌড় দিলে ধানবন ভেঙে ?

—কি করি বলো। আমরা হলাম গরীব-গুরবো লোক। শ্যামচাঁদ পিঠে বসিয়ে দিলে করচি কি তাই বলো দিনি। কি বললে সায়েব তোমারে ?

—বললে ভালোই।

—তোমারে রায় মশাই কি বলছিল ?

—বলছিল, সায়েব আসচে। সোজা হয়ে বোসো।

—তা বলবে না ? ওরাই তো সায়েবের দালাল। কুটি-র দেওয়ানি করে সোজা রোজগারটা করেচে রায় মশাই ! অতবড় দোমহলা বাড়ীটা তৈরী করলে সে বছর।

রায় মশায়ের পুরো নাম রাজারাম রায়। মোল্লাহাটি নীলকুঠির দেওয়ান। সাহেবের খয়েরখাঁই ও প্রজাপীড়নের জন্যে এদেশের লোক যেমন ভয় করে, তেমনি ঘৃণা করে। কিন্তু মুখে কারো কিছু বলবার সাহস নেই। নিকটবর্তী পাঁচপোতা গ্রামে বাড়ী।

বিকেলের সূর্য্য বাগানের নিবিড় সবুজের আড়ালে ঢলে পড়েচে, এমন সময় রাজারাম রায় নিজের বাড়ীতে ঢুকে ঘোড়া থেকে নামলেন। নফর মুচির এক খুড়তুতো ভাই ভজা মুচি এসে ঘোড়া ধরলে। চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চেয়ে দেখলেন অনেকগুলো লোক সেখানে জড়ো হয়েচে। নীলকুঠির দেওয়ানের চণ্ডীমণ্ডপে অমন ভিড় বারো মাসই লেগে আছে। কত রকমের দরবার করতে এসেচে নানা গ্রামের লোক, কারো জমিতে ফসল ভেঙে নীল বোনা হয়েচে জোর-জবরদস্তি করে, কারো নীলের দাদনের জন্যে যে জমিতে দাগ দেওয়ার কথা ছিল তার বদলে অন্য এবং উৎকৃষ্টতর জমিতে কুঠির আমীন গিয়ে নীল বোনার জন্যে চিহ্নিত করে এসেচে—এই সব নানা রকমের নালিশ।

নালিশের প্রতিকার হোত। নতুবা দেওয়ানের চণ্ডীমণ্ডপে লোকের ভিড় জমতো না রোজ রোজ। তার জন্যে ঘুষ-ঘাষের ব্যবস্থা ছিল না। রাজারাম রায় কারো কাছে ঘুষ

নেবার পাত্র ছিলেন না, তবে কার্য্য অন্তে কেউ একটা রুই মাছ, কি বড় একটু মানকচু কিংবা দু'ভাঁড় খেজুরের নলেন্ গুড় পাঠিয়ে দিলে ভেটস্বরূপ, তা তিনি ফেরৎ দেন বলে শোনা যায় নি।

রাজারামের স্ত্রী জগদম্বা এক সময়ে বেশ সুন্দরী ছিলেন, পরনে লালপেড়ে তাঁতের কোরা শাড়ি, হাতে বাউটি পৈঁছে, লোহার খাড়ু ও শাঁখা, কপালে চওড়া করে সিঁদুর পরা, দোহারা চেহারার গিন্নিবান্নি মানুষটি।

জগদম্বা এগিয়ে এসে বললেন—এখন বাইরে বেরিও না। সন্দে-আহ্নিক সেরে নাও আগে।

রাজারাম হেসে স্ত্রীর হাতে ছোট একটা থলি দিয়ে বললেন—এটা রেখে দাও। কেন, কিছু জলপান আছে বুঝি?

—আছেই তো। মুড়ি আর ছোলা ভেজেচি।

—বাঃ বাঃ, দাঁড়াও আগে হাত পা ধুয়ে নিই। তিলু বিলু নিলু কোথায়?

—তরকারি কুটচে।

—আমি আসচি। তিলুকে জল দিতে বলো।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর রাজারাম আহ্নিক করতে বসলেন রোয়াকের একপ্রান্তে। তিলু এসে আগেই সেখানে একখানা কুশাসন পেতে দিয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে সন্ধ্যা-আহ্নিক করলেন—ঘণ্টাখানেক প্রায়। অনেক কিছু স্তব-স্তোত্র পড়লেন।

এত দেরি হওয়ার কারণ এই, সন্ধ্যা-গায়ত্রী শেষ করে রাজারাম বিবিধ দেবতার স্তবপাঠ করে থাকেন। দেবদেবীর মধ্যে প্রতিদিন তুষ্ট রাখা উচিত মনে করেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, রক্ষাকালী, সিদ্ধেশ্বরী ও মা মনসাকে। এঁদের কাউকে চটালে চলে না। মন খুঁত-খুঁত করে। এঁদের দৌলতে তিনি করে খাচ্চেন। আবার পাছে কোন দেবী শুনতে না পান, এজন্যে তিনি স্পষ্টভাবে টেনে টেনে স্তব উচ্চারণ করে থাকেন।

তিলু এসে বললে—দাদা, ডাব খাবে এখন?

—না। মিছরির জল নেই?

—মিছরি ঘরে নেই দাদা।

—ডাব থাক্, তুই জলপান নিয়ে আয়।

তিলু একটা কাঁসার জামবাটিতে মুড়ি ও ছোলাভাজা সর্ষের তেল দিয়ে জবজবে করে মেখে নিয়ে এলো—সে জামবাটিতে অন্তত আধ কাঠা মুড়ি ধরে। বিলু নিয়ে এলো একটা কাঁসার থালায় একখানা খাজা কাঁঠালের কোষ। নিলু নিয়ে এলো এক ঘটি জল ও একটা পাথরের বাটিতে আধ পোয়াটাক খেজুর গুড়।

রাজারাম নিলুকে সস্নেহে বললেন—বোস নিলু, কাঁটাল খাবি?

—না দাদা। তুমি খাও, আমি অনেক খেয়েচি।

—বিলু নিবি?

—তুমি খাও দাদা।

জগদম্বা এতক্ষণে আহ্নিক সেরে এসে স্বামীর কাছে বসলেন—তুমি সারাদিন খেটেখুটে এলে, খাও না জলপান। না খেলে বাঁচবে কিসে? পোড়ারমুখো সাহেবের কুঠিতে তো ভূতোনন্দী খাটুনী।

রাজারাম বললে—কাঁচালঙ্কা নেই? আনতে বলো।

—বাতাস করবো? ও তিলু, তোর ছোট বৌদিদির কাছ থেকে কাঁচালঙ্কা চেয়ে আন—ডালে ধরা গন্ধ বেরুলো কেন ছাখো না, ও নেত্য পিসি? ছোট বউ গিয়ে ছাখো তো—

জগদম্বা কাছে বসে বাতাস করতে করতে বললেন—ওগো, জলপান খেয়ে বাইরে যেও না, একটা কথা আছে—

—কি?

—বলচি। ঠাকুরঝিরা চলে যাক।

—চলে গিয়েচে। ব্যাপার কি?

—একটি সুপাত্র এসেচে এই গ্রামে। ঠাকুরঝিদের বিয়ের চেষ্টা ছাখো।

—কে বলো তো?

—সন্নিসি হয়ে গিইছিল। বেশ সুপুরুষ। চন্দ্র চাটুয্যের দূর সম্পর্কের ভাগ্নে। সে কাল চলে যাবে শুনচি—একবার যাও সেখানে—

—তুমি কি করে জানলে?

—আমাকে দিদি বলে গেলেন যে। দুবার এসেছিলেন আমার কাছে।

—দেখি।

—দেখি বললে চলবে না। তিলুর বয়েস হোল তিরিশ। বিলুর সাতাশ। এর পরে আর পাত্তর জুটবে কোথা থেকে শুনি? নীলকুঠির কিচিরমিচির একদিন বন্ধ রাখলেও ক্ষেতি হবে না।

—তাই যাই তবে। চাদরখানা ছাও। তামাক খেয়ে তবে বেরুবো।

চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দিয়ে গেলেন না, যাওয়াব উপায় থাকবে না। মহরালি মণ্ডলের সম্পত্তি ভাগের দিন, তিনিই ধার্য্য করে দিয়েচেন। ওরা এতক্ষণ ঠিক এসে বসে আছে—রমজান, সুকুর, প্রহ্লাদ মণ্ডল, বনমালী মণ্ডল প্রভৃতি মুসলমান পাড়ার মাতব্বর লোকেরা। ও পথে গেলে এখন বেরতে পারবেন না তিনি।

চন্দ্র চাটুয্যে গ্রামের আর একজন মাতব্বর লোক। সত্তর-বাহাত্তর বিঘে ব্রহ্মোত্তর জমির আয় থেকে ভালো ভাবেই সংসার চলে যায়। পাঁচপোতা গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার কেউই চাকরি করেন না। কিছু না কিছু জমিজমা সকলেরই আছে। সন্ধ্যার পর নিজ নিজ চণ্ডীমণ্ডপে পাশা-দাবার আড্ডায় রাত দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত কাটানো এঁদের দৈনন্দিন অভ্যাস।

চন্দ্র চাটুয্যে রাজারামকে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা করে বললেন—বাবাজি এসো। মেঘ না চাইতে জল! আজ কি মনে করে? বো'সো বোসো। একহাত হয়ে যাক।

নীলমণি সমাদ্দার বলে উঠলেন—দেওয়ানজি যে, এদিকে এসে মন্ত্রীটা সামলাও তো দাদাভাই—

ফণী চক্কত্তি বললেন—আমার কাছে বোসো ভাই, এখানে এসো। তামাক সাজবো?

রাজারাম হাসিমুখে সকলকেই আপ্যায়িত করে বললেন—বোসো দাদা! চন্দর কাকা, আপনার এখানে দেখচি মস্ত আড্ডা—

চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—আসো না তো বাবাজি কোনোদিন? আমরা পড়ে আছি একধারে, দ্যাখো না তো চেয়ে।

রাজারাম শতরঞ্চির ওপর পা দিতে না দিতে প্রত্যেকে আগ্রহের সঙ্গে সরে বসে তাঁকে জায়গা করে দিতে উদ্যত হোল। নীলমণি সমাদ্দার অপেক্ষাকৃত হীন অবস্থার গৃহস্থ, সকলের মন রেখে কথা না বললে তাঁর চলে না। তিনি বললেন—দেওয়ানজি আসবে কি, ওর নিজের চণ্ডীমণ্ডপে রোজ সন্ধেবেলা কাছারি বসে। আসামী ফরিয়াদীর ভিড় ঠেলে যাওয়া যায় না। ও কি দাবার আড্ডায় আসবার সময় করতে পারে?

ফণী চক্কত্তি বললেন—সে আমরা জানি। তুমি নতুন করে কি শোনালে কথা।

নীলমণি বললেন—দাবায় পাকা হাত। একহাত খেলবে ভায়া?

রাজারাম এগিয়ে এসে হুঁকো নিলেন ফণী চক্কত্তির হাত থেকে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ চন্দ্র চাটুয্যের সামনে তামাক খাবেন না বলে চণ্ডীমণ্ডপের ভেতরের ঘরে হুঁকো হাতে ঢুকে গেলেন এবং খানিক পরে এসে নীলমণির হাতে হুঁকো দিয়ে পূর্ব্বস্থানে বসলেন।

দাবা খেলা শেষ হোল। রাত দশটারও বেশি। লোকজন একে একে চলে গেল।

চন্দ্র চাটুয্যেকে রাজারাম তাঁর আগমনের কারণ খুলে বললেন। চন্দ্র চাটুয্যের মুখ উজ্জ্বল দেখালো।

রাজারামের হাত ধরে বললেন—এইজন্যে বাবাজির আসা? এ কঠিন কথা কি। কিন্তু একটা কথা বাবা। ভবানী সন্নিসি হয়ে গিইছিল, তোমাকে সে কথাটা আমার বলা দরকার।

—বাড়ী গিয়ে আপনার বৌমাদের কাছে বলি। তিলুকে জানাতে হবে, ওরাই জানাবে—

—বেশ।

পরে সুর নিচু করে বললেন—একটা কথা বলি। ভবানীকে এখানে বাস করাবো এই আমার ইচ্ছে। তুমি গিয়ে তোমার তিনটি বোনের বিয়েই ওর সঙ্গে দাও গিয়ে—বালাই চুকে যাক। পাঁচবিঘে ব্রহ্মোত্তর জমি যতুক দেবে। এখুনি সব ঠিক করে দিচ্চি—

রাজারাম চিন্তিত মুখে বললেন—বাড়ী থেকে না জিগ্যেস করে কোনো কিছুই বলতে পারবো না কাকা। কাল আপনাকে জানাবো।

—তুমি নির্ভয়ে বিয়ে দাও গিয়ে। আমার ভাগ্নে বলে বল চনে। কাটাদ' বন্দিঘাটির বাঁড়ুরি, এক পুরুষে ভঙ্গ, ঘটকের কাছে কুলুজি শুনিয়ে দেবো এখন। জলজ্যান্ত কুলীন, একডাকে সকলে চেনে।

—বয়েস কতো হবে পাত্তরের?

—তা পঞ্চাশের কাছাকাছি। তোমার বোন্‌দেরও তো বয়স কম নয়। ভবানী সন্নিসি না হয়ে গেলি এতদিনে সাতছেলের বাপ। ছাখো আগে তাকে—নদীর ধারে রোজ এক ঘণ্টা সন্ধে-আহ্নিক করে, তারপর আপন মনে বেড়ায়, এই চেহারা! এই হাতের গুল্!

—ভবানী রাজি হবেন তিনটি বোনকে এক সঙ্গে বিয়ে করতে?

—সে ব্যবস্থা বাবাজি, আমার হাতে। তুমি নিশ্চিন্দি থাকো।

একটু অন্ধকার হয়েছিল বাঁশবনের পথে। জোনাকি জ্বলছে কুঁচ আর বাবলা গাছের নিবিড়তার মধ্যে। ছাতিম ফুলের গন্ধ ভেসে আসচে বনের দিক থেকে।

অনেক রাত্রে তিলোত্তমা কথাটা শুনলে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেচে নদীর দিকের বাঁশ-ঝাড়ের পেছন দিয়ে। ছোট বোন বিলুকে ডেকে বললে—ও বিলু, বৌদিদি তোকে কিছু বলেচে?

—বলবে না কেন? বিয়ের কথা তো?

—আ মরণ, পোড়ার মুখ, লজ্জা করে না?

—লজ্জা কি? ধিঙ্গি হয়ে থাকা খুব মানের কাজ ছিল বুঝি?

—তিনজনকেই একক্ষুরে মাথা মুড়ুতে হবে, তা শুনেচ তো?

—সব জানি।

—রাজী?

—সত্যি কথা যদি বলতে হয়, তবে আমার কথা এই যে—হয় তো হয়ে যাক্।

—আমারও তাই মত। নিলুর মতটা কাল সকালে নিতে হবে।

সে আবার কি বলবে, ছেলেমানুষ, আমরা যা করবো সেও তাতে মত দেবেই।

তিলু কত রাত পর্য্যন্ত ছাদে বসে ভাবলে। ত্রিশবছর তার বয়েস হয়েচে। স্বামীর মুখ দেখা ছিল অস্বপনের স্বপন। এখনো বিশ্বাস হয় না; সত্যিই তার বিয়ে হবে? স্বামীর ঘরে সে যাবে? বোনেদের সঙ্গে, তাই কি? ঘরে ঘরে তো এমনি হচ্চে। চন্দ্রকাকার বাপের সতেরোটা বিয়ে ছিল। কুলীন ঘরে অমন হয়েই থাকে। বিয়ের দিন কবে ঠিক করেচে দাদা কে জানে। বরের বয়স পঞ্চাশ তাই কি, সে নিজে কি আর খুকি আছে এখন।

উৎসাহে পড়ে রাত্রে তিলুর ঘুম এল না চক্ষে। কি ভীষণ মশার গুঞ্জন বনে ঝোপে!

তিলু যে সময় ছাদে একা বসে রাত জাগছিল, সে সময় নালু পাল মোল্লাহাটির হাট থেকে ফিরে নিজের হাতে রান্না করে খেয়ে তবিল মিলিয়ে শুয়ে পড়েচে সবে।

নালু এক ফন্দি এনেচে মাথায়।

ব্যবসা কাজ সে খুব ভাল বোঝে এ ধারণা আজই তার হল। সাতটাকা ন'আনার পান-সুপুরি বিক্রি হয়েচে আজ। নিট লাভ একটাকা তিন আনা। খরচের মধ্যে কেবল দু'আনার

আড়াইসের চাল, আর ছ'পয়সার গাঙের টাট্‌কা খয়রামাছ একপোয়া। আধসের মাছই নেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অত মাছ ভাজবার তেল নেই। সর্ষের তেল ইদানীং আক্রা হয়ে পড়েচে বাজারে, তিন আনা সের ছিল, হয়ে দাঁড়িয়েচে চোদ্দ পয়সা; কি করে বেশি তেল খরচ করে সে?

হাতের পুঁজি বাড়াতে হবে। পান-সুপুরি বিক্রি করে উন্নতি হবে না। উন্নতি আছে কাটা কাপড়ের কাজে। মুকুন্দ দে তার বন্ধু, মুকুন্দ তাকে বুঝিয়ে দিয়েচে। ত্রিশটা টাকা হাতে জম্‌লে সে কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করে দেবে।

নালু পালের ঘুম চলে গেল। মামার বাড়ীতে গলগ্রহ হয়ে থাকার দায় থেকে সে বেঁচেছে। এখন সে আর ছেলেমানুষ নয়, মামীমার মুখনাড়ার সঙ্গে ভাত হজম করবার বয়েস তার নেই। নিজের মধ্যে সে অদম্য উৎসাহ অনুভব করে। এই ঝিঁঝিঁপোকার-ডাকে-মুখর জ্যোৎস্নালোকিত ঘুমন্ত রাত্রে অনেক দূর পর্য্যন্ত যেন সে দেখতে পাচ্চে। জীবনের কত দূরের পথ।

রাজারাম সকালে উঠেই ঘোড়া করে নীলকুঠিতে চলে গেলেন। নীলকুঠি যাবার পথটি ছায়াস্নিগ্ধ, বনের লতাপাতায় শ্যামল। যজ্ঞিডুমুর গাছের ডালে পাখীর দল ডাকচে কিচ্‌কিচ্ করে, জ্যৈষ্ঠের শেষে এখনো ঝাড়-ঝাড় সোঁদালি ফুল মাঠের ধারে।

নীলকুঠির ঘরগুলি ইছামতী নদীর ধারেই। বড় থামওয়ালা সাদা কুঠিটা বড়সাহেব শিপ্‌টনের। রাজারাম শিপ্‌টনের কুঠির অনেক দূরে ঘোড়া থেকে নেমে ঝাউগাছে ঘোড়া বেঁধে কুঠির সামনে গেলেন, এবং উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে পায়ের জুতো জোড়া খুলে রেখে ঘরের মধ্যে বড় হলে প্রবেশ করলেন।

শিপ্‌টন্ ও তাঁর মেম বাদে আর একজন কে সাহেব হলে বসে আছে। শিপ্‌টন্ বললেন —দেওয়ান, এডিকে এসো—Look here, Grant, this is our Dewan Roy—

অন্য সাহেবটি আহেলা বিলিতি। নতুন এসেচেন দেশ থেকে। বয়েস ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে, পাদ্রীদের মত উঁচু কলার পরা, বেশ লম্বা দোহারা গড়ন। এঁর নাম কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যাণ্ট, দেশভ্রমণ করতে ভারতবর্ষে এসেচেন। খুব ভালো ছবি আঁকেন এবং বইও লেখেন। সম্প্রতি বাংলার পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে বই লিখচেন। মিঃ গ্র্যাণ্ট মুখ তুলে দেওয়ানের দিকে চেয়ে হেসে বললেন—Yes, he will be a fine subject for my sketch of a Bengalee gentleman, with his turban—

শিপ্‌টন্ সাহেব বললেন—That is a Shamla, not a turban—

—I would never manage it. Oh!

—You would, with his turban and a good bit of roguery that he has—

—In human nature I believe so far as I can see him—no more.

—All right, all right—please yourself—

মিসেস্ শিপ্‌টন্—I am not going to see you fall out with each other—wicked men than you are!

মিঃ গ্র্যাণ্ট হেসে বললেন—So I beg your pardon, madam!

এই সময় ভজা মুচির দাদা শ্রীরাম মুচি বেয়ারা সাহেবদের জন্যে কল্কি নিয়ে এল। সাহেবদের চাকর বেয়ারা সবই স্থানীয় মুচি বাগ্দী প্রভৃতি শ্রেণী থেকে নিযুক্ত হয়। তাদের মধ্যে মুসলমান নেই বললেই হয়, সবই নিম্নবর্ণের হিন্দু। দু-একটি মুসলমান থাকেও অনেক সময়, যেমন এই কুঠিতে মাদার মণ্ডল আছে, ঘোড়ার সহিস।

রাজারাম দাঁড়িয়ে গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছিলেন? শিপ্‌টন্ বললেন—টুমি যাও ডেওয়ান। টোমাকে ডেখে ইনি ছবি আঁকিটে ইচ্ছা করিটেছেন। টোমাকে আঁকিটে হইবে।

—বেশ হুজুর।

—ডাডন খাটাগুলো একবার ডেখে রাখো।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দপ্তরখানায় কার্যরত রাজারামকে শ্রীরাম মুচি এসে ডাকলে—রায় মশায়, আপনাকে ডাকচে। সেই নতুন সায়েব আপনাকে দেখে ছবি আঁকবে—ওই দেখুন দুপুরে রোদে নদীর ধারে বিলিতি গাছতলায় কি সব টেঙিয়েছে। গিয়ে দেখুন রগড়! রায় মশায়, বড় সাহেবকে বলে মোরে একটা ট্যাকা দিতে বলুন। ধানের দর বেড়েচে, ট্যাকায় আট কাঠার বেশি ধান দেচ্ছে না। সংসার চলচে না।

—আচ্ছা, দেখবো এখন। বড় সাহেবকে বল্লি হবে না। ডেভিড সাহেবকে বলতি হবে।

রাজারাম রায় বিপন্ন মুখে নদীর ধারে গাছতলায় এসে দাঁড়ালেন। গাছটা হোল ইণ্ডিয়ান-কর্ক গাছ। শিপ্‌টন্ সাহেবের আগে যিনি বড় সাহেব ছিলেন, তিনি পাটনা জেলার নারাণগড় নীলকুঠিতে প্রথমে ম্যানেজার ছিলেন। শখ করে এই গাছটি সেখান থেকে এনে বাংলার মাটিতে রোপণ করেন। সে আজ পঁচিশ বছর আগেকার কথা। এখন গাছটি খুব বড় হয়েচে, ডালপালা বড় হয়ে নদীর জলে ঝুঁকে পড়েচে। এ অঞ্চলে এ জাতীয় বৃক্ষ অদৃষ্টপূর্ব্ব, সুতরাং জনসাধারণ এর নাম দিয়েচে বিলিতি গাছ।

রাজারাম তো বিলিতি গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। নাঃ, মজা দ্যাখো একবার। এ সব কি কাণ্ড রে বাপু। ওটা আবার কি খাটিয়েচে? ব্যাপার কি? রাজারাম হেসে ফেলতেন, কিন্তু শিপ্‌টন্ সাহেবের মেম ওখানে উপস্থিত। মাগী কি করে এখানে, ভালো বিপদ!

কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যাণ্ট এক টুকরো রঙিন পেন্সিল হাতে নিয়ে টাঙানো ক্যানভাসের এপাশে ওপাশে গিয়ে দুবার কি দেখলেন। মেমসাহেবকে বললেন—Will he be so good as to stand erect and stand still, say for ten minutes, madam?

মেম বললেন—সোজা হইয়া ডাঁড়াও ডেওয়ান।

—আচ্ছা হুজুর।

রাজারাম কাঁচুমাচু মুখে খাড়া হয়ে পিঠ টান করে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতেই গ্র্যাণ্ট সাহেব বললেন—No, no, your Dewan wears a theatrical mask, madam. Will he just stand at ease ?

মেমসাহেব হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন—অটখানি লম্বা হয় না। বুক ঠিক করো।

রাজারাম এ অদ্ভুত বাংলার অর্থগ্রহণ করতে না পেরে আরও পিঠ টান করে বুক চিতিয়ে উল্টোদিকে ধনুক করে ফেলবার চেষ্টা করলেন দেহটাকে।

গ্র্যাণ্ট সাহেব হেসে উঠলেন—Oh, no, my good man! this is how—বলে নিজেই রাজারামের কাছে গিয়ে তাকে হাত দিয়ে ঠেলে সামনের দিকে আর একটু ঝুঁকিয়ে সিধে করে দাঁড করিয়ে দিলেন।

—I hope to goodness, he will stick to this! God's death!

তখনি মেমসাহেবের দিকে চেয়ে বললেন—I ask your pardon madam, for my words a moment ago.

মেমসাহেব বললেন—Oh, you wicked man!

রাজারাম এবার ঠিক হয়ে দাঁড়ালেন। ছবিওয়ালা সাহেবটা প্রাণ বের করে দিয়েছে, মেমসাহেবের সামনে, বাবাঃ! আবার ছুঁয়ে দিল! ভেবে ছিলেন আজ আর নাইবেন না। কিন্তু নাইতেই হবে। সাহেব-টায়েব ওরা ম্লেচ্ছ, অখাদ্য কুখাদ্য খায়। না নাইলে ঘরে ঢুকতেই পারবেন না।

ঘণ্টা খানেক পরে তিনি রেহাই পেয়ে বাঁচলেন। বা রে, কি চমৎকার করেচে সাহেবটা! অবিকল তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তবে এখনো মুখ চোখ হয়নি। ওবেলা আবার আসতে বলেচে। আবার ওবেলা ছোঁবে না কি ? অবেলায় তিনি আর নাইতে পারবেন না।

কোল্‌সওয়ার্দি গ্র্যাণ্ট বিকেলে পাঁচ-পোতার বাঁওড়ের ধারের রাস্তা ধরে বড় টম্‌টমে বেড়াতে বার হলেন। সঙ্গে ছোট সাহেব ডেভিড ও শিপ্‌টন্ সাহেবের মেম। রাস্তাটি সুন্দর ও সোজা। একদিকে স্বচ্ছতোয়া বাঁওড় আর একদিকে ফাঁকা মাঠ, নীলের ক্ষেত, আউশ ধানের ক্ষেত। গ্র্যাণ্ট সাহেব শুধু ছবি-আঁকিয়ে নয়, কবি ও লেখকও। তাঁর চোখে পল্লী-বাংলার দৃশ্য এক নতুন জগৎ খুলে দিলে। বন্ধহীন উদাস মাঠের মধ্যে ফুল-ভর্ত্তি সোঁদালি গাছের রূপ, ফুল-ফোটা বন-ঝোপে অজানা বন-পক্ষীর কাকলী—এসব দেখবার চোখ নেই ওই হাঁদামুখো ডেভিডটার কি গোঁয়ার-গোবিন্দ শিপ্‌টনের। ওরা এসেচে গ্রাম্য ইংলণ্ডের চাষাভুষো পরিবার থেকে। ওয়েস্টার্ন মিড্‌ল্যাণ্ডের রাই ও কেম্বারিংফোর্ড গ্রাম থেকে। এখানে নীলকুঠির বড় ম্যানেজার না হোলে ওরা প্যান্টক্‌স্ ম্যানরের জমিদারের অধীনে লাঙল চষতো নিজের নিজের ফার্ম্ম হাউসে। দরিদ্র কালা আদমীদের ওপর এখানে রাজা সেজে বসে আছে। হায় ভগবান! তিনি এসেছেন দেশ দেখতে শুধু নয়, একখানা বই লিখবেন বাংলা দেশের এই জীবন নিয়ে। এখানকার লোকজনের, এই

চমৎকার নদীর, এই অজানা বনদৃশ্যের ছবি আঁকবেন সেই বইতে। ইতিমধ্যে সে বইয়ের পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এসে গিয়েচে। নাম দেবেন, "Anglo-Indian life in Rural Bengal"। অনেক মাল-মশলা যোগাড়ও করে ফেলেচেন।

ঠিক সেই সময় নালু পাল মোল্লাহাটির হাট থেকে মাথায় মোট নিয়ে ফিরচে। আগের হাটের দিন সে যা লাভ করেছিল, আজ লাভ তার দ্বিগুণ। বেশ চেঁচিয়ে সে গান ধরেছে—

'হৃদয়-রাসমন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হয়ে—'

এমন সময় পড়ে গেল গ্র্যাণ্ট সাহেবের সামনে। গ্র্যাণ্ট সাহেব ডেভিডকে বললেন—লোকটাকে ভালো করে দেখি। একটু থামাও। বাঃ বাঃ, ও কি করে?

ডেভিড সায়েব একেবারে বাঙালী হয়ে গিয়েচে কথাবার্ত্তার ধরনে। ঠিক এ দেশের গ্রাম্য লোকের মত বাংলা বলে। অনেকদিন এক জায়গাতে আছে। সে মেমসায়েবের দিকে চেয়ে হেসে বললে—He can have his old yew cut down, can't he, madam?

পরে নালু পালের দিকে চেয়ে বললে—বলি ও কর্ত্তা, দাঁড়াও তো দেখি—

নালু পাল আজ একেবারে বাঘের সামনে পড়ে গিয়েচে। তবে ভাগ্যি ভালো, এ হোল ছোট সাহেব, লোকটি বড় সাহেবের মত নয়, মারধোর করে না। মেমটা কে? বোধ হয় বড় সাহেবের।

নালু পাল দাঁড়িয়ে পড়ে বললে—আজ্ঞে, সেলাম। কি বলচেন?

—দাঁড়াও ওখানে।

গ্র্যাণ্ট সাহেব বললেন—ও কি একটু দাঁড়াবে এখানে? আমি একটু ওকে দেখে নিই।

ডেভিড বললে—দাঁড়াও এখানে। তোমাকে দেখে সাহেব ছবি আঁকবে।

গ্র্যাণ্ট সাহেব বললে—ও কি করে? বেশ লোকটি! খাসা চেহারা। চলো যাই।

—ও আমাদের হাটে জিনিস বিক্রি করতে এসেছিল। You won't want him any more?

—No, I want to thank him, David, or shall I—

গ্র্যাণ্ট সাহেব পকেটে হাত দিতে যেতেই ডেভিড্ তাড়াতাড়ি নিজের পকেট থেকে একটা আধুলি বার করে নালু পালের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—নাও, সায়েব তোমাকে বক্‌শিশ করলেন—

নালু পাল অবাক হয়ে আধুলিটা ধুলো থেকে কুড়িয়ে নিয়ে বল্লে—সেলাম, সায়েব। আমি যেতে পারি?

—যাও।

সুন্দর বিকেল সেদিন নেমেছিল পাঁচপোতার বাঁওড়ের ধারে। বন্যপুষ্প সুরভিত হয়েছিল ঈষত্তপ্ত বাতাস। রাঙা মেঘের পাহাড় ফুটে উঠেছিল অস্ত-আকাশপটে দূরবিস্তৃত আউশ ধানের সবুজ ক্ষেতের ও-প্রান্তে। কিচমিচ করছিল গাঙ্‌শালিক ও দোয়েল পাখীর ঝাঁক।

কোল্‌সওয়ার্দি গ্র্যান্ট কতক্ষণ একদৃষ্টে অস্তদিগন্তের পানে চেয়ে রইলেন। তাঁর মনে একটি শান্ত গভীর রসের অনুভূতি জেগে উঠলো। বহুদূর নিয়ে যায় সে অনুভূতি মানুষকে। আকাশের বিরাটত্বের সচেতন স্পর্শ আছে সে অনুভূতির মধ্যে। দূরাগত বংশীধ্বনির সুস্বরের মত করুণ তার আবেদন।

গ্র্যান্ট সাহেব ভাবলেন, এই তো ভারতবর্ষ। এতদিন ঘুরে মরেচেন, বোম্বাই, পুনা ক্যান্টন্‌মেন্টের পোলো খেলার মাঠে আর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের ক্লাবে। এরা এক অদ্ভুত জীব। এদেশে এসেই এমন অদ্ভুত জীব হয়ে পড়ে যে কেন এরা! যে ভারতবর্ষের কথা তিনি 'শকুন্তলা' নাটকের মধ্যে পেয়েছিলেন (মনিয়ার উইলিয়াম্‌সের অনুবাদে), যে ভারতবর্ষের খবর পেয়েছিলেন এড্‌উইন আর্নল্ডের কাব্যের মধ্যে, যা দেখতে এতদূরে তিনি এসেছিলেন—এতদিন পরে এই ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীতীরের অপরাহ্ণটিতে সেই অনিন্দ্যসুন্দর মহাকবিত্বময় সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের সন্ধান পেয়েচেন। সার্থক হোল তাঁর ভ্রমণ!

রাজারামের ভগ্নী তিনটির বয়স যথাক্রমে ত্রিশ, সাতাশ ও পঁচিশ। তিলুর বয়স সবচেয়ে বেশি বটে কিন্তু তিন ভগ্নীর মধ্যে সে-ই সবচেয়ে দেখতে ভালো, এমন কি তাকে সুন্দরী-শ্রেণীর মধ্যে সহজেই ফেলা যায়। রঙ অবিশ্যি তিন বোনেরই ফর্সা, রাজারাম নিজেও বেশ সুপুরুষ, কিন্তু তিলুর মধ্যে পাকা সবরি কলার মত একটু লাল্‌চে ছোপ থাকায় উনুনের তাতে কিংবা গরম রৌদ্রে মুখ রাঙা হয়ে উঠলে বড় সুন্দর দেখায় ওকে। তন্বী, সুঠাম, সুকেশী,—বড় বড় চোখ, চমৎকার হাসি। তিলুর দিকে একবার চাইলে হঠাৎ চোখ ফেরানো যায় না। তবে তিলু শান্ত পল্লীবালিকা, ওর চোখে যৌবনচঞ্চল কটাক্ষ নেই, বিয়ে হোলে এতদিন ছেলেমেয়ের মা ত্রিশবছরের অর্দ্ধপ্রৌঢ়া গিন্নী হয়ে যেতো তিলু। বিয়ে না হওয়ার দরুন ওদের তিন বোনেই মনে-প্রাণে এখনো সরলা বালিকা—আদরে আবদারে, কথাবার্ত্তায়, ধরনে-ধারনে—সব রকমেই।

জগদম্বা তিলুকে ডেকে বললেন—চাল কোটার ব্যবস্থা করে ফেলো ঠাকুরঝি।

—তিল?

—দীনু বুড়িকে বলা আছে। সন্দেবেলা দিয়ে যাবে। নিলুকে বলে দাও বরণের ডালা যেন গুছিয়ে রাখে। আমি একা রান্না নিয়েই ব্যস্ত থাকবো।

—তুমি রান্নাঘর ছেড়ে যেও না। যজ্ঞি-বাড়ীর কাণ্ড। জিনিসপত্তর চুরি যাবে।

তিন বোনে মহাব্যস্ত হয়ে আছে নিজেদের বিয়ের যোগাড় আয়োজনে। ওদের বাড়ীতে প্রতিবেশিনীরা যাতায়াত করেচেন। গাঙ্গুলীদের মেজ বৌ বল্লে—ও ঠাকুরঝি, বলি আজ যে বড্ড ব্যস্ত, নিজেরা বাসরঘর সাজিও কিন্তু। বলে দিচ্ছি ও-কাজ আমরা কেউ করবো না। আচ্ছা দিদি, তিলু-ঠাকুরঝিকে কি চমৎকার দেখাচ্ছে! বিয়ের জল গায়ে না পড়তেই এই, বিয়ের জল পড়লে না জানি কত লোকের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেয় আমাদের তিলু-ঠাকুরঝি!

গাঙ্গুলীদের বিধবা ভগ্নী সরস্বতী বললে—বৌদিদির যেমন কথা! মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে হয় ওর নিজের সোয়ামীরই ঘোরাবে, অপর কারে আবার খুঁজে বার করতে যাচ্চে ও?

সবাই হেসে উঠলো।

পরদিন ভবানী বাঁড়ুয্যের সঙ্গে শুভ গোধুলি-লগ্নে তিন বোনেরই একসঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। হ্যাঁ, পাত্রও সুপুরুষ বটে। বয়স পঞ্চাশই বোধ হয় হবে কিন্তু মাথার চুলে পাক ধরেনি, গৌরবর্ণ সুন্দর সুঠাম সুগঠিত দেহ। দিব্যি একজোড়া গোঁপ। কুস্তিগিরের মত চেহারার বাঁধুনি।

বাসরঘরে মেয়েরা আমোদ-প্রমোদ করে চলে যাওয়ার পরে ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—তিলু, তোমার বোনদের সঙ্গে আলাপ করাও।

তিলোত্তমার গৌরবর্ণ সুঠাম বাহুতে সোনার পৈঁছে, মণিবন্ধে সোনার খাড়ু, পায়ে গুজরীপঞ্চম, গলায় মুড়কি-মাদুলি—লাল চেলি পরনে। পৈঁছে নেড়ে বললে—আপনি ওদের কি চেনেন না?

—তুমি বলে দাও নয়!

—এর নাম স্বরবালা, ওর নাম নীলনয়না।

—আর তোমার নাম কি?

—আমার নাম নেই।

—বলো সত্যি। কি তোমার নাম?

—তি-লো-ত্ত-মা।

—বিধাতা বুঝি তিলে তিলে তোমায় গড়েচেন?

তিলু, বিলু ও নীলু একসঙ্গে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। তিলু বললে—না গো মশাই, আপনি শাস্তরও ছাই জানেন না—

বিলু বললে—বিধাতা পৃথিবীর সব সুন্দরীর—

নিলু বললে—রূপের ভাল ভাল অংশ—

তিলু বললে—নিয়ে—একটু একটু করে নিয়ে—

ভবানী হেসে বললেন—ও বুঝেচি! তিলোত্তমাকে গড়েছিলেন।

তিলু হেসে বললে—আপনি তাও জানেন না।

নিলু ও বিলু একসঙ্গে বলে উঠলো—আমরা আপনার কান মলে দেবো—

তিলু বোনেদের দিকে চেয়ে বললে—ও কি? ছিঃ—

বিলু বলে—"ছিঃ" কেন, আমরা বলবো না? সতীদিদি তো কান মলেই দিয়েছে আজ। দেখ নি?

ভবানী গম্ভীর মুখে বল্লেন—সে হলো সম্পর্কে শ্যালিকা। তোমরা তো তা নও। তোমরা কি তোমাদের স্বামীর কান মলে দেবার অধিকারী? বুঝেসুজে কথা বলো।

নিলু বললে—আমরা কি, তবে বলুন।

তিলু বোনের দিকে চোখ পাকিয়ে বললে—আবার!

ভবানী হেসে বল্লেন—তোমরা সবাই আমার স্ত্রী। আমার সহধর্ম্মিণী।

বিলু বললে—আপনার বয়েস কত?

ভবানী বললেন—তোমার বয়েস কত?

—আপনি বুড়ো।

তিলু চোখ পাকিয়ে বোনের দিকে চেয়ে বললে—আবার!

ভবানী বাঁড়ুয্যে বাস করবেন রাজারাম-প্রদত্ত জমিতে। ঘরদোর বাঁধবার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েচে, আপাতত তিনি শ্বশুরবাড়ীতেই আছেন অবিশ্যি। এ এক নূতন জীবন। গিয়েছিলেন সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে, কত তীর্থে তীর্থে ঘুরে এসে শেষে এমন বয়সে কিনা পড়ে গেলেন সংসারের ফাঁদে!

খুব খারাপ লাগচে না। তিলু সত্যি বড় ভালো গৃহিণী, ভবানী ওর কথা চিন্তা করলেই আনন্দ পান। তাঁকে যেন ও দশহাত বাড়িয়ে ঘিরে রেখেচে জগদ্ধাত্রীর মত। এতটুকু অনিয়ম, এতটুকু অসুবিধে হবার জো নেই।

রোজ ভবানী বাঁড়ুয্যে একটু ধ্যান করেন। তাঁর সন্ন্যাসী-জীবনের অভ্যাস এটি, এখনো বজায় রেখেচেন। তিলু বলে দিয়েচে,—ঠাণ্ডা লাগবে, সকাল করে ফিরবেন। একদিন ফিরতে দেরি হওয়াতে তিলু ভেবে নাকি অস্থির হয়ে গিয়েছিল। বিলু নিলু ছেলেমানুষ ভবানী বাঁড়ুয্যের চোখে, ওদের তিনি তত আমল দিতে চান না। কিন্তু তিলুকে পাবার জো নেই।

সেদিন ভবানী বেরুতে যাচ্চেন, নিলু এসে গম্ভীর মুখে বললে—দাঁড়ান ও রসের নাগর, এখন যাওয়া হবে না—

—আচ্ছা, ছ্যাবলামি করো কেন বলো তো? আমার বয়েস বুঝে কথা কও নিলু।

—রসের নাগরের আবার রাগ কি!

নিলু চোখ উল্টে কুঁচকে এক অদ্ভুত ভঙ্গি করলে।

ভবানী বললেন—তোমাদের হয়েচে কি জানো? বড়লোক দাদা, খেয়ে-দেয়ে আদরে-গোবরে মানুষ হয়েচো। কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য কিছু শেখোনি। আমার মনে কষ্ট দেওয়া কি তোমার উচিত? যেমন তুমি, তেমনি বিলু। দুজনেই ধিঙ্গি, ধুরন্ধর। আর দেখ দিকি তোমাদের দিদিকে?

—ধিঙ্গি, ধুরন্ধর—এসব কথা বুঝি খুব ভালো?

—আমি বলতাম না। তোমরাই বলালে!

—বেশ করেচি। আরও বলবো।

—বলো। বলচোই তো। তোমাদের মুখে কি বাধে শুনি?

এমন সময়ে তিলু একরাশ কাপড় সাজিমাটি দিয়ে কেচে পুকুরঘাট থেকে ফিরচে দেখা

গেল। পেয়ারাতলায় এসে স্বামীর কথার শেষের দিকটা ওর কানে গেল। দাঁড়িয়ে বললে —কি হয়েচে ?

ভবানী বাঁড়ুয্যে যেন অকূলে কূল পেলেন। তিলুকে দেখে মনে আনন্দ হয়। ওর সঙ্গে সব ব্যাপারের একটা সুরাহা আছে।

—এই ত্যাখো তোমার বোন আমাকে কি-সব অশ্লীল কথা বলচে।

তিলু বুঝতে না পারার সুরে বললে—কি কথা ?

—অশ্লীল কথা। যা মুখ দিয়ে বলতে নেই এমনি কথা।

নিলু বলে উঠলো—আচ্ছা দিদি, তুইই বল্। পাঁচালীর ছড়ায় সেদিন পঞ্চাননতলার বারোয়ারীতে বলে নি 'রসের নাগর' ? আমি তাই বলেছি। দোষটা কি হয়েচে শুনি ? বরকে বলবো না ?

ভবানী হতাশ হওয়ার সুরে বল্লেন—শোন কথা !

তিলু ছোটবোনের দিকে চেয়ে বললে—তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি কবে হবে নিলু ?

ভবানী বললেন—ও দুইই সমান, বিলুও কম নাকি ?

তিলু বললে—না, আপনি রাগ করবেন না। আমি ওদের শাসন করে দিচ্চি। কোথায় বেরুচ্চেন এখন ?

—মাঠের দিকে বেড়াতে যাবো।

—বেশিক্ষণ থাকবেন না কিন্তু—সন্দের সময় এসে জল খাবেন। আজ বৌদিদি আপনার জন্যে মুগতক্তি করচে—

—ভুল কথা। মুগতক্তি এখন হয় না। নতুন মুগের সময় হয়, মাঘ মাসে।

—দেখবেন এখন, হয় কি না। আসবেন সকাল সকাল, আমার মাথার দিব্যি—

নিলু বললে—আমারও—

তিলু বললে—যা, তুই যা।

ভবানী বাড়ীর বাইরে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। শরৎকাল সমাগত, আউশ ধানের ক্ষেত শূন্য পড়ে আছে ফসল কেটে নেওয়ার দরুন। তিৎপল্লার হলদে ফুল ফুটেচে বনে বনে ঝোপের মাথায়। ভবানীর বেশ লাগে এই মুক্ত প্রসারতা। বাড়ীর মধ্যে তিনটে স্ত্রীকে নিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হতে হয়। তার ওপর পরের বাড়ী। যতই ওরা আদর করুক, স্বাধীনতা নেই—ঠিক সময়ে ফিরে আসতে হবে। কেন রে বাবা !

ভবানী অপ্রসন্ন মুখে নদীর ধারে এক বটতলায় গিয়ে বসলেন। বিশাল বটগাছটি, এখানে-সেখানে সব জায়গায় ঝুরি নেমে বড় বড় গুঁড়িতে পরিণত হয়েছে। একটা নিভৃত ছায়াভরা শান্তি বটের তলায়। দেশের পাখী এসে জুটেছে গাছের মাথায় ; দূরদূরান্তর থেকে পাখীরা যাতায়াতের পথে এখানে আশ্রয় নেয়, যাযাবর শামকুট, হাঁস ও সিল্লির দল। স্থায়ী বাসস্থান বেঁধেচে খোড়ো হাঁস, বক, চিল, দু'চারটি শকুন। ছোট পাখীর ঝাঁক—যেমন

শালিক, ছাতারে, দোয়েল, জলপিপি—এ গাছে বাস করে না বা বসেও না।

ভবানী এ গাছতলায় এর আগে এসেচেন এবং এসব লক্ষ্য করে গিয়েচেন। দু-একটা সন্ধ্যামণির জংলা ফুল ফুটেচে গাছতলায় এখানে-ওখানে। ভবানী এদিক-ওদিক তাকিয়ে গাছতলায় গিয়ে চুপচাপ বসলেন। একটু নির্জ্জন জায়গা চাই। চাষীলোকেরা বড় কৌতূহলী, দেখতে পেলে এখানে এসে উঁকিঝুঁকি মারবে আর অনবরত প্রশ্ন করবে, তিনি কেন এখানে বসে আছেন। তিনি একা বসে রোজ এ-সময়ে একটু ধ্যান করে থাকেন—তাঁর সন্ন্যাসী জীবনের বহুদিনের অভ্যাস।

আজও তিনি ধ্যানে বসলেন। একটা সন্ধ্যামণি ফুলগাছের খুব কাছেই। খানিকটা সময় কেটে গেল। হঠাৎ একটা অপরিচিত ও বিজাতীয় কণ্ঠস্বরে ভবানী চমকে উঠে চোখ খুলে তাকালেন। একজন সাহেব গাছের গুঁড়ির ওদিকে একটা মোটা ঝুরি ধরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

সাহেবটি আর কেউ নয়, কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্রাণ্ট—তিনি বটগাছের শোভা দূর থেকে দেখে ভাল করে দেখবার জন্যে কাছে এসে আরও আকৃষ্ট হয়ে গাছের তলায় ঢুকে পড়েন এবং এদিক-ওদিক ঘুরতে গিয়ে হঠাৎ ধ্যানরত ভবানীকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন, An Indian Yogi!

সাহেবের টম্‌টম্ দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে কেউ নেই। ভজা মুচি সইস টম্‌টমেই বসে আছে ঘোড়া ধরে।

কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যাণ্ট ভবানীর সামনে এসে আশ্বাসের সুরে বললেন—Oh, I am very sorry to disturb you. Please go on with your meditations! ভবানী বাঁড়ুয্যে কিছুই না বুঝে অবাক হয়ে সাহেবের দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি সাহেবকে দু'একদিন এর আগে যে না দেখেচেন এমন নয়, তবে এত কাছে থেকে আর কখনো দেখেন নি।

—I offer you my salutations—I wish I could speak your tongue.

বটতলায় কি একটা ব্যাপার হয়েচে বুঝে ভজা মুচি টম্‌টমের ঘোড়া সামলে ওখানে এসে হাজির হোল। সেও ভবানীকে চেনে না। এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—পেন্নাম হই বাবাঠাকুর! ও সাহেব ছবি আঁকে কিনা, তাই দেখুন সকালবেলা কুঠি থেকে বেরিয়ে মোরে নিয়ে সারাদিন বন-বাদাড় ঘোরচে। আপনাকে দেখে ওর ভাল লেগেচে তাই বলচে।

ভবানী হাত জুড়ে সাহেবকে নমস্কার করলেন ও একটু হাসলেন।

গ্র্যাণ্টও দেখাদেখি সেভাবে নমস্কার করবার চেষ্টা করলেন, হোল না! বল্লেন—Let me not disturb you—I sincerely regret, I have trespassed into your nice sanctuary. May I have the permission to draw your sketch?—You man, will you make him understand? ভজা মুচিকে গ্র্যাণ্ট সাহেব হাত-পা নেড়ে ছবি আঁকার ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

ভজা মুচি ভবানীর দিকে চেয়ে বললে—ও বলচে আপনার ছবি আঁকবে। মুই জানি কি

না, এই সাহেবটা ওই রকম করে—একটুখানি চুপটি মেরে বসুন—

কি বিপদ! একটু ধ্যান করতে বসতে গিয়ে এ আবার কোন্ হাঙ্গামা এসে হাজির হোল ভাখো। কতক্ষণ বসতে হবে? মরুক গে, দেখাই যাক্ রগড়। ভবানী বসেই রইলেন।

গ্র্যান্ট সাহেব ভজা মুচিকে বললেন—Don't you stand agape,—just go on and bring my sketching things from the cart—

পরে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন—যাও—

এতদিনে ঐ কথাটি গ্র্যান্ট ভালো করে শিখেচেন।

দেরি হোল বাড়ী ফিরতে সুতরাং, ভবানী নিজের ঘরটিতে ঢুকে দেখলেন তিলু দোরের চৌকাঠে কি একটা নেকড়া দিয়ে পুঁছচে। ভবানী বললেন—কি ওখানে?

তিলু মুখ না তুলেই বললে—রেড়ির তেল পড়ে গেল, পিদিমটা ভাঙলো, জল পড়লো মেজেতে।

এ-সময়ে সমস্ত পল্লীগ্রামে দোতলা প্রদীপ বা সেজ ব্যবহার হোত—তলায় জল থাকতো, ওপরের তলায় তেল। এতে নাকি তেল কম পুড়তো। ভবানী দেখলেন তাঁর খাটের তলায় দোতলা পিদিমটা ছিটকে ভেঙে পড়ে আছে।

—সবই আনাড়ি! ভাঙলে তো পিদিমটা?

—আমি ভাঙি নি।

—কে? নিলু বুঝি?

—আজ্ঞে মশাই, না। চুপ করুন। কথা বলবো না আপনার সঙ্গে।

—কেন, কি করিচি?

—কি করিচি, বটে! আমার কথা শোনা হোল? সন্দের সময় এসে জল খেতে বলেছিলুম না?

—শোনো, আসবো কি, এক মজা হয়েচে, বলি। কি বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম যে।

তিলু কৌতূহলের দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বললে—কি বিপদ? সাপ-টাপ তাড়া করে নি তো? খড়ের মাঠে বড্ড কেউটে সাপের ভয়—

—না গো। সাপ নয়, এক পাগলা সায়েব। টমটমের সইস বললে নীলকুঠির সায়েবদের বন্ধু, দেশ থেকে বেড়াতে এসেচে। আমি বটতলায় বসে আছি, আমার সামনে এসে হাঁ করে দাঁড়িয়েচে। কি সব হিট্ মিট্ টিট্ বলতে লাগলো। সইসটা বললে—আপনার ছবি আঁকবে—

—ও, সেই ছবি-আঁকিয়ে সায়েব! হ্যাঁ হ্যাঁ, দাদার মুখে শুনিচি বটে। আপনার ছবি আঁকলে?

—আঁকলে বইকি। ঠায় বসে থাকতে হোল চার দণ্ড।

—মাগো!
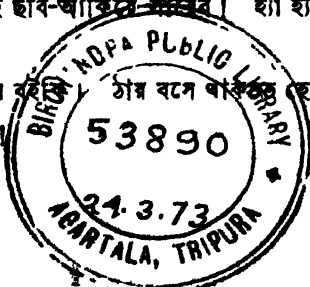
—এখন বোঝো কার দোষ।

পরক্ষণেই তিলুর দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলেন। কি সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে! নিখুঁত সুন্দরী নয় বটে, কিন্তু অপূর্ব্ব রূপ ওর। যেমন হাসি-হাসি মুখ, তেমনি নিটোল বাহুদুটি। গলায় খাঁজকাটা দাগগুলি কি চমৎকার—তেমনি গায়ের রঙ। সন্দেবেলা দেখাচ্ছে ওকে যেন দেবীমূর্ত্তি।

বললেন—তোমার একটা ছবি আঁকতো সাহেব, তবে বুঝতো যে রূপখানা কাকে বলে।

—যান্। আপনি যেন—

পরে হেসে বললে—দাঁড়ান, খাবার আনি—সন্দে আহ্নিকের জায়গা করে দিই?

—হুঁ।

—ও নিলু, শোন্ ইদিকে—আসনখানা নিয়ে আয়—

নিলু এসে আসন পেতে দিলে। গঙ্গাজলের কোশাকুশি দিয়ে গেল। তিলু যত্ন করে আঁচল দিয়ে সন্দে-আহ্নিকের জায়গাটা মেজে দিলে।

ভবানী মনে মনে যা ভাবছিলেন, আহ্নিকের সময়েও ভাবছিলেন, তা হচ্ছে এই। কালও সাহেব ওঁকে বটতলায় যেতে বলেচে। সাহেবের হুকুম, যেতেই হবে। রাজার মত ওরা। তিলুকে নিয়ে গেলে কেমন হয়? অপূর্ব্ব সুন্দরী ও। ওর একটা ছবি যদি সায়েব আঁকে, তবে বড ভালো হয়। কিন্তু নিয়ে যাওয়াই মুশকিল। যদি কেউ টের পেয়ে যায়—তবে গাঁয়ে শোরগোল উঠবে। একঘরে হতে হবে সমাজে তাঁর শ্যালক রাজারাম রায়কে।

তিলু একখানা রেকাবিতে খাবার নিয়ে এল, নারকেলের সন্দেশ, চিঁড়েভাজা আর মুগ-তক্তি। হেসে বললে—কেমন! মুগতক্তি যে বড় হয় না এ সময়ে! এখন কি দেবেন তাই বলুন—

নিলু বললে—এমন কান মলে দেবো যে—

—দূর! তুই যে কি বলিস কাকে, ছি! ও-কথা বলতে আছে?

বিলু আড়াল থেকে বার হয়ে এসে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। ভবানী বিরক্তির সুরে বললেন—আর এই এক নষ্টের গোড়া! কি যে সব হাসো! যা-তা মুখে কথাবার্ত্তা তোমাদের দুজনের, বাধে না। ছিঃ—

বিলু বললে—অত ছিঃ ছিঃ করতে হবে না বলে দিচ্চি—

নিলু বললে—হ্যাঁ। আমরা অত ফেল্না নই যে সর্ব্বদা ছিছিক্কার শুনতে হবে।

তিলু বললে—আপনি কিছু মনে করবেন না। ওরা বড্ড আদুরে আর ছেলেমানুষ—দাদা ওদের কক্ষনো শাসন করতেন না। আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছেন—

নিলু বললে—হ্যাগো বৃন্দে। তোমাকে আর আমাদের ব্যাখ্যানা কত্তে হবে না, থাক্।

বিলু বললে—দিদি সুয়ো হচ্ছে ভাতারের কাছে, বুঝলি না?

ভবানী বললে—ছিঃ ছিঃ, আবার সব অশ্লীল বাক্য!

বিলু রাগের সুরে বললে—হ্যাগো সব অশ্লীল বাক্য, আর অশ্লীল বাক্য! তবে কি কথা

বলবে শুনি? দুটো কথা বলেচো কি না, অমনি অশ্লীল বাক্য হয়ে গেল! বেশ করবো, আমরা, অশ্লীল বাক্য বলবো—আপনি কি করবেন শুনি?

তিলু ধমকে বললে—যা এখান থেকে। দুজনেই যা। পান নিয়ে এসো। আর মুগ-তক্তি দেবো? কেমন লাগলো? বৌদিদি আপনার জন্যে মুগতক্তি রসে ফেলচে। ভাত খাবার সময় দেবে।

—একটা কথা বলি তিলু—

—কি?

—কেউ নেই তো এখানে? দেখে এসো।

—না, কেউ নেই। বলুন—

—কাল একবার আমার সঙ্গে সেই বটতলায় যেতে পারবে?

—কেন?

—সায়েবকে দিয়ে তোমার ছবি আঁকাবো। ঢাকাই শাড়িখানা পরে যেও। পারবে?

—ও মা!

—কেন কি হয়েচে?

—সে কি হয়? দিনমানে আপনার সঙ্গে কি করে বেরুবো? এই দেখুন আপনার সামনে দিনমানে বার হই বলে কত নিন্দে করচে লোকে। গাঁয়ে সেই রাত্তির ছাড়া দেখা করার নিয়ম নেই। আমাকে বেরুতে হয় বাধ্য হয়ে, বৌদিদি পেরে ওঠেন না একা সবদিক ভাংড়াতে।

—শোনো। ফন্দি করতে হবে। আমাকে যেতে হবে বিকেলে। আজ যে সময় গিয়েছিলুম সে সময়। তুমি নদীর ঘাটে গা ধুতে যেও ঘড়া গামছা নিয়ে। ওখান থেকে নিয়ে যাবো, কেউ টের পাবে না। লক্ষ্মীটি তিলু, আমার বড্ড ইচ্ছে।

—আপনার আজগুবি ইচ্ছে। ওসব চলে কখনো সমাজে? আপনি সন্নিসি হয়ে দেশ-বিদেশ বেড়িয়েচেন বলে সমাজের কোনো খবর তো রাখেন না! আমার যা ইচ্ছে করবার জো নেই—

শেষ পর্যন্ত কিন্তু তিলুকে যেতে হোল। স্বামীর মনে ব্যথা দেওয়ার কষ্ট সে সইতে পারবে না। ঢাকাই শাড়ি পরে ঘড়া নিয়ে ঘাটের পথ আলো করে যাবার সময় তাকে কেউ দেখেনি, কেবল বাদা বোষ্টমের বৌ ছাড়া।

বোষ্টম বৌ বললে—ও দিদিমণি, একি, এমন সেজেগুজে কোথায়? রূপে যে ঝলক তুলেচো?

—যাঃ, ঘাটে গা ধোবো। শাড়িখানা কাচবো। তাই—

তিলুর বুকের মধ্যে ঢুড়ঢুড় করছিল। অপরাধীর মত মিথ্যা কৈফিয়তটা খাড়া করলে। ভাগ্যিস যে বোষ্টম বৌ দাঁড়ালো না, চলে গেল। আর ভাগিস, ঘাটে শেষবেলায় কেউ ছিল না।

গ্র্যান্ট সাহেব দূর থেকে তিলুকে দেখে তাড়াতাড়ি টুপি খুলে সামনে এসে সম্ভ্রমের সুরে

বললেন—Oh, she is a queenly beauty! Oh! I am grateful to you, sir,—

তার পর তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তিলুর সলজ্জ মুখের ও অপূর্ব্ব কমনীয় ভঙ্গির একটা আল্‌গা রেখাচিত্র আঁকতে চেষ্টা করলেন।

১৮৬৪ সালে প্রকাশিত কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যাণ্টের 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্ রুর‍্যাল বেঙ্গল' নামক বইয়ের চুয়ান্ন ও সাতান্ন পৃষ্ঠায় 'এ বেঙ্গলী উম্যান' ও 'অ্যান্ ইণ্ডিয়ান ইয়োগী ইন্ দি উড্‌স্' নামক দুখানা ছবি যথাক্রমে তিলু ও ভবানী বাঁড়ুয্যের রেখাচিত্র।

গ্রামের কেউ টের পায় নি। মুশকিল ছিল, রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। এ মাঠ দিয়ে ও মাঠ দিয়ে ঘুরে তিলু স্বামীকে নিয়ে এল, ভবানী বিদেশী লোক, গ্রামের রাস্তাঘাট চিনতেন না। ভজা মুচি সইস্‌কে ভবানী সব খুলে বলে বারণ করে দিয়েছিলেন। তিলু বল্লে—বাবা কি কাণ্ড আপনার! শিশির পড়চে। ঠাণ্ডা লাগাবেন না। সায়েবটা বেশ দেখতে! আমি এত কাছ থেকে সায়েব কখনো দেখি নি। আপনি একটি ডাকাত।

—ও সব অশ্লীল কথা স্বামীকে বলতে আছে, ছিঃ—

রাজারাম রায়কে ছোট সাহেব ডেকে পাঠিয়েচেন। কেন ডেকে পাঠিয়েচেন রাজারাম তা জানেন। কোন প্রজার জমিতে জোর করে নীলের মার্কা মেরে আসতে হবে। রাজারাম দুর্দ্ধর্ষ দেওয়ান, প্রজা কি করে জব্দ করা যায় তাঁকে শেখাতে হবে না। আজ আঠারো বছর এই কুঠিতে তিনি আছেন, বড় সাহেবের প্রিয়পাত্র হয়েচেন শুধু এই প্রজা জব্দ রাখবার দক্ষতার গুণে।

পাঁচু শেখের বাড়ী তেঘরা শেখহাটি। সেখানকার প্রজারা আপত্তি জানিয়ে বলেচে,—দেওয়ানজি, আপনাদের খাসের জমিতে নীল বুনুন, প্রজার জমিতে এবার আমরা নীল বুনতি দেবো না।

রাজারাম জোর করে নীলের দাগ মেরে এসেচেন পাঁচু শেখের ও তার শ্বশুর বিপিন গাজি ও নবু গাজির জমিতে। এরা সে গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, বিপিন গাজির বাড়িতে আটটি ধান-বোঝাই গোলা, বিশ-পঁচিশটি হালের বলদ, ছ' জোড়া লাঙল। তার ভাই নবু গাজি তেজারতি কারবারে বেশ ফেঁপে উঠেচে আজকাল। কম পক্ষেও একশো বিঘে আউশ ধানের চাষ হয় দুই ভায়ের জোতে। গ্রামের সব লোকে ওদের সমীহ করে চলে, এরাও বিপদে আপদে সব সময়ে বুক দিয়ে পড়ে।

নবু গাজি আজ ছোট সাহেবের কাছে এসে নালিশ করেচে। তাই বোধ হয় ছোট সাহেব ডেকেচেন। কি জানি। রাজারাম ভয় খান না। নবু গাজি কি করতে পারে করুক।

ছোট সাহেব অনেকদিন এদেশে থেকে এদেশের গ্রাম্যলোকের মত বাংলা বলতে পারে। রাজারামকে ডেকে বললে,—কি বলছিল নবু গাজি, ও রাজারাম!

—কি বলুন হুজুর—

—ওর তামাকের জমিতে নাকি দাগ মেরে এসেচ।

—না মারলি ও গাঁ জব্দ রাখা যাবে না হুজুর।

—ও বলচে ওদের পীরির দরগার সামনের জমিও নিয়েচ ?

—মিথ্যে কথা হুজুর। আপনি ডাকান ওকে।

নবু গাজি বেশ জোয়ান মর্দ্দ লোক, ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোকও সে নিতান্ত নয়। কিন্তু ছোট সাহেব ও দেওয়ানজির সামনে সে নিরীহের মত এসে দাঁড়ালো। নীলকুঠির চতুঃসীমার মধ্যে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে কথা বলবার সাধ্য নেই কোনো রায়তের।

ছোট সাহেব বললে,—কি নবু গাজি, এবার গুড় পাটালি করেছিলে ?

নবু গাজি বিনম্রসুরে বললে,—না সায়েব, মোরা এবার গাছ ঝুড়িনি এখনো।

—পাটালি হলি খাতি দেবা না ?

—আপনাদের দেবো না তো কাদের দেবো বলুন।

—দেবা ঠিক ?

—ঠিক সাহেব।

—রাজারাম, তুমি এদের দরগাতলার জমিতে দাগ মেরেচ ?

—না হুজুর। জমির নাম দরগাতলার জমি, এই পর্য্যন্ত। পুরোনো খাতাপত্রে তাই আছে। সেখানে পীরের দরগা বা মসজিদ আছে কি না ওকেই জিগ্যেস করুন না। আছে সেখানে তোমাদের দরগা ?

—ছেল আগে। এখন নেই দেওয়ানবাবু।

—তবে ? তবে যে বড্ড মিথ্যে কথা বললে সায়েবকে ?

—বাবু, আপনি একটু দয়া করুন; ও জমিতি মোরা হাজৎ করি। অঘ্রান মাসের সংক্রান্তির দিন পীরের নামে রেঁধে বেড়ে খাই। হয়-না-হয় আপনি একদিন দেখে আসবেন। মুই মিথ্যে কথা কেন বলবো আপনারে, আপনারা হলেন দেশের রাজা। আমার জমিটা ছেড়ে দ্যান দয়া করে।

ছোট সাহেব রাজারামের দিকে চেয়ে সুপারিশের সুরে বললে—যাক্ গে, দাও ছেড়ে জমিটা। ওরা কি যে করে বলচে—

নবু গাজি বললে—হাজৎ।

—সেটা কি আবার ?

—ওই যে বললাম সাহেব, খোদার নামে ভাত গোস্ত রেঁধে ফকির মিচকিনিদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যা থাকে মোরা সবাই মেলে খাই।

ছোট সাহেব খুশি হয়ে বলে উঠলো—বেশ, বেশ। আমারে একদিন দেখাতি হবে।

—তা দেখাবো সাহেব।

—বেশ। রাজারাম, ওর জমিটা ছেড়ে দিও। যাও—

নবু গাজি আভূমি সেলাম করে চলে গেল। কিন্তু সে বোকা লোক নয়, দেওয়ান রাজা-

রামকে সে ভালো ভাবেই চেনে। বাইরে গিয়ে গাছের আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলো।

রাজারাম ছোট সাহেবকে বললেন—হুজুর, আপনি কাজ মাটি করলেন একেবারে।

—কেন ?

—ও জমি এক নম্বরের জমি। বিঘেতে সাড়ে তিনমণ নীলের গুঁড়ো পড়তা হবে। ও জমি ছেড়ে দিতে আছে ? আর আপনি যদি অমন করে আশ্কারা দ্যান প্রজাদের, তবে আমারে আর কি কেউ মানবে ?—না কোনো কথা আমার কেউ শুনবে ?

ছোট সাহেব শিস্ দিতে দিতে চলে গেল। রাজারাম রাগে অভিমানে ফুলে উঠলেন। তখনি সদর-আমীন প্রসন্ন চক্কত্তির ঘরে গিয়ে কি পরামর্শ করলেন দুজনে। প্রসন্ন চক্কত্তির বয়েস চল্লিশের ওপরে, বেশ কালো রং, দোহারা গড়ন, খুব বড় জোড়া গোঁফ আছে, চোখগুলো গোল গোল ভাঁটার মত। সকলে বলে অমন বদমাইশ লোক নীলকুঠির কর্ম্মচারীদের মধ্যে আর দুটি নেই। হয়কে নয় এবং নয়কে হয় করার ওস্তাদ। আমীনদের হাতে অনেক ক্ষমতাও দেওয়া আছে। সরল গ্রাম্য প্রজারা জরিপ কার্য্যের জটিল কর্ম্মপ্রণালী কিছুই বোঝে না, রামের জমি শ্যামের ঘাড়ে এবং শ্যামের জমি যদুর ঘাড়ে চাপিয়ে মিথ্যে মাপ মেপে নীলের জমি বার করে নেওয়াই আমীনের কাজ। প্রজারা ভয় করে, সুতরাং ঘুষও দেয়। রাজারামের অংশ আছে ঘুষের ব্যাপারে। প্রসন্ন চক্কত্তি থেলো হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে বললে—এ রকম কল্লি তো আমাদের কথা কেউ শোনবে না, ও দেওয়ানজি!

রাজারাম সেটা ভালই বোঝেন। বললেন—তা এখন কি করা যায় বলো, পরামর্শ দাও।

—বড় সায়েবকে বলুন কথাটা।

—সে বাঘের ঘরে এখন যাবে কেডা ?

—আপনি যাবেন, আবার কেডা ?

বড়সাহেব শিপ্‌টন্ বেজায় রাশ-ভারী জবরদস্ত-লোক। ছোটসাহেবের মন একটু উদার, লোকটা মাতাল কিনা! সবাই তো তাই বলে। বড়সাহেবের কাছে যেতে সাহস হয় না যার তার। কিন্তু মানের দায়ে যেতে হোল রাজারামকে। শিপ্‌টন্ মুখে বড় পাইপ টানচেন বসে, হাতখানেক লম্বা পাইপ। কি সব কাগজপত্র দেখচেন। তক্তপোশের মত প্রকাণ্ড একটা ভারী টেবিলের ধারে কাঁঠাল কাঠের একটা বড় চেয়ার। সাতবেড়ের মুসাব্বর মিস্ত্রিকে দিয়ে টেবিল চেয়ার বড় সাহেবই তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন, নিজের হাতে পালিশ আর রং করেচেন। টেবিলের একধারে মোটা চামড়া-বাঁধানো একরাশ খাতা। দেওয়ালে অনেকগুলো সাহেব-মেমের ছবি: এই ঘরের এককোণে ফায়ার প্লেস, তেমন শীত না পড়লেও কাঠের মোটা মোটা ডালের আগুন মাঘের শেষ পর্য্যন্ত জ্বলে।

বড়সাহেব চোখ তুলে দেওয়ানের দিকে চেয়ে বললেন—গুড্ মর্ণিং।

রাজারাম পূর্ব্বে একবার সেলাম করেচেন, তখন সাহেব দেখতে পান নি ভেবে আর একবার লম্বা সেলাম করলেন। জিভ শুকিয়ে আসচে তাঁর। ছোটসাহেবের মত দিলখোলা

লোক নয় ইনি। মেজাজ বেজায় গম্ভীর, দুর্দান্ত বলেও খ্যাতি যথেষ্ট। না জানি কখন কি করে বসে। সাহেবসুবো লোককে কখনো বিশ্বাস করতে নেই। ভালো ছিল সেই ছবি-আঁকিয়ে পাগলা সাহেবটা। তিলু ও ভবানী ভায়ার ছবি এঁকেছিল লুকিয়ে। যাবার সময় সেই কথার উল্লেখ করে রাজারাম পাগলা সাহেবটার কাছে পঁচিশ টাকা বকশিশ আদায় করেও নিয়েছিলেন। অবিশ্যি ভবানী তার কিছু জানে না। যেমন সেই পাগলা সাহেব, তেমনি ভবানী, দুই-ই সমান। আপন খেয়াল-মত চলে দুজনেই।

রাজারাম বললেন—আপনার আশীর্বাদে হুজুর ভালোই আছি।

—কি দরকার আছে এখানে? বিশেষ কোনো কাজ আছে? আমি এখন খুব বিজি আছি। সময় কম আছে।

—অন্য কিছু না হুজুর। আমি তেঘরার একটা প্রজার জমিতে দাগ মেরেছিলাম; ছোটসাহেব তাকে মাপ করে দিয়েচেন।

শিপ্‌টন্ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন—যা হুকুম ডিয়েচেন, টাহাই হইবে। ইহাটে টোমার কি অমান্য আছে।

বড়সাহেব অমন উল্টোপাল্টা কথা বলে, ভালো বাংলা না জানার দরুন। ভালো বালাই সব! রাজারামের হয়েছে মহাপাপ, এই সব অদ্ভুত চিজ নিয়ে ঘর করা। সাহেবের ভুল সংশোধন করে দেওয়া চলবে না, চটে যাবে। বালাইয়ের দল যা বলে তাই সই। তিনি বললেন—আজ্ঞে না, অমান্য আর কি আছে? তবে এমন করলে প্রজা শাসন করা যায় না।

—কি হবে না?

—প্রজা জব্দ করা যাবে না। নীলের চাষ হবে না হুজুর।

—নীলের চাষ হবে না টবে টোমাকে কি জন্য রাখা হইল?

—সে তো ঠিক হুজুর। আমাকে প্রজাদের সামনে অপমান করা হোলে আমার কাজ কি করে হয় বলুন হুজুর—

—অপমান? ওহো, ইউ আর ইন্ ডিস্‌গ্রেস্ ইউ ওল্ড স্কাউণ্ড্রেল, আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড। টোমাকে কি করিটে হইবে?

—আপনি বুঝুন হুজুর। নবু গাজি বলে একজন বদমাইশ প্রজার জমিতে দাগ মেরেছিলাম, উনি হুকুম দিয়েচেন জমি ছেড়ে দিতে। ও গাঁয়ে আর কোনো জমিতে হাত দেওয়া যাবে না। নীলের চাষ হবে কি করে?

—কটো জমি এবছর ডাগ দিয়াছ, আমাকে কাল ডেখাটে হইবে। ইমপ্রেশন্ রেজিস্টার টৈরি করিয়াছ?

—হাঁ হুজুর।

—যাও। না ডেখাইটে পারিলে জরিমানা হইবে। কাল লইয়া আসিবে।

বাস্, কাজ মিটে গেল। প্রসন্ন চক্কত্তির কাছে মুখ ভারী করে ফিরে গেলেন রাজা-

রাম।—না কিছুই হোল না। ওরা নিজের জাতের মান অপমান আগে দেখে। পাজি শুওরখোর জাত কিনা। তোমার আমার অপমানে ওদের বয়েই গেল।

প্রসন্ন চক্কত্তি ঘুঘু লোক। আগেই জানতেন কি হবে। তামাক টানতে টানতে বললেন—অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা চ পৃষ্টকে—ছেলেবেলায় চাণক্যশ্লো'কে পড়েছিলাম দেওয়ানজি। ওদের কাছে এসে মান অপমান দেখতে গেলে চলবে না। তা যান, আপনি আপনার কাজে যান—

—আবার উল্টে জরিমানার ব্যবস্থা—

—সে কি! জরিমানা করে দিলে নাকি?

—সেজন্যে জরিমানা নয়। দাগের খতিয়ান হাল সনের তৈরি হয়েচে কিনা, কাল দেখাতি হবে, না দেখাতি পারলে জরিমানা করবে।

—ভালো। ওদের অমনি বিচার।

—উল্টে কচু গালে লাগলো—

রাজারাম অপ্রসন্ন মুখে বার হয়ে গিয়েই দেখলেন নবু গাজি দলবল নিয়ে সদর ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে কারকুন রামহরি তরফদারের সঙ্গে একগাল হেসে কি বলচে। রাজারামকে সে এখনও বুঝতে পারে নি। স্বয়ং সাহেবও বোঝেন না। রাজারাম গম্ভীর স্বরে হাঁক দিয়ে বললেন—এই নবু গাজি, ইদিকে শুনে যাও।

নবু গাজির হাসি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে। সে আজকের ব্যাপার নিয়ে হাসছিল না। সে সাহস তার নেই। তার একটা গোরু চুরি করে নিয়ে গিয়ে তারই জনৈক অসাধু কৃষাণ ন'হাটার হাটে বিক্রি করে, কি ভাবে সেই গোরুটা আবার নবু গাজি উদ্ধার করেছিল, তারই গল্প ফেঁদে নিজের কৃতিত্বে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসছিল সে। রাজারামের স্বরে তার প্রাণ উবে গেল। তাড়াতাড়ি এসে সামনে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রমের সুরে বললে—কি বাবু?

—যে জমিতে দাগ মেরেচি, সেটাতেই নীলের চাষ হবে। বুঝলে?

নবু গাজি বিস্ময়ের সুরে বললে—সে কি বাবু, ছোটসাহেব যে বললেন—

—ছোটসাহেব বলেচেন, বলেচেন। বাবার ওপরে বাবা আছে। এই বড়সাহেবের হুকুম। এই আমি আসচি বড়সাহেবের দপ্তর থেকে। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া চলে না, বুঝলে নবু গাজি? তোমাকে নীলকুঠির চুনের গুদোমে পুরে ধান খাওয়াবো, তবে আমার নাম রাজারাম চৌধুরী, এই তোমায় বলে দিলাম। তুমি যে কি রকম—তোমার ভিটেতে ঘুঘু যদি না চরাই—

নবু গাজি ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল। দেওয়ান রাজারামকে ভয় করে না এমন রায়ত নীলকুঠির সীমানা সরহদ্দের মধ্যে কেউ নেই। তিনি ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারেন। সে হাতজোড় করে বললে—মাপ করুন দেওয়ানজি, ক্ষ্যামা দ্যান। আপনি মা-বাপ, আপনি মারলি মারতে পারেন রাখলি রাখতি পারেন। মুই মুরুক্ষু মানুষ, আপনার সন্তানের মত। মোর ওপর রাগ করবেন না। মরে যাবো তা হলি—

—এখনই হয়েচে কি ? তোমার উঠোনে গিয়ে নীলের দাগ মারবো। তোমার সাহেব বাবা যেন উদ্ধার করে তোমায়। দেখি তোমার কতদূর—

নবু গাজি এসে রাজারামের পা দুটো জড়িয়ে ধরলে।

রাজারাম রুক্ষ সুরে বললেন—না, আমার কাছে নয়। যাও তোমার সেই সাহেব বাবার কাছে।

নবু গাজি তবুও পা ছাড়ে না।

রাজারাম বললেন—কি ?

—আপনি না বাঁচালি বাঁচবো না। মুরুক্ষু মানুষ, করে ফেলেছি এক কাজ। ক্ষ্যামা স্থান বাবু। আপনি মা-বাপ।

—আচ্ছা, এবার সোজা হয়ে এসো। তোমার জমি ছেড়ে দিতে পারি কিন্তু—

—বাবু সে আমায় বলতে হবে না। আপনার মান রাখ্‌তি মুই জানি।

—যাও, জমি ছেড়ে দিলাম। কাল আমীনবাবু গিয়ে ঠিক করে আসবে। তবে মার্কা-তোলার মজুরিটা জরিপের কুলীদের দিয়ে দিও। যাও—

নবু গাজি আভূমি সেলাম করলে পুনরায়। চলে গেল সে কাঁটপোড়ার বাঁওড়ের ধারে ধারে। দেওয়ান রাজারাম রায় ও সদর আমীন প্রসন্ন চক্কত্তির মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

এই রকমই চলচে এদের শাসন অনেকদিন থেকে। বড়সাহেব ছোটসাহেব যদি বা ছাড়ে, এরা ছাড়ে না। চাষীদের, সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থদের ভালো ভ লো জমিতে মার্কা দিয়ে আসে, সে জমিতে নীল পুঁততেই হবে। না পুঁতলে তার ব্যবস্থা আছে।

বড়সাহেব এ অঞ্চলের ফৌজদারি বিচারক। সপ্তাহে তিন দিন নীলকুঠিতে কোর্ট বসে। গোরু চুরি, ধান চুরি, মারামারি দাঙ্গাহাঙ্গামার অভিযোগে বিচার হবে এখানেই। বড় কুঠির সাদা হল-ঘরে এ সময় নানা গ্রাম থেকে মামলা রুজু করতে লোক আসে। তেমাথার মোড়ে সনেকপুরের মাঠে একটা ফাঁসিকাঠ টাঙানো হয়েচে সম্প্রতি। রাজারাম বলে বেড়াচ্ছেন চারিদিকে যে এবার বড় সাহেব ফাঁসির হুকুম দেওয়ার ক্ষমতা পেয়েচেন গভর্ণমেণ্ট থেকে।

বড়সাহেব কিন্তু সুবিচারক। খুব মন দিয়ে উভয় পক্ষ না শুনে বিচার করে না। রায় দেবার সময় অনেক ভেবে স্থায়। অপরাধীর যম, লঘুপাপে গুরুদণ্ড সর্ব্বদাই লেগে আছে। নীলকুঠির কাজের একটু ত্রুটি হলে স্বয়ং দেওয়ানেরও নিষ্কৃতি নেই। তবু ছোটসাহেবের চেয়ে বড়সাহেবকে পছন্দ করে লোক। দেওয়ানকে বলে—টোমাক চুনের গুডামে পুরিয়া রাখিলে টুমি জব্ড হইবে।

রাজারাম বলেন—আপনার ইচ্ছা হুজুর। আপনি করলি সব করতি পারেন।

—You have a very oily tongue I know, but that would'nt cut ice this time—টোমাকে আমি জব্ড করিটে জানে।

—কেন জানবেন না হুজুর। হুজুর মা-বাবা—

—মা বাবা! মা বাবা! চুনের গুডামে পুরিলে টোমার জব্ড ঠিক হইয়া যাইবে।

—হুজুরের খুশি।

—যাও ডশ টাকা জরিমানা হইল।

—যে আজ্ঞে হুজুর।

রাজারামের কাজ এ ভাবেই চলে।

কুঠিতে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর আসবেন। দেওয়ান রাজারাম ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন আজ সকাল থেকে। ভেড়া, মাছ, ভালো আম ও ঘি যোগাড করবার ভার তাঁর ওপর। মাঝে মাঝে এ রকম লেগেই আছে, সাহেব-সুবো অতিথি যাতায়াত করচে মাসে দু'বার তিনবার।

মুডোপাড়ার তিনকড়িকে ডাকিয়ে এনেচেন তার একটি নধর শূওরের জন্যে। তিনকড়ি জাতে কাওরা, শূয়রের ব্যবসা ক'রে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেচে। দোতলা কোঠাবাড়ী, লোকজন, ধানের গোলা, পুকুর। অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ তাকে খাতির করে চলে। রাজারামকে উপহার দেওয়ার জন্যে সে বাড়ী থেকে ঘানি-ভাঙ্গা সর্ষের তেল এনেছিল প্রায় দশ সের, কিন্তু রাজারাম তা ফেরৎ দিয়েচেন, কাওরার দেওয়া জিনিস তাঁর ঘরে ঢুকবে না।

তিনকড়ি বল্লে—একটা আছে পাঁচ মাসের আর একটা আছে দু' বছরের। যেটা পছন্দ করেন বলে দেবেন। তবে বলতি নেই, আপনারা ওর সোয়াদ জানেন না, দেওয়ানবাবু, একবার খেলি আর ভুলতি পারবেন না। ওই পাঁচ মাসের বাচ্চাডা শুধু ভেজি খাবেন ঘি দিয়ে—

—রাজারাম হেসে বল্লেন—দূর ব্যাটা, কি বলে! বামুনদের অমন বলতি আছে। তোদের পয়সা হলি কি হবে জাতের স্বধম্মো য'বে কোথায়?

—বাবু, ঐ যা! আপনারা যে খান না, সে কথা ভুলে গিইচ, মাপ করবেন।

—না না, তোর কথায় আমার রাগ হয় না। তা হলি শূওরের সরবরাহ করতি হবে তোমাকেই, এই মনে রাখবা।

—মনে রাখারাখি কি, কালই আমি পাঁচমাসের বাচ্চা আর দু'বছরেরডা পেঠিয়ে দেবো এখন। কোথায় পেঠিয়ে দেবো বলুন, এখানেই আপনার বাড়ী আমার নোকে নিয়ে আসবে?

—না না, আমার বাড়ী কেন? কুঠিতে পাঠিয়ে দেবা। ব্রাহ্মণের বাড়ী শূওর? ব্যাটাকে কি যে করি—

তিনকড়ি বিদায় নেবার উদ্যোগ করতেই রাজারাম বলেন—ব্রাহ্মণবাডী এসেচ, পেরসাদ না পেয়ে যাবে, না যেতে আছে? পয়সা হয়েচে বলে কি ধরাকে সরা দেখচো নাকি?

তিনকড়ি জিভ কেটে বললে—ও কথাই বলবেন না। ব্রাহ্মণের পাত কুড়িয়ে খেয়ে মোরা মানুষ দেওয়ানজি। মুখ থেকে ফেলে দিলি সে ভাতও মাথায় করে নেবো। তবে

মোর মনটাতে আজ আপনি বড্ড কষ্ট দেলেন।

—কেন, কেন ?

—ভালো, তেলটা এনেলাম আপনার জন্তি আলাদা ক'রে, তেলডা নেলেন না।

—নিলাম না মানে, শূদ্দুরের দান নিতি নেই আমাদের বংশে, সেজন্তে মনে দুঃখু করো না তিনকড়ি। আচ্ছা তুমি দুঃখিত হচ্চ, কিছু দাম দিচ্চি, নিয়ে তেলটা রেখে যাও—

—দাম ? কত দাম দেবেন ?

—এক টাকা।

—তাহলি তো পাঁচসের তেলের দাম দিয়েই দেলেন কত্তা। মুই কি তেল বিক্রি করতি এনেলাম বাবুর কাছে ? এট্টু দয়া করবেন না ? আছিই না হয় ছোটনোক—

—না তিনকড়ি। মনে করো না সেজন্তি কিছু। একটা টাকাই তোমারে নিতি হবে। তার কম নিলি আমি পারব না। ওরে, কে আছিস্। সীতেনাথ—বাবা ইদিকি তিনকড়ির কাছ থেকে তেলের ভাঁড়টা নাও—

এই সময়ে ছোটসায়েব ব্যস্তসমস্ত হয়ে সেখানে এসে হাজির হোলো। রাজারামকে দেখে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তিনকড়িকে দেখে থেমে গেল।

রাজারাম দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—পাঁচমাসের শুওরের বাচ্চা একটা যোগাড করা গেল হুজুর—

—Oh, the sucking pig is the best. পাঁচমাসের বাচ্চা বড় হলো। মাই খায় এমন বাচ্চা দিতে পারবা না তুমি ?

—না, তেমন নেই সায়েব। এত ছোট বাচ্চা কনে পাবো ?

—জেলা থেকে হাকিম আসচে, এখানে খাবে। বাচ্চা হলি খাবার জুত হোত।

—এবার হ'লি রেখে দেবো। সায়েব, সেলাম। মুই চল্লাম। পেন্নাম হই দেওয়ানজি।

রাজারাম সাহেবকে দেখেই বুঝেছিলেন একটা গুরুতর ব্যাপারের খবর নিয়ে সে এখানে এসেচে। তিনকড়ি বিদায় নেবার পরক্ষণেই তিনি সাহেবকে জিগ্যেস করলেন—কি হয়েচে সাহেব ?

—খুব গোলমাল। রসুলপুর আর রাহাতুনপুরির মুসলমান চাষীরা ক্ষেপে উঠেছে, নীল বুনবে না।

—কে বললে ?

—কারকুন গিয়েছিল নীলির দাগ মারতি—তারা দাগ মারতি দেয়নি, লাঠি নিয়ে তাড়া করেচে—

—এতবড় আস্পদ্দা তাদের ?

—তুমি ঘোড়া আনতি বলো। চলো দুজনে ঘোড়া ক'রে সেখানে যাবো। বড়সাহেবকে কিছু বলো না এখন।

—যদি সত্যি হয় তখন কি করা যাবে সে আমাকে বলতি হবে না সায়েব। আপনি দয়া

ক'রে শুধু জুয়াচুরি মামলা থেকে আমারে বাঁচাবেন।

—না না, তুমি বড্ড rash কিছু করে বস্‌বা। ওই জন্যি তোমারে আমার বিশ্বাস হয় না।

একটু পরে ছুটো ঘোড়ায় চড়ে ছুজনে বেরিয়ে গেল। কখন দেওয়ান ফিরে এসেছিলেন কেউ জানে না। পরদিন সকালে চারিধারে খবর রটে গেল রাত্রে রাহাতুনপুর গ্রাম একেবারে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েচে। বড় বড় চাষীদের গ্রাম, কারো বাড়ী বিশ-ত্রিশটা পর্য্যন্ত ধানের গোলা ছিল—আর ছিল ছ'চালা আটচালা ঘর, সব পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েচে। কি ভাবে আগুন লেগেছিল কেউ জানে না, তবে সন্ধ্যারাত্রে ছোটসাহেব এবং দেওয়ানজি রাহাতুনপুরের বড় মোড়লের বাড়ী গিয়েছিলেন; সেখানে প্রজাদের ডাকিয়ে নীল বুনবে না কেন তার কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন। তারা রাজী হয়নি। ওঁরা ফিরে আসেন রাত এগারোটার পর। শেষরাত্রে গ্রামসুদ্ধ আগুন লেগে ছাইয়ের ঢিবিতে পরিণত হয়েছে। এই ছুই ব্যাপারের মধ্যে কার্য্যকারণ-সম্পর্ক বিদ্যমান বলেই সকলে সন্দেহ করচে।

পরদিন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডঙ্কিন্‌সন্‌ নীলকুঠির বড় বাংলোতে সদলবলে এসে পৌঁছুলেন। তিনি যখন কুঠির ফিটন্‌ গাড়ী থেকে নামলেন, তখন শুধু বড়সাহেব ও ছোটসাহেব সদর ফটকে তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে উপস্থিত ছিলেন—দেওয়ান রাজারাম নাকি চুরুটের বাক্স এগিয়ে দেওয়ার জন্যে উপস্থিত ছিলেন বৈঠকখানার টেবিলের পাশে। ডঙ্কিন্‌সন্‌ এসেছিলেন শুধু নীলকুঠির আতিথ্য গ্রহণ করতে নয়, বড়সাহেব একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই ম্যাজিস্ট্রেটকে এখানে এনেছিলেন।

রাজারামকে ডেকে বড়সাহেব বল্লেন—টুমি কি ডেখিলে ইঁহাকে বলিটে হইবে। ইনি জেলার ম্যাজিস্ট্রেট আছে—this man is our Dewan, Mr. Duncinson, and a very shrewd old man too—go on, বলিয়া যাও—রাহাটুনপুরে কি ডেখিলে—

রাজারাম আভূমি সেলাম করে বললেন—সায়েব, ওরা ভয়ানক চটেচে। লাঠি নিয়ে আমাকে মারে আর কি! নীল কিছুতেই বুনবে না। আমি কত কাকুতি করলাম—হাতে-পায়ে ধরতে গেলাম। বললাম—

ডঙ্কিন্‌সন্‌ সাহেব বড়সাহেবের দিকে চেয়ে বললো—What he did, he says?

—Entreated them—

—I understand. Ask him how many people were there—

—কটো লোক সেখানে ছিল?

—তা প্রায় ছুশো লোক সায়েব। সব লাঠি-সোঁটা নিয়ে এসেছিল—

—Came with lathis and other weapons.

—Oh, they did, did they? The scoundrels!

—টারপরে টুমি কি করিলে?

—চলে এলাম সায়েব। ছুঃখিত হয়ে চলে এলাম। ভাবতি ভাবতি এলাম, এতগুলো

নীলির জমি এবার পড়ে রইলো! নীলচাষ হবে না। কুঠির মস্ত লোকসান।

কিছুক্ষণ পরে সদর কুঠির সামনের মাঠ জনতায় ভরে গেল। ওরা এসেচে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে নালিশ জানাতে—দেওয়ানজি ওদের গ্রাম রাহাতুনপুর একেবারে জালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে এসেচেন।

ম্যাজিস্ট্রেট দেওয়ান রাজারামকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—টুমি কি করিয়াছে। আগুন ডিয়াছে?

রাজারাম আকাশ থেকে পড়লেন। চোখ কপালে তুলে বললেন—আগুন! সে কি কথা সায়েব! আগুন।

আগুন জিনিসটা কি তাই যেন তিনি কখনও শোনেন নি।

ম্যাজিস্ট্রেটের সন্দেহ হোল। তিনি রাজারামকে অনেকক্ষণ জেরা করলেন। ঘুঘু রাজারাম অমন অনেক জেরা দেখেচেন, ওতে তিনি ভয় পান না। রাহাতুনপুর গ্রামের লোকদের অনেককে ডাক দিলেন, তাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। কিন্তু কুঠির সীমানায় দাঁড়িয়ে ওরা বেশি কিছু বলতে ভয় পেলে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আজ এসেচে, কাল চলে যাবে, কিন্তু ছোটসায়েব আর দেওয়ানজি চিরকালের জুজু। বিশেষত দেওয়ানজি। ওঁদের সামনে দাঁড়িয়ে ওঁদের বিরুদ্ধে কথা বলতে যাওয়া—সে অসম্ভব। রাহাতুনপুর গ্রামে ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং গেলেন দেখতে। সঙ্গে বড়সাহেব ও ছোটসাহেব। মস্ত বড় হাতী তৈরি হোল তাঁদের যাবার জন্যে দু-দুটো। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল রাহাতুনপুরের মাঠ।

খুব বড় গ্রাম নয় রাহাতুনপুর, একপাশে খড়ের মাঠ, খড়ের মাঠের পুবদিকে এই গ্রামখানি—একখানাও কোঠাবাড়ী ছিল না। চাষী গৃহস্থদের খড়ের চালাঘর গায়ে গায়ে লাগা। পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে গিয়েচে। কোনো কোনো ভিটেতে পোড়া কালো বাঁশগুলো দাঁড়িয়ে আছে। মাটির দেওয়াল পুড়ে রাঙা হয়ে গিয়েচে, কুমোর বাড়ীর হাঁড়ি-পোড়ানো পনের মত দেখতে হয়েচে তাদের রং। কবীর শেখের গোয়ালে দুটো দামড়া হেলে গোরু পুড়ে মরেচে। প্রত্যেকের উঠানে আধ-পোড়া ধানের গাদা, পোড়া ধানের গাদা থেকে মেয়েরা কুলো করে ধান বেছে নিয়ে ঝাড়ছিল—মুখের ভাত যদি কিছুটা বাঁচাতে পারা যায়।

অনেকে এসে কেঁদে পড়লো। দেওয়ানজির কাজ অনেকে বললে, কিন্তু প্রমাণ তো তেমন কিছু নেই। কেউ তাঁকে বা তাঁর লোককে আগুন দিতে দেখেচে এটা প্রমাণ হোল না। ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত ভালোভাবেই করলেন। বড়সাহেবকে ডেকে বললেন—আই অ্যাম রিয়্যালি সরি ফর দি পুওর বেগার্স—উই মাস্ট ডু সামথিং ফর দেম।

বড়সাহেব বললে—আই ওয়ানডার হু হ্যাজ কমিটেড্ দিস্ ব্ল্যাক্ ডিড্—আই সাস্পেক্ট মাই অয়েলি-টাংড্ দেওয়ান।

—ইউ থিংক ইট ইজ এ কেস্ অফ্ আর্সন?

—আই কান্ট টেল—ইয়ার্স এগো আই স এ কেস্ লাইক দিস্, অ্যাণ্ড স্থাট্ ওয়াজ এ কেস্ অফ আর্সন—মাই ডেওয়ান ওয়াজ রেস্পন্সিবল ফর স্থাট—দি ডেভিল্।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একশো টাকা মঞ্জুর করলেন সাহায্যের জন্য, বড়সাহেব দিলেন দুশো টাকা। সাহেবদের জয়জয়কার উঠলো গ্রামে।

সকলে বললে—না, অমন বিচারক আর হবে না। হাজার হোক রাঙা মুখ।

সেই রাত্রে কুঠির হলঘরে মস্ত নাচের আসর জম্‌লো। রাঙামুখ সাহেবরা সবাই মদ খেয়েচে। মেমদের কোমর ধরে নাচচে, ইংরিজি গান করচে। সহিস ভজা মুচি উর্দ্দি পরে মদ পরিবেশণ করচে। নীলকুঠিতে কোনো অবাঙালী চাকর বা খানসামা নেই। এই সব আশপাশের গ্রামের মুচি, বাগদি, ডোম শ্রেণীর লোকেরা চাকর খানসামার কাজ করে। ফলে সাহেব-মেম সকলেই বাংলা বলতে পারে, হিন্দি কেউ বলেও না, জানেও না।

আমীন প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী বার-দেউড়িতে তাঁর ছোট কুঠুরিতে বসে তামাক টানছিলেন। সামনে বসে ছিল বরদা বাগ্‌দিনী। বরদার বয়স প্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর চেয়ে বেশি, মাথার চুল শণের দড়ি। বরদাকে প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মাঝে মাঝে স্মরণ করেন নিজের কাজ উদ্ধারের জন্যে।

প্রসন্ন বললেন—গয়া ভালো আছে?

—তা একরকম আছে আপনাদের আশীর্ব্বাদে।

—বড় ভালো মেয়ে। এমন এ দিগরে দেখি নি। একটা কথা বরদা দিদি—

—কি বলো—

—এক বোতল ভাল বিলিতি মাল গয়াকে বলে আনিয়ে দাও দিদি। আজ অনেক ভালো জিনিসের আমদানি হয়েচে। সায়েব-সুবোর খানা, বুঝতেই পারচো। অনেক দিন ভালো জিনিস পেটে পড়ে নি—

—সে বাপু আমি কথা দিতে পারবো না। গয়া এখন ইদিকি নেই—সাহেবদের খানার সময় গয়া সেখানে থাকে না—

—লক্ষ্মি দিদি, শোনবো না, একটু নজর করতিই হবে—উঠে যাও দিদি। ছাখো, যদি গয়াকে বলে নিদেনে একটা বোতল যোগাড় করতি পাবো—

বরদা বাগ্‌দিনী চলে গেল। এ অঞ্চলে বরদার প্রতিপত্তি অসাধারণ, কারণ ও হোল সুবিখ্যাত গয়া মেমের মা! গয়া মেমকে মোল্লাহাটি নীলকুঠির অধীন সব গ্রামের সব প্রজা জানে ও মানে। গয়া বরদা বাগদিনীর মেয়ে বটে, কিন্তু বড়সাহেবের সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, এই জন্যেই ওর নাম এ অঞ্চলে গয়া মেম।

গয়া খারাপ লোক নয়, ধরে পড়লে সাহেবকে অনুরোধ ক'রে অনেকের ছোটবড় বিপদ সে কাটিয়ে দিয়েচে। মেয়েমানুষ কিনা, পাপ পথে নামলেও ওর হৃদয়ের ধর্ম্ম বজায় আছে ঠিক। গয়ার বয়স বেশি নয়, পঁচিশের মধ্যে, গায়ের রং কটা, বড় বড় চোখ, কালো চুলের ঢেউ ছেড়ে দিলে পিঠ পর্য্যন্ত পড়ে, মুখখানা বড় ছাঁচের কিন্তু এখনো বেশ টুল্‌টুলে। সর্ব্বাঙ্গের সুঠাম গড়নে ও অনেক ভদ্রঘরের সুন্দরীকে হার মানায়। পথ বেয়ে হেঁটে গেলে ওর দিকে চেয়ে থাকতে হয় খানিকক্ষণ।

গয়া মেমকে কিন্তু বড়সাহেবের সঙ্গে কেউ দেখে নি। অথচ ব্যাপারটা এ অঞ্চলে অজানা নয়। সে হোল বড়সাহেবের আয়া, সর্ব্বদা থাকে হল্‌দে কুঠিতে, যেটা বড়সাহেবের খাস কুঠি। ফরসা কালাপেড়ে শাড়ী ছাড়া সে পরে না, হাতে পৈঁছে, বাজুবন্ধ, কানে বড় বড় মাকড়ি—ঘনবনের বুকচেরা পাহাড়ী পথের মত বুকের খাঁজটাতে ওর দুলচে সরু মুড়কি-মাদুলি সোনার হারে গাঁথা।

ডোম-বাগদির মেয়েরা বলে—গয়া দিদি এক খেলা দেখালো ভালো! ওদের মধ্যে ভালোঘরের ঝি-বৌয়েরা নাক সিঁটকে বলে—অমন পৈঁছে বাজুবন্ধের পোড়া কপাল!

নিশ্চয় ওদের মধ্যে অনেকে ঈর্ষা করে ওকে। এর প্রমাণও আছে। অনেকে প্রতিযোগিতায় হেরেও গিয়েচে ওর কাছে। ঈর্ষা করবার সঙ্গত কারণ আছে বৈকি!

আমীন প্রসন্ন চক্কত্তির ঘরে এহেন গয়া মেমের আবির্ভাব খুবই অপ্রত্যাশিত ঘটনা। প্রসন্ন চক্কত্তি চমকে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—এই যে গয়া। এসো মা এসো—বসতি দিই কোথায়—

গয়া হেসে বললে—থাক্ খুড়োমশাই—আমি ঝনুকাঠের ওপর বসচি—তারপর কি বললেন মোরে?

—একটা বোতল যোগাড় করে দিতি পারো মা?

—দেখুন দিকি আপনার কাণ্ড। মা গিয়ে মোরে বললে, দাদাঠাকুরকে একটা ভালো বোতল না দিলি নয়। এই দেখুন আমি এনিচি—কেমন ধারা দেখুন তো?

গয়া কাপড়ের মধ্যে থেকে একটা সাদা পেটমোটা বেঁটে বোতল বার করে প্রসন্ন চক্কত্তির সামনে রাখলো। প্রসন্ন চক্কত্তির ছোট ছোট চোখ দুটো লোভে ও খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বোতলটা ধরে বল্লে—আহা, মা আমার—দেখি দেখি—কি ইংরিজী লেখা রয়েছে পড়তে পারিস?

—না খুড়োমশাই, ইঞ্জিরি মিঞ্জিরি আমরা পড়তি পারিনে।

প্রসন্ন চক্কত্তি গয়ার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাইলে। কিঞ্চিৎ মুগ্ধ দৃষ্টিতেও বোধ হয়। গয়া মেমের সুঠাম যৌবন অনেকেরই কামনার বস্তু। তবে বড্ড উঁচু ডালের ফল, হাতের নাগালে পাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে কি?

প্রসন্ন চক্কত্তি বললে—হ্যাঁরে গয়া, সায়েব মেমের নাচের মধ্যি হোল কি? দেখেচিস্ কিছু?

—না খুড়োমশাই। মোরে সেখানে থাকতি দ্যায় না।

—শিপ্‌টন্ সায়েবের মেম নাকি ছোটসায়েবের সঙ্গে নাচে?

—ওদের পোড়া কপাল। সবাই সবার মাজা ধরে নাচতি নেগেছে। ঝাঁটা মারুন ওদের মুখি। মুই দেখে নজ্জায় মরে যাই খুড়োমশাই।

—বলিস্ কি!

—হ্যাঁ খুড়োমশাই, মিথ্যে বলচিনে। আপনি না হয় গিয়ে একটু দেখে আসুন, বড়-

সাহেবের চাপরাশি নফর মুচি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

—ভজা মুচি কোথায়? ও আমার কথা একটু আধটু শোনে।

—সেও সেখানে আছে।

—বড়সাহেবও আছে?

—কেন থাকবে না। যাবে কনে?

—ভেতরে ভেতরে কেমন লোক বড়সাহেব?

গয়া সলজ্জ চোখ দুটি মাটির দিকে নামিয়ে বললে—ওই এক রকম। বাইরে যতটা গোঁয়ার-গোবিন্দ দেখেন ভেতরে কিন্তু ততটা নয়। বাবাঃ সব ভালো, কিন্তু ওদের গায়ে যে—

—গন্ধ?

—বোটকা গন্ধ তো আছেই। তা নয়, গায়ে বড্ড ঘামাচি। ঘামাচি পেকে উঠবে রোজ রাত্তিরি। মোর মাথার কাঁটা চেয়ে নিয়ে সেই ঘামাচি রোজ গালবে। কথাটা বলে ফেলেই গয়ার মনে পড়লো বৃদ্ধ প্রসন্ন আমীনের কাছে, বিশেষত যাকে খুড়োমশাই বলে ডাকে তাঁর কাছে, এ কথাটা বলা উচিত হয় নি। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা গেল বড্ড—সেটা ঢাকবার চেষ্টায় তাড়াতাড়ি উঠে বললে—যাই খুড়োমশাই, অনেক রাত হোল। বিস্কুট খাবেন? খান তো এনে দেবো এখন। আর এক জিনিস খায়—তারে বলে চিজ। বড্ড গন্ধ। মুই একবার মুখি দিয়ে শেষে গা ঘুরে মরি। তবে খেলি গায়ে জোর হয়।

গয়া মেম চলে গেলে প্রসন্ন আমীন মনের সাধে বোতল খুলে বিলিতি মদে চুমুক দিলেন। হাতে পয়সা আসে মন্দ নয় মাঝে মাঝে, দেওয়ানজির কৃপায়। কিন্তু এসব মাল জোটানো শুধু পয়সা থাকলেই বুঝি হয়? হদিস্ জানা চাই। দেওয়ানজির এসব চলে না, একেবারে কাঠখোট্টা লোক। ও পারে শুধু দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাতে। কি ক'রেই রাহাতুনপুরটা পুড়িয়ে দিলে এক রাত্তিরে। এই ঘরে বসেই সব সলাপরামর্শ ঠিক হয়, প্রসন্ন আমীন জানে না কি। ম্যাজিস্ট্রেটই আসুক আর যে ই আসুক, নীলকুঠির সীমানায় মধ্যে ঢুকলে সব ঠাণ্ডা।

তা ছাড়া, রাজার জাত রাজার জাতের পক্ষে কথা বলবে না তো কি বলবে কালা আদমিদের দিকে?

খাও দাও, মেমেদের মাজা ধরে নাচো, ব্যস্, মিটে গেল।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বেশ সুখে আছেন।

দেওয়ান রাজারাম রায়ের বাড়ী থেকে কিছুদূরে বাঁশবনের প্রান্তে দুখানা খড়ের ঘর তৈরি করে সেখানেই বসবাস করচেন আজ দু'বছর; তিলুর একটি ছেলে হয়েচে। ভবানী বাঁড়ুয্যে কিছু করবেন না, তিন চার বিঘে ধানের জমি যৌতুক স্বরূপ পেয়েছিলেন, তাতে যা ধান হয়, গত বছর বেশ চলে গিয়েছিল। সে বছর সেই যে সাহেবটি তাঁদের ছবি এঁকে নিয়ে গিয়েছিল, এ বার সে সাহেব তাঁকে একখানা চিঠি আর একখানা বই পাঠিয়েচে বিলেত

থেকে। রাজারাম নীলকুঠি থেকে বই আর চিঠি এনে ভবানীর হাতে দেন। হাতে দিয়ে বলেন—ওহে ভবানী, এতে তিলুর ছবি কি ক'রে এল ? সাহেব এঁকেছিল বুঝি। চমৎকার এঁকেচে, একেবারে প্রাণ দিয়ে এঁকেচে। কি সুন্দর ভঙ্গিতে এঁকেচে ওকে। ওর ছবি কি ক'রে আঁকলে সাহেব ? থাক্ থাক্, এ যেন আর কাউকে দেখিও না এ গাঁয়ে। কে কি মনে করবে। ইংরিজি বই। কি তাতে লিখেচে কেউ বলতে পারে না, শুধু এইটুকু বোঝা যায় এই গাঁ এবং যশোর অঞ্চল নিয়ে অনেক জায়গার ছবি আছে। সাহেবটা ভালো লোক ছিল।

তিলু হেসে বললে—দেখলেন, কেমন ছবি উঠেচে আমার।

—আমারও।

—বিলু-নিলুকে দেখাবেন। ওরা খুশি হবে। ডাকি দাঁড়ান—

নিলু এসে হৈ চৈ বাধিয়ে দিলে। সব তাতেই দিদি কেন আগে ? তার ছবি কি উঠতে জানে না ? দিদির সোহাগ ভুলতে পারবেন না রসের গুণমণি—অর্থাৎ ভবানী বাঁড়ুয্যে।

তবে আজকাল ওদের অনেক চঞ্চলতা কমেচে। কথাবার্ত্তার ছেলেমিও আগের মত নেই। বিলুর স্বভাব অনেক বদলেচে, দু'এক মাস পরে তারও ছেলেপুলে হবে।

তিলু কিন্তু অদ্ভুত। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরের আদুরে আবদেরে মেয়ে হয়ে সে ভবানী বাঁড়ুয্যের খড়ের ঘরে এসে কেমন মানিয়ে নিয়ে ঘর আলো করে বসেচে। এখানে কুলুঙ্গি, ওখানে তাক তৈরি করচে নিজের হাতে। নিজেই ঘর গোবর দিয়ে পরিপাটি করে নিকুচ্চে, উনুন তৈরি করচে পুকুরের মাটি এনে, সন্ধ্যের সময় বসে কাপাস তুলোর পৈতে কাটে। একদণ্ড বসে থাকবার মেয়ে সে নয়। চরকির মত ঘুরচে সর্ব্বদা।

বিলুও অনেক সাহায্য করে। দিদি রাঁধে, ওরা কুটনো কুটে দেয়। বিলু ও নিলু দিদির নিতান্ত অনুগত সহোদরা, দিদি যা বলে তাই সই। দিদি ছাড়া ওরা এতদিন কিছু জানতো না—অবিশ্যি আজকাল স্বামীকে চিনেচে দুজনেই। স্বামীর সঙ্গে বসে গল্প করতে ভারি ভালো লাগে।

বৌদিদি জগদম্বা বলেন—ও নিলু, আজকাল যে এ-বাড়ী আর আসিস নে আদপে ?

নিলু সলজ্জসুরে বলে—কত কাজ পড়ে থাকে ঘরের। দিদি একা, আমরা না থাকলি—

—তা তো বটেই। আমাদের তো আর ঘর-সংসার ছিল না, কেবল তোদেরই হয়েচে, না ?

—যা বলো।

—তিলুকে ওবেলা তাই বলছিলাম—

—ও বাবা, দিদি তোমার জামাইকে ফেলি আর খোকনকে ফেলি স্বগ্গে যেতি বল্লিও যাবে না।

—তা জানি।

—দিদি একা পারে না বলে খোকনকে নিয়ে আমাদের থাকতি হয়।

—বড্ড ভালো মেয়ে আমার তিলু। সন্দের পর একটু পাঠিয়ে দিস্। উনি কুঠি থেকে আগে আগে ফিরে এলে তিলুই ওঁর তামাক সেজে দিতো। জানিস তো। উনি রোজ ফিরে এসে বলেন, তিলু বাড়ী না থাকলি বাড়ী অন্ধকার।

—দিদিকে বলবো এখন।

—খোকাকে নিয়ে যেন আসে না, সন্দের পর।

—তোমাদের জামাই না ফিরে এলি তো দিদি আসতি পারবে না। তিনি গুণমণি ফেরেন রাতে।

—কোথা থেকে ?

—তা বলতে পারিনে।

—সন্ধান-টন্ধান নিবি। পুরুষের বার-দোষ বড্ড দোষ—

—সে-সব নেই তোমাদের জামাইয়ের, বৌদি। ও অন্য এক ধরনের মানুষ। সন্নিসি গোছের লোক। সন্নিসি হয়েই তো গিয়েছিল জানো তো। এখনো সেই রকম। সংসারে কোনো কিছুতেই নেই। দিদি যা করবে তাই।

—খাশা বড্ড ভালোমানুষ। আমার বড্ড দেখতি ইচ্ছে করে। সন্দের সময় আজ দুজনকেই একটু আসতি বলিস। এখানেই আহ্নিক ক'রে জল খাবেন জামাই।

ভবানী নদীর ধার থেকে সন্দের পর ফিরে আসতেই নিলু বললে—শুনুন, আপনাকে আর দিদিকে জোড়ে যেতি হবে ও-বাড়ী—বৌদিদির হুকুম—

—আর, তুমি আর বিলু ?

—আমাদের কে পোঁছে ? নাগর-নাগরী গেলেই হোল—

—আবার ওই সব কথা ?

—ঘাট হয়েচে। মাপ করুন মশাই।

এমন সময়ে তিলু এসে দুজনকে দেখে হেসে ফেললে। বললে,—বেশ তো বসে গল্পগুজব করা হচ্চে! আহ্নিকের জায়গা তৈরি যে—

ভবানী বললেন, নিলু বলচে তোমাকে আর আমাকে ওবাড়ী যেতে বলেচে বৌদিদি।

তিলু বললে—বেশ চলুন। খোকনকে ওদের কাছে রেখে যাই।

দিব্যি জ্যোৎস্না উঠেছে সন্ধ্যার পরেই। শীত এখনো সামান্য আছে, গাছে গাছে আমের মুকুল ধরেচে, এখনো আম্রমুকুলের সুগন্ধ ছড়াবার সময় আসে নি। দু' একটি কোকিল কখনো কখনো ডেকে ওঠে বড় বকুল গাছটার নিবিড় শাখা-প্রশাখার মধ্যে থেকে।

ভবানী বললেন—তিলু, বসবে ? চলো নদীর ধারে গিয়ে একটু বসা যাক্।

তিলুর নিজের কোনো মত নেই আজকাল। বললে—চলুন। কেউ দেখতি পাবে না তো ?

—পেলে তাই কি ?

—আপনার যা ইচ্ছে—

—রায়েদের ভাঙাবাড়ীর পেছন দিয়ে চলো। ও পথে ভূতের ভয়ে লোক যায় না।

নদীর ধারে এসে দুজনে দাঁড়ালো একটা বাঁশঝাড়ের তলায়, শুকনো পাতার রাশির ওপরে। তিলু বললে—দাঁড়ান, আঁচলটা পেতে নিচে বসুন—

—তুমি আঁচল খুলো না, ঠাণ্ডা লাগবে—

—আমার ঠাণ্ডা লাগে না, বসুন আপনি—

—বেশ লাগচে, না?

তিলু হেসে বললে—সত্যি বেশ, সংসার থেকে তো বেরুনোই হয় না আজকাল—কাজ আর কাজ। বিলু নিলু সংসারের কি জানে? ছেলেমানুষ। আমি যা বলে দেবো, তাই ওরা করে! সব দিকেই আমার ঝক্কি।

তিলুর কথার সুরে যশোর জেলার গ্রাম্য টানগুলি ভবানী বাঁড়ুয্যের এত মিষ্টি লাগে! তিনি নিজে নদীয়া জেলার লোক, সেখানকার বাংলার উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি সুমার্জ্জিত। এদেশে এসে প্রথমে শুনলেন এই ধরনের কথা।

হেসে বল্লেন—শোনো, তোমাদের দেশে বলে কি জানো? শিবির মাটি, পুঁবির ঘর—মুগির ডালি ঘি দিলি ক্ষীরির তার হয়—

—কি, কি?

—মুগির ডালি মানে মুগের ডালে, ঘি দিলি মানে ঘি দিলে—

—থাক্ ও, আপনার মানে বলতি হবে না। ও কথা আপনি প্যালেন কোথায়?

—এই দেখচি দেশের বুলি ধরেচ, বলতি হবে না, প্যালেন কোথায়! তবে মাঝে মাঝে চেপে থাকো কেন?

—লজ্জা করে আপনার সামনে বলতি—

ভবানী তিলুকে টেনে নিলেন আরো কাছে। জ্যোৎস্না বাঁকা ভাবে এসে সুন্দরী তিলুর সমস্ত দেহে পড়েচে, বয়স ত্রিশ হোলেও স্বামীকে পাবার দিনটি থেকে দেহে ও মনে ও যেন উদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরী হয়ে গিয়েচে! বালিকা-জীবনের কতদিনের অতৃপ্ত সাধ, কুলীন-কুমারীর অতি দুর্লভ বস্তু স্বামীরত্ন এতকালে সে পেয়েচে হাতের মুঠোয়। তাও এমন স্বামী। এখনো যেমন তিলুর বিশ্বাস হয় না। যদিও আজ দু'বছর হয়ে গেল।

তিলু বল্লে—আমার মনে হয় কি জানেন? আপনি আসেন নি বলেই আমাদের এতদিন বিয়ে হ'চ্ছিল না—কুলীনের মেয়ের বিয়ে—

—আচ্ছা, একটা কথা বুঝলাম না। রায় উপাধি তোমাদের, রায় আবার কুলীন কিসের! রায় তো শ্রোত্রিয়—

—ওকথা দাদাকে জিগ্যেস করবেন। আমি মেয়েমানুষ, কি জানি। আমরা কুলীন সত্যিই। আমার দুই পিসি ছিলেন তাঁদের বিয়ে হয় না কিছুতেই। ছোট পিসি মারা যাওয়ার পরে বড় পিসিকে বিয়ে ক'রে নিয়ে গেল কোথায় অজ বাঙাল দেশে—ভালো কুলীনের ছেলে—

—আহা, তোমরা আর বাঙাল দেশ বোলো না। যশুরে বাঙাল কোথাকার! মুগির ডালি ঘি দিলি ক্ষীরির তার হয়। শিবির মাটি, পুঁবির ঘর—

—যান আপনি কেবল ক্ষ্যাপাবেন—আর আপনাদের যে গেলুম, মলুম হালুম হুলুম—হি হি—হি হি—

—আচ্ছা থাক্। তারপর?

—তখন বড় পিসির বয়েস চল্লিশের ওপর। সেখানে গিয়ে আগের সতীনের বড় বড় ছেলেমেয়ে, বিশ ত্রিশ বছর বয়েস তাদের। সতীন ছিল না। ছেলেমেয়েরা কি যন্ত্রণা দিতো! সব মুখ বুজে সহ্যি করতেন বড় পিসি। নিজের সংসার পেয়েছিলেন অতকাল পরে। একটা বিধবা বড় মেয়ে ছিল, সে পিসিকে কাঠের চ্যালার বাড়ি মারতো, বলতো—তুই আবার কে? বাবার নিকের বৌ, বাবার মতিচ্ছন্ন হয়েচে তাই তোকে বিয়ে করে এনেচে। তাও পিসি মুখ বুজি সয়ে থাকতো। অবশেষে বুড়ো বাহাত্তুরে স্বামী তুললো পটল।

—তারপর?

—তারপর সতীনপো সতীনঝিরা মিলে কী দুর্দ্দশা করতে লাগলো পিসির! তারপর তাড়িয়ে দিলে পিসিকে বাড়ী থেকে। পিসি কাঁদে আর বলে—আমার স্বামীর ভিটেতে আমাকে একটু থান দাও। তা তারা দিলে না। পথে বার করে দিলে। সেকালের লজ্জাবতী মেয়েমানুষ, বয়েস হয়েছিল তা কি, কনে-বৌয়ের মত জড়োসড়ো। একজনেরা দয়া করে তাদের বাড়ীতে আশ্রয় দিলে। কি কান্না পিসির। তারাই বাপের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেল। তখনো স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান। বাড়ী এসে পিসিকে একাদশী করতে হয়নি বেশিদিন। ভগবান সতীলক্ষ্মীকে দয়া করে তুলে নিলেন।

—এ কতদিন আগের কথা?

—অনেক দিনের। আমি তখন জন্মিচি কিন্তু আমার জ্ঞান হয় নি। পিসিমাকে আমি মনে করতে পারিনে। বড় হয়ে মার মুখে বৌদির মুখে সব শুনতাম। বৌদি তখন কনে-বৌ, সবে এসেচে এ বাড়ী।

তিলু চুপ করলে, ভবানী বাঁড়ুযোও কতক্ষণ চুপ করে রইলেন। ভবানী বাঁড়ুয্যের মনে হোল, বৃথাই তিনি সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। সমাজের এই অত্যাচারিতাদের সেবার জন্যে বার বার তিনি সংসারে আসতে রাজী আছেন। মুক্তি-টুক্তি এর তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ।

কতদিন আগের সেই অভাগিনী কুলীন-কুমারীর স্মৃতি বহন করে ইছামতী তাঁদের সামনে দিয়ে বয়ে চলেচে, তাঁরই না-মেটা স্বামী-সাধের পুণ্য-চোখের জল ওর জলে মিশে গিয়েচে কতদিন আগে। আজ এই পানকলস ফুলের গন্ধ মাখানো চাঁদের আলোয় তিনিই যেন স্বর্গ থেকে নেমে বললেন—বাবা, আমার যে সাধ পোরে নি, তোমার সামনে যে বসে আছে এই মেয়েটির তুমি সে সাধ পুরিও। বাংলা দেশের মেয়েদের ভালো স্বামী হও, এদের সে সাধ পূর্ণ হোক আমার যা পুরলো না—এই আমার আশীর্ব্বাদ!

ভবানী বাঁড়ুয্যে তিলুকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন।

যখন ওরা দেওয়ানবাড়ী পৌঁছলো তখন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েচে, একদণ্ড রাত্রিও কেটে গিয়েচে। জগদম্বা বললেন—ওমা, তোরা ছিলি কোথায় রে তিলু? নিলু এসেছিল এই খানিক আগে। বললে, তারা কতক্ষণ বাড়ী থেকে বেরিয়েচে। আমি জামাইয়ের জন্যে আহ্নিকের জায়গা করে জলখাবার গুছিয়ে বসে আছি ঠায়, কি যে কাণ্ড তোদের—

তিলু বলে—কাউকে বোলো না বৌদিদি, উনি নদীর ধারে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি ওঁকে জলখাবার খাইয়ে দাও। আমার মন কেমন করচে খোকনের জন্যে। কতক্ষণ দেখি নি। নিলু কী বললে, খোকন কাঁদচে না তো।

—না, খোকন ঘুমিয়ে পড়েচে নিলু বলে গেল। তুই খেয়ে নে—

—উনি আহ্নিক করুন আগে। দাদা আসেন নি?

—তাঁর ঘোড়া গিয়েচে আনবার জন্যি।

জলখাবার সাজিয়ে দিলেন জগদম্বা জামাইয়ের সামনে। শালাজ বৌ হোলেও ভবানী তাঁকে শাশুড়ীর মত সম্মান করেন। জগদম্বা ঘোমটা দিয়ে ছাড়া বোরোন না জামাইয়ের সামনে। মুগের ডাল ভিজে, পাটালি, খেজুরের রস, নারকেল নাড়ু, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ এবং ফেণী বাতাসা। তিলু খেতে খেতে বললে—বিলু নিলুকে দিয়েচ?

—নিলু এসে খেয়ে গিয়েচে, বিলুর জন্যি নিয়ে গিয়েচে।

—এবার যাই বৌদি। খোকন হয়তো উঠে কাঁদবে।

—জামাইকে নিয়ে আবার পরেও আসবি। দুখানা আঁদোসা ভেজে জামাইকে খাওয়াবো। খেজুরের রসের পায়েস করবো সেদিন। আজ মোটে এক ভাঁড় রস দিয়ে গেল ভজা মুচির ভাই, নইলে আজই করতাম।

—শোনো বৌদি। তোমাদের জামাই বলে কিনা আমার বাঙালে কথা। বলে—শিবির মাটি, পূবির ঘর। আবার এক ছড়া বার করেচে—মুগির ডালি ঘি দিলি নাকি ক্ষীরির তার হয়—হি হি—

—আহা, কি শহুরে জামাই। দেবো একদিন শুনিয়ে। তবুও যদি দাড়িতে জট না পাকাতো। আমি যখন প্রথম দেখি তখন এত বড় দাড়ি, যেন নারদ মুনি।

—তোমাদের জামাই তোমরাই বোঝো বৌদি। আমি যাই, খোকন ঠিক উঠেচে। আবার আসবো পরশু।

পথে বার হয়ে ভবানী আগে আগে তিলু পেছনে ঘোমটা দিয়ে চলতে লাগলো। পাড়ার মধ্যে দিয়ে পথ। এখানে ওদের একত্র ভ্রমণ বা কথোপকথন আদৌ চলবে না।

চন্দ্র চাটুয্যের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দিয়ে রাস্তা। রাত্রে সেখানে দাবার আড্ডা বিখ্যাত। সম্পর্কে চন্দ্র চাটুয্যে হোলেন তিলুর মামাশ্বশুর। তিলুর বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো, যদি মামাশ্বশুর দেখে ফেলেন? এত রাতে সে স্বামীর সঙ্গে পথে বেরিয়েচে!

চণ্ডীমণ্ডপের সামনাসামনি যখন ওরা এসেচে তখন চণ্ডীমণ্ডপের ভিড়ের মধ্যে থেকে কে জিজ্ঞেস করে উঠল,—কে যায় ?

ভবানী গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন—আমি।

—কে, ভবানী ?

—হ্যাঁ।

—ও।

লোকটা চুপ করে গেল। তিলু আরও এগিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে—কে ডাকলে ?

—মহাদেব মুখুয্যে।

—ভালো জ্বালা। আমাকে দেখলে নাকি ?

—দেখলে তাই কি ? তুমি আমার সঙ্গে থাক, অত ভয়ই বা কিসের ?

আপনি জানেন না এ গাঁয়ের ব্যাপার। ঐ নিয়ে কাল হয়তো রটনা রটবে। বলবে, অমুকের বৌ সদর রাস্তা দিয়ে তার স্বামীর সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিল গট্ গট্ করে।

—বয়েই গেল। এসব বদলে যাবে তিলু, থাকবে না, সেদিন আসচে। তোমার আমার দিন চলে যাবে। ঐ খোকন যদি বাঁচে, ওর বৌকে নিয়ে ও পাশাপাশি হেঁটে বেড়াবে এ গাঁয়ের পথে—কেউ কিছু মনে করবে না।

নালু পাল একখানা দোকান করেচে। ইছামতী থেকে যে বাঁওড় বেরিয়েচে, এটা ইছামতীরই পুরনো খাত ছিল একসময়ে। এখন আর সে খাতে স্রোত বয় না, টোপাপানার দাম জমেচে। নালু পালের দোকান এই বাঁওড়ের ধারে, মুদির দোকান একখানা ভালোই চলে এখানে, মোল্লাহাটির হাটে মাথায় ক'রে জিনিস বিক্রি করবার সময়ে সে লক্ষ্য করেছিল।

নালু পালের দোকানে খদ্দের এল। জাতে বুনো, এদের পূর্ব্বপুরুষ নীলকুঠির কাজের জন্যে এদেশে এসেছিল সাঁওতাল পরগণা থেকে। এখন এরা বাংলা বেশ বলে, কালীপুজো মনসাপুজো করে, বাঙালী মেয়ের মত শাড়ী পরে।

একটি মেয়ে বললে—দু'পয়সার তেল আর নুন দ্যাও গো। মেঘ উঠেচে, বিষ্টি আসবে—

একটি মেয়ে আঁচল থেকে খুললে চারটি পয়সা। সে কড়ি ভাঙাতে এসেচে। এক-পয়সায় পাঁচগণ্ডা কড়ি পাওয়া যায়—আজ সবাইপুরের হাট, কড়ি দিয়ে শাক বেগুন কিনবে।

নালু পাল আজ বড় ব্যস্ত। হাটবারের দিন আজ, সবাইপুর গ্রাম এখান থেকে আধ-মাইল, সব লোক হাটের ফেরৎ ওর দোকান থেকে জিনিস কিনে নিয়ে যাবে। পয়সার বাক্স আলাদা, কড়ির বাক্স আলাদা—সে জিনিস বিক্রি ক'রে নির্দ্দিষ্ট বাক্সে ফেলচে।

এখানে বসে সে সস্তায় হাট করে। একটি মেয়ে লাউশাক বিক্রি করতে যাচ্ছে, নালু পাল বললে—শাক কত ?

—আট কড়া।

—দূর, ছ' কড়া কালও কিনিচি। শাক আবার আটকড়া! কখনো বাপের জন্মে শুনি নি। দে ছ'কড়া ক'রে।

—দিলি বড্ড ক্ষেতি হয়ে যায় যে—টাটকা শাক, এখুনি তুলি নিয়ে অ্যালাম।

—দিয়ে যা রে বাপু। টাট্‌কা শাক ছাড়া বাসি আবার কে বেচে ?

ছুটি কচি লাউ মাথায় একটা ঝুড়িতে বসিয়ে একজন লোক যাচ্ছে। নালুর দৃষ্টি শাক থেকে সেদিকে চলে গেল।

—বলি ও দবিরুদ্দি ভাই। শোনো শোনো ইদিকি—

—কি ? লাউ তুমি কিনতি পারবা না। ছস্তায় দিতি পারবো না!

—কত দাম ?

—ছ' পয়সা এক একটা।

দোকানের তাবৎ লোক দর শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। সকলেই ওর দিকে চাইতে লাগল। একজন বললে—ঠাট্টা করলে নাকি ?

দবিরুদ্দি মাথার লাউ নামিয়ে একজনের হাত থেকে কল্কে নিয়ে হেসে বললে—ঠাট্টা করবো কেন! মোরা ঠাট্টার যুগ্যি নোক ?

নালু হেসে বললে—কথাটা উল্টো বলে ফেললে। আমরা কি তোমার ঠাট্টার যুগ্যি লোক ? আসল কথাটা এই হবে। এখন বল কত নেবা ?

—একপয়সা দশকড়া দিও।

—না, একপয়সা পাঁচকড়া নিও। আর জ্বালিও না বাপু, ওই নিয়ে খুশি হও। দুটো লাউই দিয়ে যাও।

বৃদ্ধ হরি নাপিত বসে তামাকের গুল একটা পাতায় জড়ো করছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলে ভূধর ঘোষ—ও কি হচ্চে ?

—দাঁত মাজবো বেন্ বেলা। লাউ একটা কিনবো ভেবেলাম তা দর দেখে কিনতি সাহস হোল না। এই মোল্লাহাটির হাটে জন্‌সন্ সাহেবের আমলে অমন একটা লাউ ছ'কড়া দিয়ে কিনিচি। দশ কড়ায় অমন দুটো লাউ পাওয়া যেত। আমার তখন নতুন বিয়ে হয়েছে, পার্শ্বনাথ ঘোষের বাড়ী ওর বড় ছেলের বৌভাতে একপাড়ি তরকারি এয়েল, একটাকা দাম পড়ল মোটমাট। অমন লাউ তার মধ্যি পনেরো বিশটা ছিল।' পটল, কুমড়ো, বেগুন, ঝিঙে, থোড়, মোচা, পালংশাক, শসা তো অগুন্তি। এখন সেই রকম একপাড়ি তরকারি দু'টাকার কম নয় ?

অক্রুর জেলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—নাঃ, মানুষের খাদ্যখাদক কেরমেই অনাটন হয়ে ওঠছে। মানুষের খাবার দিন চলে যাচ্ছে, আর খাবে কি ? এই সবাইপুরে দুধ ছিল ট্যাকায়

বাইশ সের চব্বিশ সের। এখন আঠারো সেরের বেশি কেউ দিতি চায় না।

নালু পাল বললে—আঠারো সের কি বলচো খুড়ো? আমাদের গাঁয়ে ষোল সেরের বেশি পাওয়া যাচ্ছে না। একটু সন্দেশ করবো বলে ছানা কিন্‌তি গিয়েছিলাম অঘোর ঘোষের কাছে, তা নাকি দু' আনা করে খুলি! এক খুলিতে বড্ড জোর পাঁচপোয়া ছানা থাকুক—

অক্রূর জেলে হতাশভাবে বললে—নাঃ—আমাদের মত গরীবগুরবো না খেয়েই মারা যাবে। অচল হয়ে পড়লো কেরমেশে।

—তা সেই রকমই দাঁড়িয়েচে।

দবিরুদ্দি নিজেকে যথেষ্ট তিরস্কৃত বিবেচনা করে এক একটা লাউ এক এক পয়সা হিসাবে দাম চুকিয়ে নিয়ে হাটের দিকে চলে গেল। নালু পাল তাকে একটা পয়সা দিয়ে বললে—অম্‌নি এক কাজ করবা। এক পয়সা চিংড়ি মাছ আমার জন্যে কিনে এনো। লাউ দিয়ে চিংড়ি দিয়ে তবে মজে। বেশ ছটকালো দেখে দোয়াড়ির চিংড় আনবা।

হরি নাপিত বললে—চালখানা ছেয়ে নেবো বলে ঘরামির বাড়ী গিয়েলাম। চার আনা রোজ চেল বরাবর, সেদিন সোনা ঘরামি বললে কিনা চার আনায় আর চাল ছাইতে পারবো না, পাঁচ আনা রুরি দিতি হবে। ঘরামি জন পাঁচ আনা আর একটা পেটেল দু'আনা—তাহলি একখানা পাঁচ-চালা ঘর ছাইতে কত মজুরি পড়লো বাপধনেরা? পাঁচ ছ টাকার কম নয়।

বর্ত্তমানকালের এই সব দুর্ম্মূল্যতার ছবি অক্রূরকে এত নিরাশ ও ভীত করে তুললো যে সে বেচারী আর তামাক না খেয়ে কল্কেটি মাটিতে নামিয়ে রেখে হন্‌হন্ করে চলে গেল।

কিন্তু কিছুদূর গিয়েই আবার তাকে ফিরতে হোল। অক্রূর জেলের বাড়ী পাশের গ্রাম পুস্তিঘাটায়। তার বড়ছেলে মাছ ধরার বাঁধাল দিয়েচে সবাইপুরের বাঁওড়ে। হঠাৎ দেখা গেল দূরে ডুমুরগাছের তলায় সে আসচে, মাথায় চুপড়িতে একটা বড় মাছ।

অক্রূর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে গেল। অত বড় মাছটা কি তার ছেলে পেয়েচে নাকি? বিশ্বাস তো হয় না। আজ হাট করবার পয়সাও তার হাতে নেই। যত কাছে আসে ওর ছেলে, তত ওর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওঃ, মস্ত বড় মাছটা দেখচি।

দূর থেকে ছেলে বললে—কনে যাচ্ছ বাবা?

—বাড়ী যাচ্ছিলাম। মাছ কাদের?

—বাঁধালের মাছ। এখন পড়লো।

—ওজন?

—আট সের দশ ছটাক। তুমি মাছটা নিয়ে হাটে যাও।

—তুই কনে যাবি?

—নৌকো বাঁওড়ের মুখে রেখে অ্যালাম যে। ঝড় হলি উড়ে বেরিয়ে যাবে। তুমি যাও।

নালু পালের দোকানে খদ্দেরের ভিড় আরম্ভ হবে সন্দে বেলা। এই সময়টা সে পাঁচ-জনের সঙ্গে গল্পগুজব করে দিন কাটায়। অক্রুর জেলেকে দোকানের সামনে সবাই মিলে দাঁড় করালে। বেশ মাছটা। এত বড় মাছ অবেলায় ধরা পড়লো ?

নালু বললে—মাছটা আমাদের দিয়ে যাও অক্রুরদা—

—দ্যাও না। আমি বেঁচে যাই তা হ'লে। অবেলায় আর হাটে যাই নে।

—দাম কি ?

—চার ট্যাকা দিও।

—বুঝে সুজে বল অক্রুরদা। অবিশ্যি অনেকদিন তুমি বড় মাছ বিক্রি কর নি, দাম জানো না। হরি কাকা, দাম কত হতে পারে ?

হরি নাপিত ভালো করে মাছটা দেখে বললে—আমাদের উঠতি বয়েসে এ মাছের দাম হোত দেড় ট্যাকা! দাও তিন টাকাতে দিয়ে যাও।

—মাপ কোরো দাদা, পারবো না। বড্ড ঠকা হবে।

—আচ্ছা, সাড়ে তিন টাকা পাবে। আর কথাটি বোলো না, আজ দু'ট্যাকা নিয়ে যাও। কাল বাকিটা নেবে।

মাছ কিনে কেউ বিশেষ সন্তুষ্ট হোল না, কারণ অক্রুর মাঝিকে এরা বেশি ঠকাতে পারে নি। ন্যায্য দাম যা হাটে-বাজারে তার চেয়ে না হয় আনা-আটেক কম হয়েচে।

নালু পাল বললে—কে কে ভাগ নেবা, তৈরি হও। নগদ পয়সা। ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল, তুমি কি আমার পর ?

পাঁচ ছ'জন নগদ দাম দিয়ে মাছ কিনতে রাজি হোল। সবাই মিলে মাছটা কেটে ফেললে দোকানের পেছনে বাঁশতলার ছায়ায় বসে। এক এক খানা মানকচুর পাতা যোগাড় করে এনে একভাগ মাছ নিয়ে গেল প্রত্যেকে।

নালু পাল নিলে এক ভাগের অর্দ্ধেকটা।

অক্রুর জেলে বললে—পাল মশায়, অর্দ্ধেক কেন, পুরো নিলে না ?

—না হে, দোকানের অবস্থা ভালো না। অত মাছ খেলেই হোল!

—তোমরা তো মোটে মা ছেলে, একটা বুঝি বোন। সংসারে খরচ কি ?

—দোকানটাকে দাঁড় না করিয়ে কিছু করচি নে দাদা।

—বৌ নিয়ে এসো এই সামনের অঘ্রাণে। আমরা দেখি।

—ব্যবসা দাঁড় করিয়ে নিই আগে। সব হবে।

নালু পাল আর কথা বলতে সময় পেলে না। দোকানে ওর বড় ভিড় জমে গেল। কড়ির খদ্দের বেশী, পয়সার কম। টাকা ভাঙাতে এলো না একজনও। কেউ টাকা বার করলে না। অথচ রাত আটটা পর্য্যন্ত দলে দলে খদ্দেরের ভিড় হোল ওর দোকানে। ভিড় যখন ভাঙলো তখন রাত অনেক হয়েচে।

এক প্রহর রাত্রি।

তবিল মেলাতে বসলো নালু পাল। কড়ি গুণে গুণে একদিকে, পয়সা আর এক দিকে। দু'টাকা সাত আনা পাঁচ কড়া।

নালু পাল আশ্চর্য্য হয়ে গেল। একবেলায় প্রায় আড়াই টাকা বিক্রি। এ বিশ্বাস করা শক্ত। সোনার দোকানটুকু। মা সিদ্ধেশ্বরীর কৃপায় এখন এই রকম যদি চলে রোজ রোজ তবেই।

আড়াই টাকা একবেলায় বিক্রি। নালু পাল কখনো ভাবে নি। সামান্য মশলার বেসাতি করে বেড়াতো হাটে হাটে। রোদ নেই, বর্ষা নেই, কাদা নেই, জল নেই—সব শরীরের ওপর দিয়ে গিয়েচে। গোপালনগরের বড় বড় দোকানদার তার সঙ্গে ভালো করে কথা বলতো না। জিনিস বেসাতি করে মাথায় নিয়ে, সে আবার মানুষ!

আজ আর তার সে দিন নেই। নিজের দোকান, খড়ের চালা, মাটির দেওয়াল। দোকানে তক্তপোশের ওপর বসে সে বিক্রি করে গদিয়ান চালে। কোথাও তাকে যেতে হয় না, রোদ বৃষ্টি গায়ের ওপর দিয়ে যায় না। নিজের দোকানের নিজে মালিক। পাঁচজন এসে বিকেলে গল্প করে বাইরে বাঁশের মাচায় বসে। সবাই খাতির করে, দোকানদার ব'লে সম্মান করে।

আড়াই টাকা বিক্রি। এতে সে যত আশ্চর্য্যই হোক, এর বেশি তাকে তুলতে হবে। পাঁচ টাকায় দাঁড় করাতে যদি পারে দৈনিক বিক্রি, তবেই সে গোবর্দ্ধন পালের উপযুক্ত পুত্র। মা সিদ্ধেশ্বরী সে দিন যেন দেন।

নালু পাল কিছু ধানের জমির চেষ্টায় ঘুরচে আজ কিছুদিন ধরে। রাত্রে বাড়ী গিয়ে সে ঠিক করলে সাতবেড়ের কানাই মণ্ডলের কাছে কাল সকালে উঠেই সে যাবে। সাতবেড়েতে ভাল ধানী জমি আছে বিলের ধারে, সে খবর পেয়েছে।

বিয়ে?

ও কথাটা হরি নাপিত মিথ্যে বলে নি কিছু। বিয়ে করে বৌ না আনলে সংসার মানায়?

তার সন্ধানে ভালো মেয়েও সে দেখে রেখেছে—বিনোদপুরের অম্বিক প্রামাণিকের সেজ মেয়ে তুলসীকে।

সেবার তুলসী জল দিতে এসে বেলতলায় দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়েছিল। দু'বার চেয়েছিল, নালু লক্ষ্য করেচে। তুলসীর বয়স এগার বছরের কম হবে না, শ্যামাঙ্গী মেয়ে, বড় বড় চোখ—হাত-পায়ের গড়ন কি চমৎকার যে ওর, চোখে না দেখলে বোঝানো যাবে না। বিনোদপুরের মাসির বাড়ী আজকাল মাঝে মাঝে যাতায়াত করার মূলেই যে মাসিদের পাড়ার অম্বিক প্রামাণিকের এই মেয়েটি—তা হয়তো স্বয়ং মাসিও খবর রাখেন না। কিন্তু না, কথা তা নয়।

বিয়ে করতে চাইলে, তুলসীর বাবা হাতে স্বর্গ পাবেন সে জানে। বিয়ে করতে হলে

এমন একটি শ্বশুর দরকার যে তার ভাল অভিভাবক হতে পারে। সে নিজে অভিভাবকশূন্য, তার পেছনে দাঁড়িয়ে তাকে উৎসাহ দেবার কেউ নেই, বিপদে আপদে পরামর্শ করবার কেউ নেই। বাবা মারা যাওয়ার পর একা তাঁকে যুঝতে হচ্ছে সংসারের মধ্যে। বিনোদ প্রামাণিক ওই গ্রামের ছোট আড়তদার, সর্ষে, কলাই, মুগ কেনাবেচা করে, খড়ের চালা আছে খানদুই বাড়ীতে। এমন কিছু অবস্থাপন্ন গৃহস্থ নয়, হঠাৎ হাত পাতলে পঞ্চাশ একশো বার করবার মত সঙ্গতি নেই ওদের। নালুর এখন কিন্তু সেটাও দরকার। ব্যবসার জন্যে টাকা দরকার। মাল সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে, এখুনি বায়না করতে হবে—এ সময়ে ব্যবসা আরো বড় করে ফাঁদতে পারতো। ব্যবসা সে বুঝেচে—কিন্তু টাকা দেবে কে?

নালুর মা ভাত নিয়ে বসে ছিল রান্নাঘরের দাওয়ায়। ও আসতেই বললে—বাবা নালু এলি? কতক্ষণ যে বসে বসে ঢুলুনি নেমেচে চকি।

—ভাত বাড়ো। খিদে পেয়েচে।

—হাত পা ধুয়ে আয়। ময়না জল রেখে দিয়েচে ছেঁচতলায়।

—ময়না কোথায়?

—ঘুমুচ্ছে।

—এর মধ্যি ঘুম?

—ওমা, কি বলিস? ছেলেমানুষের চকি ঘুম আসে না এত রাত্তিরি?

—পরের বাড়ী যেতে হবে যে। না হয় আর একবচ্ছর। তারা খাটিয়ে নেবে তবে খেতে দেবে। বসে খেতে দেবে না। চকি ঘুম এলি তারা শোনবে না।

নালু ভাত খেতে বসলো। উচ্ছে চচ্চড়ি আর কলাইয়ের ডাল। ব্যস, আর কিছু না। রাঙা আউশ চালের ভাত আর কলাইয়ের ডাল মেখে খাবার সময় তার মুখে এমন একটি তৃপ্তির রেখা ফুটে উঠলো যা বসে দেখবার ও উপভোগ করবার মতো।

ময়না এসে বললে—দাদা, তামাক সাজি?

—আন।

—তুমি নাকি আমায় বক্‌ছিলে ঘুমুইচি বলে, মা বলচে।

—বকচিই তো। ধাড়ী মোষ, সংসারে কাজ নেই—এত সকালে ঘুম কেন?

—বেশ করবো।

—যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা—আ মোলো যা—

—গাল দিও না দাদা বলে দিচ্ছি। তোমার খাই না পরি?

—তবে কার খাস পরিস, ও পোড়ারমুখী?

—যার।

—মা তোমাকে এনে দেয় রোজগার করে। বাঁদরি কোথাকার, ধুচুনি মাথায় দোজবরে বুড়ো বর যদি তোর না আনি—

—ইস বঁটি দিয়ে নাক কেটে দেবো না বুড়ো বরের? হাঁ দাদা, তুমি আমাদের

বৌদিদিকে কবে আনচো?

—তোমায় আগে পার করি, তবে সে কথা। তোমার মত খাণ্ডার ননদকে বাড়ী থেকে না তাড়িয়ে—

—আহা হা! কথার কি ছিরি! খাণ্ডার ননদ দেখো তখন বৌদিদির কত কাজ করে দেবে। আমার পাল্‌কি কই?

—পাল্‌কি পাই নি। পোড়ানো থাকে না তো। সুয়ো পোটোকে ব'লে রেখেছি। রথের সময় রং করে দেবে।

—পুতুলের বিয়ে দেবো এ ষাঢ় মাসে। তার আগে কিনে দিতে হবে পাল্‌কি। না যদি দাও তবে—

—যা যা তামাক সেজে আন। বাজে বকুনি রেখে দে।

ময়না তামাক সেজে এনে দিল। অল্প কয়েক টান দিয়েই নালু পাল একটা মাদুর দাওয়ায় টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লো।

গ্রীষ্মকাল। আতা ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ বাতাসে। আকাশে সামান্য একটু জ্যোৎস্না উঠেছে কৃষ্ণাকিম্বিন।

নন্দীদের বাগানে শেয়াল ডেকে উঠলো। রাত হয়েচে নিতান্ত কমও নয়। এ পাড়া নিষুতি হয়ে এসেছে।

ময়না আবার এসে বললে—পা টিপে দেবো?

—না না, তুই যা। ভারি আমার—

—দিই না।

—রাত হয়েচে। শুগে যা। কাল সকালে আমায় ডেকে দিবি। সাতবেড়েতে যাবো জমি দেখতি।

—ডাকবো। পা টিপতি হবে না তো?

—না, তুই যা।

নালু পাল বাড়ী ফিরবার পথে সন্নিসিনীর আখড়ায় একটা ক'রে আধলা পয়সা দিয়ে যায় প্রতি রাত্রে। দেব'দ্বজে ওর খুব ভক্তি, ব্যবসায় উন্নতি তো হবে ওঁদেরই দয়ায়। সন্নিসিনীর আশ্রম বাঁওড়ের ধারের রাস্তার পাশে প্রাচীন এক বটবৃক্ষ-তলে, নিবিড় সাঁই-বাবলা বনের আড়ালে, রাস্তা থেকে দেখা যায় না। সন্নিসিনীর বাড়ী ধোপাখোলা, সে নাকি হঠাৎ স্বপ্ন পেয়েছিল, এ গ্রামের এই প্রাচীন বটতলার জঙ্গলে শ্মশানকালীর পীঠস্থান সাড়ে তিনশো বছর ধরে লুকোনো। তাই সে এখানে এসে জঙ্গল কেটে আশ্রম বসিয়েছিল বছর সাতেক আগে। এখন তার অনেক শিষ্যসেবক, পুজো-আচ্চা ধন্না দিতে আসে ভিন্ন গ্রামের কত লোক।

সন্ধ্যার পরে যারা আসে, বৈঁচি গাছের জঙ্গল ঘেঁষে যে খড়ের নীচু ঘরখানা, যার মাথার

উপর বটগাছের বড় ডালটা, যেখানে বাসা বেঁধেচে অজস্র বাবুই, যেখানে ঝোলে কলাবাদুড়ের পাল রাত্রের অন্ধকারে, সেই ঘরটির দাওয়ায় বসে বসে ওরা গাঁজার আড্ডা জমায়।

নালুকে বললে ছিহরি জেলে,—কেডা গা? নালু?

—হ্যাঁ।

—কি করতি এলে?

—মায়ের বিত্তিটা দিয়ে যাই। রোজ আসি।

—বিত্তি?

—হ্যাঁ গো।

—কত?

—দশকড়া। আধপয়সা।

—বসো। একটু ধোঁয়া ছাড়বা না?

—না, ওসব চলে না। বোসো তোমরা। আর কে কে আছে?

—নেই এখন কেউ। হরি বোষ্টম আসে, মনু যুগী আসে, দ্বারিক কর্ম্মকার আসে, হাফেজ আসে, মনসুর নিকিরি আসে।

নালু কি একটা কথা বলতে গিয়ে বড় অবাক হয়ে গেল। তার চোখকে যেন বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে উঠলো। দেওয়ান বাড়ীর জামাই বাঁড়ুয্যে মশাইকে সে হঠাৎ দেখতে পেলে অশথতলার দিকে আসতে। উনিও কি এখানে গাঁজার আড্ডায়— ?

নালু দাঁড়ালো চুপ করে দাওয়ার বাইরে ছেঁচ্‌তলায়।

ভবানী বাঁড়ুয্যে এসে বটতলার বসলেন আসনের সামনে। মূর্ত্তি নেই, ত্রিশূল বসানো সিঁদুরলেপা একটা উঁচু জায়গা আছে গাছতলায়, আসন বলা হয় তাকেই। ভবানী বাঁড়ুয্যে একমনে বসে থাকবার পরে সন্নিসিনী সেখানে এসে বসলো তাঁর পাশেই। সন্নিসিনীর রং কালো, বয়েস পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, মুখশ্রী তাড়কা রাক্ষসীকে লজ্জা দেয়, মাথার দু'দিক থেকে দুটি লম্বা জট এসে কোলের ওপর পড়েচে।

ভবানী বললেন—কি খেপী, খবর কি?

—ঠাকুর, কি খবর বলো।

—সাধনা টাধনা করচো?

—আপনাদের দয়া। জেতে হাড়িডোম, কি সাধনা করবো আমরা ঠাকুর? আজও আসনসিদ্ধি হোল না দেবতা।

—আমি আসবো সামনের অমাবস্যেতে, দেখিয়ে দেবো প্রণালীটা।

—ওসব হবে না ঠাকুর। আর ফাঁকি দিও না। আমাকে শেখাও।

—দূর খেপী, আমি কি জানি? তাঁর দয়া। আমি সাধন ভজন করিও নে, মানিও নে —তবে দেখি তোমাদের এই পর্য্যন্ত।

—আমায় ঠকাতে পারবে না ঠাকুর। তুমি রোজ এখানে আসবে সন্দের পর। যত সব

অজ্ঞান লোকেরা ভিড় করে রাত দিন ; নিয়ে এসো ওষুধ, নিয়ে এসো মামলা জেতা, ছেলে হওয়া—

—সে তোমারই দোষ। সেটা না করলেই পারতে গোড়া থেকে। ধন্না দিতে দিলে কেন ?

—তুমি ভুলে যাচ্চ। এ জায়গাটা গোরাসাহেবের বাংলা নয়—তবে এত লোক আসে কেন ? ধর্ম্মের জন্যে নয়। অবস্থা ঘোরাবার জন্যে। মামলা জেত্‌বার জন্যে।

—সে তো বুঝি।

—একটু থেকে দেখবেন না দিনের বেলায়। এত রাতে আর কি আছে ? চলে গেল সবাই। কি বিপদ যে আমার। সাধন ভজন সব যেতে বসেচে, ডাক্তার বদ্যি সেজে বসেচি। শুধু রোগ সারাও, আর রোগ সারাও।

নালু পাল এ সব শুনে কিছু বুঝলে, কিছু বুঝলে না। ভবানী বাঁড়ুয্যেকে সে অনেকবার দেখেচে, দেওয়ান মহাশয়ের জামাই সুচেহারার লোক বটে, দেখলে ভক্তি হয়। বাড়ী ফিরে মাকে সে বল্লে—একটা চমৎকার জিনিস দেখলাম আজ। সন্নিসিনীর গুরু হোলেন আমাদের দেওয়ানজির ভগ্নিপতি বড়দিদি-ঠাকরুণের বর। তিন দিদি-ঠাকরুণেরই বর। সব কথা বোঝলাম না, কি বল্লেন, কিন্তু সন্নিসিনী যে অত বড়, সে একেবারে তটস্থ।

তিলু বললে—এত রাত করলেন আজ ? ভাত জুড়িয়ে গেল। নিলু ইদিকি আয়, জায়গা করে, দে—বিলু কোথায় ?

নিলু চোখ মুছতে মুছতে এল। রান্নাঘরের দাওয়া ঝাঁট দিতে দিতে বললে—বিলু ঘুমিয়ে পড়েচে। কোথায় ছিলেন নাগর এত রাত অব্ধি ? নতুন কিছু জুটলো কোথাও ?

ভবানী বাঁড়ুয্যে অপ্রসন্ন মুখে বললেন—তোমার কেবল যতো—

—হি হি হি—

—হ্যাঃ—হাসলেই মিটে গেল।

—কি করতে হবে শুনি তবে।

—দ্যাখো গে লোকে কি করচে। মানুষ হয়ে জন্মে আর কিছু করবে না ? শুধু খাবে আর বাজে বকবে ?

—ওগো অত শত উপদেশ দিত্তি হবে না আপনার। আপনি পরকালের ইহকালের সর্ব্বস্ব আমাদের। আর কিছু করতে হয়, সে আপনি করুন গিয়ে। আমরা ডুমুরের ডালনা দিয়ে ভাত খাবো আর আপনার সঙ্গে ঝগড়া করবো। এতেই আমাদের স্বগ্‌গো। খেয়ে উঠে খোকাকে ধরুন।

ভবানী খেয়ে উঠে খোকনকে আদর করলেন কতক্ষণ ধরে। আট মাসের সুন্দর শিশু। তিলুর খোকা। সে হাব্‌লার মত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে বাবার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর অকারণে একগাল হাসি হাসে দন্তবিহীন মুখে, বলে ওঠে—গ্‌-গ-গ্‌-গ—

ভবানী বলেন—ঠিক ঠিক।

—হেঁ—এ—এ—ইয়া। গ্-গ্-গ্-গ্-গ্—

—ঠিক বাবা।

খোকা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে নিজের হাতখানা নিজের চোখের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে, যেন কত আশ্চর্য্য জিনিস। ভবানীর সামনে অনন্ত আকাশের এক ফালি। বাঁশবনে জোনাকি জ্বলচে। অন্ধকারে পাকা বকুলের গন্ধের সঙ্গে বনমালতী ও ঘেঁটুকোল ফুলের গন্ধ। নক্ষত্র উঠেচে এখানে ওখানে আকাশে। কত বড় আকাশ, কত নক্ষত্র—চাঁদ উঠেচে কৃষ্ণা তৃতীয়ার, পূর্ব্ব দিগন্ত আলো হয়েচে। এই ফুল, এই অন্ধকার, এই অবোধ শিশু, এই নক্ষত্র-ওঠা আকাশ সবই এক হাতের তৈরি বড় ছবি। ভবানী অবাক হয়ে যান ওর খোকার মতই।

তিলু বললে—খোকনের ভাত দেবেন কবে?

—ভাত হবে উপনয়নের সময়।

—ওমা, সে আবার কি কথা! তা হয় না, আপনি অন্নপ্রাশনের দিনক্ষ্যাণ দেখুন। ও বললি চলবে না।

—তোমাদের বাঙালদেশে এক রকম, আমাদের আর এক রকম। ওসব চলবে না আমাদের নদে-শান্তিপুরের সমাজে। তুমি ওকে একটু আদর করো দিকি?

তিলু তার সুন্দর মুখখানি খোকনের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে কানের মাকড়ি দুলিয়ে দুলিয়ে অনবদ্য ভঙ্গিতে আদর করতে লাগলো—ও খোকন, ও সনলু তুমি কার খোকন? তুমি কার সনলু, কার মানুকু? সঙ্গে সঙ্গে খোকা মায়ের চুল ক্ষুদ্র একরত্তি হাতের মুঠো দিয়ে অক্ষম আকর্ষণে টেনে এনে, মায়ের মাথার লুটন্ত কালো চুলের কয়েক গাছি নিজের মুখের কাছে এনে, খাবার চেষ্টা করলে। তারপর দন্তবিহীন একগাল হাসি হাসলে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে একবার আকাশের দিকে চাইলেন, নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ—নিচে এই মা ও ছেলের ছবি। অমনি স্নেহময়ী মা আছেন এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে, নইলে এই মা, এই স্নেহ এখানে থাকতো না—ভবানী বাঁড়ুয্যে ভাবেন।

ভবানী কত পথে পথে বেড়িয়েচেন, কত পর্ব্বতে সাধু-সন্নিসির খোঁজ করেচেন, কত যোগাভ্যাস করেচেন, আজকাল এই মা-ছেলের গভীর যোগাযোগের কাছে তাঁর সকল যোগ ভেসে গিয়েচে। অনুভূতি সর্ব্বাশ্রয়ী, সর্ব্বমঙ্গলকর সে অনুভূতির দ্বারপথে বিশ্বের রহস্য যেন সবটা চোখে পড়লো। ক্ষণশাশ্বতীর অমরত্ব আসা-যাওয়ার পথের এই রেখাই যুগে যুগে কবি, ঋষি ও মরমী সাধকেরা খোঁজে নি কি?

তিনি আছেন তাই এই মা আছে, ছেলে আছে, ফুল আছে, স্নেহ আছে, আত্মত্যাগ আছে, সেবা আছে, প্রেমিকা আছে, প্রেমিক আছে।

ভবানীর মনে আছে তিনি একবার কানপুরে একজন প্রসিদ্ধ খেয়াল গায়কের গান শুনেছিলেন, তাঁর নাম ছিল কানহাইয়ালাল সাস্তারা, প্রসিদ্ধ গায়ক হনুমানদাসজীর তিনি

ছিলেন গুরুভাই। আস্থায়ীর বাণীটি শ্রোতাদের সামনে নিখুঁত পাকা সুরে শুনিয়ে নিয়ে তারপর এমন সুন্দর অলঙ্কার সৃষ্টি করতেন, এমন মধুর সুরলহরী ভেসে আসতো তাঁর কণ্ঠ থেকে সুরপুরের বীণানিক্বণের মত—যে কতকাল আগে শুনলেও আজও যখনি চোখ বোজেন ভবানী, শুনতে পান ত্রিশবছর আগে শোনা সেই অপূর্ব্ব দরবারী কানাড়ার সুরপুঞ্জ।

বড় শিল্পী সবার অলক্ষ্যে কখন যে মনোহরণ করেন, কখন তাঁর অমর বাণী দরদের সঙ্গে প্রবেশ করিয়ে দেন মানুষের অন্তরতম অন্তরটিতে!

ভবানী বিস্মিত হয়ে উঠলেন। এই মা ও শিশুর মধ্যেও সেই অমর শিল্পীর বাণী, অন্য ভাষায় লেখা আছে। কেউ পড়তে পারে, কেউ পারে না।

বাইরে বাঁশগাছে রাতচরা কি পাখী ডাকচে, জিউলি গাছের বউলের মধু খেতে যাচ্চে পাখীটা। জেলেরা আলোয় মাছ ধরছে বাঁওড়ে, ঠক্ ঠক্ শব্দ হচ্চে তার। আলোয় মাছ ধরতে হোলে নৌকোর ওপর ঠক্ ঠক্ শব্দ করতে হয়—এ ভবানী বাঁড়ুয্যে এদেশে এসে দেখচেন। বেশ দেশ। ইছামতীর স্নিগ্ধ জলধারা তাঁর মনের ওপরকার কত ময়লা ধুয়ে মুছে দিয়েচে। সংসারের রহস্য যাঁরা প্রত্যক্ষ করতে ইচ্ছে করে, তারা চোখ খুলে যেন বেড়ায় সব সময়। সংসার বর্জ্জন করে নয়, সংসারে থেকেই সেই দৃষ্টি লাভ করতে পারার মন্ত্র ইছামতী যেন তাকে দান করে। কলস্বনা অমৃতধারাবাহিনী ইছামতী!...যে বাণী মনে নতুন আশা-আনন্দ আনে না, সে আবার কোন্ ঈশ্বরের বাণী?

তিলু বললে—সত্যি বলুন, কবে ভাত দেবেন?

—তুমিও যেমন, আমরা গরীব। তোমার বাপের বাড়ীর মান বজায় রেখে দিতে গেলে কত লোককে নেমন্তন্ন করতে হবে। সে এক হৈ-হৈ কাণ্ড হবে। আমি ঝামেলা পছন্দ করিনে।

—সব ঝামেলা পোয়াবো আমি। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।

—যা বোঝো করো। খরচ কেমন হবে?

—চালডাল আনবো বাপের বাড়ী থেকে। দু'টাকার তরকারি এক গাড়ী হবে। পাঁচখানা গুড় পাঁচসিকে। আধ মণ দুধ এক টাকা। এক মণ মাছ বারো পনেরো টাকা। আবার কি?

—কত লোক খাবে?

—দু'শো লোক খাবে ওর মধ্যে। আমার হিসেব আছে। দাদার লোকজন খাওয়ানোর বাতিক আছে, বছরে যজ্ঞি লেগেই আছে আমাদের বাড়ী। তিরিশ টাকার ওপর যাবে না।

—তুমি তো বলে খালাস। তিরিশ টাকা সোজা টাকা! তোমার কি, বড় মানুষের মেয়ে। দিব্যি বলে বসলে।

তিলু রাগভরে ঘাড় বাঁকিয়ে বললে—আমি শুনবো না, দিতিই হবে খোকার ভাত।

নিলু কোথা এসে বললে—দেবেন না ভাত? তবে বিয়ে করবার শখ হয়েছিল কেন?

ভবানী তিরস্কারের সুরে বললেন—তুমি কেন এখানে? আমাদের কথা হচ্চে—

নিলু বললে—আমারও বুঝি ছেলে নয় ?

—বেশ। তাই কি ?

—তাই এই—খোকনের ভাত দিতি হবে সামনের দিনে।

ভবানী বাঁড়ুয্যের নবজাত পুত্রটির অন্নপ্রাশন। তিলু রাত্রে নাড়ু তৈরি করলে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে পুরো পাঁচ ঝুড়ি। খোকা দেখতে খুব সুন্দর হয়েচে, যে দেখে সেই ভালবাসে। তিলু খোকার জন্যে একছড়া সোনার হার গড়িয়ে দিয়েচে দাদাকে বলে। রাজারাম নিজের হাতে সোনার হারছড়া ভাগ্নের গলায় পরিয়ে দিলেন।

তিলুদের অবস্থা এমন কিছু নয়, তবুও গ্রামের কাউকে ভবানী বাড়ুয্যে বাদ দিলেন না। আগের দিন পাড়ার মেয়েরা এসে পর্ব্বতপ্রমাণ তরকারি কুটতে বসলো। সারারাত জেগে সবাই মাছ কাটলে ও ভাজলে।

গ্রামের কুসী ঠাকরুণ ওস্তাদ রাঁধুনি, শেষ রাতে এসে তিনি রান্না চাপালেন, মুখুয্যেদের বিধবা বৌ ও ন' ঠাকরুণ তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন।

ভাত রান্না হোল কিন্তু বাইরে লম্বা বান্ কেটে। আর ছিরু রায় এবং হরি নাপিত মাছ কুটে ঝুড়ি করে বাইরের বানে নিয়ে এল মাছ ভাজিয়ে নিতে। ভাত যারা রান্না করছিল, তারা হাঁকিয়ে দিয়ে বললে—এখন তাদের সময় নেই। নিজেরা বান্ কেটে মাছ ভাজুক গিয়ে। এই কথা নিয়ে দুই দলে ঘোর তর্ক ও ঝগড়া, বৃদ্ধ বীরেশ্বর চক্কত্তি এসে দু'দলের ঝগড়া মিটিয়ে দিলেন শেষে।

রাজারামের এক দূরসম্পর্কের ভাইপো সম্প্রতি কলকাতা থেকে এসেঁচে। সেখানে সে আমুটি কোম্পানীর কুঠিতে নকলনবিশ। গলায় পৈতে মালার মত জড়িয়ে রাঙা গামছা কাঁধে সে রান্নার তদারক ক'রে বেড়াচ্ছিল। বড় চালের কথাবার্ত্তা বলে। হাত পা নেড়ে গল্প করছিল—কলকাতায় একরকম তেল উঠেচে, সায়েবরা জ্বালায়, তাকে মেটে তেল বলে। সায়েবেরা জ্বালায় বাতিতে। বড় দুর্গন্ধ।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—পিদিম জ্বলে ?

—না। সায়েববাড়ীর বাতিতে জ্বলে। কাঁচ বসানো, সে এখানে কে আনবে ? অনেক দাম।

হরি রায় বললেন—আমাদের কাছে কল্‌কেতা কল্‌কেতা করো না। কল্‌কেতায় যা আছে তা আগে আসবে আমাদের নীলকুঠিতে। এদের মতো সায়েব কল্‌কেতায় নেই।

—নাঃ, নেই। কলকাতার কি দেখেচ তুমি ? কখনো গেলে না তো। নৌকা ক'রে চলো নিয়ে যাবো।

—আচ্ছা, নাকি কলের গাড়ী উঠেচে সায়েবদের দেশে ? নীলকুঠির নদেরচাঁদ মণ্ডল শুনেচে ছোটসায়েবের মুখে। ওদের দেশ থেকে নাকি কাগজে ছেপে ছবি পাঠিয়েচে। কলের গাড়ী।

ভবানী বাঁড়ুয্যে খোকাকে কোলে নিয়ে পাড়া প্রদক্ষিণ করতে চললেন, পেছনে পেছনে

স্বয়ং রাজারাম চললেন ফুল আর খই ছড়াতে ছড়াতে। দীনু মুচি ঢোল বাজাতে বাজাতে চললো। বাঁশি বাজাতে বাজাতে চললো তার ছেলে। রায়পাড়া, ঘোষপাড়া, ও পূবেরপাড়া ঘুরে এলেন ভবানী বাঁড়ুয্যে অতটুকু শিশুকে কোলে করে নিয়ে। বাড়ী বাড়ী শাঁখ বাজতে লাগলো। মেয়েরা ঝুঁকে দেখতে এল খোকাকে।

ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় নিমন্ত্রিতদের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা হতে লাগলো কে কত কলাইয়ের ডাল খেতে পারে। কে কত মাছ খেতে পারে। মিষ্টি শুধু নারকোল নাড়ু। খেতে বসে অনেকে বললেন এমন নারকোলের নাড়ু তাঁরা অনেককাল খান নি। অন্য কোন মিষ্টির রেওয়াজ ছিল না দেশে। এক একজন লোক সাত আট গণ্ডা নারকোল নাড়ু, আরো অতগুলো অন্নপ্রাশনের জন্য ভাজা আনন্দনাড়ু উড়িয়ে দিলে অনায়াসে।

ব্রাহ্মণভোজন প্রায় শেষ হয়েছে এমন সময় কুখ্যাত হলা পেকে বাড়ীতে ঢুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে ভবানী বাঁড়ুয্যেকে। ভবানী ওকে চিনতেন না, নবাগত লোক এ গ্রামে। অন্য সকলে তাকে খুব খাতির করতে লাগলো। রাজারাম বললেন—এসো বাবা হলধর, বাবা বসো—

ফণি চক্কত্তি বললেন—বাবা হলধর, শরীর-গতিক ভালো?

দুর্দান্ত ডাকাতের সর্দ্দার, রণ-পা পরে চল্লিশ ক্রোশ রাস্তা রাতারাতি পার হওয়ার ওস্তাদ, অগুন্তি নরহত্যাকারী ও লুঠেরা, সম্প্রতি জেলফেরৎ হলা পেকে সবিনয়ে হাতজোড় ক'রে বললে—আপনাদের ছিচরণের আশিব্বাদে বাবাঠাকুর—

—কবে এলে?

—এ্যালাম শনিবার বেন্‌বেলা বাবাঠাকুর। আজ এখানে দুটো পেরসাদ পাবো ব্রাহ্মণের পাতের—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবা বোসো।

হলা পেকে নীলকুঠির কোর্টের বিচারে ডাকাতির অপরাধে তিন বৎসর জেলে প্রেরিত হয়েছিল। গ্রামের লোকে সভয়ে দেখলে সে খালাস পেয়ে ফিরেচে। ওর চেহারা দেখবার মত বটে। যেমন লম্বা তেমনি কালো দশাসই সাজোয়ান পুরুষ, একহাতে বন্‌বন্ ক'রে ঢেঁকি ঘোরাতে পারে, অমন লাঠির ওস্তাদ এদেশে নেই—একেবারে নির্ভীক, নীলকুঠির মুডি সাহেবের টম্‌টম্ গাড়ী উল্টে দিয়েছিল ঘোড়ামারির মাঠের ধারে। তবে ভরসা এই দেবদ্বিজে নাকি ওর অগাধ ভক্তি, ব্রাহ্মণের বাড়ী সে ডাকাতি করেচে বলে শোনা যায় নি, যদিও এ-কথায় খুব বেশী ভরসা পান না এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা।

হলা পেকে খেতে বসলে সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়াল। সবাই বলতে লাগলো, বাবা হলধর, ভালো ক'রে খাও।

হলধর অবিশ্যি বলবার আবশ্যক রাখলে না কারো। দু'কাঠা চালের ভাত, দু হাঁড়ি কলাইয়ের ডাল, আঠারো গণ্ডা নারকেলের নাড়ু, একখোরা অম্বল আর দু ঘটি জল খেয়ে সে ভোজন পর্ব্ব সমাধা করলে।

তারপর বললে—খোকার মুখ দেখবো।

তিলু শুনে ভয় পেয়ে বললে—ওমা, ও খুনে ডাকাত, ওর সামনে খোকারে বার করবো না আমি।

শেষ পর্য্যন্ত ভবানী বাঁড়ুয্যে নিজে খোকাকে কোলে নিয়ে হলা পেকের কোলে তুলে দিতেই সে গাঁট থেকে এক ছড়া সোনার হার বার ক'রে খোকার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললে,—আমার আর কিছু নেই দাদা-ভাই, এই ছেল, তোমারে দিলাম। নারায়ণের সেবা হলো আমার!

ভবানী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে হার ছড়ার দিকে চেয়ে বললেন—না, এ হার তুমি দিও না। দামী জিনিসটা কেন দেবে? বরং কিছু মিষ্টি কিনে দিও—

হলা পেকে হেসে বললে—বাবাঠাকুর, আপনি যা ভাবচেন, তা নয়। এ লুঠের মাল নয়। আমার ঘরের মানুষের গলার হার ছেল, তিনি স্বগ্‌গে গিয়েচে। আজ বাইশ তেইশ বছর। আমার ভিটেতে ভাঁড়ের মধ্যে পোঁতা ছেল। কাল এরে তুলে তেঁতুল দিয়ে মেজেচি। অনেক পাপ করেচি জীবনে। ব্রাহ্মণকে আমি মানিনে বাবাঠাকুর। সব তুচ্ছ। খোকাঠাকুর নিষ্পাপ নারায়ণ। ওর গলায় হার পরিয়ে আমার পরকালের কাজ হোল। আশিব্বাদ করুন।

উপস্থিত সকলে খুব বাহবা দিলে হলা পেকেকে। ভবানী নিজেকে বিপন্ন বোধ করলেন বড়। তিলুকে নিয়ে এসে দেখাতে তিলুও বললে—এ আপনি ওকে ফেরৎ দিন। খোকনের গলায় ও দিতি মন সরে না।

—নেবে না। বলি নি ভাবচো? মনে কষ্ট পাবে। হাত জোড় করে বললে।

—বলুক গে। আপনি ফেরৎ দিয়ে আসুন।

—সে আর হয় না, যতই পাপী হোক, নত হয়ে যখন মাপ চায়, নিজের ভুল বুঝতে পারে, তার ওপর রাগ করি কি ক'রে? না হয় এর পরে হার ভেঙে সোনা গালিয়ে কোন সৎকাজে দান করলেই হবে।

তিলু আর কোন প্রতিবাদ করলে না। কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হলো সে মন খুলে সায় দিচ্চে না এ প্রস্তাবে।

হলা পেকে সেইদিনটি থেকে রোজ আসতে আরম্ভ করলে ভবানী বাঁড়ুয্যের কাছে। কোনো কথা বলে না, শুধু একবার খোকনকে ডেকে দেখে চলে যায়।

একদিন ভবানী বললেন—শোনো হে, বোসো—

সামান্য বৃষ্টি হয়েচে বিকেলে। ভিজে বাতাসে বকুল ফুলের সুগন্ধ। হলা পেকে এসে বসে নিজের হাতে তামাক সেজে ভবানী বাঁড়ুয্যেকে দিলে। এখানে সে যখনই এসে বসে, তখন যেন সে অন্যরকম লোক হয়ে যায়। নিজের মুখে নিজের কৃত নানা অপরাধের কথা বলে—কিন্তু গর্ব্বের সুরে নয়, একটি ক্ষীণ অনুতাপের সুর বরং ধরা পড়ে ওর কথার মধ্যে।

—বাবাঠাকুর, যা করে ফেলেচি তার আর কি করবো। সেবার গোঁসাই বাড়ীর

দোতলায় ওঠলাম বাঁশ দিয়ে। ছাদে উঠি দেখি স্বামী-স্ত্রী শুয়ে আছে। স্বামী তেমনি জোয়ান, আমারে মারতি এলো বর্শা তুলে। মারলাম লাঠি ছুঁড়ে, মেয়েটা আগে মলো। স্বামী ঘুরে পড়লো, মুখি থান-খান রক্ত উঠতি লাগলো। দুজনেই সাবাড়।

—বলো কি ?

—হ্যাঁ বাবাঠাকুর। যা করে ফেলিচি তা বলতি দোষ কি ? তখন বৈবন বয়েস ছেল, ত্যাতো বোঝতাম না। এখন বুঝতি পেরে কষ্ট পাই মনে।

—রণ-পা চড়ো কেমন ? কতদূর যাও ?

—এখন আর তত চড়িনে। সেবার হলুদপুকুরি ঘোষেদের বাড়ী লুঠ করে রাত-দুপুরির সময় রণ-পা চড়িয়ে বেরোলাম। ভোরের আগে নিজের গাঁয়ে ফিরেলাম। এগারো কোশ রাস্তা।

—ওর চেয়ে বেশি যাও না ?

—একবার পনেরো কোশ পজ্জন্ত গিইলাম। নন্দীপুর থেকে কামারপেঁড়ে। মুরশিদ মোড়লের গোলাবাড়ী।

—এইবার ওসব ছেড়ে দাও। ভগবানের নাম করো।

—তাইতো আপনারি কাছে যাতায়াত করি বাবাঠাকুর, আপনারে দেখে কেমন হয়েচে জানিনে। মনটা কেমন ক'রে ওঠে আপনারে দেখলি। একটা উপায় হবেই আপনার এখানে এলি, মনডা বলে।

—উপায় হবে। অন্যায় কাজ একেবারে ছেড়ে না দিলে কিন্তু কিছুই করতে পারা যাবে না বলে দিচ্চি।

হলা পেকে হঠাৎ ভবানী বাঁড়ুয্যের পা ছুঁয়ে বললে—আপনার দয়া বাবাঠাকুর। আপনার আশিব্বাদে হলধর যমকেও ডরায় না। রণ-পা চড়ি যমের মুণ্ডু কেটে আনতি পারি, যেমন সেবার এনেলাম ঘোড়ের ডাঙ্গার তুষ্টু কোলের মুণ্ডু—শোনবেন সে গল্প—

হলা পেকে অট্টহাস্য করে উঠলো।

ভবানী বাঁড়ুয্যে দেখতে পেলেন পরকালের ভয়ে কাতর ভীরু হলধর ঘোষকে নয়, নির্ভীক, দুর্জ্জয়, অমিততেজ হলা পেকেকে—যে মানুষের মুণ্ডু নিয়ে খেলা করেচে যেমন কিনা ছেলেপিলেরা খেলে পিটুলির ফল নিয়ে! এ বিশালকায়, বিশালভুজ হলা পেকে মোহমুদ্গরের শ্লোক শুনবার জন্যে তৈরি নেই—নরহন্তা, দস্যু—আসলে যা তাই আছে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে দেড় বছরের মধ্যেই এ গ্রামকে, এ অঞ্চলকে বড় ভালো বাসলেন। এমন ছায়াবহুল দেশ তিনি কোথাও দেখেন নি জীবনে। বৈচি,বাঁশ, নিম, সোঁদাল, রড়া কুঁচলতার বনঝোপ। দিনে রাতে শালিখ, দোয়েল, ছাতারে আর বৌ-কথা-ক পাখীর কাকলী। ঋতুতে ঋতুতে কত কি বনফুলের সমাবেশ। কোনো মাসেই ফুল বাদ যায় না—বনে বনে ধুঁদুলের ফুল, রাধালতার ফুল, কেয়া, বিল্বপুষ্প, আমের বউল, বকুল, মুঁয়ো, বনচটকা নাটা-কাঁটার ফুল।

ইছামতীর ধারে এদেশে লোকের বাস নেই, নদীর ধারে বনঝোপের সমাবেশ খুব বেশী। ভবানী বাঁড়ুয্যে একটি সাধন কুটির নির্ম্মাণ করে সাধন-ভজন করবেন, বিবাহের সময় থেকেই এ ইচ্ছা তাঁর ছিল। কিন্তু ইছামতীর ধারে অধিকাংশ জমি চাষের সময় নীলকুঠির আমীনে নীলের চাষের জন্যে চিহ্নিত করে যায়। খালি জমি পাওয়া কঠিন। ভবানী বাঁড়ুয্যেও আদৌ বৈষয়িক নন, ওসব জমিজমার হাঙ্গামে জড়ানোর চেয়ে নিস্তব্ধ বিকেলে দিব্যি নির্জ্জনে গাঙের ধারের এক যজ্ঞিডুমুর গাছের ছায়ায় বসে থাকেন। বেশ কাজ চলে যাচ্চে। জীবন ক'দিন? কেন বা ওসব ঝঞ্চাটের মধ্যে গিয়ে পড়বেন। ভালোই আছেন।

তাঁর এক গুরুভ্রাতা পশ্চিমে মীর্জ্জাপুরের কাছে কোন পাহাড়ের তলায় আশ্রমে থাকেন। খুব বড় বেদান্তের পণ্ডিত—সন্ন্যাসাশ্রমের নাম চৈতন্ত-ভারতী পরমহংসদেব। আগে নাম ছিল গোপেশ্বর রায়। ভবানীর সঙ্গে অনেকদিন একই টোলে ব্যাকরণ পড়েচেন। তারপর গোপেশ্বর কিছুকাল জমিদারের দপ্তরে কাজ করেন পাটুলি-বলাগড়ের সুপ্রসিদ্ধ রায় বাবুদের এস্টেটে। হঠাৎ কেন সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে চলে যান, সে খবর ভবানী জানেন না; কিন্তু মির্জ্জাপুরের আশ্রমে বসবার পরে ভবানী বাঁড়ুয্যেকে দু'চারখানা চিঠি দিতেন।

সেই সন্ন্যাসী গোপেশ্বর তথা চৈতন্তভারতী পরমহংস একদিন এসে হাজির ভবানী বাঁড়ুয্যের বাড়ী। একমুখ আধ্-পাকা আধ্-কাঁচা দাড়ি, গেরুয়া পরণে, চিমটে হাতে, বগলে ক্ষুদ্র বিছানা। তিলু খুব যত্ন-আদর করলে। ঘরের মধ্যে থাকবেন না। বাইরে বাঁশতলায় একটা কম্বল বিছিয়ে বসে থাকেন সারাদিন। ভবানী বলেন—পরমহংসদেব, সাপে কামড়াবে। তখন আমায় দোষ দিও না যেন।

চৈতন্তভারতী বলেন—কিছু হবে না ভাই। বেশ আছি।

—কি খাবে?

—সব।

—মাছমাংস?

—কোনো আপত্তি নেই। তবে খাই না আজকাল। পেটে সহ্য হয় না।

—আমার স্ত্রীর হাতে খাবে?

—স্বপাক।

—যা তোমার ইচ্ছে।

তিলুকে কথাটা বলতেই তিলু বিনীতভাবে সন্ন্যাসীর কাছে এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে বললে—দাদা—

পরমহংস বললেন—কি?

—আপনি আমার হাতের রান্না খাবেন না?

—কারো হাতে খাইনে দিদি। তবে ইচ্ছে হয়ে থাকে রেঁধে দিতে পারো। মাছ মাংস কোরো না।

—মাছের ঝোল?

—না।

—কই মাছ, দাদা?

—তুমি দেখচি নাছোড়বান্দা। যা খুশি কর গিয়ে।

সেই থেকে তিলু শুচিশুদ্ধ হয়ে সন্ন্যাসীর রান্না রাঁধে। বিলু নিলু যত্ন ক'রে খাবার আসন ক'রে তাঁকে খেতে ডাকে। তিন বোনে পরিবেশন করে ভবানী বাঁড়ুয্যে ও সন্ন্যাসীকে।

ইছামতীর ধারে যজ্ঞিডুমুর গাছতলায় সন্ধ্যার দিকে দুজনে বসেচেন। পরমহংস বললেন—হাঁা হে, একে রক্ষা নেই, আবার তিনটি!···

—কুলীনের মেয়ের স্বামী হয় না জানো তো? সমাজে এদের জন্যে আমাদের মন কাঁদে। সাধনভজন এ জন্মে না হয় আগামী জন্মে হবে। মানুষের দুঃখ তো ঘোচাই এ জন্মে। কি কষ্ট যে এদেশের কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ের।

—মেয়ে তিনটি বড় ভালো। তোমার খোকাকেও বেশ লাগলো।

—আমার বয়েস হোল বাহান্ন। ততদিন যদি থাকি, ওকে পণ্ডিত করে যাবো।

—তার চেয়ে বড কাজ, ভক্তি শিক্ষা দিও।

—তুমি বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। ভূতের মুখে রাম নাম?

—বৈদান্তিক হওয়া সহজ নয় জেনো। বেদান্তকে ভালো ভাবে বুঝতে হোলে আগে ন্যায়-মীমাংসা ভালো ক'রে পড়া দরকার। নইলে বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিকমত বোঝা যায় না। ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জন করা বড় কষ্টসাধ্য।

—আমাকে পড়াও না দিনকতক?

—দিনকতকের কর্ম্ম নয়। ন্যায় পড়তেই অনেকদিন কেটে যাবে। তুমি ন্যায় পড, আমি এসে বেদান্ত শিক্ষা দেবো। তবে সাধনা চাই। শুধু পড়লে হবে না। সংসারে জড়িয়ে পড়েচ, সাধন ভজন করবে কি ক'রে? এ জন্মে হোল না।

—কুছ্ পরোয়া নেই। ওই জন্যেই ভক্তির পথ ধরেচি।

—সেও সহজ কি খুব? জ্ঞানের চেয়েও কঠিন। জ্ঞান স্বাধ্যায় দ্বারা লাভ হয়, ভক্তি তা নয়। মনে ভাব আসা চাই, ভক্তির অধিকারী হওয়া সবচেয়ে কঠিন। কোনটাই সহজ নয় রে দাদা।

—তবে হাত-পা গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকবো?

—তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্—গীতায় বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁতে চিত্ত নিযুক্ত রাখলে তিনিই তাঁকে পাবার বুদ্ধি দান করেন—দদামি বুদ্ধিযোগং তং—

—তুমিই তো আমার উত্তর দিলে।

—বিয়েটা করে একটু গোলমাল করে ফেলেচো। জড়িয়ে পড়বে। একেবারে তিনটি—একেই রক্ষা থাকে না।

—পরীক্ষা করে দেখি না একটা জীবন। তাঁর কৃপায় দৌড়টাও তো বোঝা যাবে।

ভাগবতে শুকদেব বলেচেন—গৃহৈর্দারাসুতৈষনাং—গৃহস্থের মত ভোগ যারা পুত্র স্ত্রী নিয়ে ঘর করবার বাসনা দূর করবে। তাই করচি।

—তা হোলে এতকাল পরিব্রাজক হয়ে তীর্থে বেড়ালে কেন? যদি গৃহস্থ সাজবার বাসনাই মনে ছিল তোমার?

—ভেবেছিলাম বাসনা ক্ষয় হয়েচে। পরে দেখলাম রয়েচে। তবে ক্ষয়ই করি। শুকদেবের কথাই বলি—তক্তৈষনাঃ সর্ব্বে যযুর্ধীরাস্তপোবনম্—সকল বাসনা ত্যাগ করে পরে তপোবনে যাবে। কিন্তু বাসনা থাকতে নয়। সংসার করলে ভগবানকে ডাকতে নেই তাই বা তোমায় কে বলেচে?

—ডাকতে নেই কেউ বলে নি। ডাকা যায় না এই কথাই বলেচে। জ্ঞানও হয় না, ভক্তিও হয় না।

—বেশ দেখবো। ভগবান তোমাদের মত অত কড়া নয়। অন্ততঃ আমি বিশ্বাস করি না যে সংসারে থাকলে ভক্তি লাভ হয় না। সংসার তবে ভগবান স্থষ্টি করলেন কেন? তিনি প্রতারণা করবেন তাঁর অবোধ সন্তানদের? যারা নিতান্ত অসহায়, তিনি পিতা হয়ে তাদের সামনে ইচ্ছে করে মায়া ফাঁদ পেতেছেন তাদের জালে জড়াবার জন্তে? এর উত্তর দাও।

—এষাবৃত্তির্ণাম তমোগুণস্য—তমোগুণের শক্তিই আবরণ। বস্তু যথার্থ ভাবে প্রতিভাত না হয়ে অন্ত প্রকারে প্রতিভাত হয়—এই জন্তেই তমোগুণের নাম বৃতি। ভগবানকে দোষ দিও না। ও ভাবে ভগবানকে ভাবচো কেন? বেদান্ত পড়লে বুঝতে পারবে। ও ভাবে ভগবান নেই। তিনি কিছুই করেন নি। তোমার দৃষ্টির দোষ। মায়ার একটা শক্তির নাম বিক্ষেপ, এই বিক্ষেপ তোমাকে মোহিত করে রেখে ভগবানকে দেখতে দিচ্চে না।

—তাঁর শরণাগত হয়ে দেখাই যাক না। তাঁর কৃপার দৌড়টা দেখবো বলচি তো। মায়াশক্তি-কক্তি যত বড়ই হোক, তাদের চেয়ে তাঁর শক্তি বড। মায়াশক্তি কি ভগবান ছাড়া? তাঁর সংসারে সবই তাঁর জিনিস। তিনি ছাড়া আবার মায়া এল কোথা থেকে? গোঁজামিল হয়ে যাচ্চে যে।

—গোঁজামিল হয় নি। আমার কথা তুমি বুঝতেই পারলে না। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে বলেচে 'অজামেকাং' অজ্ঞান কারো স্থষ্ট নয়। যিনিই সমষ্টিরূপে ঈশ্বর, তিনিই ব্যষ্টিতে কার্য্যরূপে জীব। অদ্বৈত বেদান্তে বলে, সমষ্টিতে বর্ত্তমান যে চৈতন্ত তাই হোল কার্য্য। অর্থাৎ ঈশ্বর কর্ত্তা, জীব কার্য্য। কিন্তু স্বরূপে উভয়েই এক। কেবল উপাধিতে ভিন্ন। তুমিই তোমার ঈশ্বর। আবার ঈশ্বর কে?

—একবার এক রকম বল্লে, গীতার শ্লোক ওঠালে আবার এখন অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্ত নিয়ে এসে ফেল্লে।

—গীতার শ্লোক ওঠানোতে কি অন্যায় করলাম?

—গীতা হোল ভক্তিশাস্ত্র। অদ্বৈত বেদান্ত জ্ঞানের শাস্ত্র। ছু'য়ে মিলিও না।

—ও কথাই বলো না। বড় কষ্ট হোল একথা তোমার মুখে শুনে। বেদান্তে ব্রহ্মই

একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। অন্য সব দর্শনে ঈশ্বরকে স্বীকারই করে নি। একমাত্র বেদান্তেই ব্রহ্মকে খাড়া করে বসেচে। সেই বেদান্ত নিরীশ্বরবাদী!

—নিরীশ্বরবাদী বলি নি। ভক্তিশাস্ত্র নয় বলিচি।

—তুমি কিছুই জানো না। তোমাকে এবার আমি 'চিৎসুখী' আর 'খণ্ডনখণ্ড খাদ্য' পড়াবো। তুমি বুঝবে কি অসাধারণ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁরা ব্রহ্মকে সন্ধান করেছেন। তবে বড় শক্ত দুরবগাহ গ্রন্থ। তর্কশাস্ত্র ভালো করে না পড়লে বোঝাই যাবে না। দেখবে বেদান্তের মধ্যে অন্য কোনো কুতর্কের বা বিকৃত ভাষ্যের ফাঁক বুজিয়ে দিয়েছে কি ভাবে। আর তুমি কি-না বলে বসলে—

—আমি কিছুই বলে বসি নি। তুমি আর আমি অনেক তফাৎ। তুমি মহাজ্ঞানী—আমি তুচ্ছ গৃহস্থ। তুমি যা বলবে তার ওপর আমার কথা কি? আমার বক্তব্য অন্য সময়ে বলবো।

—বোলো, তুমি অনুরাগী শ্রোতা এবং বক্তা। তোমাকে শুনিয়ে এবং বলে সুখ আছে।

—তোমার সঙ্গে দুটো ভালো কথা আলোচনা করেও আনন্দ হোল। এ গ্রাম একেবারে অন্ধকারে ডুবে আছে। শুধু আছে নীলকুঠি আর সায়েব আর জমি আর জমা আর ধান আর বিষয়—এই নিয়ে। আমার শ্যালকটি তার মধ্যে প্রধান। তিনি নীলকুঠির দেওয়ান। সায়েব তাঁর ইষ্টদেব। তেমনি অত্যাচারী। তবে গোবরে পদ্মফুল আমার বড় স্ত্রী।

—ভালো?

—খুব। অতিরিক্ত ভালো।

—বাকী দুটি?

—ভালো, তবে এখনো ছেলেমানুষি যায় নি। আদুরে বোন কিনা দেওয়ানজির! এদিকে সৎ।

ভবানী বাঁড়ুয্যে আর পরমহংস সন্ন্যাসীকে দিনকতক প্রায়ই নদীর ধারে বসে থাকতে দেখা যেতো। ঠিক হোল যে সন্ন্যাসী তিলু বিলু নিলুকে দীক্ষা দেবেন। তিলু রাত্রে স্বামীকে বললে—আপনি গুরু করেচেন?

—কেন?

—দীক্ষা নেবেন না?

—কি বুদ্ধি যে তোমার! আহা মরি! এই সন্নিসি ঠাকুর আমার গুরুভাই হোল কি করে যদি আমার দীক্ষা না হয়ে থাকে?

—ও ঠিক ঠিক। আমি ও দীক্ষা নেবো না।

—কেন? কেন?

তিলু কিছু বললে না। মুচকি হেসে চুপ করে রইল। প্রদীপের আলোর সামনে নিজের হাতের বাউটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেই দেখতে লাগলো। একটা ছোট ধুনুচিতে ধুনো গুঁড়ো করে দিতে লাগলো ছড়িয়ে। এটি ভবানীর বিশেষ খেয়াল। কোনো শৌখিনতা নেই যে স্বামীর,

কোনো আকিঞ্চন নেই, কোনো আবদার নেই—স্বামীর এ অতি তুচ্ছ খেয়ালটুকুর প্রতি তিলুর বড় স্নেহ। রোজ শোবার সময় অতি যত্নে ধুনো গুঁড়ো ক'রে সে ধুনুচিতে দেবে এবং বার বার স্বামীকে জিগ্যেস করবে—গন্ধ পাচ্ছেন? কেমন গন্ধ—ভালো না?

তিলুকে হঠাৎ চলে যেতে উদ্যত দেখে ভবানী বললেন—চলে যাচ্ছ যে? খোকা কই?

তিলু হেসে বললে—আহা, আজ তো নিলুর দিন। বুধবার আজ যে—মনে নেই? খোকা নিলুর কাছে। নিলু আনবে।

—না, আজ তুমি থাকো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—বা রে, তা কখনো হয়। নিলু কত শখের সঙ্গে ঢাকাই শাড়ীখানা পরে খোকাকে কোলে ক'রে বসে আছে।

—তুমি থাকলে ভালো হোত তিলু। আচ্ছা বেশ। খোকনকে নিয়ে আসতে বলো।

একটু পরে নিলু ঘরে ঢুকলো খোকনকে কোলে নিয়ে। ওর কোলে ঘুমন্ত খোকন। খোকনের গলায় হলা পেকের উপহার দেওয়া সেই হার ছড়াটা। অতি সুন্দর খোকন। ভবানী বাঁড়ুয্যে এমন খোকা কখনো দেখেন নি। এত সুন্দর ছেলে এবং এত চমৎকার তার হাবভাব। এক এক সময় আবার ভাবেন অন্য সবাই তাদের সন্তানদের সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলবে না কি? এমন কি খুব কুৎসিত সন্তানদের বাপ-মাও? তবে এর মধ্যে অসত্য কোথায় আছে? নিলু খোকাকে সন্তর্পণে শুইয়ে দিলে, ভবানী চেয়ে চেয়ে দেখলেন—কি সুন্দর ভাবে ওর বড় বড় চোখ দুটি বুজিয়ে ঘুমে নেতিয়ে আছে খোকন। তিনি আস্তে আস্তে সেই অবস্থায় তাকে উঠিয়ে বসিয়ে দিতেই খোকা নিমীলিত চোখেই বুদ্ধদেবের মত শান্ত হয়ে রইল, কেবল তার ঘাড়টি পিছন দিকে হেলে পড়তে দেখে ভবানী পিছন থেকে একটা হাত দিয়ে ওর ঘাড় ধ'রে রাখলেন। নিলু তাড়াতাড়ি এসে বললে—ওকি? ওর ঘাড় ভেঙে যাবে যে! কি আক্কেল আপনার?

ভবানীর ভারি আমোদ লাগলো, কেমন সুন্দর চুপটি করে চোখ বুজে একবারও না কেঁদে কেষ্টনগরের কারিগরের পুতুলের মত বসে রইল।

নিলুকে বললে—দ্যাখো দ্যাখো কেমন দেখাচ্চে—তিলুকে ডাকো—তোমার দিদিকে ডাকো—

নিলু বললে—আহা হা মরে যাই! কেমন ক'রে চোখ বুজে ঘুমিয়ে আছে, কেন ওকে অমন কষ্ট দিচ্চেন? ছি ছি—শুইয়ে দিন—

তিলু এসে বললে—কি?

—দ্যাখো কেমন দেখাচ্চে খোকনকে?

—আহা বেশ।

—মুখে কান্না নেই, কথা নেই।

—কথা থাকবে কি? ও ঘুমে অচেতন যে। ও কি কিছু বুঝতে পাচ্চে ওকে বসানো হয়েচে, কি করা হয়েচে?

নিলু বললে—এবার শুইয়ে দিন। আহা মরে যাই, সোনামণি আমার—শুইয়ে দিন, ওর লাগচে। দিদি কিছু বলবে না আপনার সামনে।

খোকাকে শুইয়ে দিয়ে হঠাৎ ভবানীর মনে হোল, ঠিক হয়েছে, শিশুর সৌন্দর্য্য বুঝবার পক্ষে তার বাপ-মাকে বাদ দিলে চলবে কেন? শিশু এবং তার বাপ মা একই স্বর্ণসূত্রে গাঁথা মালা। এরা পরস্পরকে বুঝবে। পরস্পর পরস্পরকে ভালো বলবে—সৃষ্টির বিধান এই। নিজেকে বাদ দিলে চলবে না। এও বেদান্তের সেই অমর বাণী, দশমস্তমসি। তুমিই দশম। নিজেকে বাদ দিয়ে গুণলে চলবে কেন?

তার পরদিন সকালে এল হলা পেকে, তার সঙ্গে এল হলা পেকের অনুচর দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত আঘোর মুচি। অঘোর মুচিকে তিলুরা তিন বোনে দেখে খুব খুশি। অঘোর ওদের কোলে ক'রে মানুষ করেচে ছেলেবেলায়।

তিলু বললে—এসো অঘোর দাদা, জেল থেকে কবে এলে?

অঘোর বললে—কাল এ্যালাম দিদিমণিরা। তোমাদের দেখতি এ্যালাম, আর বলি সন্নিসি ঠাকুরকে দেখে একটা পেরণাম করে আসি। গঙ্গাচানের ফল হবে। কোথায় তিনি?

—তিনি বাড়ী থাকেন কারো? ওই বাঁশতলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন আখো গিয়ে। অঘোর দাদা বোসো, কাঁটাল খাবা? তোমরা দুজনেই বোসো।

—খোকনকে দেখবো দিদিমণি। আগে সন্নিসি ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করে আসি।

বাঁশতলার আসনে চৈতন্যভারতী চুপ ক'রে বসে ছিলেন। ধুনি জ্বালানো ছিল না। হলা পেকে আর অঘোর মুচি গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে।

সন্ন্যাসী বললেন—কে?

—মোরা, বাবা।

হলা পেকে বললে—এ আমার সাকরেদ, অঘোর। গারদ থেকি কাল খালাস পেয়েচে। এই গাঁয়েই বাড়ী।

—জেল হয়েছিল কেন?

—আপনার কাচে লুকুবো কেন বাবা। ডাকাতি করেলাম দুজনে। দুজনেরই হাজত হয়েল।

—খুব শক্তি আছে তোমাদের দুজনেরই। ভালো কাজে সেটা লাগালে দোষ কি?

—দোষ কিছু নেই বাবা। হাত নিস্‌পিস্ করে। থাকতি পারিনে।

চৈতন্যভারতী বললেন—হাত নিস্‌পিস্ করুক। যে মনটা তোমাকে ব্যস্ত করে, সেটা সর্ব্বদা সৎকাজে লাগিয়ে রাখো। মন আপনিই ভালো হবে।

হলা পেকে বসে বসে শুনলে। অঘোর মুচির ও সব ভালো লাগছিল না, সে ভাবছিল তিলু দিদিমণির কাছ থেকে একখানা পাকা কাঁটাল চেয়ে নিয়ে খেতে হবে। এমন সময় নিলু সেখানে এসে ডাকলে—ও সন্নিসি দাদা—

চৈতন্তভারতী বললেন—কি দিদি ?

—পাকা কলা আর পেঁপে নিয়ে আসবো ? ছ্যান্ হয়েচে ?

—না হয় নি। তুমি নিয়ে এসো, ওতে কোনো আপত্তি নেই। আচ্ছা এ দেশে ছ্যান করা বলে কেন ?

—কি বলবে ?

—কিছু বলবে না। তুমি যাও, যশুরে বাঙাল সব কোথাকার! নিয়ে এসো কি খাবার আছে।

—অমনি বললি আমি কিন্তু আনবো না সেটুকু বলে দিচ্চি, দাদা।

হলা পেকে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—তাহলে মুই রণ-পা পরি ?

সন্ন্যাসী হেসে বললেন—রণ-পা পরে কি হবে ?

—আপনার জন্তি কলা-মূলো সংগেরো ক'রে নিয়ে আসি। নিলু দিদি তো চটে গিয়েচে।

অঘোর মুচি বললে—মোর জন্তি একখানা পাকা কাঁটাল। ও দিদিমণি, বড্ড খিদে নেগেচে।

নিলু বললে—যাও বাড়ী গিয়ে বড়দিদি বলে ডাক গিয়ে। বড়দি দেবে এখন।

—না দিদি, তুমি চলো। বড়দি এখুনি বকবে এমন। গারদ খেটে এসিচি—কেন গিইছিলি, কি করিছিলি, সাত কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আরে সবাই তো জানে, মুই চোর ডাকাত। খাতি পাইনে তাই চুরি ডাকাতি করি, খাতি পেলি কি আর করতাম। গেরামে এসে যা দেখচি, চালের কাঠা তু' আনা দশ পয়সা। তাতে আর কিছুদিন গারদে থাকলি হোত ভালো। খাবো কেমন করে অত আক্রা চালের ভাত ? ছেলে-পিলেরে বা কি খাওয়াবো। কি বলেন বাবাঠাকুর ?

সন্নিসি বললেন—যা ভালো বোঝো তাই করবে বাবা। তবে মানুষ খুন কোরো না। ওটা করা ঠিক নয়।

হলা পেকে এতক্ষণ চুপ ক'রে বসে ছিল। মানুষ খুনের কথায় সে একবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। হলা আসলে হল খুনী। অনেক মুণ্ডু কেটেচে মানুষের। খুনের কথা পড়লে সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

চৈতন্তভারতীর সামনে এসে বল্লে—জোড়হাত করি বাবাঠাকুর! কিছু মনে করবেন না। একটা কথা বলি শুনুন। পানচিতে গাঁয়ের মোড়ল-বাড়ী সেবার ডাকাতি করতি গেলাম। যখন সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠচি, তখন ছোট মোড়ল মোরে আটকালে। ওর হাতে মাছমারা কোঁচ। এক লাঠির ঘায়ে কোঁচ ছুঁড়ে ফেলে দেলাম—আমার সামনে লাঠি ধরতি পারবে কেন ছেলে-ছোকরা ? তখন সে ইট তুলি মারতি এল। আমি ওরে বললাম—আমার সঙ্গে লাগতি এসো না, সরে যাও। তা তার নিয়তি ঘুনিয়ে এসেচে, সে কি শোনে ? আমায় একটা খারাপ গালাগালি দেলে। সঙ্গে সঙ্গে এক লাঠিতে ওর মাথাটা দোফাঁক

করে দেলাম। উল্টে পড়লো গড়িয়ে সিঁড়ির নীচে, কুমড়ো গড়ান দিয়ে।

নিলু বললে—ইস্—মাগো!

চৈতন্যভারতী মশায় বললেন—তারপর?

—তারপর শুনুন আশ্চয্যি কাণ্ড। বড় মোড়লের পুতের বৌ, দিব্যি দশাসই সুন্দরী, মনে হোল আঠারো কুড়ি বয়স—চুল এলো করে দিয়ে এই লম্বা সড়কি নিয়ে রয়েচে দোতলার মুখি সিঁড়ির নিচে, যেখান থেকে চাপা সিঁড়ি ফেলবার দরজা।

ভারতী মশাই অনেকদিন ঘরছাড়া, জিজ্ঞেস করলেন—চাপা সিঁড়ি কি?

নিলু বললে—চাপা সিঁড়ি দেখেন নি? আমার বাপের বাড়ী আছে দেখাব। সিঁড়িতে ওঠবার পর দোতলায় যেখানে গিয়ে পা দেবেন, সেখান থেকে চাপা সিঁড়ি মাথার ওপর দিয়ে ফেলে দেয়। সে দরজার কবাট থাকে মাথার ওপর। তাহোলে ডাকাতেরা আর দোতলায় উঠ্‌তি পারে না।

—কেন পারবে না?

হলা পেকে উত্তর দিলে এ কথার। বললে—আপনাকে বুঝিয়ে বলতি পারলে না দিদি-মণি। চাপা সিঁড়ি চেপে ফেলে দিলি আর দোতলায় ওঠা যায় না। বড্ড কঠিন হয়ে পড়ে। এমনি সিঁড়ি যা, তার মুখের কবাট জোড়া কুড়ল দিয়ে চালা করা যায়, চাপা সিঁড়ির কবাট মাথার ওপর থাকে, কুড়ুল দিয়ে কাটা যায় না। বোঝলেন এবার?

—যাক, তারপর কি হোল?

—তখন আমি দেখচি কি বাবাঠাকুর সাক্ষাৎ কালী পিত্তিমে। মাথার চুল এলো, দশাসই চেহারা, কি চমৎকার গড়ন-পেটন, মুখ-চোখ—সড়কি ধরেচে যেন সাক্ষাৎ দশভূজা দুগ্‌গা। ঘাম-তেল মুখে চক্‌চক্ করচে, চোখ দুটো তে যেন আলো ঠিক্‌রে বেরুচ্চে! সত্যি বলচি বাবাঠাকুর, অনেক মেয়ে দেখিচি, অমন চেহারা আর কখনো দেখি নি। আর সড়কি চালানো কি? যেন তৈরি হাত। ব্যাঁকা ক'রে খোঁচা • রে, আর লাগলি নাড়ি-ভুঁড়ি নামিয়ে নেবে এমনি হাতের ট্যারচা তাক্। মনে মনে ভাবি, সাবাস্ মা, বলিহারি! দুধ খেয়েলে বটে!

—তারপর? তারপর?

চৈতন্যভারতী অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সোজা হয়ে উঠে বসলেন ধুনির সামনে।

—একবার ভাবলাম যা থাকে কপালে, লড়ে দেখবো। তারপর ভাবলাম, না, পিছু হটি। গতিক আজ ভাল না। আমি পিছিয়ে প'ড়চি, বীরো হাড় বললে,—

পরক্ষণেই জিভ্ কেটে ফেলে বললে—•ই ছাখো, দলের লোকের নাম করে ফেলেলাম। কেউ জানে না যে ব্যাটা আমাদের সাংড়ার লোক ছিল। যাক্, আপনারা আর ওর কথা বলি দিতি যাচ্চেন না নীলকুঠির সায়েবের কাছে—

ভারতী মশায় বললেন—নীলকুঠির সায়েব কি করবে?

—সে কি বাবাঠাকুর? এদেশে বিচের-আচার সব তো কুঠির সায়েবেরা করবেন।

আমার আর অঘোরের গারদ হয়েল, সেও বিচের করেন ওই বড়সাহেব। তারপর শুনুন। বীরো হাড়ি ব্যাটা এগিয়ে গেল। আমাদের বললে, দুয়ো! মেয়েলোকের সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে গেলি এম্‌নি মরদ?···সিঁড়ির ওপরের ধাপে দুপ্‌ দুপ্‌ ক'রে উঠে গেল। আমি ঘুরে দাঁড়িইচি,—মেয়েলোকের গায়ে হাত দিলি বীরো হাড়ির একদিন না আমার একদিন—মুই দেখে নেবো! এমন সময়—'বাপ্‌রে'! বলে বীরো হাড়ি একেবারে চিৎ হয়ে সিঁড়ির মুখে পড়ে গেল। তারপরই উঠে দুহাত তলপেটে দিয়ে কি একটা টানচে দড়ির মত—আমি ভাবচি ওটা আবার কি? কাছে গিয়ে দেখি তলপেট হাঁ হয়ে ফুটো বেরিয়েচে, সেই ফুটো দিয়ে পেটের রক্তমাখা নাড়ি দড়ির মতো চলে গিয়েচে ওপরে সড়কির ফলার আলের সঙ্গে গিঁথে। সড়কি যত টান দিচ্চে বৌমা, ওর পেটের নাড়ি ততই হড় হড় ক'রে বেরিয়ে চলেছে ওপর-বাগে। আর বেশীক্ষণ না, চোখ পাল্টাতি আমি গিয়ে ওরে পাঁজাকোলা করে তুলি বাইরি নিয়ে এসে বসলাম। এট্টু জল পাইনে যে ওর মৃত্যুকালে মুখে দিই, কারণ আমি তো বুঝচি ওর হয়ে এল—

ভারতী মশাই বললেন—সেই সড়কিতে গাঁথা নাড়িটা?

—লাঠির এক ঝটকায় নাড়ি ছিঁড়ে দিইচি, নইলে আনচি কোথা থেকে? তা বড্ড শক্ত জান্‌ হাড়ির পো'র। মরে না। শুধু গোঙায় আর বোধ হয় জল জল করে,—বুঝতি পারি না। ইদিকে নোক এসে পড়বে, তখন বড্ড হৈ-চৈ হচ্চে বাইরে। কি করি, বাড়ীর পেছনে একটা ডোবা পর্য্যন্ত ওরে পাঁজাকোলা করে নিয়ে গ্যালাম, তখনো ও গোঁ গোঁ করে হাত নেড়ে কি বলে। রক্তে ধরণী ভাসচে বাবাঠাকুর। লোকজন এসে পড়বার আর দ্রিং নেই। তখন বেমো মুচির কাতানখানা চেয়ে নিয়ে এক কোপে ওর মুণ্ডটা ঝট্‌কে ফেলে ধড়টা ডোবায় টান মেরে ফেলে দেলাম—মুণ্ডুটা সাথে নিয়ে এ্যালাম। কেন না তাহলি লাশ সেনাক্ত করতি পারবে না—ব্যাটা বীরো হাড়ির মুণ্ডু চোখ চেয়ে মোর দিকি চেয়ে বলে যেন আমারে বকুনি দেচ্চে—এখনো যেন চোখ দুটো মুই দেখতি পাই, যেন মোর দিকি চেয়ে কত কি বলচে মোরে—

—তারপর সে বৌটির কি হোল?

—কিছু জানি নে। তবে দু'মাস পরে ফকির সেজে আবার গিয়েছিলাম মোড়ল বাড়ী সেই বৌটারে দেখবো বলে।—দুটো ভিক্ষে দাও মা ঠাকরুণ, যেমন বলিচি অমনি তিনি এসে মোরে ভিক্ষা দেলেন। বেলা তখন দুপুর, রাত্তিরি ভালো দেখতি পাইনি; মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, জগদ্ধাত্তিরি পিরতিমে। দশাসই চেহারা, হর্ত্তেলের মত রং, দেখে ভক্তি হোল। বললাম—মা খিদে পেয়েচে।

মা বললেন—কি খাবা?

বললাম—ঝা দেবা। তখন তিনি বাড়ীর মধ্যে গিয়ে আধ-খুঁচি চিঁড়ে-মুড়কি এনে আবার ঝুলিতে দেলেন। মুই মোছলমান সেজিচি, গড় হয়ে পেরণাম করলি সন্দেহ করতি পারে, তাই হাত তুলে বললাম—সালাম, মা—বলে চলে এ্যালাম। কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছিল

দু'পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে লুটিয়ে পেরণাম করি। তারপর চলে এ্যালাম—

নিলু এতক্ষণ কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে শুনছিলো, এইবার বললে—সে যদি মরেই গিয়েচে দাদা, তবে আবার তোমাদের দলের লোক বলে জিভ কাটলে কেন? সে কিসে মরেচে তা আজো কেউ জানে না।

—দিদিমণি তুমি কি বোঝো। নীলকুঠির লোক গিয়ে তার দুটো ছেলেকে উস্তোন-কুস্তোন করবে! বলবে, তোর বাবা কনে গিয়েচে। এ আজ ছ' সাত বছরের কথা। লোক জানে বীরো হাড়ি গঙ্গার ধারে আর একটা বিয়ে করে সেখানেই কোথায় বাস করচে। মোর সাংড়ার লোক রটিয়ে দিয়েচে। ওর ছেলে দুটো এখন লাঙল চষতি পারে। বড় ছেলেডা খুব জোয়ান হবে ওর বাবার মত।

—বৌটিকে আর ত্যাখো নি?

—না, তারপরই দু'বছর গারদ বাস। সে অন্য কারণে। এ ডাকাতির কিনারা হয়নি।

চৈতন্যভারতী বললেন—তোমার মুখে এ কাহিনী শুনে ভাবচি বৌমার সঙ্গে আমি দেখা করে আসবো। তারা কি জাত বললে?

—সদ্‌গোপ।

—আমি যাবো সেখানে। শক্তিমতী মেয়েরা জগদ্ধাত্রীর অবতার। তুমি ঠিকই বলেচ।

—বাবাঠাকুর, আপনি বোধ হয় ইদিক আর কখনো আসেন নি, থাকেনও না। অমন কিন্তু এখনে আরো দু চারটে আছে। তবে ভদ্দর গেরস্ত বাড়িতে আর দেখি নি ওই বৌটি ছাড়া। বাগদি, দুলে, মুচি, নমশূদ্দুরের মধ্যে অনেক মেয়ে পাবেন যারা ভালো সড়কি চালায়, কোঁচ চালায়, ফালা চালায়, কাতান চালায়।

নিলু বললে—আমি জানি। সেবার নীলকুঠির দাঙ্গায় দাদা স্বচক্ষে দেখেচেন খড়ের ছোট্ট চালা ঘরের মধ্যে থেকে দুটো দুলেদের বৌ এমন তীর চালাচ্চে, নীলকুঠির বরকন্দাজ হটে গেল।

—বাঃ বাঃ, বড খুশি হলাম শুনে দিদি। ব্রহ্মদর্শনের আনন্দ হয় যদি এই শক্তিমতী মায়েদের একবার সাক্ষাৎ পাই। জয় মা জগদম্বা।

ভবানী বাঁড়ুয্যে এই সময় গাড়ু হাতে কোথা থেকে আসছিলেন, সেখান থেকে বলে উঠলেন—আরে ও কি ভায়া! একেবারে মা জগদম্বা! নাঃ, বৈদান্তিক জ্ঞানীর ইয়েটা একেবারে নষ্ট করে দিলে?

—ভাই, নিত্য থেকে লীলায় নামলেই মা বাবা। বৈদান্তিকের তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল! বলেচি তো তোমাকে সেদিন। বেদান্ত অত সোজা জিনিস নয়। অদ্বৈত বেদান্ত বুঝতে বহু দিন যাবে। জীব গোস্বামীর বেদান্ত বরং কিছু সহজ।

—ও কথা থাক্। কি নিয়ে কথা বলছিলে?

—লীলার কথা। এদেশের মেয়েদের শক্তি-সামর্থ্যের কথা। সবই মায়ের লীলা।

নিলু বলে উঠল—হ্যাঁ ভালো কথা—বড়দি ভালো ঢাল আর লাঠির খেলা জানে।

একবার আকবর আলি লেঠেলের সঙ্গে লড়ি চালিয়েছিল ঢাল আর লড়ি নিয়ে। নীলকুঠির বড় লেঠেল আকবর আলি। বড়দি এমন আগ্‌লেছিল, একটা লড়ির ঘাও মারতি পারে নি ওর গায়ে। শরীরে শক্তিও আছে বড়দির। দুটো বড় বড় ক্ষিতুরে ঘড়া কাঁকে মাথায় ক'রে নিয়ে আসতে পারে। এখনও পারে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে হলা পেকে ও অঘোর মুচিকে নিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে ডাক দিলেন—ও তিলু, শুনে যাও—ও তিলু, ও বড় বৌ—

তিলু খোকাকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। একটু পরে খোকাকে কোলে করে এসে বললে—বাপ্‌রে, এসব ডাকাতের দল কেন আমার বাড়ীতে!

হলা পেকে উত্তর দিলে—বড়দি, পেটের জ্বালায় এইচি। খাতি দ্যাও, নইলে লুঠ হবে।

তিলু হেসে বললে—আমি লাঠি ধরতি জানি।

—সে তো জানি।

—বার করি ঢাল লড়ি?

—কিসের লড়ি?

—ময়না কাঠের।

অঘোর মুচি বললে—সত্যি বড়দি, হাত বজায় আছে তো?

—খেলবি নাকি এক দিন? মনে আছে সেই রথতলার আখড়াতে? তখন আমার বয়েস কত—সতেরো আঠারো হবে—

—উঃ, সে যে অনেকদিনের কথা হয়ে গেল। তখন রথতলার আখড়াতে মোদের বড্ড খেলা হোত। মনে আছে খুব।

—বসো, আমি আসচি।

একটু পরে দুটি বড় কাঁটাল দু'হাতে বোঁটা ঝুলিয়ে নিয়ে এসে তিলু ওদের সামনে রাখলে। বললে—খাও ভাই সব, দেখি কেমন জোয়ান—

হলা পেকে বললে—কোন্ গাছের কাঁটাল দিদি?

—মালসি।

—খাজা না রসা?

—রস খাজা। এখন আষাঢ়ের জল পেলে কাঁটাল আর রসা থাকে? খাও দুজনে।

মিনিট দশ-বারোর মধ্যে অঘোর মুচি তার কাঁটালটা শেষ করলে। হলা পেকের দিকে তাকিয়ে বললে—কি ওস্তাদ, এখনো বাকি যে?

—কাল রাত্তিরি খাসির মাংস খেয়েলাম সের দুয়েক। তাতে করে ভাল খিদে নেই।

তিলু বললে—সে হবে না দাদা। ফেলতি পারবে না। খেতে হবে সবটা। অঘোর দাদা, আর একখানা দেবো বার করে? ও গাছের আর কিন্তু নেই। খয়েরখাগীর কাঁটাল আছে খান চারেক, একটু বেশি খাজা হবে।

—দ্যাও, ছোট দেখে একখানা।

হলা পেকে বললে—খেয়ে নে অঘ্‌রা, এমন একখানা কাঁটালের দাম হাটে এক আনার কম নয়, এমন অসময়ে। মুই একখানা শেষ করে আর পারবো না। বয়েসও তো হয়েচে তোর চেয়ে। ছাও দিদিমণি, একটু গুড় জল ছাও—

তিলু বললে—তা হোলে সাক্‌রেদের কাছে হেরে গেলে দাদা। গুড় জল এমনি খাবে কেন, ছুটো ঝুনো নরকোল দি, ভেঙে ছুজনে খাও গুড় চিয়ে। তবে বেশি গুড় দিতি পারবো না। এবার সংসারে গুড় বাড়ন্ত। দশখানা কেনা ছিল, দুখানাতে ঠেকেচে। উনি বেজায় গুড় খান।

দিনটা বেশ আনন্দে কাটল।

হলা পেকে এবং অঘোর মুচি চলে যাওয়ার সময় চৈতন্যভারতী মহাশয়কে আর একবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে চলে গেল।

ভবানী বাঁড়ুয্যে তিলুকে নিয়ে রোজ নদীতে নাইতে যান সন্ধ্যাবেলা, আজও গেলেন। ইছামতীর নির্জ্জন স্থানে নিবিড় নল-খাগড়ার ঝোপের মধ্যে দিয়ে মুক্তো-খোঁজা জেলেরা (কারণ ইছামতীতে বেশ দামী মুক্তাও পাওয়া যেত) গত শীতকালে যে সুঁড়ি পথটা কেটে করেছিল, তারই নীচে বাব্‌লা যজ্ঞিডুমুর, পিটুলি ও নট্‌কান গাছের তলায় ভবানী ও তিলু নিজেদের জন্যে একটা ঘাট করে নিয়েচে, সেখানে হল্‌দে বাব্‌লা ফুল ঝরে পড়ে টুপটাপ করে স্বচ্ছ কাচ-চক্ষু জলের ওপর, গুলঞ্চের সরু ছোট লতা নট্‌কান ডাল থেকে জলের ওপর ঝুলে পড়ে, তেচোকো মাছের ছানা স্নানরতা তিলু সুন্দরীর বুকের কাছে খেলা করে, হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলে নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হয়; ঘনান্তরাল বনকুঞ্জের ছায়ায় কত কি পাখী ডাকে সন্ধ্যায়! ওদের কেউ দেখতে পায় না ডাঙার দিক থেকে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে জলে নেমে বললেন—চলো সাঁতার দিয়ে ও'পারে যাই—

তিলু বললে—চলুন, ওপারের ক্ষেত থেকে পটল তুলে আনি—

—ছিঃ, চুরি করা হয়। পাড়াগেঁয়ে বুদ্ধি তোমার—চুরি বোঝ না?

—যা বলেন। আমরা কত তুলে আনতাম।

—দেবে সাঁতার?

—চলুন। গো-ঘাটার দিকে যাবেন? মাঠের বড় অশথতলার দিকে?

তিলু অদ্ভুত সুন্দর ভাবে সাঁতার দেয়। সুন্দর, ঋজু তনুদেহটি জলের তলায় নিঃশব্দে চলে, পাশে পাশে ভবানী বাঁড়ুয্যে চলেন।

হঠাৎ এক জায়গায় গহিন কালো জলে ভবানী বাঁড়ুয্যে বলে ওঠেন—ও তিলু তিলু!

তিলু এগিয়ে চলেছিল, থেমে স্বামীর কাছে ফিরে এসে বললে—কি? কি?

ভবানী দুহাত তুলে অসহায়ের মত খাবি খেয়ে বললে—তুমি পালাও তিলু। আমায় কুমীরে ধরেচে—তুমি পালাও! পালাও! খোকাকে দেখো!...

তিলু হতভম্ব হয়ে বললে—কি হয়েচে বলুন না! কি হয়েচে? সে কি গো!

জল খেতে খেতে ভবানী দু'হাত তুলে ডুবতে ডুবতে বললেন—খো-কা-কে দেখো! খোকাকে দেখো—খো-ও-ও—

তিলু শিউরে উঠলো জলের মধ্যে, বর্ষা-সন্ধ্যার কালো নদীজল এক্ষুনি কি তার প্রিয়তমের রক্তে রাঙা হয়ে উঠবে? এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল জীবনের সব কিছু সাধ-আহ্লাদ?

চক্ষের নিমেষে তিলু জলে ডুব দিলে কিছু না ভেবেই।

স্বামীর পা কুমীরের মুখ থেকে ছাড়িয়ে নেবে কিংবা নিজেই কুমীরের মুখে যাবে। ডুব দিয়েই স্বচ্ছ জলের মধ্যে সে দেখতে পেলে, প্রকাণ্ড এক শিমুলগাছের গুঁড়ি জলের তলায় আড়ভাবে পড়ে, এবং তারই ডালপালার কাঁটায় স্বামীর কাপড় মজবুত জড়িয়ে আটকে গিয়েচে! হাতের এক এক ঝটকায় কাপড়খানা ছিঁড়ে ফেললে খানিকটা। আবার জলের ওপর ভেসে স্বামীকে বললে—ভয় নেই, ছাড়িয়ে দিচ্ছ, শিমুল-কাঁটায় বেধেচে—

আবার দম নিয়ে আরো খানিকটা কাপড় ছিঁড়ে ফেললে। জলের মধ্যে খুব ভাল দেখাও যায় না। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসচে জলের তলায়, কি করে কাপড় বেধেচে ভালো বোঝাও যায় না। আবার ও ডুব দিলে, আবার ভেসে উঠলো। তিন-চার বার ডুব দেওয়ার পর স্বামীকে মুক্ত করে অবসন্নপ্রায় স্বামীকে শক্ত হাতে ধরে ভাসিয়ে ডাঙার দিকে অল্প জলে নিয়ে গেল।

ভবানী বাঁড়ুয্যে হাঁপ নিয়ে বললেন—বাবাঃ! ওঃ!

তিলুর কাপড় খুলে গিয়েছিল, চুলের রাশ এলিয়ে গিয়েছিল, দু'হাতে সেগুলো এঁটে সেঁটে নিলে, চুল জড়িয়ে নিলে, সেও বেশ হাঁপাচ্ছিল। কিন্তু তার সতর্ক দৃষ্টি স্বামীর দিকে। আহা, বয়েস হয়ে গিয়েচে, ওঁর, তবু কি সুন্দর চেহারা! আজ কি হোত আর এক হোলে?

হেসে স্বামীর দিকে চেয়ে বললে—বাপ্‌রে, কি কাণ্ডটা করে বসেছিলেন সন্দে বেলায়!

ভবানী বাঁড়ুয্যেও হাসলেন।

—খুব সাঁতার হয়েচে, এখন চলুন বাড়ী—

—তুমি ভাগ্যিস ডুব দিয়ে দেখেছলে। কে জানত ওখানে শিমুলগাছের গুঁড়ি রয়েচে জলের তলায়। আমি কুমীর ভেবে হাত পা ছেড়ে দিয়েছিলাম তো—

প্রায়ান্ধকার নির্জ্জন পথ দিয়ে দুজন বাড়ী ফিরে চলে।

তিলু ভাবছিল—উঃ, আজ কি হোত, যদি সত্যি সত্যি ওঁর কিছু হোত!

তিলু শিউরে উঠলো।

স্বামী চলে গেলে সে কি বাঁচতো?

নীলকুঠির বড় সাহেবের কামরায় দেওয়ান রাজারামের ডাক পড়েছিল। সম্প্রতি তিনি হাতজোড় করে বড়সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে।

বড়সাহেব কাঠে-খোদা পাইপ খেতে খেতে বললেন—টোমার কাজ ঠিকমট হইটেছে না।

—কেন হুজুর ?

—নীলের চাষ এবার এট লো ফিগার—কম হইল কি ভাবে ?

—হুজুর, মাপ করেন তো ঠিক কথা বলি। সেবার সেই রাহাতুনপুরির কাণ্ডকারখানার পর—

জেন্ বিল্স্ শিপটন্ হঠাৎ টেবিলের ওপর দুম্ করে ঘুঁষি মেরে বললে—ও সব শুনিটে চাই না—আই ডোণ্ট উইশ ইউ স্পিন ছাট রিগম্যারোল ওভার হিয়ার এগেন—কাজ চাই, কাজ। ডুশো বিঘা জমিতে এ বছর নীল বুনিটে হইবে। বুঝিলে ? বাজে কথা শুনিটে চাই না।

—হুজুর।

—মিঃ ডব্কিন্‌স্‌ন্ বদলি হইয়া গেলো। নটুন ম্যাজিস্ট্রেট খাসিল। এ আমাদের ডলে আছেন। নীলের ডাডন এ বছর ক্রিস্‌মাস্‌লি আরম্ভ করিটে হইবে। ফিগার চাই। ডাডনের খাটা রোজ আমাকে ডেখাইবে।

—হুজুর।

শ্রীরাম মুচি এ সময়ে সাহেবের কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে রাজারাম বললেন—

—হুজুর এ লোককে জিজ্ঞেস করুন। এদের চরপাডা গ্রামের মুচিপাড়ার লোকে কিছুতে নীল বুনতে দেবে না, আপনি জিগ্যেস করুন ওকে—

সাহেব শ্রীরাম মুচিকে বললে—কি কঠা আছে ?

শ্রীরাম বড়সাহেবের পেয়ারের খানসামা, বড়সাহেবকেও সে ততটা সম্ভ্রম ও ভয়ের চোখে দেখে না, অন্য লোকের কথা বলাই বাহুল্য। সে বললে—কথা সবই ঠিক।

—কি ঠিক ?

—গলু আর হংস দল পেকিয়েচে হুজুর। নীলির দাগ মারতি দেবে না।

জেন্ বিল্স্ শিপ্‌টন্ রেগে উঠে দেওয়ালের দিকে চেয়ে বললেন—ইউ আর নো মিক্সপ—মুচিপাড়ার জমি সব ডাগ লাগাও—টো ডে—আজই। আমি ঘোড়া করিয়া দেখিটে যাইব। শ্যামচাঁদ ভুলিয়া গেলো ? রামু মুচি লিডার হইয়াছে—টাহাকে সোজা করিবে।

এই সময়ে শ্রীরাম মুচি হাতজোড় করে বললে—সাহেব, আমার তিন বিঘে মুসুরি আছে, রবিখন্দ। আমার ওটা দাগ যেন না দেন দেওয়ানজি। রানু সর্দারের বাড়ী আমি যাইনে, তার ভাত খাইনে।

—আচ্ছা, গ্র্যাণ্টেড, মঞ্জুর হইল। ডেওয়ান, ইহার জমি বাদ পড়িল।

রাজারাম বললেন—হুজুরের হুকুম।

—আচ্ছা যাও।—ছাট ডেভিল অফ্ এ্যান আমীন শুড গো উইথ ইউ—প্রসন্ন আমীন টোমার সাথে যাইবে। হরিশ আমীন নয়।

হুজুরের হুকুম।

প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী নিজের ঘরে ভাত রাঁধছিল। দেওয়ান রাজারাম ঘরে ঢুকতেই প্রসন্ন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। ভবুভালো, কিছুক্ষণ আগে তার এই ঘরেই নবু গাজিদের দল

এসেছিল। নীলের দাগ কিছু কম করে যাতে এ বছর তাদের গাঁয়ে দেওয়া হয়, সেজন্তে অনুরোধ জানাতে।

শুধু-হাতে তারা আসে নি।

আর একটু বেশিক্ষণ ওরা থাকলে ধরা পড়ে যেতে হোত। ঘুঘু রাজারামের চোখ এড়াত না কিছু।

রাজারাম বললেন—কি ? ভাত হচ্ছে ?

—আসুন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

—শিগ্‌গির চলো চক্কত্তি, মুচিদের আজ শেষ করে আসতি হবে। বড়সাহেব রেগে আগুন। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল।

—একটা কথা বলবো ?—রাগ করবেন ?

—না। কি ?

—দাগ শেষ।

—সে কি ?

প্রসন্ন চক্রবর্তী ভাতের হাত ধুয়ে গামছা দিয়ে মুছে ঘরের কোণের টিনের ক্ষুদ্র পেঁটরাটা খুলে দাগ-নক্সার বই ও ম্যাপ বার করে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললে—সাত পাখী জমি এই, দু পাখী জমি এই—আর এই দেড় পাখী—একুনে তিরিশ বিঘে সাত কাঠা।

রাজারাম প্রশংসমান দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বললেন—বাঃ—কবে করলে ?

রবিবার রাত দুপুরের পর।

—সঙ্গে কে ছিল।

—করিম লেঠেল আর আমি। পিন্‌ম্যান ছিল সয়ারাম বোষ্টম।

—রিপোর্ট কর নি কেন ? আগে জানাতি হয় এ সব কথা। তাহলি বড়সায়েবের কাছে আমাকে মুখ খেতি হোত না। যাও—

—কিছু মনে করবেন না দেওয়ানজি। কেন বলি নি শুনুন, ভরসা পাই নি, ঠিক বলচি। রাহাতুনপুরির সেই ব্যাপারের পর আর কিছু—

—সে ভয় নেই। ম্যাজিস্ট্রেট বদলে গিয়েচে। বড়সায়েব নিজে বললে আমাকে।

কিন্তু সেদিন সকালেই চরপাড়ায় গোলমাল বাধলো।

পাইক এসে খবর দিলে চরপাড়ার প্রজারা দাগ উপড়ে ফেলেচে। রাজারাম রায় বড়সাহেবকে কথাটা জানালেন না। তাঁর দূর সম্পর্কের সেই ভাইপো রামকান্ত রায়, যে কলকাতার আমুটি কোম্পানীর হৌসে নকলবিশি করে এবং যে অদ্ভুত কলের গাড়ী ও জাহাজের কথা বলেছিল, সে নীলকুঠিতে এসেছিল দেওয়ানের সঙ্গে দেখা করতে।

প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী আমীন যে কাজ একা করে এসেচে, তাতে দেওয়ান রাজারাম নিজেও কিছু ভাগ বসাতে চান, রিপোর্ট সেইভাবেই লিখছিলেন, প্রসন্ন চক্রবর্ত্তীকে অবিশ্যি

হাওয়া করে দিচ্ছিলেন না একেবারে।

রাজারাম তখুনি ঘোড়া ছুটিয়ে বেরুলেন চরপাড়ার দিকে। সেখানে এক বটতলায় বসে একে একে সমস্ত মুচিদের ডাকালেন। যার যত জমিতে আগে দাগ ছিল, তার চেয়ে বেশি দাগ স্বীকার করিয়ে টিপসই নিলেন প্রত্যেকের। কারো কিছু কথা শুনলেন না।

রামু সর্দ্দারকে ডেকে বললেন—এবার পাঁচপোতার বাঁওড়ে বাঁধাল দিইছিলে তুমি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ রায়মশাই। ফি বছর মোর বাঁধাল পড়ে।

—হুঁ।

রামু সর্দ্দারের বুক কেঁপে গেল। দেওয়ানজিকে সে চেনে। ঘোড়ায় উঠবার সময় সে দেওয়ানকে বললে—মোর কি দোষ হয়েচে? অপরাধ নেবেন না যদি কেউ কিছু বলে থাকে।

দেওয়ানজি ঘোড়ায় চেপে উড়ে বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যের পর পাঁচপোতার বাঁওড়ের বাঁধালে রামু সর্দ্দার বসে তামাক খাচ্ছে আর চার-পাঁচজন নিকিরি ও চাষীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলচে, এমন সময়ে হঠাৎ কোথা থেকে আট-দশজন লোক এসে ওর বাঁধাল ভাঙতে আরম্ভ করলে।

রামু সর্দ্দার খাড়া হয়ে উঠে বললে—কে? কে? বাঁধালে হাত দেয় কোন সুমুন্দির ভাই রে?

করিম লাঠিয়াল এগিয়ে এসে বললে—তোর বাবা।

—তবে রে—

রামু সর্দ্দার বাগ্দি পাড়ার মোড়ল। দুর্ব্বল লোক নয় সে। লাঠি হাতে সে এগিয়ে যেতেই করিম লাঠিয়ালের লাঠি এসে পড়লো ওর মাথায়। রামু সর্দ্দার লাঠি ঠেকিয়ে দিতেই করিম হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো—সামলাও!

আবার ভীষণ বাড়ি।

রামু সর্দ্দার ফিরিয়ে বাড়ি দিলে।

—সাবাস্! সামলাও।

রামু সর্দ্দার ফাঁক খুঁজছিল। বিজয়গর্ব্বে অসতর্ক করিম লাঠিয়ালের মাথার দিকে খালি ছিল, বিদ্যুৎ-বেগে রামু সর্দ্দার লাঠি উঠিয়ে বললে—তুমি সাম্লাও কর্‌মে খানসামা।

সঙ্গে সঙ্গে রামুর লাঠি ঘুরে গেল বোঁ করে ওর বাঁকা আড়-করা লাঠির ওপর দিয়ে, বেল ফাটার মত শব্দ হোল। করিম পেঁপে গাছের ডাঙা ডালের মত পড়ে গেল বাঁধালের জালের খুঁটির পাশে। কিন্তু রামু সামলাতে পারলে না। সেও গেল হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অমনি করিম লাঠিয়ালের সঙ্গী লাঠিয়ালরা দুড়দাড় করে লাঠি চালালে ওর উপর, যতক্ষণ রামু শেষ না হয়ে গেল। রক্তে বাঁধালের খাল রাঙা হয়ে ছিল তার পরদিন সকালেও। চাপ চাপ রক্ত পড়ে ছিল ঘাসের ওপর—পথযাত্রীরা দেখেছিল। বাঁধালের চিহ্নও ছিল না তার পরদিন সেখানে। বাঁশ ভেঙেচুরে নিয়ে চলে গিয়েছিল লাঠিয়ালের দল।

এই বাঁধালের খুব কাছে রামকানাই চক্রবর্ত্তী কবিরাজ একা বাস করতেন একটা খেজুর

গাছের তলায় মাঠের মধ্যে। রামকানাই অতি গরীব ব্রাহ্মণ। ভাত আর সোঁদালি ফুল ভাজা এই তাঁর সারা গ্রীষ্মকালের আহার—যতদিন সোঁদালি ফুল ফোটে বাঁওড়ের ধারের মাঠে। কবিরাজি জানতেন ভালোই, কিন্তু এ পল্লীগ্রামে কেউ পয়সা দিত না। খাওয়ার জন্য ধান দিত রোগীরা। তাও শ্রাবণ মাসে অসুখ সারলো তো আশ্বিন মাসের প্রথমে নতুন আউশ উঠল তবে চাষীর বাড়ী বাড়ী এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে ঘুরে ধান নিজেকেই সংগ্রহ করতে হোত তাঁকে।

রামকানাই খেজুরতলায় নিজের ঘরটিতে বসে দাশু রায়ের পাঁচালী পড়ছিলেন, এমন সময় হৈ চৈ শুনে তিনি বই বন্ধ করে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। তারপর আরও এগিয়ে দেখতে পেলেন, নীলকুঠির কয়েকজন লাঠিয়াল বাঁধালের বাঁশ খুলচে। একটু পরে শুনতে পেলেন কারা বলচে খুন হয়েচে। রামকানাই ফিরে আসচেন নিজের ঘরে, তাঁর পাশ দিয়ে হারু নিকিরি আর মনসুর নিকিরি দৌড়ে পালিয়ে চলে গেল।

রামকানাই বললেন—ও হারু, ও মনসুর, কি হয়েচে? কি হয়েচে?

তাদের পেছনে অন্ধকারে পালাচ্ছিল হজরৎ নিকিরি। সে বললে—কে? কবিরাজ মশায়? ওদিকে যাবেন না। রামু বাগ্‌দিকে নীলকুঠির লেঠেলরা মেরে ফেলে দিয়ে বাঁধাল লুঠ করচে।

রামকানাই ভয়ে এসে ঘরের দোর বন্ধ করে দিলেন।

একটা খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটলো এই উপলক্ষ্যে। খুনের চেয়েও বড়, হাঙ্গামার চেয়েও বড়।

পরদিন সকালে চারিদিকে হৈ চৈ বেধে গেল—নীলকুঠির লোকেরা পাঁচপোতার বাঁধাল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েচে, রামু সর্দ্দারকে খুন করেচে। দলে দলে লোক দেখতে গেল ব্যাপারটা কি। অনেকে বললে—নীলকুঠির সাহেব এবার জলকর দখল করবে বলে এ রকম করচে।

অনেকে রাজারামের বাড়ী গেল। দেওয়ান রাজারাম আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—খুন? সে কি কথা? আমাদের কুঠির কোন লোক নয়। বাইরের লোক হবে। রামু বাগ্‌দি ছিল বদমাইশের নাজির। তার আবার শত্রুর অভাব। তুমিও যেমন। যা কিছু হবে, অমনি নীলকুঠির ঘাড়ে চাপালেই হোল! কে খুন করে গেল, নীলকুঠির লোকে করেচে—নাও ঠ্যালা!

বড়সাহেব রাজারামকে ডেকে বললে—খুনের কঠা কি শুনিটেছি? কে খুন করিল?

রাজারাম বললেন—আমাদের লোক নয় হুজুর। তার শত্রু ছিল অনেক—রামু বাগ্‌দির। কে খুন করেচে আমরা কি জানি?

—আমাদের লাঠিয়াল গিয়াছিল কি না?

—না হুজুর।

—পুলিসের কাছে এই কঠা প্রমাণ করিটে হইবে।

ছোটসাহেবকে বললে—আই থিঙ্ক দ্যাট ম্যান হ্যাজ ওভারশট হিজ মার্ক দিস টাইম। আই ডোণ্ট এ্যাপ্রিসিয়েট দিস মার্ডার বিজনেস, ইউ সী? টু মাচ অফ এ ট্রাব্‌ল—হোয়েন আই এ্যাম দি এনকোয়্যারিং ম্যাজিস্ট্রেট।

—আই অর্ডারড ওনলি দি ফিশ-বাণ্ড টু বি সোরেপ্ট্ এ্যাওয়ে, সার।

—আই নো, সেট রেডি ফর দি ট্রাব্‌ল দিস টাইম।

পুলিস তদন্তের পূর্ব্বে রামকানাই কবিরাজের ডাক পড়লো রাজারামের বাড়ী। রাজারাম তাঁকে বলে দিলেন, এই কথা তাঁকে বলতে হবে—বুনোপাড়ার লোকদের রামুকে খুন করতে তিনি দেখেচেন।

রামকানাই চক্রবর্ত্তী বললেন—একেবারে মিথ্যে কথা আমি কি করে বলি রায়মশাই?

—বলতে হবে। বেশি ফ্যাচ ফ্যাচ করবেন না। যা বলা হচ্চে তাই করবেন।

—আজ্ঞে এ তো বড় বিপদে ফেললেন রায়মশাই।

—আপনাকে পান খেতে দেবো কুঠি থেকে।

—রাম রাম! ও কথা বলবেন না। পয়সা নিয়ে ও কাজ করবো না।

তদন্তের সময় রামকানাইয়ের ডাক পড়লো। দারোগা নীলকুঠির অনেক নুন খেয়েচে, সে অনেক চেষ্টা করলে রামকানাইয়ের সাক্ষ্য উল্টপাল্ট করে দিতে।

রামকানাইয়ের এক কথা। নীলকুঠির লাঠিয়ালদের তিনি বাঁধাল থেকে পালাতে দেখেচেন। রামু সর্দ্দারের মৃতদেহও তিনি দেখেচেন, তবে কে তাকে মেরেচে, তা তিনি দেখেন নি।

দারোগা বললে—বুনোপাড়ার সঙ্গে ওর বিবাদ ছিল জানেন?

—না দারোগা মশাই।

—বুনোপাড়ার কোন লোককে সেখানে দেখছিলেন?

—না।

—ভালো করে মনে করুন।

—না দারোগা মশাই।

যাবার সময় দারোগা রাজারাম রায়কে ডেকে বলে গেল—দেওয়ানজি, কবিরাজ বুড়ো বড় তেঁদড়। ওকে হাত করার চেষ্টা করতে হবে। ডাবের জল খাওয়ান বেশি করে।

রামকানাইকে নীলকুঠিতে ডেকে নিয়ে যাওয়া হোল পাইক দিয়ে। প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী আমীন বললে—কবিরাজ মশাই—বড়সায়েব বাহাদুর বলেচেন আপনাকে খুশি করে দেবেন। শুধু কি চান বলুন—বড় সন্তুষ্ট হয়েচেন আপনার ওপর।

—আমি আবার কি চাইবো? গরিব বামুন, আমীনমশায়। যা দেন তিনি।

—তবুও বলুন কি আপনার—মানে ধরুন টাকাকড়ি কি ধান—

—ধান দিলে খুব ভালো হয়।

—তাই আমি বলচি দেওয়ানজির কাছে—

রামকানাই চক্রবর্ত্তীকে তারপর নিয়ে যাওয়া হোল ছোটসাহেবের খাসকামরায়। রামকানাই গরীব ব্যক্তি, সাহেবসুবোর আব্‌হাওয়ায় কখনো আসেন নি, কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকলেন। ছোটসাহেব পাইপ মুখে বসে ছিল। কড়া সুরে বললে—ইদিকি এসো—

—আজ্ঞে সায়েব মশাই—নমস্কার হই।

—তুমি কি কর ?

—আজ্ঞে, কবিরাজি করি।

—বেশ। কুঠিতে কবিরাজি করবে ?

—আজ্ঞে কার কবিরাজি সায়েব মশায় ?

—আমাদের।

—সে আপনাদের অভিরুচি। যা বলবেন, তাই করবো বই কি ?

—তাই করবা ?

—আজ্ঞে কেন করবো না ?

—মাসে তোমায় দশ টাকা করে দেওয়া হবে তাহলি।

রামকানাই চক্রবর্ত্তী নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। দশ টাকা! মাসে দশ টাকা আয় তো দেওয়ান মশায়দের মত বড়মানুষের রোজগার! আজ হঠাৎ এত প্রসন্ন হোলেন কেন এঁরা।

রামকানাই কবিরাজ বললেন—দশ টাকা সায়েব মশাই ?

—হ্যাঁ তাই দেওয়া হবে।

রাজারামকে ডেকে ধূর্ত্ত ছোটসাহেব বলে দিলে—এই লোকের সঙ্গে একটা চুক্তি করে লেখাপড়া হোক। দশ টাকা মাসে কবিরাজির জন্যে কুঠির ক্যাশ থেকে দেওয়া হবে। দশটা টাকা দিয়ে দাও এক মাসের আগাম।

—বেশ হুজুর।

পরদিন রামকানাইয়ের আবার ডাক পড়লো নীলকুঠিতে। তার আগের দিন বিকেলে টাকা নিয়ে চলে এসেচেন হৃষ্ট মনে। আজ সকালে আবার কিসের ডাক ? দেওয়ান রাজারামের সেরেস্তায় গিয়ে হাজিরা দিতে হোল রামকানাইকে। দেওয়ান বললেন—তা হোলে তো আপনি এখন আমাদের লোক হয়ে গেলেন ?

রামকানাই বিনীতভাবে জানালেন, সে তাঁদের কৃপা।

—না না ওসব নয়। আপনি ভাল কবিরাজ। আমাদেরও দরকার। দশ টাকা পেয়েচেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—একটা কথা। সব তো হোলো। নীলকুঠির নুন তো খ্যালেন, এবার যে তার গুণ গাইতে হবে।

—আজ্ঞে মহানুভব বড়সায়েব, ছোটসায়েব আর দেওয়ানজির গুণ সর্ব্বদাই গাইবো।

গরীব ব্রাহ্মণ, যা উপকার আপনারা করলেন—

—ও কথা থাক্। সে খুনের মোকদ্দমায় আপনাকে আমাদের পক্ষে সাক্ষী দিতি হবে। এই উপকারডা আপনি করুন আমাদের।

রামকানাই আকাশ থেকে পড়লেন।—সে কি? সে তো মিটে গিয়েচে, যা বলবার পুলিসের কাছে বলেচেন, আবার কেন?

—তা নয়, আদালতে বলতি হবে। আপনাকে আমরা সাক্ষী মানবো। আপনি বলবেন—বুনো পাড়ার ভস্তে বুনো, হ্যাঁটা বুনো, ছিকুষ্ট বুনো আর পাতিরাম বুনোকে আপনি লাঠি নিয়ে পালিয়ে যেতে দেখেচেন।

—কিন্তু তা তো দেখি নি দেওয়ানমশাই?

—না দেখেচেন না-ই দেখেচেন। বোকার মত কথা বলবেন না। নীলকুঠির মাইনে করা বাঁধা কবিরাজ আপনাকে করা হোল। সায়েব-মেমের রোগ সারালে বক্‌শিশ পাবেন কত। দশ টাকা মাসে তো বাঁধা মাইনে হয়েচে। একটা ঘর কাল আপনার জন্তে দেওয়ানো হবে, বড়সায়েব বলেচে। আপনি তো আমাদের নিজির লোক হয়ে গ্যালেন। আমাদে' '' টেনে একটা কথা—ওই একটা কথা—বাস্ হয়ে গেল। আপনাকে আর কিছু বলতি হবে না।—ওই একটা আপনি বলবেন, অমুক অমুক বুনোকে দৌড়ে পালাতে আপনি দেখেচেন।

রামকানাই বিষণ্নমুখে বললেন—তা—তা—

—তা-তা নয়, বলতি হবে। আপনি কি চান? বড়সায়েব বড্ড ভালো নজর দিয়েচে আপনার ওপর। যা চান, তাই দেবে। আপনার উন্নতি হয়ে যাবে এবার।

রাজারাম আরও বললেন—তা হোলে যান এখন। নীলকুঠির ঘোড়া দিতাম, কিন্তু আপনি তো চড়তি জানেন না। গরুর গাড়ীতি যাবেন?

রামকানাই খুব বিনীতভাবে হাত জোড় করে বললেন—দেওয়ান মশাই, আমি বড্ড গরীব। আমারে মুশকিলে ফ্যালবেন না। আদালতে দাঁড়িয়ে হলপ্ করে তবে সাক্ষী দিতি হয় শুনিচি। আজ্ঞে, আমি সেখানে মিথ্যে কথা বলতি পারবো না। আমায় মাপ করুন দেওয়ান মশাই, আমার বাবা ত্রিসন্ধ্যা না করে জল খেতেন না। কখনো মিথ্যে বলতি শুনি নি কেউ তাঁর মুখে। আমি বংশের কুলাঙ্গার তাই কবিরাজি করে পয়সা নিই। বিনা-মূল্যে রোগ আরোগ্য করা উচিত। জানি সব, কিন্তু বড্ড গরীব, না নিয়ে পারিনে। আদালতে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা আমি বলতি পারবো না দেওয়ান মশাই।

দেওয়ান রাজারাম রেগে উত্তর দিলেন— এডা বড্ড ধড়িবাজ। এডারে চুনের গুদোমে পুরে রেখো আজ রাত্তিরি। চাপুনির জল খাওয়ালি যদি জ্ঞান হয়। তাতেও যদি না সারে, তবে শ্যামচাঁদ আছে জানো তো?

পাইক নফর মুচি কাছে দাঁড়িয়ে বললে—চলুন ঠাকুরমশায়।

—কোথায় নিয়ে যাবা?

—চুনির গুদোমে নিয়ে যাত্তি বলচেন দাওয়ানজি, শোনলেন না? আপনি ব্রাহ্মণ দেবতা, গায়ে হাত দেবো না, দিলি আমার মহাপাপ হবে। আপনিই চলুন এগিয়ে।

—কোন্ দিকি।

—আমার পেছনে পেছনে আসুন।

কিছুদূর যেতেই রাজারাম পুনরায় রামকানাইকে ডেকে বললেন—তাহলি চুনের গুদোমেই চললেন? সে জায়গাটাতে কিন্তু নাকে কাঁদতি হবে গেলে। আপনি ভদ্রলোকের ছেলে তাই বললাম।

—তবে আমারে কেন সেখানে পাঠাচ্চেন দেওয়ান মশাই, পাঠাবেন না।

—আমার তো পাঠানোর ইচ্ছে নয়। আপনি যে এত ভদ্রলোক হয়ে, কুঠির মাইনে-বাঁধা কবিরাজ হয়ে আমাদের একটা উপকার করবেন না—

—তা না, হলপ করে মিথ্যে বলতি পারবো না। ওতে পতিত হতে হয়।

—তবে চুনের গুদামে ওঠো গিয়ে ঠেলে। যাও নফর—চাবি বন্ধ করে এসো।

রাত প্রায় দশটা। দেওয়ান রাজারাম একা গিয়ে চুনের গুদামের দরজা খুললেন। রামকানাই কবিরাজ ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়েচেন। নীলকুঠির চুনের গুদাম শয়নঘর হিসেবে খুব আরামদায়ক স্থান নয়। 'চুনের গুদাম'-এর সাথে চুনের সম্পর্ক তত থাকে না যত থাকে বিদ্রোহী প্রজা ও কৃষকের। বড়সাহেবের ও নীলকুঠির স্বার্থ নিয়ে যার সঙ্গে বিরোধ বা মতভেদ, সে চুনের গুদামের যাত্রী। এই আলো-বাতাসহীন দুটো মাত্র ঘুল্-ঘুলিওয়ালা ঘরে তাকে আবদ্ধ থাকতে হবে ততক্ষণ, যতক্ষণ বড়সাহেব বা ছোটসাহেবের অথবা দেওয়ানজির মরজি। চুনের গুদামের বাইরে একটা বড় মাদার গাছ ছিল। একবার রাসমণিপুরের জনৈক দুর্দ্দান্ত প্রজা ঘুলঘুলি দিয়ে বার হয়ে মাদার গাছের নিচু ডাল ধরে ঝুলে পালিয়ে গিয়েছিল বলে তৎকালীন বড়সাহেব জন সাহেবের আদেশে গাছটা কেটে ফেলা হয়। চুনের গুদামে ইতিপূর্ব্বে একজন প্রজা নাকি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল ভূত দেখে।

রাজারামের মনে ভূতের ভয়টা একটু বেশি। একলা কখনো তিনি এত রাত্রে চুনের গুদামে আসতেন না। আসবার আগে তাঁর গা-টা ছম্ ছম্ করছিল, এখন রামকানাইকে দেখে তিনি মনে একটু সাহস পেলেন। হোক না ঘুমন্ত, তবুও একটা জলজ্যান্ত মানুষ তো বটে। দেওয়ানজি ডাক দিলেন—ও কবরেজ মশাই—ও কবরেজ—

রামকানাই চমকে ধড়মড় করে উঠে বললেন—কে? ও দেওয়ান মশাই—আসুন আসুন—বলেই এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাঁকে বসবার ঠাঁই দিতে, যেন রাজারাম তাঁর বাড়ীতে আজ রাতের বেলা অতিথি রূপে পদার্পণ করেচেন।

রাজারাম বললেন—থাক থাক। বসবার জন্যি আসিনি, চলুন আমার সঙ্গে।

—কোথায় দেওয়ান মশাই?

—চলুন না।

—তা চলুন। তবে এমন ঘরে আর আমায় পোরবেন না দেওয়ান মশাই, বড্ড মশা। কামড়ে আমারে খেয়ে ফেলে দিয়েচে একবারে।

—আপনার গেরোর ফের। নইলি আজ আপনি নীলকুঠির কবিরাজ, আপনাকে এখানে আসতি হবে কেন! যাক যা হবার হয়েচে, এখন চলুন আমার সঙ্গে।

—যেখানেই নিয়ে যান, একটু যেন ঘুমুতি পারি।

—মত বদলেচে!

—না দেওয়ান মশাই, হাত জোড় করে বলদি, আমারে ও অনুরোধ করবেন না। আমি কবিরাজ লোক, কারো অসুখ দেখলি নিজে গাছগাছড়া তুলে এনে বড়ি করে দোবো, নিজের হাতে পাঁচন সেদ্ধ করবো, সে কাজে ক্রুটি পাবেন না। কিন্তু ওসব মামলা-মকদ্দমার কাজে আমারে জড়াবেন না। দোহাই আপনার—

রামকানাই সরল লোক, নীলকুঠির সাহেবদের ক্রিয়াকলাপ কিছুই জানতেন না বা সাহেবদের চেয়েও তাদের এইসব নন্দী-ভৃঙ্গির দল যে এককাঠি সরেস, তারা যে রাত দুপুরে সাহেবদের হুকুমে ও ইঙ্গিতে বিনা দ্বিধায় অম্লান বদনে জলজ্যান্ত মানুষকে খুন করে লাশ গাজিপুরের ..ল পুঁতে রেখে আসতে পারে তাই বা তিনি কোন চরক সুশ্রুতের পুঁথিতে পড়বেন?

ছোটসাহেব একটা লম্বা বারান্দায় বসে নীলের বাণ্ডিলের হিসেব করছিলেন। এই সব বাণ্ডিল-বাঁধা নীল কলকাতা থেকে আমুটি কোম্পানীর বায়না করা। দিন তিনেকের মধ্যে তাদের তরফ থেকে হেড ম্যানেজার রবার্টস সাহেব এসে নীল দেখবে। ছোটসাহেব নীলের বাণ্ডিলের তদারক করচে এই জন্যই। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে প্রসন্ন আমীন, সে খুব ভালো নীল চেনে, এবং জমানবিশ কানাই গাঙ্গুলি। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সহিস ভজা মুচি।

দেওয়ানকে দেখে ছোটসাহেব বলে উঠলো—আরে দেওয়ান এসো এসো। তুমি বলো তো তিন শো তেষট্টি নম্বর আকাইপুরির নীলের বাণ্ডিলের সঙ্গে দেউলে, ঘোষা, সরাবপুরির নীল মিশবে?

আসল কথা এরা নীল ভালোমন্দতে মেশাচ্চে। সব মাঠের নীল ভালো হয় না। যারা এদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ তারা নীল দেখে বলে দেবে তার শ্রেণী। বলে দেবে, এ নীলের সঙ্গে ও নীল মিশিও না, আমুটি কোম্পানীর দালাল ধরে ফেলে দেবে।

দেওয়ান বললে—খুব মিশবে। এ বছর আর কালীবর দালাল আসবে না, রবার্ট সাহেব কিছু বোঝে না—ঘোষা আর আমাদের মোল্লাহাটি, পাঁচপোতার নীল মিশিয়ে দিলি কেউ ধরতি পারবে না। এই এনিচি হুজুর, আমাদের সেই কবিরাজ।

ছোটসাহেব রামকানাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন—চুনের গুদাম কি রকম লাগলো?

রামকানাই হাত জোড় করে বললে—সায়েব মশায়, নমস্কার আজ্ঞে?

—চুনের গুদাম কেমন জায়গা?

দেওয়ান রাজারাম জিভে একটা শব্দ করে হাত দু'খানা তুলে বললেন—হুজুর, আপনি

বললেন কিঁ রকম জায়গা। কবিরাজ তার কি জানে? সেখানে ঢুকে ঘুমুতি লেগেচে।

—অ্যাঁ? ঘুমুচ্ছিলে। তা হোলে খুব আরামের জায়গা বলে মনে হয়েচে দেখচি। আর ক'দিন থাকতি চাও?

—আজ্ঞে? সায়েব মশায় কি বলচেন, আমি বুঝতি পারচি নে।

—খুব বুঝেচ। তুমি ঘুঘু লোক, স্যাকা সাজ্‌লি জন্ ডেভিড্ তোমায় ছাড়বে না। মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবে কি না বলো। যদি স্যাও, তোমাকে আরও দশ টাকা এখুনি মাইনে বাড়িয়ে দেবো। কেমন রাজী? কোনো কথা বলতি হবে না, তুমি বুনোপাড়ার ছিরুই বুনো আর দু' একজন লোককে লাঠি হাতে চলে যেতি দেখেচ বলবে। রাজী?

—আজ্ঞে সায়েব মশায়?

—ও সায়েব মশায় বলা খাটবে না। করতি হবে, সাক্ষী দিতি হবে। তোমার উন্নতি করে দেবো। এখানে বাঁধা মাইনের কবরেজ হবে। কুড়ি টাকা মাইনে ধরে দিও দেওয়ান জুন মাস থেকে।

দেওয়ান রাজারাম তখুনি পড়া পাখীর মত বলে উঠলেন—যে আজ্ঞে হুজুর।

—বেশ নিয়ে যাও। কবিরাজ রাজী আছে। নিয়ে যাও ওকে। প্রসন্ন আমীন, তোমার ঘরে শোবার জায়গা করে দিতি পারবা না কবিরাজের?

প্রসন্ন আমীন তটস্থ হয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললে—হাঁ হুজুর। আমার বিছানা পাতাই আছে, তাতেও উনি শুতে পারেন না হয়—

রামকানাইয়ের মুখ শুকিয়ে গিয়েচে, জল-তেষ্টায় তাঁর জিভ জড়িয়ে এসেচে, কিন্তু নীলকুঠিতে সাহেবের ও মুচির ছোঁয়া জল তিনি খাবেন না, কারণ এইমাত্র দেখলেন বেহারা শ্রীরাম মুচি ছোটসাহেবের জন্যে কাঁচের বাটি ক'রে মদ (মদ নয় কফি, রামকানাই ভুল করেচেন) নিয়ে এল—সত্যিক জাতের ছোঁয়াছুঁয়ি এখানে—নাঃ। এই সব ব্রাহ্মণেরও দেখচি এখানে জাত নেই। এখানে কবিরাজি করতে হোলে জল খাবেন না এখানকার, শুধু ডাব খেয়ে কাটাতে হবে।

প্রসন্ন আমীন বললে—তাহোলে চলুন কবিরাজ মশাই—রাত হয়েচে।

দেওয়ান রাজারাম পাকা লোক, তিনি এই সময় বললেন—তাহোলে কবিরাজ মশাইয়ের সাক্ষী দেওয়া ঠিক হোলো তো?

প্রসন্ন আমীন রামকানাইয়ের দিকে চাইলে। রামকানাই বললে—সায়েব মশাই, তা আমি কেমন করে দেবো? সে আগেই বললাম তো দেওয়ান মশাইকে।

ছোটসাহেব চোখ গরম করে বললে—সাক্ষী দেবা না?

—না সায়েব মশাই। মিথ্যে কথা বলতি আমি পারবো না। দোহাই আপনার। হাতজোড় করচি আপনার কাছে। আমার বাবা ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত—

—ও তুমি এমনি শায়েস্তা হবে না। তোমার মাথার ঠিক এমনি হবে না। ভজা, নফরকে ডাক স্যাও। দশ ঘা শ্যামচাঁদ কষে দিক।

নফর মুচি লম্বা জোয়ান মিশকালো লোক। সে অনেক লোককে নিজের হাতে খুন করেচে। কুঠির বাইরে আশপাশ গ্রামে নফরকে সবাই ভয় করে। নফর বোধ হয় ঘুমুচ্ছিল। ভজার পেছনে পেছনে সে চোখ মুছতে মুছতে এল।

ছোটসাহেব রামকানাইয়ের দিকে চেয়ে বললে—কেমন? লাগাবে শ্যামচাঁদ।

—আজ্ঞে সাহেব মশাই—তাহলি আমি মরে যাবো। আমারে মারতি বলবেন না। আষাঢ় মাসে বাত শ্লেষ্মা হয়ে আমার শরীর বড় দুর্ব্বল—

—মরে গেলে তাতে আমার কিছুই হবে না। নিয়ে যাও নফর—

নফর বললে—যে আজ্ঞে হুজুর।

নফর এসে রামকানাইয়ের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললো। যাবার সময় দেওয়ানজির দিকে তাকিয়ে বললে—তাহোলি আস্তাবলে নিয়ে যাই?

এই সময় দেওয়ানের দিকে সে সামান্য ক্ষণের জন্য স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

দেওয়ান বললেন—নিয়ে যাও—

রামকানাই বলিদানের পাঁঠার মত নফরের সঙ্গে চললেন। লোকটা স্বভাবত নির্ব্বোধ, এখুনি যে নফর মুচির জোরালো হাতের শ্যামচাঁদের ঘায়ে তাঁর পিঠের চামড়া ফালা ফালা হয়ে যাবে সে সম্ভাবনা কানে শুনলেও বুদ্ধি দিয়ে এখনো হৃদয়ঙ্গম ক'রে উঠতে পারেন নি।

আস্তাবলে দাঁড় করিয়ে নফর ক্ষীণ চন্দ্রালোকে রামকানাইয়ের দিকে ভালো করে চেয়ে বললে—ক' ঘা খাবা।

—আমারে মেরো না বাবা। আমার বাত শ্লেষ্মার অসুখ আছে, আমি তাহলি মরি যাবো।

—মরে যাও, বাঁওড়ের জলে ভাসিয়ে দেবানি। তার জন্যে ভাবতি হবে না। অমন কত এ হাতে ভাসিয়ে দিইচি। পেছন ফিরে দাঁড়াও।

দু'ঘা মাত্র শ্যামচাঁদ খেয়ে রামকানাই মাটিতে পড়ে গিয়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন। নফর কোথা থেকে একটা চটের থলে এনে রামকানাইয়ের গায়ে ফেলে দিলে। তার ধুলোয় রামকানাইয়ের মুখের ভিতর ভর্ত্তি হয়ে দাঁত কিচ্‌কিচ্ করতে লাগলো। পিঠে তখন ওদিকে নফর সজোরে শ্যামচাঁদ চালাচ্চে ও মুখে শব্দ করচে—রাম, দুই, তিন, চার—

দশ ঘা শেষ করে নফর বললে—যাও, বেরাহ্মণ মানুষ। সাহেব বললি কি হবে, তুমি মরে যেতে দশ ঘা শ্যামচাঁদ খেলি। রাত্তিরি এখান থেকে নড়বা না। সামনে এসে ছোট-সাহেব দেখলি ছুটি।

রামকানাই বাকি রাতটুকু মড়ার মত পড়ে রইলেন আস্তাবলের মেঝেতে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে সকালে বাড়ীর সামনে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে আছেন, আজ হাটবার, চাল কিনবেন। নিলু বলে দিয়েচে একদম চাল নেই। এমন সময় তিলু একবছরের খোকাকে এনে তাঁর কাছে দিতে গেল। ভবানী বললেন—এখন দিও না, আমি একটু মামার কাছে

যাবো। যাও, নিয়ে যাও।

খোকা কিন্তু ইতিমধ্যে মার কোল থেকে নেমে পড়ে ভবানীর কোলে যাবার জন্তে দু'হাত বাড়াচ্চে। তিলু নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে সে কাঁদতে লাগল ও ছোট্ট ডান হাতখানা বাড়িয়ে বাবাকে ডাকতে লাগলো।

—দিয়ে যাও, দিয়ে যাও। দাঁড়াও, ঐ তো দীনু বুড়ি আসচে। দেখে নাও তো চালটা—। ভবানী ছেলেকে কোলে করলেন। খোকা আনন্দে তাঁর কান ধরে বলতে লাগলো—ই—গুল্‌ল্‌ন্—আঙুল দিয়ে পথের দিকে দেখিয়ে দিলে।

ভবানী বললেন—না, এখন তোমার বেড়াবার সময় নয়। ওবেলা যাবো।

খোকা ওসব কথা বোঝে না। সে আবার আঙুল দিয়ে পথের দিকে দেখিয়ে বল্‌লে —ইঃ।

—না। এখন না।

তিলু বললে—যাচ্চেন তো মামাশ্বশুরের ওখানে। নিয়ে যান না সঙ্গে।

খোকা ততক্ষণে বাবার পৈতের গোছ ছোট্ট মুঠোতে ধরে পথের দিকে টানচে, আর চেঁচিয়ে বলচে—অ্যাঃ—নোবল্ নোবল্—উঁ—

পরেই কান্নার স্বর।

তিলু বললে—যাও, যাও। আহা, আপনার সঙ্গে বেড়াতে ভালোবাসে।

—কেন, ওর তিন মা। আমি না হোলে চলে না?

—না গো। রান্নাঘরে যখন থাকে, তখন থাকে থাকে কেবল আঙুল তুলে বাইরের দিকে দেখায়, মানে আপনার কাছে নিয়ে যেতে বলে—

এমন সময় দীনু বুড়ি চালের ধামা কাঁধে করে নিয়ে ওদের কাছাকাছি এসে পড়তেই ওরা বললে—দেখি কি চাল?

দীনু বুড়ির বয়স আশীর ওপর, চেহারা ভারতচন্দ্র বর্ণিত জরতীবেশিনী অন্নদার মত। এমন কি হাতের ছোট্ট নড়িটি পর্য্যন্ত। ওদের কাছে এসে একগাল হেসে ধামা নামিয়ে বললে—ডবল নাগরা দিদিমণি। আর কে? জামাই।

তিলু বললে—হ্যাঁ গো। দর কি?

—ছ'পয়সা।

—না, এক আনা করে হাটে দর গিয়েচে।

—না দিদিমণি, তোমাদের খেয়ে মানুষ, তোমাদের ফাঁকি দেব নি? ছ' পয়সা না ছাও, পাঁচ পয়সা দিও। এক মুঠো নিয়ে চিবিয়ে দ্যাখো কেমন মিষ্টি। আকোরকোরার মত।

—চল বাড়ীর মধ্যি। পয়সা কিন্তু বাকী থাকবে।

—ঐ দ্যাখো, তাতে কি হয়েচে? ওবেলা দিও।

—ওবেলা না। মঙ্গলবারের ইদিকি হবে না।

—তাই দিও।

এই ফাঁকে খোকা খপ করে একমুঠো চাল ধামা থেকে উঠিয়ে নিয়েই মুখে পুরে দিলে। কিছু কিছু পড়ে গেল মাটিতে। ভবানী ওর হাত থেকে চাল কেড়ে নিয়ে কোলে নিয়ে বললেন—হাঁ করো—হাঁ করো খোকা—

খোকা অমনি আকাশ-পাতাল বড় হাঁ করলে, এটা তিলু খোকাকে শিখিয়েচে। কারণ যখন তখন যা তা সে দুই আঙুলে খুঁটে তুলে সর্ব্বদা মুখে পুরচে, ওর মা বললে—হাঁ করো খোকন্—নক্ষি ছেলে। কেমন হাঁ করে—

অমনি খোকা আকাশ-পাতাল হাঁ করে অনেকক্ষণ থাকবে, সেই ফাঁকে ওর মা মুখে আঙুল পুরে মুখের জিনিস বার করে ফেলবে।

আজকাল সে হাঁ ক'রে বলে—আঁ—আ—আ—আ—

ওর মা বলে—থাক—থাক। অত হাঁ করতি হবে না—

ভবানী বাঁড়ুয্যে খোকনের মুখ থেকে আঙুল দিয়ে সব চাল বের করে ফেলে দিলেন। এমন সময় পথের ওদিক থেকে দেখা গেল ফণি চক্কত্তি আসচেন, পেছনে ভবানীর মামা চন্দ্র চাটুয্যে। ভবানী বললেন—তিলু, তুমি দীনু বুড়িকে নিয়ে ভেতরে যাও—খোকাকেও নিয়ে যাও—

ওঁরা দুজন কাছে আসচেন, তিলু খোকাকে নিতে গেল, কিন্তু সে বাবার কোল আঁকড়ে রইল দু'হাতে বাবার গলা জাপটে ধরে। মুখে তারস্বরে প্রতিবাদ জানাতে লাগলো।

তিলু বললে—ও আপনার কোল থেকে কারো কোলে যেতে চায় না, আমি কি করবো?

ভবানী হাসলেন। এ খোকাকে তিনি কত বড় দেখলেন এক মুহূর্ত্তে। বিজ্ঞ, পণ্ডিত ছেলে টোল খুলে কাব্য, দর্শন, ভক্তিশাস্ত্র পড়াচ্ছে ছাত্রদের। সৎ, ধার্ম্মিক, ঈশ্বরকে চেনে। হবে না? তাঁর ছেলে কিনা? খুব হবে। দেশে দেশে ওকে চিনবে, জানবে।

সেই মুহূর্ত্তে তিলুকেও দেখলেন—দীনু বুড়ির আগে আগে চ'লে গিয়ে বাড়ীর ছোট্ট দরজার মধ্যে ঢুকে চলে গেল। কি নতুন চোখেই ওকে দেখলেন যেন। মেয়েরাই সেই দেবী, যারা জন্মের দ্বারপথের অধিষ্ঠাত্রী—অনন্তের রাজ্য থেকে সসীমতাব মধ্যেকার লীলাখেলার জগতে অহরহ আত্মাকে নিয়ে আসচে, তাদের নবজাত ক্ষুদ্র দেহটিকে কত যত্নে পরিপোষণ করচে; কত বিনিদ্র উদ্বিগ্ন রাত্রির ইতিহাস রচনা করে জীবনে জীবনে, কত নিঃস্বার্থ সেবার আকুল অশ্রুরাশিতে ভেজা সে ইতিহাসের অপঠিত অবজ্ঞাত পাতাগুলো।

ভবানী বললেন—শোনো তিলু—

—কি?

—খোকাকে নেবে?

—ও যাবে না বললাম যে!

—একটু দাঁড়াও, দেখি। দাঁড়াও ওখানে।

—আহা হা! ঢং!

মুচকে হেসে সে হেলেদুলে ছোট্ট দরজা দিয়ে বাড়ী ঢুকলো। কি শ্রী! মা হওয়ার

মহিমা ওর সারাদেহে অমৃতের বসুধারা সিঞ্চন করেচে।

ফণি চক্কত্তি বললেন—বোসো বাবাজি।

সবাই মিলে বসলেন। ভবানী বাঁড়ুয্যে তামাক সেজে মামা চন্দ্র চাটুয্যের হাতে দিলেন। ফণি চক্কত্তি বললেন—বাবাজি, তোমাকে একটা কাজ করতি হবে—

—কি মামা?

—তোমাকে একবার আমার বাড়ী যেতি হবে। আমি একবার গয়া-কাশী যাবো ভাবচি। তোমার মামাও আমার সঙ্গে যাবেন। তুমি তো বাবা সব জানো ওদিকির পথ ঘাট! কোথা দিয়ে যাবো, কি করবো।

—হেঁটে যাবেন?

—নয়তো বাবা পাল্‌কি কে আমাদের জন্যি ভাড়া করে নিয়ে আসচে? হেঁটেই যাবো।

—এখান থেকে যাবেন—

—ওরকম করে বললি হবে না। ঈশ্বর বোষ্টম সেখো আমাদের সঙ্গে যাবে। সে কিছু কিছু জানে, তবে তুমি হোলে গিয়ে জাহাজ। তোমার কথা শুনলি—তুমি ওবেলা আমাদের বাড়ী গিয়ে চালছোলাভাজা খাবে। অনেকে আসবে শুনতি।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বাড়ীর মধ্যে এসে তিলুকে বললেন—ওগো ভূতের মুখে রামনাম!

—কি গা?

—ফণি চক্কত্তি আর মামা চন্দ্র চাটুয্যে নাকি যাচ্চেন গয়া-কাশী! এবার তোমার দাদা না বলে বসেন তিনিও যাবেন!

তিলুর পেছনে পেছনে নিলু বিলুও এসে দাঁড়িয়েছিলো। নিলু বললে—কেন দাদা বুঝি মানুষ না! বেশ!

—মানুষ তো বটেই। তবে আমি আর সকালবেলা গুরুনিন্দেটা করবো? আমার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা না-ই বেরুলো।

বিলু বললে—আহা রে, কি যে কথার ভঙ্গি! কবির গুরু, ঠাকুর হরু—হরু ঠাকুর এলেন। দিদি কি বলো?

তিলু চুপ করে রইল। স্বামীর সঙ্গে তার কোন বিষয়ে দুমত নেই, থাকলেও কখনো প্রকাশ করে না। গ্রামের লোকেও তিলুর স্বামীভক্তি নিয়ে বলাবলি করে। এমনটি নাকি এদেশে দেখা যায় নি। দু'একজন দুষ্ট লোকে বলে—আহা, হবে না? বলে,

কুলীনের কন্যে আমি নাগর খুঁজে ফিরি—
দেশ-দেশান্তরে তাই ঘুরে ঘুরে মরি—

কুলীন কন্যের ভাতার জুটলো বুড়োবয়সে। তার আবার ছেলে হয়েচে। ভক্তি কি অমনি আসে? যা হোত না, তাই পেয়েচে। ওদের বড় ভাগ্যি, বুড়ো ধুম্‌ড়ি বয়েসে বর জুটেচে।

শ্রোতাগণ ঘাঁটিয়ে আরও শোনবার জন্যে বলে—তবু বর তো?

—হ্যাঁ, বর বইকি। তার আর ভুল? তবে—

—কি তবে—

—বড্ড বেশি বয়েস।

—যাও যাও, কুলীনের ছেলের আবার বয়েস।

সবাই কিন্তু এখানে একমত হয় যে ভবানী বাঁড়ুয্যে সত্যই সুপাত্র এবং সৎব্যক্তি! কেউ এ গাঁয়ে ভবানী বাঁড়ুয্যের সম্বন্ধে নিন্দের কথা উচ্চারণ করে নি, যে পাড়াগাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপের মজলিসি ঘোঁটে ব্রহ্মাবিষ্ণু পর্য্যন্ত বাদ যান না, সেখানে সবার কাছে অনিন্দিত থাকা সাধারণ মানুষ পর্য্যায়ের লোকের কর্ম্ম নয়।

ভবানী বাঁড়ুয্যে সন্ধ্যের আগেই ফণি চক্কত্তির চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বসলেন। কার্ত্তিক মাস। বেলা পড়ে একদম ছায়ানিবিড় হয়ে এসেচে, ভেরেণ্ডাগাছের বেড়া, চারাবাগানের শেওড়া-আকন্দের ঝোপ। বনমরচে লতার ফুলের সুগন্ধ বৈকালের ঠাণ্ডা বাতাসে। ফণি চক্কত্তির বেড়ার পাশে তাঁরই ঝিঙে ক্ষেতে ফুল ফুটেচে সন্ধ্যেতে। শালিখের দল কিচ্‌কিচ্‌ করচে চণ্ডীমণ্ডপের সামনের উঠোনে, কার্ত্তিকশাল ধানের গাদার ওপরে।

ফণি চক্কত্তির সেকেলে চণ্ডীমণ্ডপ। একটা বাতাছুরি কাঠের খুঁটির গায়ে খোদাইকরা লেখা আছে—"শ্রীশিবসত্য চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সন ১১৭২ সালে মাধব ঘরামি ও অক্রূর ঘরামি তৈরি করিল এই চণ্ডীমণ্ডপ ইহা ঠাকুরের ঘর ইহা জানিবা"—সুতরাং চণ্ডীমণ্ডপের বয়স প্রায় একশত বছর হোতে চলেচে। অনেক দূর থেকে লোকে এই চণ্ডীমণ্ডপ দেখতে আসে। খড়ের চালের ছাঁচ ও পাট, রলা ও সলা বাখারির কাজ, ছাঁচপড়নের বাঁশের কাজ, মটকায় দুই লড়ায়ে পায়রার খড়ের তৈরী ছবি দেখে লোকে তারিফ করে। এমন কাজ এখন নাকি প্রায় লুপ্ত হতে বসেচে এদেশে।

দীনু ভট্‌চাজ বললেন—আরে এখন হয়েচে সব ফাঁকি। সাহেবসুবোরা বাংলা করেচে নীলকুঠিতে, তাই দেখি সবাই ভাবে অমনডা করবো। এখন যে খড়ের ঘরের রেওয়াজ উঠেই যাচ্চে। তেমন পাকা ঘরামিই বা আজকাল কই?

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—সেদিন রাজারামের এক ভাইপো বলেচে সায়েবদের দেশে নাকি কলের গাড়ী উঠেচে। কলে চলে। কাগজে ছাপা করা ছবি নাকি সে দেখে এসেচে।

দীনু বললেন—কলে চলে বাবাজি?

—তাই তো শোনলাম। কালে কালে কতই দেখবো। আবার শুনেচ খুড়ো, মেটে তেল বলে একরকম তেল উঠেচে, পিদিমে জ্বলে। দেখে এসেচে সে কলকেতায়।

—বাদ ছাও। বলে কলির কেতা, কলকেতা। আমাদের সর্ষে তেলই ভালো, রেড়ির তেলই ভালো, মেটে তেল, কাঠের তেলে আর দরকার নেই বাবাজি। হ্যাঁ বলো, ভবানী বাবাজি, একটু রাস্তাঘাটের খবর ছাও দিনি। বলো একটু। তুমি তো অনেক দেশ বেড়িয়েচ। পাহাড়গুলো কিরকম দেখতি বাবাজি?

রূপচাঁদ মুখুয্যে দীনুর হাত থেকে হুঁকো নিতে নিতে বললেন—থাক, পাহাড়ের কথা

এখন থাক। পাহাড় আবার কি রকম? মাটির ঢিবির মত আবার কি? দেবনগরের গড়ের মাটির ঢিবি ভাখো নি? ওই রকম। হয়তো একটু বড়।

ভবানী বললেন—দাদামশাই, পাহাড় দেখেচেন কোথায়?

—দেখি নি তবে শুনিচি।

—ঠিক।

ভবানী এতগুলি বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির সামনে তামাক খাবেন না, তাই হুঁকো নিয়ে আড়ালে চলে গেলেন। ফিরে এসে বললেন—কোথায় আপনারা যেতে চান?

ফণি চক্কত্তি বললেন—আমরা কিছুই জানিনে। ঈশ্বর বোষ্টম সেথোগিরি করে সে নিয়ে যাবে বলেচে। সে আসুক, বোসো। তাকে ডাকতি লোক গিয়েচে।

ফণি চক্কত্তির বড় মেয়ে বিনোদ এই সময়ে চালছোলাভাজা তেল নুন মেখে বাটিতে করে প্রত্যেককে দিয়ে গেল। তারপর নিয়ে এলো প্রত্যেকের জন্যে এক ঘটি করে জল। এঁর বাড়ীতে সন্ধ্যের মজলিসে চালছোলাভাজার বাঁধা ব্যবস্থা। দা-কাটা তামাক অবারিত, রোজ দেড়সের আন্দাজ তামাক পোড়ে। ফণি চক্কত্তির চণ্ডীমণ্ডপের সান্ধ্য আতিথেয়তা এ গাঁয়ে বিখ্যাত।

ঈশ্বর বোষ্টম এসে পৌঁছুলো। ভবানী তাকে বললেন—কোন পথ দিয়ে এঁদের নিয়ে যাবে গয়া কাশী?

ঈশ্বর গড় হয়ে প্রণাম করে বললেন—আজ্ঞে তা যদিস্যাৎ জিগ্যেস করলেন, তবে ব'লি, বর্দ্ধমান ইস্তক বেশ যাবো। তারপর রাস্তা ধরে সোজা এজ্ঞে গয়া।

—বেশ। কি রাস্তা?

—এজ্ঞে ইংরেজি কথায় বলে গ্যাং ট্যাং রাস্তা। আমরা বলি অহিল্যেবাইয়ের রাস্তা।

—কতদিন ধরে সেথো-গিরি করচো?

—তা বিশ বছর। একা তো যাইনে, সেথোর দল আছে, বর্দ্ধমান থেকে যায়, চাকদহ থেকে, উলো থেকে যায়। এক আছে ধীরচাঁদ বৈরিগী, বাড়ী হুগলী। এক আছে কুমুদিনী জেলে, বাড়ী হাজরাপাড়া, ঐ হুগলী জেলা।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—কুমুদিনী জেলে, মেয়েমানুষ?

—এজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি মেয়েমানুষ হলি কি হবে, কত পুরুষকে যে জব্দ করেচেন তা আর কি বলবো। রূপও তেমনি, জগদ্ধাত্রী পিরতিমে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—ও ঠিকই বলচে। বর্দ্ধমান দিয়ে গিয়ে ওখানে শের শা'র বড় রাস্তা পাওয়া যায়। অহল্যাবাই-টাই বাজে, ওটা নবাব শের শা'র রাস্তা।

—কোথাকার নবাব?

—মুরশিদাবাদের নবাব। সিরাজদ্দৌলার বাবা।

দীনু ভট্চাজ বললেন—হাঁ বাবাজি, এখনো নাকি সায়েব কোম্পানী মুরশিদাবাদের নবাবকে খাজনা দেয়?

ভবানী বললেন—তা হবে। ওসব আমি তত খোঁজ রাখিনে। আজ দুজন সন্নিসির কথা বলবো আপনাদের, শুনে বড় খুশি হবেন।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—তাই বলো বাবাজি। ওসব নবাব-টবাবের কথায় দরকার নেই। আমরা তো কুয়োর মধ্যি যেমন ব্যাঙ আছে, তেমনি আছি পড়ে। পয়সা নেই যে বিদেশে যাবো। বাবাজি ভয়ও পাই। কোথাও চিনি নে, গাঁ থেকে বেরুলি সব বিদেশ বেভূঁই। চাকদা পজ্জন্ত গিইচি গঙ্গাস্নানের মেলায়—আর ওদিকি গিইচি নদে-শান্তিপুর। ইছামতী দিয়ে নৌকা বেয়ে রাসের মেলায় নারকোল বিক্রি করতে গিইছিলাম বাবাজি। বেশ দু'পয়সা লাভ করেছিলাম সেবার।

সবাই ভবানীকে ঘিরে বসলেন। দীনু ভট্চাজ এগিয়ে এসে একেবারে সামনে বসলেন।

ভবানী বললেন—আপনারা জানেন কিছুদিন আগে আমার একজন গুরুভাই এসেছিলেন। ওঁর আশ্রম হোল মীর্জ্জাপুর।

দীনু ভট্চাজ বললেন—সে কোথায় বাবাজি?

—পশ্চিমে, অনেকদূর। সে আপনারা বুঝতে পারবেন না। চমৎকার পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সেখানে এক সাধু থাকেন, আমাদের বাঙালী সাধু, তাঁর নাম হৃষিকেশ পরমহংস। ছোট্ট একখানা ঝুপড়িতে দিনরাত কাটান। নির্জ্জন বনে শিরীষ ফুল আর কাঞ্চন ফুল ফোটে, ময়ূর বেড়ায় পাহাড়ী ঝর্ণার ধারে, আমলকী গাছে আমলকী পাকে—

রূপচাঁদ মুখুয্যে আবেগভরে বললেন—বাঃ বাঃ—আমরা কখনো দেখিনি এমন জায়গা—

দীনু ভট্চাজ বললেন—পাহাড় কাকে বলে তাই ছাখলাম না জীবনে বাবাজি। তার আবার ঝর্ণা!

চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—পড়ে আছি গু-গোবরের গর্ত্তে, আর দেখিচি কিছু, তুমিও যেমন! বয়েস পঁয়ষট্টির কাছে গিয়ে পৌঁছুলো। তুমি সেখানে গিয়েচ বাবাজি?

ভবানী বললেন—আমি পরমহংস মহারাজের কাছে ছ'মাস ছিলাম। তিনিই আমার গুরু। তবে মন্ত্র-দীক্ষা আমি নিই নি, তিনি মন্ত্র ছান না কাউকে।

—মহারাজ কোথাকার?

—তা নয়। ওঁদের মহারাজ বলে ডাকা বিধি।

—ও। সেখানে জঙ্গলে খেতে কি?

—আমলকী, বেল, বুনো আম। আর এত আতার জঙ্গল পাহাড়ে! দু'ঝুড়ি দশ ঝুড়ি পাকা আতা জঙ্গলের মধ্যে গাছের তলায় রোজ শেয়ালে খেতো। সুমিষ্ট আতা। তেমন এখানে চক্ষেও দেখেন নি আপনারা।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—তাই বলো বাবাজি, ঈশ্বর বোষ্টমকে সেই হদিস্টা ছাও দিকি। খুব করে আতা খেয়ে আসি—

চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—আরে দূর কর আতা! ওই সব সাধু সন্নিসির দর্শন পেলে তো

ইহজন্ম সার্থক হয়ে গেল। বয়েস হয়েচে আর আতা খেলি কি হবে ভায়া? তারপর বাবাজি—?

—তারপর সেখানে কাটালুম ছ'মাস। সেখান থেকে গেলাম বিঠুর। বাল্মীকি আশ্রমে।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—বাল্মীকি মনি? যিনি মহাভারত লিখেছিলেন?

দীনু ভট্‌চায বললেন—তবে তুমি সব জানো! বাল্মীকি মনি মহাভারত লিখতি যাবেন কেন? লিখেছিলেন রামায়ণ।

—ঠিক। তারপর সে আশ্রমেও এক সাধুর সঙ্গে কিছুদিন কাটালাম।

রূপচাঁদ বললেন—সেখানে যাবার হদিস্‌টা ছাও বাবাজি।

—সে গৃহীলোকের দ্বারা হবে না। বিশেষ করে ঈশ্বর বোষ্টমের সঙ্গে গেলে হবে না। ও আর কতদূর আপনাদের নিয়ে যাবে? বর্দ্ধমান গিয়ে বড় রাস্তা ধরে আপনারা চলে যান গয়া, সেখান থেকে কাশী। কাশী থেকে যাবেন প্রয়াগ।

ভরদ্বাজ মুনি বসহিঁ প্রয়াগা
যিন্‌হি রামপদ অতি অনুরাগা

প্রয়াগে সাবেক কালে ভরদ্বাজমুনির আশ্রম ছিল। কুম্ভমেলার সময় সেখানে অনেক সাধু-সন্নিসি আসেন। আম গত কুম্ভমেলার সময় ছিলাম। কিন্তু যাওয়া বড কষ্ট। হেঁটে যেতে হবে আপনাদের এতটা পথ! শের শা' নবাবের রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে সরাইখানা আছে, সেখানে যাত্রীরা থাকে, রেঁধে বেড়ে খায়।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—চালডাল?

—সব পাবেন সরাইতে। দোকান আছে। তবে দল বেঁধে যাওয়াই ভালো। পথে বিপদ আছে।

—কিসের বিপদ?

—সব রকম বিপদ। চোর ডাকাত আছে, ঠগী আছে। বর্দ্ধমান ছাডিয়ে গয়া পর্য্যন্ত সারা পথে দারুণ বন পাহাড়। বড় বড বাঘ, ভাল্লুক এ সব আছে।

—ও বাবা!

ঈশ্বর বোষ্টম বললে—উনি ঠিকই বলেচেন। সেবার খাব্‌রাপোতা থেকে একজন যাত্রী গিয়েছিল গয়ায় যাবে বলে। ওদিকের এক জায়গায় সন্দে বেলা তিনি বললেন, হাতমুখ ধুতি যাবো। আমার কথা শোন্‌লেন না। আমরা এক গাছতলায় চব্বিশজন আছি। তিনি মাঠের দিকে পলাশ-গাছের ঝোপের আড়ালে ঘটি নিয়ে চললেন। বাস! আর ফিরলেন না। বাঘে নিয়ে গেল!

সবাই একসঙ্গে বলে উঠ্‌লেন—বলো কি!

—হ্যাঁ। সে রাত্তিরি কি মুশকিল। কান্নাকাটি পড়ে গেল। সকালে কত খুঁজে তেনার রক্তমাখা কাপড় পাওয়া গেল মাঠির মধ্যি। তাঁরে টান্‌তি টান্‌তি নিয়ে গিইছিল,

তার দাগ পাওয়া গেল।

রূপচাঁদ বললেন—সর্ব্বনাশ!

এমন সময় দেখা গেল নালু পাল এদিকে আসচে। নালু পালকে একটা খেজুর পাতার চাটাই দেওয়া গেল বসতে, কারণ সে আজকাল বড় দোকান করেচে, ব্যবসাতে উন্নতি করেচে, বিয়ে-থাওয়া করেচে সম্প্রতি। তার দোকান থেকে ধারে তেলনুন এঁদের মধ্যে অনেককেই আনতে হয়। তাকে খাতির না করে উপায় নেই।

দীনু বললেন—এসো নালু, বোসো, কি মনে করে?

নালু গড় হয়ে সবাইকে একসঙ্গে প্রণাম করে জোড় হাতে বললে—আমার একটা আব্‌দার আছে, আপনাদের রাখতি হবে। আপনারা নাকি তীথি যাচ্ছেন শোনলাম। একদিন আমি ব্রাহ্মণ-তীথিযাত্রী ভোজন করাবো। আমার বড় সাধ। এখন আপনারা অনুমতি দিন আমি জিনিস পাঠিয়ে দেবো চক্কত্তি মহাশয়ের বাড়ী। কি কি পাঠাবো হুকুম করেন।

চন্দ্র চাটুয্যে আর ফণি চক্কত্তি গাঁয়ের মাতব্বর। তাঁদের নির্দ্দেশের ওপর আর কারো কথা বলবার জো নেই এই গ্রামে—এক অবিশ্যি রাজারাম রায় ছাড়া। তাঁকে নীলকুঠির দেওয়ান বলে সবাই ভয় করলেও সামাজিক ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব নেই। তিনিও কাউকে বড় একটা মেনে চলেন না, অনেক সময় যা খুশি করেন। সমাজপতিরা ভয়ে চুপ করে থাকেন।

চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—কি ফলার করাবে?

নালু হাতজোড় করে বললে,—আজ্ঞে, যা হুকুম।

—আধ মণ সরু চিঁড়ে, দই, খাঁড়গুড়, ফেণী বাতাসা, কলা, আখ, মঠ আর—

ফণি চক্কত্তি বললেন—মুড়কি।

—মুড়কি কত?

—দশ সের।

—মঠ কত।

—আড়াই সের দিও। কেষ্ট ময়রা ভালো মঠ তৈরী করে, ওকে আমাদের নাম করে বোলো। শক্ত দেখে কড়াপাকের মঠ করে দিলে ফলারের সঙ্গে ভালো লাগবে।

চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—দক্ষিণে কত দেবে ঠিক কর।

—আপনারা কি বলেন?

—তুমি বল ফণি ভায়া। সবই তো আমি বললাম, এখন তুমি কিছু বলো।

ফণি চক্কত্তি বললেন—একসিকি করে দিও আর কি।

নালু বললে—বড্ড বেশি হচ্চে কর্ত্তা। মরে যাবো। বিশজন ব্রাহ্মণকে বিশ সিকি দিতি হলি—

—মরবে না। আমাদের আশীর্ব্বাদে তোমার ভালোই হবে। একটি ছেলেও হয়েচে না?

—আজ্ঞে সে আমার ছেলে নয়, আপনারই ছেলে।

চন্দ্র চাটুয্যে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাসলেন। নালু পাল শেষে একটি দুয়ানি দক্ষিণেতে রাজী করিয়ে বাইরে চলে গেল। বোধ হয় তামাক খেতে।

এইবার চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—হ্যাঁ ভায়া, নালু কি বলে গেল?

—কি?

—তোমার স্বভাব-চরিত্তির এতদিন যাই থাক, আজকাল বুড়ো বয়েসে ভালো হয়েচে বলে ভাবতাম। নালুর বৌয়ের সঙ্গে ভাবসাব কতদিনের?

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। রাগে ফণি চক্কত্তি জোরে জোরে তামাক টানতে টানতে বললেন—ওই তো চন্দর দা, এখনো মনের সন্দ গেল না—

চন্দ্র চাটুয্যে কিছুক্ষণ পরে ভবানীকে বললেন—বাবা, নালু পালের ফলার কবে হবে তুমি দিন ঠিক করে দাও।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—নালু পালের ফলারের কথায় মনে পড়লো মামা একটা কথা। ঝাঁসির কাছে ভরসুৎ বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে অম্বিকাদেবীর মন্দিরে কার্ত্তিক মাসে মেলা হয় খুব বড়। সেখানে আছি, ভিক্ষে করে খাই। কাছে এক রাজার ছেলে থাকেন, সাধুসন্নিসির বড় ভক্ত। আমাকে বললেন—কি করে খান? আমি বললাম, ভিক্ষে করি। তিনি সেদিন থেকে দুজনের উপযুক্ত ভাত, রুটি তরকারী, দই, পায়েস, লাড্ডু পাঠিয়ে দিতেন। যখন খুব ভাব হয়ে গেল তখন একদিন তিনি তাঁর জীবনের কাহিনী বললেন আমার কাছে। জয়পুরের কাছে উরিয়ানা বলে রাজ্য আছে, তিনি তার বড় রাজকুমার। তাঁর বাপের আরও অনেক বিয়ে, অনেক ছেলেপিলে। মিতাক্ষরা মতে বড় ছেলেই রাজ্যের রাজা হবে বুড়ো রাজার পরে। তাই জেনে ছে. নী সৎ ছেলেকে বিষ দেয় খাবারের সঙ্গে।

দীনু ভট্চাজ বলে উঠলেন—এ যে রামায়ণ বাবাজি!

—তাই। অর্থ আর যশমান বড় খারাপ জিনিস মামা। সেই জন্যেই ও সব ছেড়ে দিয়েছিলাম। তারপর শুনুন, এমন চক্রান্ত আরম্ভ হোলো রাজবাড়ীতে যে সেখানে থাকা আর চললো না। তিনি তাঁর স্ত্রী পুত্র নিয়ে ভরসুৎ গ্রামে একটা ছোট্ট বাড়ীতে থাকেন, নিজের পরিচয় দিতেন না কাউকে। আমার কাছে বলতেন, রাজা হোতে তিনি আর চান না। রাজারাজড়ার কাণ্ড দেখে তাঁর ঘেন্না হয়ে গিয়েচে রাজপদের ওপর।

ফণি চক্কত্তি বললেন—তখনো তিনি রাজা হন নি কেন?

—বুড়ো রাজা তখনো বেঁচে। তাঁর বয়েস প্রায় আশি। এই ছেলেই আমার সমবয়সী। আহা, অনেক দিন পরে আবার সেকথা মনে পড়লো। অম্বিকা দেবীর মন্দিরে পূবদিকের পাথর-বাঁধানো চাতালে বসে জ্যোৎস্নারাত্রে দুজনে বসে গল্প করতাম, সে সব কি দিনই গিয়েচে! সামনে মস্ত বড় পুকুর, পুকুরের ওপারে রামজীর মন্দির। কি সুন্দর জায়গাটি ছিল। তাঁর ছোট সৎমা বিষ দিয়েছিল খাবারের সঙ্গে, কেবল এক বিশ্বস্ত চাকর জানতে পেরে তাঁকে খেতে বারণ করে। তিনি খাওয়ার ভান করে বলেন যে তাঁর শরীর কেমন করচে, মাথা ঝিম্ঝিম্ করচে, এই বলে নিজের ঘরে শুয়ে পড়েন গিয়ে। ছোট সৎমা শুনে হেসেছিল,

তাও তিনি শুনেছিলেন সেই বিশ্বস্ত চাকরের মুখে। সেই রাত্রেই তিনি রাজবাড়ী থেকে পালিয়ে আসেন, কারণ, শুনলেন ভীষণ ষড়যন্ত্র চলেচে ভেতরে ভেতরে। ছোট রাণীর দল তাঁকে মারবেই। বুড়ো রাজা অকর্ম্মণ্য, ছোটরাণীর হাতে খেলার পুতুল।

দীনু ভট্‌চাজ বললেন—না পালালি, মধা এডাবি ক'ঘা—অমন সৎমা সব করতি পারে। বাবাঃ, শুনেও গা কেমন করে।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—তারপর?

—তারপর আর কি। আমি সেখানে দু'মাস ছিলাম। এই দু'মাসের প্রত্যেক দিন দুটি বেলা অম্বিকা-মন্দিরের ধর্ম্মশালায় আমার জন্যে খাবার পাঠাতেন। কত জ্ঞানের কথা বলতেন, দুঃখু করতেন যে রাজার ছেলে না হয়ে গরীবের ঘরে জন্মালে শান্তি পেতেন। আমার সঙ্গে বেদান্ত আলোচনা করতেন। তাঁর স্ত্রীকেও আমি দেখেছি, অম্বিকা মন্দিরে পুজো দিতে আসতেন, রাজপুত মেয়ে, খুব লম্বা আর জোয়ান চেহারা, নাকে মস্ত বড় ফাঁদি নথ। একদিন দেখি ফরসি টেনে তামাক খাচ্চেন—

রূপচাঁদ মুখুয্যে অবাক হয়ে বললে—মেয়েমানুষে?

—ওদেশে খায়, রেওয়াজ আছে। বড় সুন্দর চেহারা, যেন জোরালো দুর্গা প্রতিমা, অসুর মারলেই হয়। আমি ভাবতাম, না-জানি এঁর সেই সৎশাশুড়ীটি কেমন, যিনি এঁকেও জব্দ করে রেখেচেন। মাস দুই পরে আমি ওখান থেকে বিঠুর চলে এলাম, কানপুরের কাছে। ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈকে একদিন দেখেছিলাম অম্বিকা মন্দিরে পুজো করতে। তারপর শুনেছিলাম ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে ঝাঁসির রাণী মারা পড়েচেন—পরমা সুন্দরী ছিলেন—তবে ও দেশের মেয়ে, জোয়ান চেহারা—

—বল কি বাবাজি, এ যে সব অদ্ভুত কথা শোনালে। মেয়েমানুষে যুদ্ধ করলে কোম্পানীর সঙ্গে! ওসব কথা কখনো শুনি নি—কোন্ দেশের কথা এ সব?

—শুনবেন কি মামা, গাঁ ছেড়ে কখনো কোথাও বেরুলেন না তো। কিছু দেখলেনও না। এবার যদি যান—।

এই সময় নালু পাল আবার ব্যস্ত হয়ে এসে ঢুকল। সে বাড়ী চলে যাবে, হাটবার তার অনেক কাজ বাকি। দিনটা ধার্য্য করে দিলে সে চলে যেতে পারে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—সামনের পূর্ণিমার রাত্রে দিন ধার্য্য রইল। কি বলেন মামা? সেদিন কারো অসুবিধে হবে?

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—আমার বাতের ব্যামো। পুন্নিমেতে আমি লক্ষ্মীর দিব্যি খাবো না, তাতে কোনো ক্ষতি নেই, ফল, দুধ, মঠ, এসব খাবো। ওই দিনই রইল ধার্য্য।

ঈশ্বর বোষ্টম এতক্ষণ চুপ করে ভবানীর গল্প শুনছিল, কোনো কথা বলে নি। এইবার সে বলে উঠলো—আপনারা যে কোথাকার রাণীর কথা বললেন, লড়াই করেলেন কাদের সঙ্গে। ও কথা শুনে আমার কেবলই মনে পড়চে কুমুদিনী জেলের কথা।

দীনু ভট্টচাজ বললেন—বোসো! কিসি আর কিসি! কোথায় সেই কোথাকার রাণী

লক্ষ্মীবাঈ আর কোথায় কুমুদিনী জেলে! কেডা সে?

ঈশ্বর বোষ্টম একেবারে উত্তেজনার মুখে উঠে দাঁড়িয়েচে। দু'হাত নেড়ে বললে—আজ্ঞে ও কথা বলবেন না খুড়ো ঠাকুর। আপনি সেখো কুমুদিনী জেলেকে জানেন না, ছাখেন নি, তাই বলচেন। তারে যদি ছাখতেন, তবে আপনারে বল্‌তি হোত, হ্যাঁ, এ একখানা মেয়ে-ছেলে বটে! এই দশাসই চেহারা, দেখতিও দশভুজো পিরতিমের মত। তেমনি, সাহস আর বুদ্ধি। একবার আমাদের মধ্যি তুজনের ভেদবমির ব্যারাম হোল গয়া যাবার পথে, নিজের হাতে তাদের কি সেবাটা করতি ছাখলাম! মায়ের মত। একবার গয়ালি পাণ্ডার সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করলেন, যাত্রীদের ট্যাকা মোচড় দিয়ে আদায় করা নিয়ে। সে কি চেহারা? বললে, তুমি জানো, আমার নাম কুমুদিনী, আমি ফি বচ্ছর দু'শো যাত্রী গয়ায় নিয়ে আসি। গোলমাল করবা, তো এই সব যাত্রী আমি অন্য গয়ালি পাণ্ডার কাছে নিয়ে যাবো। পাণ্ডা ভয়ে চুপ। আর কথাটি নেই। সেখোদের মান না রাখলি যাত্রী হাত-ছাড়া হয়—বোঝলেন না? অমন মেয়েমানুষ আমি দেখিনি। কেউ কাছে ঘেঁষে একটা ফাষ্টিনাষ্টি করুক দেখি? বাব্বাঃ, কারু সাধ্যি আছে। নিজের মান রাখতি কি করে হয়, তা সে জানে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—একবার নিয়ে এসো না এখানে। দেখি।

ভবানীর কথায় সবাই সায় দিয়ে বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ আনো না। তোমার তো জানা-শুনো! আমরা দেখি একবার—

ঈশ্বর বোষ্টম চুপ করে রইল। দীনু ভট্‌চাজ বললেন—কি? পারবে না?

ঈশ্বর বললে—আজ্ঞে, তাঁর মান বেশি। সেখোদের তিন মোড়ল। আমার কথায় তিনি এখানে আসবেন না। বাড়ীও অনেক দূর, সেই হুগলী জেলায়। গাঁ জানিনে, আমরা সব একেত্তরে হই ফি কাত্তিক মাসে বর্দ্ধমান শহরে কেবল চক্কত্তির সরাইয়ে। আপনারা যদি তীথি যান, তবে তো তেনার সঙ্গে দেখা হবেই। চললাম এখন তাহ'লি।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—এখানে জঙ্গলের মধ্যে এক যে সেই সন্নিসিনী আছে, খেপী বলে তাকে, আপনারা কেউ গিয়েচেন? গিয়ে দেখবেন, ভালো লাগবে আপনাদের।

ফণি চক্কত্তি বললেন—ও সব জায়গায় ব্রাহ্মণের গেলে মান থাকে না। শুনচি সে মাগী নাকি জাতে বুনো। তুমিও বাবাজি সেখানে আর যেও না।

—মাপ করবেন মামা। ওখানে আপনাদের মান আমি রাখতে পারবো না। ভগবানের নাম করলে সব সমান, বুনো আর ব্রাহ্মণ কি মামা?

ফণি চক্কত্তি আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—বুনো আর ব্রাহ্মণ সমান।

সবাই অবাক চোখে ভবানীর দিকে চেয়ে রইল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—এই দুঃখেই তো রাজা না হয়ে ফকির হয়ে রইলাম বাবা!

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো তাঁর কথায়।

ফণি চক্কত্তি বললেন—দাদার আমার কেবল রগড় আর রগড়। তারপর, আসল কথার ঠিকঠাক হোক। কে কে যাচ্চ, কবে যাচ্চ। নালু পাল কবে খাওয়াবে ঠিক কর।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—তুমি আর চন্দ্র ভায়া তো নিশ্চয় যাচ্চ?

—একেবারে।

—আর কে কে যাবে ঈশ্বর?

ঈশ্বর বোষ্টম বললে—জেলে পাড়ার মধ্যি যাবে ভগীরথ জেলের বড় বৌ, পাগলা জেলের মা, আমাদের পাড়ার নরহরির বৌ, ব্রাহ্মণ পাড়ায় আপনারা দুজন—হামিদপুর থেকে সাতজন—সব আমার খদ্দের। পুন্নিমের পরের দিন রওনা হওয়া যাবে। আমাকে আবার বর্দ্ধমানে বীরচাঁদ বৈরিগী আর কুমুদিনী জেলের দলের সঙ্গে মিশতে হবে কার্ত্তিক পূজোর দিন। রাণীগঞ্জে এক সরাই আছে, সেখানে দু'দিন থেকে জিরিয়ে নিয়ে তবে আবার রওনা। রাণীগঞ্জের সরাইতে দু'তিন দল আমাদের সঙ্গে মিলবে। সব বলা-কওয়া থাকে।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—আমি বড় ছেলেডারে বলে দেখি, সে আবার কি বলে। আমার আর সে জুৎ নেই ভায়া। ভবানীর মুখে শুনে বড্ড ইচ্ছে করে ছুটে চলে যাই সেই সন্নিসি ঠাকুরের আশ্রমে। ওই সব ফুল ফোটা, আমলকী গাছে আমলকী ফল, ময়ুর চরচে—বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। কখনো কিছু দ্যাখলাম না বাবাজি জীবনে।

ঈশ্বর বোষ্টম বললে—যাবেন মুখুয্যে মশায়। আমার জানাশুনা আছে সব জায়গায়, কিছু কম করে নেবে পাণ্ডারা।

চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—তাই চলো ভায়া। আমরা পাঁচজন আছি, এক রকম করে হয়ে যাবে, আটকাবে না।

ধার্ম্মিক নালু পালের তীর্থযাত্রীসেবার দিন চন্দ্র চাটুয্যের বাড়ীতে খাটি তীর্থযাত্রী ছাড়া আরও লোক দেখা গেল যারা তীর্থযাত্রী নয়—যেমন ভবানী বাঁড়ুয্যে, দেওয়ান রাজারাম ও নীলমণি সমাদ্দার। শেষের লোকটি ব্রাহ্মণও নয়। খোকাকে নিয়ে তিলু এসেছিল ভোজে সাহায্য করতে। ভবানী নিজের হাতে পাতা কেটে এনে ধুয়ে ভেতরের বাড়ীর রোয়াকে পাতা পেতে দিলেন, তিলু সাত আট কাটা সরু বেনামুড়ি ধানের চিঁড়ে ধুয়ে একটা বড় গামলায় রেখে দিয়ে মুড়কি বাছতে বসলো। পৃথক একটা বারকোশে মঠ ও ফেনি বাতাসা স্তুপাকার করা রয়েচে, পাঁচ-ছ পাতলে-হাঁড়িতে দই বারকোসের পাশে বসানো। রূপচাঁদ মুখুয্যে একগাল হেসে বললেন—নাঃ, নালু পাল যোগাড় করেচে ভালো—মনটা ভাল ছোকরার—

তিলু এ গ্রামের মেয়ে। ব্রাহ্মণেরা খেতে বসলে সে চিঁড়ে মুড়কি মঠ যার যা লাগে পরিবেশন করতে লাগলো।

চন্দ্র চাটুয্যে নিজে খেতে বসেন নি, কারণ তাঁর বাড়ীতে খাওয়াদাওয়া হচ্চে, তিনি গৃহস্বামী, সবার পরে খাবেন। আর খান নি ভবানী বাঁড়ুয্যে। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে এমন সুন্দরভাবে ওরা পরিবেশন করলে যে সকলেই সমানভাবে সব জিনিস খেতে পেলে—নয়তো

এ সব ক্ষেত্রে পাড়াগাঁয়ে সাধারণতঃ যার বাড়ী, তার নিভৃত কোণের হাঁড়ি কলসীর মধ্যে অর্দ্ধেক ভালো জিনিস গিয়ে ঢোকে সকলের অলক্ষিতে।

ফণি চক্কত্তি বললেন—বেশ মঠ করেচে কড়াপাকের। কেষ্ট ময়রা কারিগর ভালো—

—ওহে ভবানী আর দু'খানা মঠ এ পাতে দিও—

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—তবে ওই সঙ্গে আমাকেও একখানা—

তিলু হেসে বললে—লজ্জা করচেন কেন কাকা—আপনাকে ক'খানা দেবো বলুন না? দু'খানা না তিনখানা?

—না মা, দু'খানা দাও। বেশ খেতে হয়েচে—এর কাছে আর খাঁড় গুড় লাগে?

—আর একখানা?

—না মা, না মা—আঃ—আচ্ছা দাও না হয়—ছাড়বে না যখন তুমি।

রূপচাঁদ মুখুয্যে দেখলেন তিলুর সুগৌর সুপুষ্ট বাউটি ঘুরোনো হাতখানি তাঁর পাতে আরও দু'খানা কড়াপাকের কাঁচা সোনার রংয়ের মঠ ফেলে দিলে। অনেক দিন গরীব রূপচাঁদ মুখুয্যে এমন চমৎকার ফলার করেন নি, এমন মঠ দিয়ে মেখে।

এই মঠের কথা মনে ছিল রূপচাঁদ মুখুয্যের, গয়া যাবার পথে গ্যাং ট্যাং রোডের ওপর বারকাট্টা নামক অরণ্য-পর্ব্বত সঙ্কুল জায়গায় বড্ড বিপদের মধ্যে পড়ে একটা গাছের তলায় ওদের ছোট্ট দলটি আশ্রয় নিয়েছিল অন্ধকার রাত্রে—ডাকাতেরা তাঁদের চারিধার থেকে ঘিরে ফেলে সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছিল, ভাগ্যে তাঁদের বড় দলটি আগে চলে গিয়ে এক সরকারী চটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তাই রক্ষে, দলের টাকাকড়ি সব ছিল সেই বড় দলের কাছে। কেন যে সে রাত্রে অন্ধকার মাঠের আর বনপাহাড়ের নির্জ্জন, ভীষণ রূপের দিকে চেয়ে নিরীহ রূপচাঁদ মুখুয্যের মনে হঠাৎ তিলুর বাউটি-ঘোরানো হাতে মঠ পরিবেশনের ছবিটা মনে এসেছিল—তা তিনি কি করে বলবেন?

তবুও সে রাত্রে রূপচাঁদ মুখুয্যে একটা নতুন জীবন-রসের সন্ধান পেয়েছিলেন যেন। এতদিন পরে তাঁর ক্ষুদ্র গ্রাম থেকে বহুদূরে, তাঁর গত পঞ্চাশ বৎসরের জীবন থেকে বহুদূরে এসে জীবনটাকে যেন নতুন ক'রে তিনি চিনতে পারলেন।

স্ত্রী নেই—আজ বিশ বৎসরের ওপর মারা গিয়েচে। সেও যেন স্বপ্ন, এত দূর থেকে সব যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়। ইছামতীর ধারের তাঁর সেই ক্ষুদ্র গ্রামটিতে এখনি নিবারণ গয়লার বেগুনের ক্ষেতে হয়তো তাঁর ছাগলটা ঢুকে পড়েচে, ওরা তাড়া করচে লাঠি নিয়ে, তাঁর বড় ছেলে যতীন হয়তো আজ বাড়ী এসেচে, পুবের এড়ো ঘরে বৌমা ও দুই মেয়েকে নিয়ে শুয়ে আছে—বেচারী খোকা! মাত্র পাঁচ টাকা মাইনেতে সাতক্ষীরের ন' বাবুদের তরফে কাজ করে, দু'তিন মাস অন্তর একবার বাড়ী আসতে পারে, ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে মনটা কেমন করলেও চোখের দেখা দেখতে পায় না। গরীবের অদৃষ্টে এই রকমই হয়।

বড় ভালো ছেলে তাঁর।

যখন কথাবার্ত্তা সব ঠিকঠাক হোলো গয়াকাশী আসবার, তখন বড় খোকা এসে দাঁড়িয়ে

বললে—বাবা তোমার কাছে টাকাকড়ি আছে ?

—আছে কিছু।

—কত ?

—তা—ত্রিশটাকা হবে। ছোবায় পুঁতি রেখে দিয়েছিলাম সময়-অসময়ের জন্তি। ওতেই হবে খুনু।

—বাবা শোনো—ওতে হবে না—আমি তোমার—

—হবে রে হবে। আর দিতি হবে না তোরে।

জোর করে পনেরোটি টাকা বড় খোকা দিয়েছিল তাঁর উড়ুনির মুড়োতে বেঁধে। চোখে জল আসে সে কথা ভাবলে। কি সুন্দর তারাভরা আকাশ, কি চমৎকার চওড়া মুক্ত মাঠটা, এক সারি ভূতের মত অন্ধকার গাছগুলো...চোখে জল আসে খোকার সেই মুখ মনে হলে···

মনে কেমন করে ওঠে গরীব ছেলেটার জন্যে, একখানা ফরাসডাঙার ধুতি কখনো পরাতে পারেন নি ওকে···সামান্য জমানবিসের কাজে কিই বা উপার্জ্জন। বায়ুভূত, নিরালম্ব কোনো ভাসমান আত্মার মত তিনি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন অন্ধকার জগতের পথে পথে—কোথায় রলি খোকা, কোথায় রলি নাতনী ছুটি।

জ্যৈষ্ঠ মাসে আবার চন্দ্র চাটুয্যের চণ্ডীমণ্ডপে নালু পালের ব্রাহ্মণ ভোজন হচ্চে। যারা তীর্থ থেকে ফিরেচে, সেই সব মহাভাগ্যবান লোককে আজ আবার নালু পাল ফলার করাবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর।

নালু পাল গলায় কাপড় দিয়ে হাত জোড় করে দূরে দাঁড়িয়ে সব তদারক করচে। আম কাঁটাল জড়ো করা হয়েচে ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্যে।

সকলেই এসেচেন, ফণি চক্কত্তি, চন্দ্র চাটুয্যে, ঈশ্বর বোষ্টম, নীলমণি সমাদ্দার—নেই কেবল রূপচাঁদ মুখুয্যে। তিনি কাশীর পথে দেহ রেখেচেন, সে খবর ওঁরা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন কিন্তু যতীন সে চিঠি পায় নি।

নীলমণি সমাদ্দারের কাছে চন্দ্র চাটুয্যে তীর্থ ভ্রমণের গল্প করছিলেন, গ্যাং ট্যাং রোডের এক জায়গায় কি ভাবে ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন, গয়ালি পাণ্ডা কি অদ্ভুত উপায়ে তাদের খাতা থেকে তাঁর পিতামহ বিষ্ণুরাম চাটুয্যের নাম উদ্ধার করে তাঁকে শোনালে।

নীলমণি সমাদ্দার বললেন—রূপচাঁদ কাকার কথা ভাবলি বড কষ্ট হয়। পুণ্যি ছিল খুব, কাশীর পথে মারা গেলেন। কি হয়েছিল ?

চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—আমরা কিছু ধরতি পারি নি ভায়া। বিকারের ঘোরে কেবলই বলতো—খোকা কোথায় ? আমার খোকা কোথায় ? খোকা, আমি তামাক খাবো—আহা, সেদিন যতীন শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

নীলমণি বললেন—যতীন বড় পিতৃভক্ত ছেলে।

—উভয়ে উভয়কে ভালো না বাসলি ভক্তি আপনি আসে না ভায়া। রূপচাঁদ কাকাও

ছেলে বলতি অজ্ঞান। চিরডা কাল দেখে এলেচি।

নালু পাল খুব আয়োজন করেছিল, চিঁড়ে যেমন সরু, জ্যৈষ্ঠমাসে ভালো আম-কাঁটালও তেমনি প্রচুর।

ফণি চক্কত্তি ঘন আওটানো দুধের সঙ্গে মুড়কি আর আম-কাঁটালের রস মাখতে মাখতে বললেন—চন্দরদা, সেই আর এই! ভাবি নি যে আবার ফিরে আসবো। কুমুদিনী জেলের দলের সেই সাতকড়ি আমাদের আগেই বলেছিল, বর্দ্ধমান পার হবেন তো ডাকাত্তির দল পেছনে লাগবে! ঠিক হোলো কি ভাই।

—আমার কেবল মনে হচ্চে সেই পাহাড়ের তলাডা—ঝর্ণা বয়ে যাচ্চে, বড় বড় কি গাছের ছায়া। রূপচাঁদ কাকা যেখানে দেহ রাখলেন। অমনি জায়গাডা বুড়ো ভালোবাসতো। আমাকে কেবল বলে—এ যেন সেই বাল্মীকি মনির আশ্রম—

নালু পাল হাত জোড় করে বললে—আমার বড্ড ভাগ্যি, আপনারা সেবা করলেন গরীবের দুটো ক্ষুদ। আশীর্ব্বাদ করবেন, ছেলেডা হয়েচে যেন বেঁচে থাকে, বংশডা বজায় থাকে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে ফিরে এলে বিলু বললে—আপনার সোহাগের ইস্ত্রী কোথায়? এখনো ফিরলেন না যে? খোকা কেঁদে কেঁদে এইমাত্তর ঘুমিয়ে পড়লো।

—তার এখনো খাওয়া হয় নি। এই তো সবে ব্রাহ্মণভোজন শেষ হোলো—

নিলু শুয়ে ছিল বোধ হয় ঘরের মধ্যে, অপরাহ্ণ বেলা, স্বামীর গলার স্বর শুনে ধড়মড় ক'রে ঘুমের থেকে উঠে ছুটে বাইরে এসে বললে—এসো এসো নাগর, কতক্ষণ দেখি নি যে! বলি কি দিয়ে ফলার করলে? কি দিয়ে ফলার করলে?

ভবানী মুখ গম্ভীর করে বললেন—বয়েসে যত বুড়ো হচ্চো, ততই অশ্লীল বাক্যগুলো যেন মুখের আগায় খই ফুটচে। কই, তোমার দিদি তো কখনো—

বিলু বললে—না না, দিদির যে সাত খুন মাপ! দিদি কখনো খারাপ কিছু করতে পারে? দিদি যে স্বগ্গের অপ্সরী। বলি সে আমাদের দেখার দরকার নেই, আমাদের খাবার কই? চিঁড়ে মুড়কি? আমরা হচ্চি ডোম-ডোকলা, ছেঁচতলায় বসে চিঁড়ে-মুড়কি খাবো, হাত তুলি বলতি বলতি বাড়ী যাবো। সত্যি না কি?

নিলু মুখ টিপে টিপে হাসছিল। এবার সামনে এসে বললে—থাক গো, নাগরের মুখ শুকিয়ে গিয়েচে, আর বলো না দিদি। আমারই যেন কষ্ট হচ্চে। উনি আবার যা তা কথা শুনতি পারেন না। বলেন—কি একটা সংস্কৃতো কথা, আমার মুখ দিয়ে কি আর বেরোয় দিদি?

ভবানী বাঁড়ুয্যের বাড়ীতে একখানা মাত্র চারচালা ঘর আর উত্তরের পোঁতায় একখানা ছোট দু'চালা ঘর। ছোট ঘরটাতে ভবানী বাঁড়ুয্যে নিজে থাকেন এবং অবসর সময়ে শাস্ত্রপাঠ করেন বসে। তিলু এই ঘরেই থাকে তাঁর সঙ্গে, বিলু আর নিলু থাকে বড়

চারচালা ঘরটাতে। খোকা ছোট ঘরে তার মার সঙ্গে থাকে অবিশ্যি। নিলু হঠাৎ ভবানী বাঁড়ুয্যের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বড় ঘরটাতে। খোকা সেখানে শুয়ে ঘুমুচ্চে। ভবানী দেখলেন খোকা চিৎ হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে, টানা টানা চোখ দুটি নিদ্রিত নারায়ণের মত নিমীলিত। ভবানী বাঁড়ুয্যে শিশুকে ওঠাতে গেলে নিলু বলে উঠলো—ফুন্টুকে উঠিও না বলে দিচ্চি। এমন কাঁদবে, তখন সামলাবে কেডা?

ভবানী তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় উঠিয়ে বসালেন, খোকা চোখ বুজিয়েই চুপ করে বসে রইল, নড়লেও না চড়লেও না—কি সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে। কি নিষ্পাপ মুখখানা! সমগ্র জগৎ-রহস্য যেন এই শিশুর পেছনে অসীম প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে মহর্লোক থেকে নিম্নতম ভূমি পর্য্যন্ত ওর পাদস্পর্শের ও খেয়ালী লীলার জন্যে উৎসুক হয়ে আছে, তারায় তারায় সে আশা-নিরাশার বাণী জ্যোতির অক্ষরে লেখা হয়ে গেল।

নিলু বললে—ওর ঘাড় ভেঙ্গে যাবে—ঘাড় ভেঙ্গে যাবে—কি আপনি? কচি ঘাড় না?

বিলু ছুটে এসে খোকাকে আবার শুইয়ে দিলে। সে যেমন নিঃশব্দে বসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে ঘুমুতে লাগলো।

বিলু ও নিলু স্বামীর দু'দিকে দুজন বসলো। বিলু বললে—পচা গরম পড়েচে আজ, গাছের পাতাটি নড়চে না! জানেন, আমাদের দু'খানা কাঁটালই পেকে উঠেচে?

পাকা কাঁটালের গন্ধ ভুর ভুর করছিল ঘরের গুমট বাতাসে। বিলুর খুশির সুরে ভবানীর বড় স্নেহ হোল ওর ওপরে। বললেন—দুটোই পেকেচে? রসা না খাজা?

—বেলতলী আর কদমার কাঁটাল। একখানা রসা একখানা খাজা। খাবেন রাত্তিরি?

—আমি বুঝি বকাসুর। এই খেয়ে এসে আবার যা পাবো তাই খাবো?

বিলু বললে -আপনি যদি না খান, তবে আমরা খেতে পাচ্ছিনে। অমন ভালো কাঁটালটা নষ্ট হয়ে যাবে পাক ওজর হয়ে। একটাও কোষ খান।

—দিও রাত্রে।

—না, এখুনি খেতে হবে, নিলু এখনই কাঁটাল খাবার জন্যি আমারে বলেচে। ছেলেমানুষ তো, নোলা বেশি।

—ছেলেমানুষ আবার কি। ত্রিশের ওপর বয়স হতে চললো এখনো—

—থাক্, আপনার আর তত্তর শাস্তর আওড়াতে হবে না। আমাদের সব দোষ, দিদির সব গুণ।

ভবানী হেসে বললেন—আচ্ছা দাও, এক কোষ কাঁটাল খেলেই যদি তোমাদের খাওয়ার পথ খুলে যায় তো যাক্।

সন্ধ্যার পর তিলু এল ছোট ঘরখানাতে। বিলু দিয়ে গেল খোকাকে ওর মায়ের কাছে এ ঘরে। ভবানী বললেন—কেমন খেলে?

—ভালো। আপনি?

—খুব ভালো। তোমার বোনদের রাগ হয়েচে আমরা খেয়ে এলাম বলে। কিছু

আনলাম না, ওরা রাগ করতেই পারে।

—সে আমি ঠিক করে এনেচি গো, আপনারে আর বলতি হবে না। ভুটো সরু চিঁড়ে ওদের জন্যি আনি নি বুঝি মামীমার কাছ থেকে চেয়ে? ওগো, আজ আপনি ওদের ঘরে শুলে পারতেন।

—যাবো?

—যান। ওদের মনে কষ্ট হবে। একে তো খেয়ে এলাম আমরা দুজনে খোকাকে ওদের ঘাড়ে ফেলে। আবার এখন এ ঘরে যদি আপনি থাকেন, তবে কি মনে করবে ওরা? আপনি চলে যান।

—তোমার পড়া তা হোলে আর হবে না। ঈশোপনিষদ আজ শেষ করবো ভেবেছিলাম।—চোদ্দর শ্লোকটা আজ বুঝিয়ে দেবো ভেবেছিলাম—হিরন্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে—

—হে পূষন্, অর্থাৎ সূর্য্যদেব, মুখের আবরণ সরাও, যাতে আমরা সত্যকে দর্শন করতে পারি। সোনার পাত্র দিয়ে সত্যের মুখ আবৃত—তাই বলচে। বেদে সূর্য্যকে কবির জ্যোতি-স্বরূপ বলেচে। কবির স্বর্গীয় জ্যোতির স্বরূপ হচ্ছে সূর্য্যদেব।

—আমি আজ বসে বসে চোদ্দর এই শ্লোকটা পড়ি। নারদ-ভক্তিসূত্র ধরাবেন বলেছিলেন, কাল ধরাবেন। বসুন, আর একটুখানি বসুন—আপনাকে কতক্ষণ দেখি নি।

—বেশ। বসি।

—যদি আজ মরে যাই আপনি খোকাকে যত্ন কোরবেন।

—হুঁ।

—ওমা, একটা দুঃখের কথাও বললেন না, শুধু একটু হুঁ—ও আমার কি?

—তুমি আর আমি এই গাঁয়ের মাটিতে একটা বংশ তৈরী করে রেখে যাবো—আমি বেশ দেখতে পাচ্চি, এই আমাদের বাঁশবাগানের ভিটেতে পাঁচপুরুষ বাস করবে, ধানের গোলা করবে, লাঙল-খামার করবে, গরুর গোয়াল করবে।

তিলু স্বামীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বললে—আপনারে ফেলে থাকতি চায় না আমার মন। মনডার মধ্যি বড্ড কেমন করে। আপনার মন কেমন করে আমার জন্যি? অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষী তনুমাশ্রিতং, আপনি ভাবচেন আমি সামান্য মেয়েমানুষ? আপনি মূঢ় তাই এমনি ভাবচেন? কে জানেন আমি?—

ভবানী তিলুর রঙ্গভঙ্গিমাখানো সুন্দর ডাগর চোখ দুটিতে চুম্বন ক'রে ওর চুলের রাশ জোর করে মুঠো বেঁধে ধরে বললেন—তুমি হোলে দেবী, তোমাকে চিনতে আমার দেরি নেই। কি মোচার ঘণ্টই করো, কি কচুর শাকই রাঁধো—ঝালির পাক মুখে দেবার জো নেই, যেমন বর্ণ তেমনি গন্ধ, আকারোসদৃশ প্রাজ্ঞঃ—

তিলু রাগ দেখিয়ে স্বামীর কোল থেকে মাথা তুলে নিয়ে বললেন—বিশ্বাসঘাতকং ত্বং—

আমার রান্না কচুর শাক খারাপ? এ পর্য্যন্ত কেউ—

—ভুল সংস্কৃত হোল যে। কান-মলা খাও, এর নাম ব্যাকরণ পড়া হচ্চে, না? কি হবে ও কথাটা? কি বিভক্তি হবে?

—এখন আমি বলতে পাচ্চিনে। ঘুম আসচে। সারা দিনের খাটুনি গিয়েছে কেমন ধারা। অতগুলো লোকের চিঁড়ে একহাতে ঝেড়েচি, বেছেচি, ভিজিয়েচি। আম কাঁটাল ছাড়িয়েচি।

—তুমি ঘুমোও, আমি ও ঘরে যাই।

বিলু নিলু স্বামীকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। নিলু বললে—নাগর যে পথ ভুলে? কার মুখ দেখে আজ উঠিচি না জানি।

বিলু বললে—আপনাকে আজ ঘুমুতে দেবো না। সারারাত গল্প করবো। নিলু, কি বলিস?

—তার আর কথা? বলে—

কালো চোখের আভরা
কেন রে মন ভোমরা?

কাঁটাল খাবেন সে খাজা দুটো কাঁটালই পেকেচে। দিদির জন্যি পাঠিয়ে দিই। আজ কি করবেন শুনি।

নিলু বললে—দিদিকে রোজ রাত্তিরে পড়ান, আমাদের পড়ান না কেন?

—পড়াবো কি, তুমি পড়তে বসবার মেয়ে বটে। জানো, আজকাল কলকাতায় মেয়েদের পড়বার জন্যে বেথুন বলে এক সাহেব ইস্কুল করে দিয়েচে। কত মেয়ে সেখানে পড়চে।

—সত্যি?

—সত্যি না তো মিথ্যে? আমার কাছে একখানা কাগজ আছে—সর্ব্ব শুভকরী বলে। তাতে একজন বড় পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই সব লিখেচেন। মেয়েদের লেখাপড়া শেখার দরকার। শুধু কাঁটাল খেলে মানবজীবন বৃথায় চলে যাবে। না দেখলে কিছু, না বুঝলে কিছু।

বিলু বললে—কাঁটাল খাওয়া খুঁড়বেন না বলে দিচ্চি। কাঁটাল খাওয়া কি খারাপ জিনিস?

নিলু বললে—খেতেই হবে আপনাকে দশটা কোষ। কদমার কাঁটাল কখনো খান নি, খেয়েই দেখুন না কি বলচি।

—আমি যদি খাই তোমরা লেখাপড়া শিখবে? তোমার দিদি কেমন সংস্কৃত শিখেচে, কেমন বাংলা পড়তে পারে। ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতা মুখস্থ করেচে। তোমরা কেবল—

নিলু কৃত্রিম রাগের সুরে হাত তুলে বললে—চুপ! কাঁটাল খাওয়ার খোঁটা খবরদার আর দেবেন না কিন্তু—

—স্বাধ্যায় কাকে বলে জানো? রোজ কিছু কিছু শাস্ত্র পড়া। ভগবানের কথা জানবার

ইচ্ছে হয় না ? বৃথা জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে লাভ কি ? কাঁ—

—আবার !

—আচ্ছা যাক। ভগবানের কথা জানবার ইচ্ছে হয় না ?

—আমরা জানি।

—কি জানো ? ছাই জানো।

—দিদি বুঝি বেশি জানে আমাদের চেয়ে ?

—সে উপনিষদ পড়ে আমার কাছে। উপনিষদ কি তা বুঝতে পারবে না এখন। ক্রমে ক্রমে বুঝবে যদি লেখাপড়া শেখো।

—আপনি এ সব শেখলেন কোথায় ?

—বাংলা দেশে এর চর্চ্চা নেই। এখানে এসে দেখচি শুধু মঙ্গলচণ্ডীর গীত আর মনসার ভাসান আর শিবের বিয়ে—এই সব। বড্ড জোর ভাষা-রামায়ণ-মহাভারত। এ আমি জেনেছিলাম হৃষীকেশ পরমহংসজির আশ্রমে, পশ্চিমে। তাঁর আর এক শিষ্য ওই যে সেবার এসেছিলেন তোমরা দেখেচ—আমার চোখ খুলে দিয়েচেন তিনি। তিনি আমার গুরু এই জন্মেই। মন্ত্র দেন নি বটে তবে চোখ খুলে দিয়েছিলেন। আমি তখন জানতাম না, কলকাতায় রামমোহন রায় বলে একজন বড় লোক আর ভারি পণ্ডিত লোক নাকি এই উপনিষদের মত প্রচার করেছিলেন। তাঁর বইও নাকি আছে। সর্ব্ব শুভকরী কাগজে লিখেচে।

—ও সব খৃষ্টানী মত। বাপ পিতেমো যা করে গিয়েচে—

—নিলু, বাপ পিতামহ কি করেছেন তুমি তার কতটুকু জানো ? উপনিষদের ধর্ম্ম ঋষিদের তৈরি তা তুমি জানো ? আচ্ছা, এসব কথা আজ থাক। রাত হয়ে যাচ্চে।

—না বলুন না শুনি—বেশ লাগচে।

—তোমার মধ্যে বুদ্ধি আছে, তোমার দিদির চেয়েও বেশি বুদ্ধি আছে। কিন্তু তুমি একেবারে ছেলেমানুষি করে দিন কাটাচ্চ।

বিলু বললে—ওসব রাখুন। আপনি কাঁটাল খান। আমরা কাল থেকে লেখাপড়া শিখবো। দিদির সঙ্গে একসঙ্গে বসে কিন্তু বলবেন আপনি। আলাদা না।

নিলু ততক্ষণ একটা পাথরের খোরায় কাঁটাল ভেঙে স্বামীর সামনে রাখলো।

ভবানী বললেন—এতগুলো খাবো ?

নিলু মাত্র দুটি কোষ তুলে নিয়ে বললে—বাকিগুলো সব খান। কদমার কাঁটাল। কি মিষ্টি দেখুন। নাগর না খেলি আমাদের ভালো লাগে, ও নাগর ? এমন মিষ্টি কাঁটালডা আপনি খাবেন না ? খান খান, মাথার দিব্যি।

বিলু বললে—কাঁটাল খেয়ে না, একটা বিচি খেয়ে নেবেন নুন দিয়ে। আর কোনো অসুখ করবে না। ওই রে ! খোকন কেঁদে উঠলো দিদির ঘরে। দিদি বোধহয় সারাদিন খাটাখাটুনির পরে ঘুমিয়ে পড়েচে—শীগ্‌গির যা নিলু—

নিলু ছুটে ঘর থেকে বার হয়ে গেল। ঘেঁটুফুলের পাপড়ির মত সাদা জ্যোৎস্না বাইরে।

রামকানাই কবিরাজ গত একবছর গৃহহীন, আশ্রয়হীন হয়ে আছেন। সেবার তিনদিন নীলকুঠির চুনের গুদামে আবদ্ধ ছিলেন, দেওয়ান রাজারাম অনেক বুঝিয়েছিলেন, অনেক প্রলোভন দেখিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুতেই মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতে রাজী করাতে পারেন নি রামকানাইকে। শ্যামচাঁদের ফলে অচৈতন্য হয়ে পড়ে ছিলেন চুনের গুদামে। নীলকুঠির সায়েবদের ঘরে বসে কি তিনি জল খেতে পারেন? জলস্পর্শ করেন নি সুতরাং ক'দিন। মর-মর দেখে তাঁকে ভয়ে ছেড়ে দেয়। নিজের সেই ছোট্ট দোচালা ঘরটাতে ফিরে এলেন। এসে দেখেন, ঘরটা আছে বটে কিন্তু জিনিসপত্তর কিছু নেই, হাঁড়িকুঁড়ি ভেঙে চুরে তচ্‌নচ্‌ করেচে, তাঁর জড়িবুটির হাঁড়িটা কোথায় ফেলে দিয়েচে—তাতে কত কষ্টে সংগ্রহ করা সোঁদালি ফুলের গুঁড়ো, পুনর্ণবা, হলহলি শাকের পাতা, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, নালিমূলের লতা এইসব জিনিস শুক্‌নো অবস্থায় ছিল। দশ আনা পয়সা ছিল একটা নেকড়ার পুঁটুলিতে, তাও অন্তর্হিত। ঘরের মধ্যে যেন মত্ত হস্তী চলাফেরা করে বেড়িয়ে সব ওল্‌ট-পালট, লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গিয়েচে।

চাল ডাল কিছু একদানাও ছিল না ঘরে। বাড়ী এসে যে এক ঘটি জল খাবেন এমন উপায় ছিল না,—না কলসী, না ঘটি।

রামু সর্দ্দারের খুনের মামলা চলেছিল পাঁচ-ছ' মাস ধরে। শেষে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসে তার কি একটা মীমাংসা করে দিয়ে যান।

রামকানাই আগে দু'একটা রোগী যা পেতেন, এখন ভয়ে তাঁকে আর কেউ দেখাতো না। দেখালে দেওয়ান রাজারামের বিরাগভাজন হতে হবে। রামকানাইকে তিন-চারমাস প্রায় অনাহারে কাটাতে হয়েচে। পৌষমাসের শেষে রামকানাই অসুস্থ পড়লেন। জ্বর, বুকে ব্যথা। সেই ভাঙা দোচালায় একা বাঁশের মাচাতে পড়ে থাকেন, কেউ দেখবার নেই, নীলকুঠির ভয়ে কেউ তাঁর কাছেও ঘেঁষে না।

একদিন ফর্সা শাড়ি-পড়া মেমেদের মত হাতকাটা জামা গায়ে দেওয়া এক স্ত্রীলোককে তাঁর দীন কুটিরে ঢুকতে দেখে রামকানাই রীতিমতো আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন।

—এসো মা বোসো। তুমি ক'নে থেকে আসচো? চিনতি পারলাম না যে।

স্ত্রীলোকটি এসে তাঁকে দূর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে। বললে—আমারে চিনতি পারবেন না, আমার নাম গয়া।

রামকানাই এ নাম শুনেছিলেন, চমকে উঠে বললেন—গয়া মেম?

—হাঁ বাবাঠাকুর, ঐ নাম সবাই বলে বটে।

—কি জন্যি এসেচো মা? আমার কত ভাগ্যি।

—আপনার ওপর সায়েবদের মধ্যি ছোটসায়েব খুব রাগ করেচে। আর করেচে দেওয়ানজি। কিন্তু বড় সাহেব আপনার ওপর এ-সব অত্যাচারের কথা অনাচারের কথা

কিছুই জানে না। আপনি আছেন কেমন?

—জ্বর। বুকে ব্যথা। বড় দুর্ব্বল।

—আপনার জন্যি একটু দুধ এনেছিলাম।

—আমি তো জ্বাল দিয়ে খেতি পারবো না। উঠতি পারচি নে। দুধ তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও মা।

—না বাবাঠাকুর, আপনার নাম করে এনেলাম—ফিরিয়ে নিয়ে যাবো না। আপনি না খান, বেলগাছের তলায় ঢেলি রেখে দিয়ে যাবো। আমার কি সেই ভাগ্যি, আপনার মত ব্রাহ্মণ মোর হাতের দুধ-সেবা করবেন!

রামকানাই শঠ নন, বলেই ফেললেন—আমি মা শূদ্রের দান নিই নে।

গয়া চতুর মেয়ে, হেসে বললে—কিন্তু মেয়ের দান কেন নেবেন না বাবাঠাকুর? আর যদি আপনার মনে হ্যাচাং-প্যাচাং থাকে, মেয়ের দুধির দাম আপনি সেরে উঠে দেবেন এর পরে। তাতো তো আর দোষ নেই?

—হ্যাঁ, তা হতি পারে মা।

—বেশ। সেই কথাই রইল। দুধ আপনি সেবা করুন।

—জ্বাল দেবে কে তাই ভাবচি। আমার তো উঠবার শক্তি নেই।

গয়া মেম ভয়ে ভয়ে বললে—বাবাঠাকুর, আমি জ্বাল দিয়ে দেবো?

—তা দ্যাও। তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই মা। দাম নিলিই হোলো। তাতেও তুমি দুঃখিত হয়ো না, আমার বাপ-ঠাকুরদা কখনো দান নেন নি। আমি নিল্লি পতিত হবো বুড়োবয়সে। তবে কি জানো, খেতি হবে আমায় তোমাদের জিনিস। পাড় হয়ে পড়লাম কিনা! কে করবো বলো। কে দেবে?

—মুই দেবানি বাবাঠাকুর। কিছু ভাববেন না। আপনার মেয়ে বেঁচি থাকতি কোনো ভাবনা নেই আপনার।

বড়সাহেব শিপ্‌টন্ সেইদিনই সন্ধ্যার সময় ছোটসাহেবকে ডেকে পাঠাল।

ছোটসাহেব ঘরে ঢুকে বললেন—Good afternoon, Mr. Shipton.

—I say, good afternoon, David. Now, what about our poor Kaviraj? I hear there's something amiss with him?

—Good heavens! I know very little about him.

—It is very good of you to know little about the poor old man! My Ayah Gaya was telling me, he is down with fever and of course she did her best. She was verp nice to him. But how is it you are alone? Where is our precious Dewan?

—There. Speeding up Mark Khatians. Shall I send for him?

—No. And, after the rather unsatisfactory experience you had of his ways and things, see that he does not get a free hand in chastising and chastening people, You understand ?

—Yes Mr, Shipton.

—Well, what have you been up to all day ?

—I was checking up audit accounts and—

—That's so. Now, listen to my word. Our guns were intact but they ceased fire while you were standing idly by with your wily Dewan waiting for orders. No, David, I really think, the way you did it was ever so odd and tactless, Mend up your ways to Kaviraj. I mean it. You know, there are'nt any secrets. You see ?

—Yes, Mr. Shipton.

—Now you can retire, I am dreadfully tired. Things are coming to head. If you don't mind, I will rather dine in my room with Mrs.

—Please yourself, Mr. Shipton, Good night,

ছোটসাহেব ঘর থেকে বারান্দায় চলে যেতে শিপ্‌টন্ সাহেব তাকে ডেকে বললে— Look here David, there's a funny affair in this week's paper, Ram Gopal Ghosh that native orator who speaks like Burke, has spoken in the Calcutta Town Hall last week in support of Indians entering the Civil Service ! What the devil the government is up to I do not know, David. Why do they allow these things to go on, beyond me. Things are not looking quite as they ought to. Here's another—you know Harish Mookherjee, the downy old bird, of the Hindu Patriot ?

—Yes, I think so.

—He led a deputation the other day to our old Guv'nor against us, planters. You see ?

—Deputation ! I would have scattered their deputation with toe of my boot.

—But the old man talked to them like a benevolent blooming father. That is why I say David, things are coming to a head. Tell your precious old Dewan to curb his poop. Shall I order a tot of rum ?

—No, thank you, Mr. Shipton. Really I've got to go now.

দেওয়ান রাজারাম অনেক রাত্রে কুঠি থেকে বাড়ী এলেন। ঘোড়া থেকে নেমেই হাঁক দিলেন—ওরে!

গুরুদাস মুচি সহিস এসে লাগাম ধরলে ঘোড়ার। ঘরে ঢোকবার আগে স্ত্রীর উদ্দেশে ডেকে বললেন—গঙ্গাজল দাও, ওগো! ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলেন জগদম্বা পুজোর ঘরের দাওয়ায় বসে কি পুজো করচেন যেন। রাজারামের মনে পড়লো আজ শনিবার, স্ত্রী শনির পুজোতে ব্যস্ত আছেন। রাজারাম হাতমুখ ধুয়ে আসতেই জগদম্বা সেখান থেকে ডেকে বললেন—পুঁথি কে পড়বে?

—আমি যাচ্চি দাঁড়াও। কাপড় ছেড়ে আসচি।

দেওয়ান রাজারাম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। গরদের কাপড় পরে কুশাসনে বসে তিনি ভক্তি সহকারে শনির পাঁচালি পাঠ করলেন। শনি পুজোর উদ্দেশ্য শনির কুদৃষ্টি থেকে তিনি এবং তাঁর পরিবারবর্গ রক্ষা পাবেন, ঐশ্বর্য্য বাড়বে, পদবৃদ্ধি হবে। শনির পুঁথি শেষ করে তিনি সন্ধ্যাহ্নিক করলেন, যেমন তিনি প্রতিদিন নিষ্ঠার সঙ্গে করে থাকেন। সাহেবদের সংসর্গে থাকেন বলে এটা তাঁর আরও বিশেষ করে দরকার হয়ে থাকে—গঙ্গাজল মাথায় না দিয়ে তিনি ঘরের মধ্যে ঢোকেন না পর্য্যন্ত।

জগদম্বা তাঁর সামনে একটু শনিপুজোর সিন্নি আর একবাটি মুড়কি এনে দিলেন। খেয়ে এক ঘটি জল ও একটি পান খেয়ে তিনি বললেন—আজ কুঠিতে কি ব্যাপার হয়েচে জানো?

জগদম্বা বললেন—বেলের শরবত খাবা?

—আঃ, আগে শোনো কি বলচি। বেলের শরবত এখন রাখো।

—কি গা? কি হয়েচে?

—বড়সাহেব ছোটসাহেবকে খুব বকেচে।

—কেন?

—রামকানাই কবিরাজকে আমরা একটু কচা-পড়া পড়িয়েছিলাম। ওর দুষ্টুমি ভাঙতি আর আমারে শেখাতি হবে না। নীলকুঠির মুখ ছোট করে দিয়েচে ওই ব্যাটা সেই রামু সর্দ্দারের খুনের মামলায়। জেলার ম্যাজিস্টার ডম্বিনসন্ সাহেব যাই বড়সায়েবকে খুব মানে, তাই এ যাত্রা আমার রক্ষে। নইলে আমার জেল হয়ে যেতো। ও বাঞ্চৎকে এমন কচা-পড়া দিইছিলাম যে আর ওঁকে এ দেশে অন্ন করি খেতি হোতো না। তা নাকি বড়সাহেব বলেচে, অমন কোরো না। নীলকুঠির জোরজুলুমের কথা সরকার বাহাদুরের কানে উঠেচে। কলকাতায় কে আছে হরিশ মুখুয্যে, ওরা বড্ড লেখালেখি করচে খবরের কাগজে। খুব গোলমালের সৃষ্টি হয়েচে। এখন অমন করলি নীলকর সাহেবদের ক্ষেতি হবে। আমারে ডেকি ছোটসাহেব বললে—গয়া মেম এই সব কানে তুলেচে বড়সাহেবের। বিটি আসল শয়তান।

—কেন, গয়া মেম তোমাকে তো খুব মানে?

—বাদ দ্যাও। যার চরিত্তির নেই, তার কিছুই নেই। ওর আবার মানামানি। কিছু

যে বলবার জো নেই, নইলে রাজারাম রায়কে আর শেখাতি হবে না কাকে কি করে জব্দ করতি হয়।

—তোমাকে কি ছোটসাহেব বকেচে নাকি?

—আমারে কি বকবে? আমি না হলি নীলির চাষ বন্ধ। কুঠিতি হাওয়া খেলবে—ভোঁ ভাঁ। আমি আর প্রসন্ন চক্কত্তি আমীন না থাকলি এক কাঠা জমিতেও নীলির দাগ মারতি হবে না কারো! নবু গাজিকে কে সোজা করেছিল? রাহাতুনপুরির প্রজাদের কে জব্দ করেছিল? ছোটসাহেব বড়সাহেব কোনো সাহেবরই কর্ম্ম নয় তা বলে দেলাম তোমারে। আজ যদি এই রাজারাম রায় চোখ বোজে—তবে কালই—

জগদম্বা অপ্রসন্ন সুরে বললেন—ও আবার কি কথা? শনিবারের সন্ধেবেলা? দুর্গা দুর্গা—রাম রাম! অমন কথা বলবার নয়।

—তিলুরা এসেছিল কেউ?

—নিলু খোকাকে নিয়ে এসেছিল। খোকা আমাকে গাল টিপে টিপে কত আদর করলে। আহা, ওই চাঁদটুকু হয়েচে, বেঁচে থাক। ওদের সবারি সাধ-আহ্লাদের সামিগ্রী। একটু ছানা খেতি দেলাম। বেশ খেলে টুকটুক্ করে।

—ছানা খেতি দিওনা, পেট কামড়াবে।

কথা শেষ হবার আগেই তিলু খোকাকে নিয়ে এসে হাজির। খোকা বেশ বড় হয়ে উঠেচে। ওর বাবার বুদ্ধি পেয়েচে। রাজারামকে দু'হাত নেড়ে বললে—বড়দা—

রাজারাম খোকাকে কোলে নিয়ে বললেন—বড়দা কি মণি, মামা হই যে?

খোকা আবার বললে—বড়দা —

তার মা বললে—ঐ যে তোমাকে আমি বড়দা বলি কিনা? ও শুনে শুনে ঠিক করেচে এই লোকটাকে বড়দা বলে।

খোকা বললে—বড়দা।

রাজারাম খোকার মুখে চুমু খেয়ে বললেন—তোমার মারও বড়দা হলাম, আবার তোমারও বড়দা বাবা? ভবানী কি করচে?

তিলু বললে—উনি আর চন্দর মামা বসে গল্প করচেন, আমি কাঁটাল ভেঙ্গে দিয়ে এলাম খাবার জন্যি। নিতি এসেছিলাম একটা ঝুনো নারকোল। ওঁরা মুড়ি খেতি চাইলেন ঝুনো নারকোল দিয়ে—

—নিয়ে যা তোর বৌদিদির কাছ থেকি। একটা ছাড়া দুটো নিয়ে যা—

এই সময়ে জগদম্বা জানালার কাছে গিয়ে বললেন—ওগো, তোমারে কে বাইরে ডাকচে—

—কেডা?

—তা কি জানি। গোপাল মাইন্দার বলচে।

রাজারাম খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন বাইরে যে এসেছিল তাকে দেখে। সে হোল

বড়সাহেবের আরদালি শ্রীরাম মুচি। এমন কি গুরুতর দরকার পড়েচে যে এতরাত্রে সাহেব আরদালি পাঠিয়েচে!

—কি রে রেমো?

—কর্ত্তামশায়, দু'সায়েব একজায়গায় বসে আছে বড় বাংলায়। মদ খাচ্চে। কি একটা জরুরী খবর আছে। আমারে বললে—ঘোড়ায় চড়ে আসতি বলিস্। এখুনি যেন আসে।

—কেন জানিস?

—তা মুই বলতি পারবো না কর্ত্তামশায়? কোনো গোলমেলে ব্যাপার হবে। নইলি এত রাত্তিরি ডাকবে কেন? মোর সঙ্গে চলুন। মুই সড়কি এনিচি সঙ্গে করে। মোদের শত্তুর চারিদিকি। রাত-বেরাত একা আঁধারে বেরোবেন না।

রাজারাম হাসলেন। শ্রীরাম মুচি তাকে আজ কর্ত্তব্য শেখাচ্চে। ঘোড়ায় চড়ে তিনি একটা হাঁক মারলে দু'খানা গাঁয়ের লোক থরহরি কাঁপে। তাঁকে কে না জানে এই দশ-বিশখানা মৌজার মধ্যে। আধঘণ্টার মধ্যে রাজারাম এসে সেলাম ঠুকে সাহেবদের সামনে দাঁড়ালেন। সাহেবদের সামনে ছোট টেবিলে মদের বোতল ও গ্লাস। বড়সাহেব রূপোর আলবোলাতে তামাক টানচে—তামাকের মিঠেকড়া মৃদু সুবাস ঘরময়। ছোটসাহেব তামাক খায় না, তবে পান দোক্তা খায় মাঝে মাঝে, তাও বড়সাহেব বা তার মেমকে লুকিয়ে। বড়সাহেব ছোটসাহেবের দিকে তাকিয়ে কি বললে ইংরেজিতে। ছোটসাহেব রাজারামের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—দেওয়ান ভারি বিপদের মধ্যি পড়ে গেলাম যে! (সেটা রাজারাম অনেক পূর্ব্বেই অনুমান করেচেন)।

—কি সায়েব?

—কলকাতা থেকে এখন খবর এল, নীল চাষের জন্যি লোক নারাজ হচ্চে। গবর্ণমেণ্ট তাদের সাহায্য করচে। কলকেতায় বড় বড় লোকে খবরের কাগজ হৈ চৈ বাধিয়েচে। এখন কি করা যায় বলো। গুলকো, গুভরত্নপুর, উলুসি, সাতবেড়ে, ন'হাটা এই গাঁয়ে কত জমি নীলির দাগ মারা বলতি পারবা?

রাজারাম মনে মনে হিসাব করে বললেন—আন্দাজ সাতশো সাড়ে সাতশো বিঘে।

এই সময় বড়সাহেব বললে—কট জমিটে ডাগ আছে?

রাজারাম সসম্ভ্রমে বললেন—ওই যে বললাম সায়েব (হুজুর বলার প্রথা আদৌ প্রচলিত ছিল না)—সাতশো বিঘে হবে।

এই সময় বিবি শিপ্‌টন্ বড় বাংলার সামনে এসে নামলেন টম্‌টম্ থেকে। ভজা মুচি সহিস পেছন থেকে এসে মেমসাহেবের হাত থেকে লাগাম নিলে এবং তাঁকে টম্‌টম্ থেকে নামতে সাহায্য করলে। ঘোর অন্ধকার রাত—মেমসাহেব এতরাতে কোথায় গিয়েছিল? রাজারাম ভাবলেন কিন্তু জিজ্ঞেস করবার সাহস পেলেন না।

মেমসাহেব ওদের দিকে চেয়ে হেসে কি ইংরিজিতে বললে। ও হরি! ওটা কি! ভজামুচি একটা মরা খরগোস নামাচ্চে টম্‌টমের পা-দানি থেকে। মেমসাহেবের হাতের

ভঙ্গিতে সেটা ভজা সসম্ভ্রমে এনে সাহেবদের সামনে নামালে। মেমসাহেবের হাতে বন্দুক। অন্ধকারে মাঠে নদীর পাড়ে খরগোস শিকার করতে গিয়েছিল মেমসাহেব তাহোলে।

মেমসাহেব ওপরে উঠতেই এই দুই সাহেব উঠে দাঁড়ালো। (যতো সব!) ওদের মধ্যে খানিকক্ষণ কি বলাবলি ও হাসাহাসি হোলো। মেমসাহেব রাজারামের দিকে তাকিয়ে বললে—কেমন হইল শিকার?

বিনয়ে বিগলিত রাজারাম বললেন—আজ্ঞে, চমৎকার।

—ভালো হইয়াছে?

—খুব ভালো। কোথায় মারলেন মেমসাহেব?

—বাঁওড়ের ধারে—এই ডিকে—খড় আছে।

—খড়?

ভজা মুচি মেমসাহেবের কথার টীকা রচনা করে বলে—সবাইপুরির বিশ্বেসদের খড়ের মাঠে।

—ওঃ, অনেকদূর গিয়েছিলেন এই রাত্তিরি।

—আমার কাছে বন্দুক আছে। ভয় কি আছে? ভূটে খাইবে না।

—আজ্ঞে না, ভূত কোথা থেকি আসবে?

—নো, নো, ভজা বলিটেছিল মাটে ভূট আছে। আলো জ্বলে। যায় আসে, যায় আসে—কি নাম আছে ভজা! আলো ভূট?

ভজা উত্তর দেবার আগে রাজারাম বললেন—আজ্ঞে আমি জানি। এলে ভূত। আমি নিজে কতবার মাঠের মধ্যি এলে ভূতির সামনে পড়িচি। ওরা মানুষেরে কিছু বলে না।

বড়সাহেব এই সময় হেসে বললেন—টোমার মাথা আছে। ভূট আছে! উহা গ্যাস আছে। গ্যাস জ্বলিয়া উঠিল টো টুমি ভূট দেখিল।...(এর ·রের কথাটা হোলো মেমসায়েবের দিকে চেয়ে ইংরিজিতে। রাজারাম বুঝলেন না)·· খরগোস কেমন?

—আজ্ঞে খুব ভালো।

—টুমি খাও?

—না সায়েব, খাইনে। অনেকে খায় আমাদের মধ্যি, আমি খাইনে।

এই সময় প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী আমীন ও গিরিশ সরকার মুহুরী অনেক খাতাপত্র বয়ে নিয়ে এসে হাজির হোলো। রাজারাম ঘুঘু লোক। তিনি বুঝলেন আজ সারারাত কুঠির দপ্তরখানায় বসে কাজ করতে হবে। আমীন দাগ-মার্কার খতিয়ান এনে হাজির করচে কেন? দাগের হিসেব এত রাত্রে কি দরকার?

ছোটসাহেব কি একটা বললে ইংরিজিতে। বড়সাহেব তার একটা লম্বা জবাব দিলে হাত পা নেড়ে—খাতার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে। ছোটসাহেব ঘাড় নাড়লে।

তারপর কাজ আরম্ভ হোলো সারারাত-ব্যাপী। ছোটসাহেব, প্রসন্ন আমীন, তিনি, গিরিশ মুহুরী ও গদাধর চক্রবর্ত্তী মুহুরীতে মিলে। কাজ আর কিছুই নয়, মার্কা-খতিয়ান

বদলানো, যত বেশি জমিতে নীলের দাগ দেওয়া হয়েচে বিভিন্ন গ্রামে, তার চেয়ে অনেক কম দেখানো। জরীপের আসল খতিয়ান দৃষ্টে নকল খতিয়ান তৈরী করার নির্দ্দেশ দিলে ডেভিড্ সাহেব।

রাজারাম বললেন—সায়েব একটা দরকারী জিনিসের কি হবে?

ডেভিড্—কি জিনিস?

—প্রজাদের বুড়ো আঙুলের ছাপ? তার কি হবে? দাগ খতিয়ানে আমাদের সুবিধের জন্যে আঙুলের ছাপ নিতি হয়েছিল। এখন তারা নকল খাতায় দেবে কেন? যে সব বদমাইশ প্রজা। নবু গাজির মামলায় রাহাতুনপুর শুদ্দু আমাদের বিপক্ষে। রামু সর্দ্দারের খুনের মামলায় বাঁধালের প্রজা সব চটা। কি করতি হবে বলুন।

—বুড়ো আঙুলের ছাপ জাল করতি হবে।

—সে বড় গোলমেলে ব্যাপার হবে সায়েব। ভেবে কাজ করা ভালো।

—তুমি ভয় পেলি চলবে কেন দেওয়ান? ডব্কিন্সনের কথা মনে নেই? এক খানা আর দু'পেগ হুইস্কি।

—এক খানা নয় সায়েব, অনেক খানা। আপনি ভেবে দেখুন। ফাঁসি-তলার মাঠের সে ব্যাপার আপনার মনে আছে তো? আমরাই গিরিধারী জেলেকে ফাঁসি দিয়েছিলাম। তখনকার দিনে আর এখনকার দিনে তফাৎ অনেক। শ্রীরাম বেয়ারাকে এখন সড়কি নিয়ে রাত্রে পথ চলতি হয় সায়েব। আজই শোনলাম ওর মুখি।

ভোর পর্য্যন্ত কুঠির দপ্তরখানায় মোমবাতি জ্বেলে কাজ চললো। সবাই অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েচে ভোরবেলার দিকে। ডেভিড্ সাহেবও বিশ্রাম নেয় নি বা কাজে ফাঁকি দেয় নি। সূর্য্য উঠবার আগেই বড়সাহেব এসে হাজির হোলো। দুই সাহেবে কি কথাবার্ত্তা হোলো, বড়সাহেব রাজারামকে বললেন—মার্কা খতিয়ান বদল হইল?

—আজ্ঞে হাঁ।

—সব ঠিক আছে?

—এখনো তিন দিনির কাজ বাকি সায়েব। টিপ-সইয়ের কি করা যাবে সায়েব? অত টিপ-সই কোথায় পাওয়া যাবে দাগ খতিয়ানে আপনিই বলুন।

—করিটে হইবে।

—কি ক'রে করা যাবে আমার বুদ্ধিতে কুলুচ্চে না। শেষ কালজ্ঞ কি জেল খেটি মরবো। টিপসই জাল করবো কি করে?

—সব জাল হইল টো উহা জাল হইবে না কেন? মাঠা খাটাইতে হইবে। পয়সা খরচ করিলে সব হইয়া যাইবে। মন দিয়া কাজ করো। টোমার ও প্রসন্ন আমীনের দু'টাকা করিয়া মাহিনা বাড়িল এ মাস হইটে।

মাথা নিচু করে দুই হাত জুড়ে নমস্কার করে বললেন রাজারাম—আপনার খেয়েই তো মানুষ, সাহেব। রাখতিও আপনি মারতিও আপনি।

কি একটা ইংরিজি কথা বলে বড়সাহেব চলে গেল ঘর থেকে বেরিয়ে।

দুপুর বেলা।

প্রসন্ন আমীন কাজ অনেকখানি এগিয়ে এনেচে। গিরিশ মুহুরী, গদাধর মুহুরীকে নিচু সুরে বললে—খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা, ও গদাধর?

গদাধর চোখের চশমার দড়ি খুলে ফেলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে বললে—রাজারাম ঠাকুরকে বলো না।

—আমি পারবো না। আমার লজ্জা করে।

—লজ্জার কি আছে? পেট জ্বলচে না।

—তা তো জ্বলচে।

—তবে বলো। আমি পারবো না।

এমন সময় নরহরি পেশ্‌কার বারান্দার বাইরে থেকে সকলকে ডেকে বললে—দেওয়ানজি? আমীনবাবু? সব চান হয়েচে? ভাত তৈরী? আপনারা নেয়ে আসুন।

দেওয়ান রাজারাম বললে—আমার এখনো অনেক দেরি। তোমরা খেয়ে নাও গিয়ে।

শেষ পর্য্যন্ত সকলেই এঁকসাথে খেতে বসলেন—দেওয়ানজি ছাড়া। তিনি নীলকুঠিতে অন্নগ্রহণ করেন না। স্নানাহ্নিক না করেও খান না। এখানে সে সবের সুবিধে নেই তত।

নরহরি পেশ্‌কার ভালো ব্রাহ্মণ, সে-ই রান্না করেচে, যোগাড় দিয়েচে গোলাপ পাঁড়ে। তা ভালোই রেঁধেচে। না, সাহেবদের নজর উঁচু, খাটিয়ে নিয়ে খাওয়াতে জানে। মস্ত বড় রুই মাছের ঝোল, পাঁচ-ছ খানা করে দাগা মাছ ভাজা, আমের অম্বল, মুড়ি-ঘণ্ট ও দই।

গদাধর মুহুরী পেটুক ব্যক্তি, শেষকালে বলে ফেললে—ও পেশ্‌কারমশায়, বলি সব করলেন, একটু মিষ্টির ব্যবস্থা করলেন না!

সে সময় রসগোল্লার রেওয়াজ ছিল না! এ সময়ে, মিষ্টি বলতে বুঝতো চিনির মঠ, বাতাসা বা মণ্ডা। নরহরি পেশ্‌কার বললে—কথাটা মনে ছিল না। নইলি ছোটসায়েব দিতি নারাজ ছিল না।

গদাধর মুহুরী ভাতের দলা কোঁৎ করে গিলে বল্লেন—না, সায়েবরা খাওয়াতে জানে, কি বলো প্রসন্নদাদা?

প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী আমীন ক'দিন থেকে আজ অন্যমনস্ক। তার মন কোনো সময়েই ভালো থাকে না। কি একটা কথা সে সব সময়েই ভাবচে···ভাবচে। গদাধরের কথার উত্তর দেবার মত মনের সুখ নেই। এই যে কাজের চাপ, এই যে বড় মাছ দিয়ে ভাতের ভোজ—অন্য সময় হোলে, অন্য দিন হোলে তার খুব ভালো লাগতো—কিন্তু আজ আর সে মন নেই। কিছুই ভালো লাগে না, খেতে হয় তাই খেয়ে যাচ্চে, কাজ করতে হয় তাই কাজ করে যাচ্চে, কলের পুতুলের মত। আর সব সময়ে সেই এক চিন্তা, এক ধ্যান, এক জ্ঞান।

সে কি ব্যাপার? কি ধ্যান, কি জ্ঞান?

প্রসন্ন আমীন গয়া মেমের প্রেমে পড়েচে।

সে যে কি টান, তা বলার কথা নয়। কাকে কি বলবে? গয়া মেম বড্ড উঁচু ডালের পাখি। হাত বাড়াবার সাধ্য কি প্রসন্ন চক্কত্তির মত সামান্য লোকের? গয়া মেম সুদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়েচে এই একটা মস্ত সান্ত্বনা। সুদৃষ্টিতে চাওয়া মানে গয়া মেম জানতে পেরেচে প্রসন্ন আমীন তাকে ভালোবাসে বা এই ভালোবাসার ব্যাপারে গয়া অসন্তুষ্ট নয় বরং প্রশ্রয় দিচ্চে মাঝে মাঝে।

এই যে বসে খাচ্চে প্রসন্ন চক্কত্তি—সে সময় মানসনেত্রে কার সুঠাম তনুভঙ্গী, কার আয়ত চক্ষুর বিলোল দৃষ্টি, কার সুন্দর মুখখানি ওর চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠচে? ভাতের দলা গলার মধ্যে ঢুকচে না চোখের জলে গলা আড়ষ্ট হওয়ার জন্যে, সে কার কথা মনে হয়ে?… ছোটসাহেবের মদগর্ব্বিত পদধ্বনিও সে তুচ্ছ করেচে কার জন্যে? প্রসন্ন আমীন এতদিন পরে সুখের মুখ দেখতে পেয়েচে। মেয়েমানুষ কখনো তার দিকে সুনজরে চেয়ে দেখে নি। কত বড় অভাব ছিল তার জীবনে। প্রথমবার যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, গোঙা, গেঙিয়ে গেঙিয়ে কথা বলতো, নাম যদিও ছিল সরস্বতী। গোঙা হোক, সরস্বতী কিন্তু বড় যত্ন করতো স্বামীকে। তখন সবে বয়েস উনিশ-কুড়ি। প্রসন্নর বাবা রতন চক্কত্তি ছেলেকে বড় কড়া শাসনে রাখতেন। বাবা দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছিলেন, বলবার জো ছিল না ছেলের। সাধ্য কি?

সরস্বতী রাত্রে পান্তাভাত খেতে দিয়ে লেবু কেটে দিত, তেঁতুলগোলা, লঙ্কা আর তেল দিত মেখে খাবার জন্যে। চড়কের দিন একখানা কাপড় পেয়ে গোঙা স্ত্রীর মুখে কি সরল আনন্দ ফুটে উঠতো। বলতো, আমার বাপের বাড়ী চলো, উচ্ছে দিয়ে কাঁটালবীচি চচ্চড়ি খাওয়াবো। আমাদের গাছে কত কাঁটাল! এত বড় বড় এক একটা! এত বড় বড় কেরা!

হাত ফাঁক করে দেখাতো।

আবার রসকলির গান গাইতো আপন মনে গোঙানো সুরে। হাসি পায় নি কিন্তু সে গান শুনে কোনো দিন। মনে বরং কষ্ট হোতো। না, দেখতে শুনতে ভালো না। রং কালো, দাঁত উঁচু। তবুও পুষলে বেড়াল-কুকুরের ওপরও তো মমতা হয়?

সরস্বতী পটল তুললো প্রথমবার ছেলেপিলে হতে গিয়ে। আবার বিয়ে হোলো রাজনগরের সনাতন চৌধুরীর ছোট মেয়ে অন্নপূর্ণার সঙ্গে। অন্নপূর্ণা দেখতে শুনতে ভালো এবং গৌরবর্ণের মেয়ে বলেই বোধ হয় একটু বেশ গুমুরে। সে এখনো বেঁচে আছে তার বাপের বাড়ীতে। ছেলে মেয়ে হয় নি। কোনদিন মনে-প্রাণে স্বামীর ঘর করে নি। না করার কারণ বোধ হয় ওর বাপের বাড়ীর সচ্ছলতা। অমন কেলে ধানের মুড়ক চিঁড়ে আর শুকো দই কারও ঘরে হবে না। সাতটা গোলা বাপের বাড়ীর উঠোনে।

অন্নপূর্ণা বড় দাগা দিয়ে গিয়েছিল জীবনে। পয়সার জন্য এতো? ধানের মরাইয়ের অহঙ্কার এতো? ৺সনাতন চৌধুরীরই বা ক'টা ধানের গোলা। যদি পুরুষ মানুষ হয় প্রসন্ন চক্কত্তি, যদি সে রতন চক্কত্তির ছেলে হয়—তবে ধানের মরাই কাকে বলে সে দেখিয়ে দেবে—ওই অন্নপূর্ণাকে দেখাবে একদিন।

একদিন অন্নপূর্ণা তাকে বললে, বেশ মনে আছে প্রসন্ন চক্কত্তির, চৈত্র মাস, গুমোট গরমের দিন, ঘেঁটুফুল ফুটেচে বাড়ীর সামনের বাঁশনি বাঁশের ঝাড়ের তলায়, বললে—আমার নারকোল ফুল ভেঙে বাউটি গড়িয়ে দেবা ?

প্রসন্ন চক্কত্তির তখন অবস্থা ভালো নয়, বাবা মারা গিয়েচেন, ও সামান্ত টাকা রোজগার করে গাঁড়াপোতার হরিপ্রসন্ন মুখুয্যের জমিদারী কাছারীতে। ও বললে—কেন, বেশ তো নারকোল ফুল, পর না, হাতে বেশ মানায়।

—ছাই! ও গাঁথা যায় না। বিয়ের জিনিস, ফঙ্গবেনে জিনিস। আমায় বাউটি গড়িয়ে ছাও।

—দেবো আর ছুটো বছর যাক।

—ছু'বছর পরে আমি মরে যাবো!

—অমন কথা বলতে নেই, ছিঃ—

—এক কড়ার মুরোদ নেই, তাই বলো। এমন লোকের হাতে বাবা আমায় দিয়ে দিল তুলে! দোজবরে বিয়ে আবার বিয়ে? তাও যদি পুষতো তাও তো বুঝ দিতে পারি মনকে। অদৃষ্টের মাথায় মারি ঝাঁটা সাত ঘা।…

এই বলে কাঁদতে বসলো পা ছড়িয়ে সেই সতেরো বছরের ধাড়ী মেয়ে। এতে মনে ব্যথা লাগে কি না লাগে? তার পরের বছর আশ্বিন মাসে বাপের বাড়ী চলে গেল, আর আসে নি। সে আজ সাত-আট বছরের কথা।

এর পরে ও রাজনগরে গিয়েচে ছু'তিনবার বৌকে ফিরিয়ে আনতে। অন্নপূর্ণার মা গুচ্ছির কথা শুনিয়ে দিয়েচে জামাইকে। মেয়ে পাঠায় নি। বলেচে—মুরোদ থাকে তো আবার বিয়ে কর গিয়ে। তোমাদের বাড়ী ধান সেদ্দ করবার জন্তি আর চাল কুটবার জন্তি আমার মেয়ে যাবে না। খ্যামতা কোনোদিন হয়, পালকি নিয়ে এসে মেয়েকে নিয়ে যেও।

আর সেখানে যায় না প্রসন্ন চক্কত্তি।

বিলের ধারে সেদিন বসেছিল প্রসন্ন আমীন।

গয়া মেম আর তার মা বরদা বাগ্দিনী আসে এই সময়। শুধু একটি বার দেখা। আর কিছু চায় না প্রসন্ন চক্কত্তি।

আজ দূরে গয়া মেমকে আসতে দেখে ওর মন আনন্দে নেচে উঠলো। বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো।

গয়া একা আসচে। সঙ্গে ওর মা বরদা নেই।

কাছে এসে গয়া প্রসন্নকে দেখে বললে—খুড়োমশায়। একা বসে আছেন?

—হ্যাঁ।

—এখানে একা বসে?

—তুমি যাবে তাই।

—তাতে আপনার কি ?

—কিছু না। এই গিয়ে—তোমার মা কোথায় ?

—মা ধান ভানচে। পরের ধান সেদ্ধ শুকনো করে রেখেচে, যে বর্ষা নেমেচে, চাল দিতি হবে না পরকে ? যার চাল সে শোনবে ? বসুন, চললাম।

—ও গয়া—

—কি ?

—একটু দাঁড়াবা না ?

—দাঁড়িয়ে কি করবো ? বিষ্টি এলি ভিজে মরবো যে।

প্রসন্ন চক্কত্তি মুগ্ধ দৃষ্টিতে গয়ার দিকে চেয়েছিল।

গয়া বললে—দ্যাখচেন কি ?

প্রসন্ন লজ্জিত সুরে বললে—কিছু না। দেখবো আবার কি ? তুমি সামনে দাঁড়িয়ে থাকলি আবার কি দেখবো ?

—কেন, আমি থাকলি কি হয় ?

—ভাবচি, এমন বেশ দিনটা—

গয়া রাগের সুরে বললে—ওসব আবোল-তাবোল এখন শোনবার আমার সময় নেই! চললাম।

—একটু দাঁড়াও না গয়া ? মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে দাঁড়ালি ?

—না, আমি সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকতি পারবো না এখানে। ঐ দেখুন, দেয়া কেমন ঘনিয়ে আসচে।

ঘাট বাঁওড়ের বিলের ওপারে ঘন সবুজ আউশ ধানের আর নীলের চারার ক্ষেতের ওপরে ঘন, কালো শ্রাবণের মেঘ জমা হয়েচে। সাদা বকের দল উড়চে দূর চক্রবালের কোলে, মেঘপদবীর নিচে নিচে, হু হু ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক বয়ে এল শ্যামল প্রান্তরের দিক থেকে, সোঁ সোঁ শব্দ উঠলো দূরে, বিলের অপর প্রান্ত যেন ঝাপ্‌সা হয়ে এসেচে বৃষ্টির ধারায়। রথচক্রের নাভির মত দেখাচ্চে স্বচ্ছজল বিল বৃষ্টিমুখর তীরবেষ্টনীর মাঝখানে।

প্রসন্ন চক্কত্তি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো—গয়া ভিজবে যে, বৃষ্টি তো এল। চলো, আমার বাসায়।

—না, আমি কুঠিতি চললাম—

—ও গয়া, শোনো আমার কথা। ভিজবা।

—ভিজি ভিজবো।

—আচ্ছা, গয়া আমি ভালোর জন্যি বলচি নে ? কেউ নেই আমার বাসায়। চলো।

—না, আমি যাবো না। আপনাকে না খুড়োমশায় বলে ডাকি ?

—ডাকো তাই কি হয়েচে ? অন্যায় কথাডা কি বললাম তোমারে ? বিষ্টিতে ভিজবা, তাই বলচি আমার ঘরটা নিকটে আছে—সেখানে আশ্রয় নেবা। খারাপ কথা এডা ?

—না। বাজে কথা শোনবার সময় নেই। আপনি ছুট দিন, ওই দেখুন তাকিয়ে বিলের ওপারে—

—আমার ওপর রাগ করলে না তো, ও গয়া, শোনো ও গয়া, মাথা খাও, ও গয়া—

গয়া ছুটতে ছুটতে হেঁকে বললে—না, না, না। কি পাগল! এমন মানুষও থাকে?

মিনতির সুরে প্রসন্ন চক্কত্তি হেঁকে বললে—কাউকে বলে দিও না যেন, ও গয়া! মাইরি!···

দূর থেকে গয়া মেমের স্বর ভেসে এল—ভেজবেন না—বাড়ী যান খুড়োমশাই—ভেজবেন না—বাড়ী যান—

বিলের শামুক আবার কতটুকু সুধা আশা করে চাঁদের কাছে?

ও-ই যথেষ্ট না?

রামকানাই কবিরাজ আশ্চর্য্য না হয়ে পারে নি যে আজকাল নীলকুঠির লোকেরা তাঁকে কিছু বলে না।

আজ আবার গয়া মেম এসে তাকে দুধ দিয়ে গিয়েচে, এটা ওটা সেটা প্রায়ই নিয়ে আসে। রামকানাই দাম দিতে পারবে না বলে আগে আগে নিত না, এখন গয়া মেয়ে সম্পর্ক পাতিয়ে দেওয়ার পথটা সহজ ও সুগম করেচে। আবার লোকজনে ডাকে কবিরাজকে। ঝিঙে, লাউ, দু'আনিটা, সিকিটা (ক্বচিৎ)—এই হোল দর্শনী ও পারিশ্রমিক।

নালু পালের স্ত্রী তুলসীর ছেলেপিলে হবে, পেটের মধ্যে বেদনা, কি কি অসুখ। হরিশ ডাক্তার দিন কতক দেখেছিল, রোগ সারে নি। লোকে বললে—তোমার পয়সা আছে নালু, ভালো কবিরাজ দেখাও—

রামকানাই কবিরাজ ভালোর দলে পড়ে না, কেননা, সে গরীব অর্থেরই লোকে মান দেয়, সততা বা উৎকর্ষে নয়। রামকানাই যদি আজ হরিশ ডাক্তারের মত পাল্‌কিতে চেপে রুগী দেখতে বেরুতো, তবে হরিশ ডাক্তারের মত আট আনা ভিজিট সে অনায়াসেই নিতে পারতো।

নালু পাল কি মনে ভেবে রামকানাই কবিরাজকে ডাক দিলে। রামকানাই রোগী দেখে বললে, ওষুধ দেবো কিন্তু অনুপান যোগাড় করতি হবে কলমীশাকের রস, সৈন্ধব লবণ দিয়ে সিদ্ধ। ভাঁড়ে করে সে রস রেখে দিতে হবে সাতদিন।

নালু পাল আর সে নালু পাল নেই, অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেচে ব্যবসা করে। আটচালা ঘর বেঁধেচে গত বৎসর। আটচালা ঘর তৈরী করা এ সব পাড়াগাঁয়ে বড়মানুষির লক্ষণ, আর চরম বড়মানুষি অবিশ্যি দুর্গোৎসব করা! তাও গত বৎসর নালু পাল করেচে। অনেক লোকজনও খাইয়েচে। নাম বেরিয়ে গিয়েচে বড়মানুষ বলে। ওর ঘরের মধ্যে নতুন কড়ি-বাঁধানো আলমারী, নক্সা-করা হাঁড়ির থাক রঙিন্ দড়ির শিকেতে ঝুলোনো, খেরোমোড়া শীতলপাটি, কাঁসার পানের ডাবর, ঝকঝকে করে মাজা পিতলের দীপগাছা—সম্পন্ন গৃহস্থের

বাড়ীর সমস্ত উপকরণ আসবাব বর্ত্তমান। রামকানাইয়ের প্রশংসমান দৃষ্টি রোগিনীর ঘরের সাজসজ্জার ওপর অনেকক্ষণ নিবদ্ধ আছে দেখে নালু পাল বললে—এইবার ঘুর্ণীর কোমোরদের তৈরী মাটির ফল কিছু আনাবো ঠিক করিচি। ওই কড়ির আলনাটা ত্থাখচেন, আড়াই ট্যাকা দিয়ে কিনিচি বিনোদপুরের এক ব্রাহ্মণের মেয়ের কাছে। তাঁর নিজের হাতে গাঁথা।

—বেশ চমৎকার দ্রব্যটি।

—অসুখ সারবে তো, কবিরাজমশাই ?

—না সারলি মাধবনিদান শাস্তরডা মিথ্যে। তবে কি জানো, অনুপান আর সহপান ঠিকমত চাই। ওষুধ রোগ সারাবে না, সারাবে ঠিকমত অনুপান আর সহপান। কলমী-শাকের রস খেতি হবে—সেটি হোলো অনুপান। বোঝলে না ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

জলযোগ ব্যবস্থা হলো শসাকাটা, ফুলবাতাসা, নারকোল কোরা ও নারকোল নাড়ু। আচমনী জিনিস অর্থাৎ কোনো কিছু শস্যভাজা খাবেন না রামকানাই শূদ্রের গৃহে। এককাঠা চাল, মটরডালের বড়ি ও একটা আধুলি দর্শনী মিললো।

পথে ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—কবিরাজমশাই—নমস্কার হই।

—ভালো আছেন জামাইবাবু ?

—আপনার আশীর্ব্বাদে। একটু আমার বাড়ীতে আসতি হবে। ছেলেটার জর আর কাসি হয়েচে দু'তিন দিন, একটু দেখে যান।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন।

খোকা ওর মামীমার বুহুনি নক্সা-কাটা কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমুচ্ছিল। রামকানাই হাত দেখে বললেন—নবজ্বর। নাড়িতে রস রয়েছে। বড়ি দেবো, মধু আর শিউলি পাতার রস দিয়ে খাওয়াতি হবে।

ওর মা তিলু এবং ওর দুই ছোট মা উৎসুক ও শঙ্কিত মনে কাছেই দাঁড়িয়েছিল। ওরা এ গ্রামের বধূ নয়, কন্যা। সুতরাং গ্রাম্য প্রথানুযায়ী ওরা যার তার সামনে বেরুতে পারে, যেখানে সেখানে যেতে পারে। কিন্তু যদি এ গ্রামের বধূ হতো, অন্য জায়গায় মেয়ে—তাহলে অপরিচিত পরপুরুষ তো দূরের কথা, স্বামীর সঙ্গে পর্য্যন্ত যখন তখন দিনমানে সাক্ষাৎ করা বা বাক্যালাপ করা দাঁড়াতো বেহায়ার লক্ষণ।

তিলু কাঁদো-কাঁদো সুরে বললে—খোকার জর কেমন দেখলেন. কবিরাজমশাই ?

—কিছু না মা, নবজ্বর। এই বর্ষাকালে চারিদিকি হচ্চে। ভয় কি ?

—সারবে তো ?

—সারবে না তো আমরা রইচি কেন ?

নিলু বললে—আপনার পায়ে পড়ি কবিরাজমশাই। একটু ভালো করে দেখুন খোকারে।

—মা, আমি বলচি তিনদিন বড়ি খেলি খোকা সেরে ওঠবে। আপনারা ভয় পাবেন না।

—ওর গলার মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হয় কেন ?

—কফ কুপিত হয়েচে, রসন্থ নাড়ী। ও রকম হয়ে থাকে। কিছু ভেবো না। আমার সামনে এই বড়িটা মেড়ে খাইয়ে দাও মা। খল আছে ?

—খল আনচি সিধু কাকাদের বাড়ী থেকে।

তিলু বললে—কবিরাজমশাই, বেলা হয়েচে, এখানে দুটি খেয়ে তবে যাবেন। দুপুরবেলা বাড়ীতি লোক এলি না খাইয়ে যেতি দিতি আছে ? আপনাকে দুটো ভাত গালে দিতিই হবে এখানে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে হাত জোড় করে বললেন—শাক আর ভাত। গরীবের আয়োজন।

রামকানাই বড় অভিভূত ও মুগ্ধ হয়ে পড়লেন এদের অমায়িক ব্যবহারে ও দীনতা প্রকাশের সম্পদে। কেউ কখনো তাঁকে এত আদর করে নি, এত সম্মান দেয় নি। তাতে এরা আবার দেওয়ানজির ভগ্নিপতি, ওদের বাড়ীর জামাই।

তিলু দুখানা বড় পিঁড়ি পেতে দুজনকে খেতে দিলে।—এটা নিন, ওটা নিন, বলে কাছে বসে কখনো কি রামকানাই কবিরাজকে কেউ খাইয়েচে ? মনে করতে পারেন না রামকানাই। মুগের ডাল, পটল ভাজা, মাছের ঝাল, আমড়ার টক আর ঘরে-পাতা দই, কাঁটাল, মর্ত্তমান কলা। নাঃ, কার মুখ দেখে আজ যে ওঠা ? অবাক হয়ে যান রামকানাই।

খাওয়ার পরে রামকানাই একটি গুরুতর প্রশ্ন করে বসলেন ভবানী বাঁড়ুয্যেকে।

—আচ্ছা জামাইবাবু, আপনি জ্ঞানী, সাধু লোক। সবাই আপনার সুখ্যেত করে। আমরা এমন কিছু লেখাপড়া শিখি নি। সামান্য সংস্কৃত শিখে আয়ুর্ব্বেদ পড়েছিলাম তেঘরা সেনহাটির ৺পতিতপাবন (হাতজোড় করে প্রণাম করলেন রামকানাই) কবিরাজের কাছে। আমারা কি বুঝি-সুজি বলুন! আচ্ছা, আদি সংবাদটা কি ? আপনার মুখি শুনি।

—কি বললেন ? কি সংবাদ ?

—আদি সংবাদ ?

—আজ্ঞে—ভালো বুঝতে পারলাম না কি বলচেন।

—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনি মিলি তো জগৎটা সৃষ্টি করলেন ?...এখন এর ভেতরের কথাটা কি একটু খুলে বলুন না ? অনেক সময় একা শুয়ে শুয়ে ঘরের মধ্যে এসব কথা ভাবি। কি করে কি হোলো।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বিপদে পড়ে গেলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে জগৎটা সৃষ্টি করেন নি, ভেতরের কথা তিনি কি করে বলবেন ? কথা বলবার কি আছে ? পতঞ্জলি দর্শন মনে পড়লো, সাংখ্য মনে পড়লো, বেদান্ত মনে পড়লো—কিন্তু এই গ্রাম্য কবিরাজের কাছে—না। অচল। সে সব অচল। তাঁর হাসিও পেল বিলক্ষণ। আদি সংবাদ!

হঠাৎ রামকানাই বললেন—আমার কিন্তু একটা মনে হয়—অনেকদিন বসে বসে ভেবেচি, বোঝলেন ? ও ব্রহ্মা বলুন, বিষ্ণু বলুন, মহেশ্বর বলুন,—সবই এক। একে তিন, তিনি এক। তা ছাড়া এ সবই তিনি। কি বলেন ?

ভবানী বাঁড়ুয্যের চোখের সামনে যদি এই মুহূর্তে রামকানাই কবিরাজ চতুর্ভুজ বিষ্ণুতে রূপান্তরিত হয়ে ওপরের দুই হাতে বরাভয় মুদ্রা রচনা করে বলতেন—'বৎস, বরং বৃণু—ইহাগতোস্মি'—তাহোলেও তিনি এতখানি বিস্মিত হতেন না। এই সামান্য গ্রাম্য কবিরাজের মুখে অতি সরল সহজ ভাষায় অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের কল্যাণময়ী বাণী উচ্চারিত হোলো এই সংস্কারবদ্ধ, অশিক্ষিত, মোহান্ধ, ঈর্ষাদ্বেষসঙ্কুল, অন্ধকার পাড়াগেঁয়ে এঁদো খড়ের ঘরে!

ভবানী বাঁড়ুয্যে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তিনি মানুষ চেনেন। অনেক দেখেচেন, অনেক বেড়িয়েচেন। মুখ তুলে বললেন—কবিরাজমশাই, ঠিক বলচেন। আপনাকে আমি কি বোঝাবো? আপনি জ্ঞানী পুরুষ।

—হঃ, এইবার ধরেচেন ঠিক জামাইবাবু? জ্ঞানী লোক একডা খুঁজে বার করেচেন—

তিলুও খুব অবাক হয়েছিল। সেও স্বামীর কাছে অনেক কিছু পড়েচে, অনেক কিছু শিখেচে, বেদান্তের মোট কথা জানে। এভাবে সেকথা রামকানাই কবিরাজ বলবে, তা সে ভাবে নি। সে এগিয়ে এসে বললে—আমি অনেক কথা শুনেচি আপনার ব্যাপার। যথেষ্ট অত্যাচার আপনার ওপর বড়দা করেচেন, নীলকুঠির লোকেরা—আপনি মিথ্যে সাক্ষী দিতে চান নি বলে টাকা খেয়ে সায়েবদের পক্ষে। অনেক কষ্ট পেয়েচেন তবু কেউ আপনাকে দিয়ে মিথ্যে বলাতি পারেনি রামু সর্দ্দারের খুনের মামলায়। আমি সব জানি। কতদিন ভাবতাম আপনাকে দেখবো। আপনি আজ আমাদের ঘরে আসবেন, আপনারে খাওয়াবো—তা ভাবি নি। আপনার মুখির কথা শুনে বুঝলাম, আপনি সত্যি আশ্রয় ক'রে আছেন বলে সত্যি জিনিস আপনার মনে আপনিই উদয় হয়েচে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে জানতেন না তিলু এত কথা বলতে পারে বা এ ভাবে কথা বলতে পারে। স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন—ভালো।

তিলু হেসে বললে—কি ভালো?

—ভালো বললে। আচ্ছা, কবিরাজমশাই, আপনার বয়েস কত?

—১২৩৪ সালের মাঘ মাসে জন্ম। তাহলি হিসেব করুন। সতেরোই মাঘ।

—আপনি আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। দাদা বলে ডাকব আপনাকে।

তিলু বললে—আমিও। দাদা, মাঝে মাঝে আপনি এসে এখানে পাতা পাড়বেন। পাড়বেন কিনা বলুন।

রামকানাই কবিরাজ ভাবচে, দিনটা আজ ভালো। এদের মত লোকে এত আদর করবে কেন নইলে?

—পাতা পাড়বো বৈকি। একশো বার পাড়বো। আমার ভগ্নীর বাড়ী ভাত খাবো না তো কম্‌নে খাবো? আচ্ছা, আজ যাই দিদি। আরো একটা রুগী দেখতি হবে সবাইপুরে। খোকারে যা দেলাম, বিকেলের দিকি জ্বর ছেড়ে যাবে। কাল সকালে আবার দেখে যাবো।

নিলু সুক্তুনিতে ফোড়ন দিয়ে নামিয়ে নিলে। খোকনকে ওর কাছে দিয়ে ওর মা গিয়েচে বড়দার বাড়ী। বড়দা বড় বিপদে পড়ে গিয়েচেন, তাঁকে নাকি কোথায় যেতে হবে সাহেবদের সঙ্গে। সে কথা শুনতে গিয়েচে বড়দি।

খোকন বলচে—ছো মা—ছো মা—

—কি ?

—দে।

—কি দেবো ? না আর গুড় খায় না।

খোকন বড় শান্ত। আপন মনে খেলতে খেলতে একটা তেলসুদ্ধ বাটি উপুড় করে ফেললে—তারপর টলতে টলতে আসতে লাগলো উনুনের দিকে।

—নাঃ, এবার পুড়ে ঝলসে বেগুনসেদ্ধ হয়ে থাকবি। আমি জানিনে বাপু! রঁাধবো আবার ছেলে সামলাবো, তিনি রাজরাণী আর ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ী যেতি পারলেন না। ও মেজদি—মেজদি—কেউ যদি বাড়ীতি থাকবে কাজের সময় ? বোস্ এখানে—এই !··· দাঁড়া দেখাচ্চি মজা। আবার তেলের বাটি হাতে নিইচিস্ ?

খোকন বললে—বাটি।

—বাটি রাখো ওখানেঁ।

—মা।

—মা আসচে বোসো। ঐ আসচে।

খোকন বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে বললে—নেই।

তারপর হাতদুটি নেড়ে বললে—নেই নেই—মা—আঃ—

—আচ্ছা, নেই তো নেই। চুপটি করে বোসো বাবা আমার—

—বাবা।

—আসচেন। গিয়েচেন নদীতে নাইতি।

—মা।

—আসচে।

—মা।

—বাবা রে বাবাঃ, আর বক্‌তি পারিনে তোর সঙ্গে। বোসো—এই! গরম—গরম—পা পুড়ে যাবে! গরম সুক্তুনির ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়চে! ও মেজদি—

এইবার খোকন কান্না শুরু করলে। নিলুর গলায় তিরস্কারের আভাসে, কান্নার সুরে বলে—মা—অঁা—অঁা—

নিলু ছুটে এসে খোকনকে কোলে তুলে নিয়ে বললে—ও আমার মানিক কাঁদে না সোনামণি—রামমণি—শ্যামমণি—চুপ চুপ। কে কেঁদেচে ? আমার সোনার খোকন কেঁদেচে! কেন কেঁদেচে ? মেজদি—যা সব্ সব, যমের বাড়ী যা—আমার খোকনের খোয়ার করে পাড়া বেরুনো হয়েচে!

খোকন ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে বললে—মা—

—কেঁদো না। আমি তোমায় বকিনি। আমি বকলি বাবা আমার আর সহ্যি করতি পারেন না। আমি বকি নি। কি দিই হাতে? ওমা ওটা কি রে? পাখী?···

এমন সময় তিলু দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে ঢুকে বললে—এই যে সোনামণি—কাঁদচে কেন রে?

—তোমার আদুরে গোপাল একটা উঁচু স্বর শুনলি অমনি ঠোঁট ওল্টান। চড়া কথা বলবার জো নেই।

নিলু বললে—দাদা কোথায় গিয়েচেন দেখে এলে?

—দাদা গিয়েচেন সাহেবদের কাজে। কোথায় তিতু মীর বলে একটা লোক,-মহারাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করচে। সেই লড়াইতে নীলকুঠির সায়েবেরা লোকজন নিয়ে গিয়েছে, দাদাকেও নিয়ে গিয়েছে।

—তিতু মীর?

—তাইতো শুনে এলাম। বৌদিদি কেঁদে কেটে অনর্থ করচে। লড়াই হেন ব্যাপার, কে বাঁচে কে মরে তার ঠিকানা কি আছে?

নিলু হঠাৎ চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো পা ছড়িয়ে। তিলু যত বলে, যত সান্ত্বনা দেয় নিলু ততই বাড়ায়—খোকা অবাক হয়ে ক্রন্দনরতা ছোট মার মুখের দিকে খানিকটা চেয়ে থেকে নিজেও চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। এমন সময় ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হোলো বিলু। সে নিলুর ও খোকার কান্নার রব শুনে ভাবলে বাড়ীতে নিশ্চয় একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটেচে। সে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—কি হোলো দিদি? নিলুর কি হলো?···

তিলু বললে—দাদা তিতু মীরের লড়াইয়ে গিয়েচে শুনে কাঁদচে। তুই একটু বোঝা। ছেলেমানুষের মতো এখনো। দাদা ওকে ভালোবাসে বড়, এখনো ছেলেমানুষের মত আবদার করে দাদার কাছে।

বিলু নিলুর পাশে বসে ওকে বোঝাতে লাগলো—যাঃ, ওকি? চুপ কর। ওতে অমঙ্গল হয়! কুঠিসুদ্ধ কত লোক গিয়েচে, ভয় কি সেখানে? ছিঃ, কাঁদে না। তুই না থামলি খোকনও থামবে না। চুপ কর।

তিলু বললে—হ্যাঁরে আমাদের দাদা নয়? আমরা কি কাঁদচি? অমন করতি নেই। ওতে অমঙ্গল ডেকে আনা হয়, চুপ কর। দাদা হয়তো আজই এসে পড়বে দেখিস এখন। থাম বাপু—

তিলুর মুখের কথা শেষ হতে না হতে ভবানী এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। প্রথম কথাই বললেন—দাদা এসেচেন তিতু মীরের লড়াই ফেরতা। দেখা করে এলাম। এ কি? কাঁদচে কেন ও? কি হয়েচে?

—ও কাঁদচে দাদার জন্যি। বাঁচা গেল! কখন এল?

—এই তো ঘোড়া থেকে নামচেন।

নিলু কান্না ভুলে আগেই উঠে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনেছিল। কথা শেষ হতেই বললে —চলো মেজদি, আমরা যাই বড়দাদাকে দেখে আসি।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—যেও না।

—যাবো না? বড্ড দেখতি ইচ্ছে করচে।

—আমি নিজে গিয়ে তত্ত্ব নিয়ে আসচি। তুমি গেলে তোমার গুণধর দিদি যেতে চাইবে। খোকাকে রাখবে কে?

তিলুও বললে—না যাস নে, উনি গিয়ে দেখে আসুন, সেই ভালো।

ওদের একটা গুণ আছে, ভবানী বারণ করলে আর কেউ সে কাজ করবে না। নিলু বললে—আপনার মনটা বড্ড জিলিপির-পাক, জানলেন? আমার দাদার জন্যি আমার কি যে হচ্চে, আমিই জানি। দেখে আসুন যান—

আধঘণ্টা পরে দেওয়ান রাজারামের চণ্ডীমণ্ডপে অনেক লোক জড়ো হয়েচে। তার মধ্যে ভবানী বাঁড়ুয্যেও আছেন।

ফণি চক্কত্তি বললেন—তারপর ভায়া, কোনো চোট্-টোট্ লাগে নি তো!

রাজারাম রায় বললেন—না দাদা, তা লাগে নি, আপনাদের আশীর্ব্বাদে যুদ্ধই হয় নি। এর আগে ওরা অনেক লোক নাকি মেরেছিল, সে হোলো নিরীহ গাঁয়ের লোক।

—তিতু মীর কেডা?

—মুসলমানদের মোড়লপানা যা বোঝলাম ওদের কথাবার্ত্তার ভাবে। সেদিন বসে আছি হঠাৎ বড়সাহেবের কাছে চিঠি এল, তিতু মীর বলে একটা ফকির মহারাণীর সঙ্গে লড়াই বাধিয়েচে। নীলকুঠির লোকদের ওপর তার ভয়ানক রাগ। লুঠপাঠ করেচে, খুনখারাবি হচ্চে।

—চিঠি দিলে কে বড় সাহেবের কাছে?

—ডস্কিন্‌সন্ সাহেবের জায়গায় যে নতুন ম্যাজিস্টর এসেচেন, তিনি লিখেচেন তোমরা লোকজন নিয়ে এসো—যেখানে যত নীলকুঠির সায়েব ছিল, গিয়ে দেখি যমুনার ধারে আমবাগানে তাঁবু সব সারি সারি। লোকজন, ঘোড়া, আসবাব, বন্দুক। ওদিকে সরকারী সৈন্য এসেচে, তাদের তাঁবু। সে এক এলাহি কাণ্ড, দাদা। আমার তো গিয়ে ভারি মজা লাগতি লাগলো। প্রসন্ন চক্কত্তি আমীন গিয়েছিল, সে বড্ড ভুঁদে। বললে, আমি দেখে আসি তিতু মীর কোথায় কি ভাবে আছে। আমাদের কারো কষ্ট হয় নি। যুদ্ধই তো হোলো না, একটা বাঁশের কেল্লা বাঁধিয়েচে যমুনার ধারে।

—অনেক সায়েব জড়ো হয়েছিল?

—বোয়ালমারি, পানচিতে, রঘুনাথগঞ্জ, পালপাড়া, দীঘড়ে-বিষ্ণুপুর সব কুঠির সায়েব লোকজন নিয়ে এসেছে। বন্দুক, গুলি, বারুদ। মুরগি, হাঁস, খাসি যোগাচ্চে গাঁয়ের লোকে। একটা মেয়েছেলেকে এমন মার মেরেচে তিতু মীরের লোক যে, তার নাকমুখ

দিয়ে রক্ত ধোঁঝালি দিয়ে পড়ছিল। তিতু মীরের কেল্লা ছিল একক্রোশ তিনপোয়া পথ দূরি। আমরা ছেলাম একটা আমবাগানে।

—যুদ্ধু কেমন হোলো ?

—তিতু মীর বলেছিল তার লোকজনদের, সায়েবদের গোলাগুলিতি তার কিছুই হবে না। সরকারের সেপাইরা প্রথমবার ফাঁকা আওয়াজ করে। তিতু মীর তার লোকজনদের বললে—গোলাগুলি সে সব খেয়ে ফেলেচে। তখন আবার গুলি পুরে বন্দুক ছোঁড়া হোলো। বাইশজন লোক ফৌৎ। তখন বাকি সবাই টেনে দৌড় মারলে। তিতু মীরকে বেঁধে চালান দিলে কলকেতা। মিটে গেল লড়াই। তারপর আমরা সব চলে এলাম।

নীলমণি সমাদ্দার তামাক খেতে খেতে বললেন—আমরা সবাই ভেবে খুন। না জানি কি মস্ত লড়াইয়ের মধ্যি গেল রাজারাম দাদা। আরে তুমি হোলে গিয়ে গাঁয়ের মাথা। তুমি গাঁয়ে না থাকলি মনডা ভালো লাগে ? শাম বাগ্দির বড় মেয়ে কুসুম বেরিয়ে গেল ওর ভগ্নিপতির সঙ্গে। মামুদপুর থেকে ওর বাবা ওরে ধরে নিয়ে এল। তার বিচের ছিল পরশু। তুমি না থাকাতি হোলো না। আজ আবার হবে শুনচি।

সন্ধ্যাবেলা এল শাম বাগ্দি ও তার মেয়ে কুসুম।

রাজারাম বললেন—কি গা শাম ?

—মেয়েডারে নিয়ে এ্যালাম কর্ত্তাবাবুর কাছে। যা হয় বিচের করুন।

রাজারাম বিজ্ঞ বিষয়ী লোক, হঠাৎ কোনো কথা না বলে বললেন—তোর মেয়ে কোথায় ?

—ওই যে আড়ালে দেঁড়িয়ে। শোন, ও কুসী—

কুসুম সামনে এসে দাঁড়ালো, আঠারো থেকে কুড়ির মধ্যে বয়েস, পূর্ণ-যৌবনা, নিটোল, সুঠাম দেহ—এক ঢাল কালো চুল মাথায়, কালো পাথরে কুঁদে তৈরি করা চেহারা, আশ্চর্য্য সুন্দর চোখদুটি। মুখখানি বেশ, রাজারাম কেবল গয়ামেমকেই এত সুঠাম দেখেছেন। মেয়েটার চোখে ভারি শান্ত, সরল দৃষ্টি।

রাজারাম ভাবলেন, বেশ দেখচি যে! ধুকড়ির মধ্যে খাসা চাল। বড়সায়েব যদি একবার দেখতে পায় তাহলে লুফে নেয়।

—নাম কি তোর ?

—কুসুম।

—কেন চলে গিইছিলি রে ?

কুসুম নিরুত্তর।

—বাবার বাড়ী ভালো লাগে না কেন ?

কুসুম ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে রাজারামের দিকে চেয়ে বললে—মোরে পেট ভরে খেতি দেয় না সৎমা। মোরে বকে, মারে। মোর ভগিনপোত বলেল—মোরে বাড়ী কিনে দেবে, মোরে ভালোমন্দ খেতি দেবে—

—দিইছিল ?

—মোরে গিয়ে ধরে আনলে বাবা। কখন মোরে দেবে ?

—আচ্ছা, ভালো মন্দ খাবি তুই, থাক আমার বাড়ী। থাকবি ?

—না।

—কেন রে ?

—মোর মন-কেমন করবে।

—কার জন্তি ? বাবাকে ছেড়ে তো গিইছিলি। সৎমা বাড়ীতি। কার জন্তি মন কেমন করবে রে ?

কুসুম নিরুত্তর।

ওর বাবা শাম বাগ্‌দি এতক্ষণ দেওয়ান রাজারামের সামনে সমীহ করে চুপ করে ছিল, এইবার এগিয়ে এসে বললে—মুই বলি শুনুন কর্ত্তাবাবু। আমার এ পক্ষের ছোট ছেলেটা ওর বড্ড ন্যাওটো। তারি জন্তি ওর মন-কেমন করে বলচে।

—তাই যদি হবে, তবে তারে ছেড়ে পালিয়েছিল তো ? সে কেমন কথা হোলো ? তোদের বুদ্ধি-সুদ্ধিই আলাদা। কি বলে কি করে আবোল তাবোল, না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু। থাকবি আমার বাড়ী। ভালোমন্দ খাবি। বেশি খাটতি হবে না, গোয়াল-গোবর করবি সকালবেলা।

শাম বাগ্‌দি বললে—থাক কর্ত্তাবাবুর বাড়ী, সব দিক থেকেই তোর সুবিধে হবে।

রাজারাম জগদম্বাকে ডেকে বললেন—ওগো শোনো, এই মেয়েটি আমাদের এখানে থাকবে আজ থেকে। ও একটু ভালোমন্দ খেতে ভালোবাসে। মুড়কি আছে ঘরে ?

জগদম্বা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে ছিলেন। বললেন—ও তো বাগ্‌দিপাড়ার কুসী না ? ও ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ীতে কত এসেচে ওর দিদিমার সঙ্গে—মনে পড়ে না, হাঁরে ?

কুসুম ঘাড় নেড়ে বললে—মুই তখন ছেলেমানুষ ছেলাম। মোর মনে নেই।

—থাকবি আমাদের বাড়ী ?

—হাঁ।

—বেশ থাক। চিঁড়ে মুড়কি খাবি ? আয় চল রান্নাঘরের দিকি।

রাজারাম বললেন—মেয়ের মত থাকবি ; আর গোয়াল পরিষ্কার-মস্কার করবি। তোর মার কাছে চাবি যা যখন খেতি ইচ্ছে হবে। নারকোল খাবি তো কত নারকোল আছে, কুরে নিয়ে খাস্। মুড়কি মাখা আছে ঘরে। খাবার জন্তি নাকি আবার কেউ বেরিয়ে যায় ? আমার বাড়ীর জিনিস খেয়ে গাঁয়ের লোক এলিয়ে যায় আর আমার গাঁয়ের মেয়ে বেরিয়ে যাবে পেট ভরে খেতি পায় না বলে ? তোর এ পক্ষের বৌটাকেও বলবি শাম, কাজডা ভালো করে নি। বলি, ওর মা নেই যখন, তখন কেডা ওরে দেখবে বল্।

শাম বিরক্তি দেখিয়ে বললে—বলবেন না সে সুমুন্দির ইস্তির কথা। মোর হাড় ভাজা-

ভাজা করে ফেললে—মুই মাঠ থেকে ফিরলি মোরে বলে না যে দুটো চালভাজা খা। রোজ পান্তভাত, রোজ পান্তভাত। মুই বলি দুটো গরম ভাত মোরে দে, সেই সূর্যি ঘুরে যাবে তখন দুটো ঝিঙে ভাতে দিয়ে ভাত দেবে। মরেও না যে, না হয় আবার একটা বিয়ে করি।

কুসুম মুখ টিপে হাসচে। বাবার কথায় তার খুব আমোদ হয়েচে বোধহয়।

রামকানাই কবিরাজ খেজুর-পাতার চট পেতে দিলেন ভবানী বাঁড়ুয্যেকে। বললেন—জামাইবাবু! আসুন, আসুন।

—কি করছিলেন ?

—ঈষের মূল সেদ্ধ করবো, তার যোগাড় করচি। এত বর্ষায় কোত্থেকে ?

সন্ধ্যা হবার দেরি নেই। অঝোরে বৃষ্টিপাত হচ্চে শ্রাবণের মাঝামাঝি। এ বাদলা তিনদিন থেকে সমানে চলচে। তিৎপল্লা গাছের ঝোপ বৃষ্টিতে ভিজে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্চে। মাটির পথ বেয়ে জলের স্রোত চলেচে ছোট ছোট নালার মত। বৃষ্টির শব্দে কান পাতা যায় না। বাগ্‌দি পাড়ার নলে বাগ্‌দি, অধর সর্দ্দার, অধর সর্দ্দারের তিন জোয়ান ছেলে, ভেঁপু মালি—এরা সব ঘুনি আর পোলো নিয়ে বাঁধালে জলের তোড়ে হাঁটু পর্যান্ত ডুবিয়ে মাছ ধরবার চেষ্টা করচে; বৃষ্টির গুঁড়ো ছাটে চারিধারে ধোঁয়া-ধোঁয়া। রামকানাইয়ের ঘরের পেছনে একটা সোঁদালি গাছে এখনো দু' এক ঝাড় ফুল দুলচে। মাঠে ঘাসের ওপর জল বেধে ছোট পুকুরের মত দেখাচ্চে। পথে জনপ্রাণী নেই কোনো দিকে। ঘরের মধ্যে চালের ফাঁক দিয়ে একটা নতুন তেলাকুচোর লতা ঢুকেচে. নতুন পাতা গজিয়েচে তার চারু কমনীয় সবুজ ডগায়।

—তামাক সাজি বসুন। ভিজে গিয়েচেন যে! গামছাখানা দিয়ে মুছে ফেলুন—

—এ বর্ষায় তিনদিন আজ বাড়ী বসে। একটু সৎ-চর্চ্চা করি এমন লোক এ গাঁয়ে নেই—সবাই ঘোর বৈষয়িক। তাই আপনার কাছে এলাম।

—আমার কত বড় ভাগ্যি জামাইবাবু। দুটো চিঁড়ে খাবেন, দেবো ? গুড় আছে কিন্তু।

—আপনি যদি খান তবে খাবো।

—দুজনেই খাবো, ভাববেন না। অতিথি এলেন ঘরে, দেবার কি আছে, কিছুই নেই। যা আছে তাই দেলাম। শিশিনিতি একটু গাওয়া ঘি আছে. মেখে দেবো ?

—দেখি, আপনি কিনেচেন না নিজে করেন ?

রামকানাই একটা ছোট্ট শিশি কাঠের জলচৌকি থেকে নিয়ে ভবানীর হাতে দিলেন। বললেন—নিজে তৈরি করি। গরামেম একটু ক'রে দুধ দেয়, আমারে বাবা বলে। মেয়েডা ভালো। সেই মেয়েডা এই শিশিনি এনে দিয়েচে সায়েবদের কুঠি থেকে। যে সরটুকু পড়ে, তাই জমিয়ে ঘি করি। ঘি আমাদের ওষুধে লাগে কি না। অনেকে গব্য ঘৃত না মিশিয়ে বাজারের ভয়সা ঘি মেশায়—সেটা হোলো মিথ্যে আচরণ। জীবন নিয়ে যেখানে

কারবার, সেখানে শঠতা, প্রবঞ্চনা যারা করে, তারা তেনার কাছে জবাবদিহি দেবে একদিন কি ক'রে?

—আর কবিরাজ মশাই। দুনিয়াটা চলচে শঠতা আর প্রবঞ্চনার ওপরে। চারিধারে চেয়ে দেখুন না। আমাদের এ গাঁয়েই দেখুন। সব ক'টি ঘুণ বিষয়ী! শুধু গরীবের ওপর চোখ রাঙানি, পরের জমি কি ক'রে ফাঁকি দিয়ে নেবে পর-নিন্দা, পর-চর্চ্চা, মামলা—এই নিয়ে আছে। কুয়োর বাং হয়ে পড়ে আছে এই মোহগর্ভে।

রামকানাই ততক্ষণে গাওয়া ঘি মাখালেন চিঁড়েতে। গুড় পাড়লেন শিকেতে ঝুলোনো মাটির ভাঁড় থেকে। পাথরের খোরাতে ঘি-মাখা কাঁচা চিঁড়ে রেখে ভবানী বাঁড়ুয্যেকে খেতে দিলেন।

ভবানীকে বললেন—কাঁচা লঙ্কা একটা দেবো?

—দিন একটা—

—আচ্ছা, একটু আদ্দি সংবাদ শোনাবেন? ভগবান কি রকম? তাঁকে দেখা যায়? আপনারে বলি। এই ঘরে একলা রাত্তিরি অন্ধকারে বসে বসে ভাবি, ভগবানডা কেডা? উত্তর কেডা দেবে বলুন? আপনি একটু বলুন।

ভবানী বাঁড়ুয্যে নিজেকে বিপন্ন বিবেচনা করলেন। রামকানাই কবিরাজ সৎ লোক, সত্যসন্ধ লোক। তাঁকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। এত বড় গম্ভীর প্রশ্নের উত্তর তিনি দেবেন? এই বৃদ্ধের পিপাসু মনের খোরাক যোগাবার যোগ্যতা তাঁর কি আছে? বিশেষ ক'রে বিশ্বের কর্ত্তা ভগবানের কথা। যেখানে সেখানে যা তা ভাবে তিনি তাঁর কথা বলতে সংকোচ বোধ করেন। বড্ড শ্রদ্ধা করেন ভবানী বাঁড়ুয্যে যাঁকে, তাঁর কথা এভাবে বলে বেড়াতে তাঁর বাধে। উপনিষদের সেই বাণী মনে পড়লো ভবানীর—

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।

নানাপ্রকার অজ্ঞানতায় ও মূঢ়তায় নিজেকে ডুবিয়ে রেখেও অজ্ঞানী ব্যক্তি ভাবে, "আমি বেশ আছি, আমি কৃতার্থ।"

তিনিও কি সেই দলের একজন নন?

এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর চেয়ে উপযুক্ত লোক নয় কি? এ কি সে দলের একজন নয়, যাঁরা :—

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংশো ভৈক্ষ্যচর্য্যাং চরন্ত
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা।

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে যে সকল শান্ত জ্ঞানী ব্যক্তি অরণ্যে বাস করেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে তপস্যায় নিযুক্ত থাকেন, সেই সব নিরাসক্ত নির্লোভ ব্যক্তি সূর্য্যদ্বারপথে সেইখানে যান,

যেখানে সেই অব্যয়াত্মা অমৃতময় পুরুষ বিদ্যমান।

ভবানী বাঁড়ুয্যে কি কামারের দোকানে ছুঁচ বিক্রি করতে আসেন নি।

তিনি বিনীতভাবে বললেন—আমার মুখে কি শুনবেন। তিনিই বিরাট, তিনি এই সমুদয় বিশ্বের স্রষ্টা। তিনি অক্ষর ব্রহ্ম, তিনিই প্রাণ, তিনি বাক্য, তিনিই মন।

তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদুবাঙ্ মনঃ

তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্যবিদ্ধি—

রামকানাই কবিরাজ সংস্কৃতে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নন্, কথা শুনতে শুনতে চোখ বুজে ভাবের আবেগে বলতে লাগলেন—আহা! আহা! আহা!

তিনি ভবানীর হাত দুটি ধরে বললেন—কি কথাই শোনালেন, জামাইবাবু। এ সব কথা কেউ এখানে বলে না। মনটা আমার জুড়িয়ে গেল। বড্ড ভালো লাগে এসব কথা। বলুন, বলুন।

ভবানী বাঁড়ুয্যে নম্রভাবে সশ্রদ্ধস্বরে বলতে লাগলেন :—

অনোরনীয়ান্মহতো মহীয়ান—

না আস্যজন্তোর্নিহিতঃ গুহায়াং

তিনি ক্ষুদ্র থেকেও ক্ষুদ্রতর, মহৎ থেকেও মহৎ। ইনি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ের মধ্যেই বাস করেন। আসীনো দূরং ব্রজতি, উপবিষ্ট হয়েও তিনি দূরে যান, শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ—শুয়ে থেকেও তিনি সর্ব্বত্র যান।

যদর্চ্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ

যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।

যিনি দীপ্তিমান, যিনি অণুর চেয়েও সূক্ষ্ম। যাঁর মধ্যে সমস্ত লোক রয়েচে, সেই সব লোকের অধিবাসীরা রয়েচে—

রামকানাই চিঁড়ে খেতে খেতে চিঁড়ের বাটিটা ঠেলে একপাশে সরিয়ে রেখেচেন, তাঁর ডান হাতে তখনো একটা আধ-খাওয়া কাঁচা লঙ্কা, মুখে বোকার মত দৃষ্টি, চোখ দিয়ে জল পড়চে। ছবির মত দেখাচ্চে সমস্তটা মিলে···ভবানী বাঁড়ুয্যে বিস্মিত হোলেন ওঁর জলে-ভরা টসটসে চোখের দিকে তাকিয়ে।

খালের ওপারে বাবলা গাছের মাথায় সপ্তমীর চাঁদ উঠেছে পরিষ্কার আকাশে। হুতুম-প্যাঁচা ডাকচে নলবনের আড়ালে।

ভবানী অনেক রাত্রে বাড়ী রওনা হোলেন। শরতের আকাশে অগণিত নক্ষত্র, দূরে বনান্তরে কাঠঠোকরার তন্দ্রাস্তব্ধ রব, ক্বচিৎ বা দু' একটা শিয়ালের ডাক—সবাই যেন তাঁর কাছে অতি রহস্যময় বলে মনে হচ্ছিল। আজ ভগবানের নিভৃত, নিস্তব্ধ রসে তাঁর অন্তর অমৃতময় হয়েচে বলে তাঁর বার বার মনে হতে লাগলো। রহস্যময় বটে, মধুরও বটে। মধুর ও রহস্যময় ও বিরাট ও সুন্দর ও বড় আপন সে দেবতা। একমাত্র দেবতা, আর কেউ নেই।

যিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস ও অগন্ধ, অনাদি ও অনন্ত, তাঁর অপূর্ব্ব আবির্ভাবে নৈশ আকাশ যেন থমথম করচে। এ সব পাড়াগাঁয়ে সেই দেবতার কথা কেউ বলে না। বধির বনতল ওদের পাশ-কাটিয়ে চলে যায়! নক্ষত্র ওঠে না, জ্যোৎস্নাও ফোটে না। সবাই আছে বিষয়সম্পত্তির তালে, দু'হাত এগিয়ে ভেরেণ্ডার কচা পুঁতে পরের জমি ফাঁকি দিয়ে নেবার তালে।

হে শান্ত, পরমব্যক্ত ও অব্যক্ত মহাদেবতা, সমস্ত আকাশ যেমন অন্ধকারে ওতপ্রোত, তেমনি আপনাতেও। তুমি দয়া করো, সবাইকে দয়া কোরো। খোকাকে দয়া কোরো, তাকে দরিদ্র করো ক্ষতি নেই, তোমাকে যেন সে জানে। ওর তিন মাকে দয়া কোরো।

তিলু স্বামীর জন্যে জেগে বসে ছিল। রাত অনেক হয়েচে, এত রাত্রে তো কোথাও থাকেন না উনি? বিলু ও নিলু বার বার ওদের ঘর থেকে এসে জিগ্যেস করচে। এমন সময় নিলু বাইরের দিকে উঁকি মেরে বললে—ঐ যে মূর্ত্তিমান আসচেন।

তিলু বললে—শরীর ভালো আছে দেখচিস তো রে?

—ব'লে তো মনে হচ্চে। বলি ও নাগর, আবার কোন বিন্দেবলীর কুঞ্জে যাওয়া হয়েছিল শুনি? বড়দিকে কি আর মনে ধরচে না? আমাদের না হয় না-ই ধরলো—

ভবানী এগিয়ে এসে বললেন—তোমরা সবাই মিলে এমন করে তুলেচ যেন আমি সুঁদর-বনে বাঘের পেটে গিয়েচি। রাত্রে বেড়াতে বেরোবার জো নেই? রামকানাই কবিরাজের বাড়ী ছিলাম।

বিলু বললে—সেখানে কি আজকাল গাঁজার আড্ডা বসে নাকি?

নিলু বললে—নইলি এত রাত অবধি সেখানে কি হচ্ছিল?

তিলু বোনেদের আক্রমণ থেকে স্বামীকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলে। কোনোরকমে ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে স্বামীর হাত পা ধোয়ার জল এনে দিলে। বললে—পা ধুয়ে দেবো? পায়ে যে কাদা!

—ওই মাল্সি কাঁটালতলার কাছে ভীষণ কাদা।

—কি খাবেন?

—কিছু না। চিঁড়ে খেয়ে এসেচি কবিরাজের বাসা থেকে।

—না খেলি হবে না। ওবেলার চালকুমড়োর সুক্তুনি রাখিতে বলেছিলেন—রয়েচে। সে কে খাবে? এক সরা সুক্তুনি রেখে দিইছিল নিলু। ও বড্ড ভালোবাসে আপনাকে—

—আচ্ছা, দাও। খোকনকে কি খাইয়েছিলে?

—দুধ।

—কাসি আর হয়নি?

—শুঁট্ গুঁড়ো গরমজলে ভিজিয়ে খেতি দিইচি।

ভবানী বাঁড়ুয্যে খেতে বসে তিলুকে সব কথা বললেন। তিলু শুনে বললে—উনি অন্য রকম লোক, সেদিনও ঐ কথা জিগ্যেস করেছিলেন মনে আছে? আপনি সেদিন পড়িয়ে-

ছিলেন—পুরুষার পরং কিঞ্চিৎ—তাঁর চেয়ে বড় আর কিছু নেই, এই তো মানে ?

—ঠিক।

—আমিও ভাবি—ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকি সব সময় পেরে উঠিনে। আপনি আমাকে আরও পড়াবেন। ভালো কথা, আমাদের ছু' আনা ক'রে পয়সা দেবেন।

—কেন ?

—কাল তেরের পালুনি। বনভোজনে যেতি হবে।

—আমিও যাবো।

—তা কি যায় ? কত বৌ-ঝি থাকবে। আচ্ছা, তেরের পালুনির দিন বিষ্টি হবেই, আপনি জানেন, ?

—বাজে কথা।

—বাজে কথা নয় গো। আমি বলচি ঠিক হবে।

—তোমারও ঐ সব কুসংস্কার কেন ? বৃষ্টির সঙ্গে কি কার্য্য-কারণ সম্পর্ক থাকতে পারে, বনে বসে খাওয়ার ?

—আচ্ছা, দেখা যাক। আপনার পণ্ডিতি কতদূর টেঁকে ?

ভাদ্র মাসের তেরোই আজ। ইছামতীর ধারে 'তেরের পালুনি' করবার জন্যে পাঁচপোতা গ্রামের বৌ-ঝিরা সব জড়ো হয়েচে। নালু পালের স্ত্রী তুলসীকে সবাই খুব খাতির করচে কারণ তার স্বামী অবস্থাপন্ন। তেরের পালুনি হয় নদীর ধারের এক বহু পুরনো জিউলি গাছের আর কদম গাছের তলায়। এই জিউলি আর কদম গাছ দুটো একসঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে আছে যে কতদিন ধরে, তা গ্রামের বর্ত্তমান অধিবাসীদের মধ্যে কেউ বলতে পারে না। অতি প্রাচীন লোকদের মধ্যে নীলমণি সমাদ্দারের মা বলতেন, তিনি যখন নববধূ রূপে এ গ্রামে প্রবেশ করেছিলেন আজ থেকে ছিয়াত্তর বছর আগে, তখনও তিনি তাঁর শাশুড়ি ও দিদিশাশুড়ির সঙ্গে এই গাছতলায় তেরের পালুনির বনভোজন করেছিলেন। গত বৎসর পঁচাশি বছর বয়সে নীলমণির মা দেহত্যাগ করেচেন।

মেয়েরা পাড়া হিসেবে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন জায়গায় বনভোজনের আয়োজন করচে। এখানে আজ রান্না হয় না, বাড়ী থেকে যার যেমন সঙ্গতি খাবার জিনিস নিয়ে এসে কলার পাতা পেতে খেতে বসে, মেয়েরা ছড়া কাটে, গান গায়, উলু দেয়, শাঁক বাজায়। এই বনভোজনের একটি চিরাচরিত প্রথা এই, তুমি সম্পন্ন গৃহস্থঘরের বৌ, তুমি ভালো ভালো জিনিস এনেচ খাবার জন্যে—যারা দারিদ্র্যের জন্যে তেমন কিছু আনতে পারে নি, তাদের তুমি ভাগ করে দেবে নিজের আনা ভালো খাবার। এ কেউ বলে দেয় না, কেউ বাধ্যও করে না—এ একটি অলিখিত গ্রাম্য-প্রথা বরাবর চলে আসচে এবং সবাই মেনেও এসেচে।

যেমন আজ হোলো ; তুলসী লাল কস্তা পেড়ে শাড়ী পরে যতীনের বৌ আর বোন নন্দরাণীর কাছে এসে দাঁড়ালো। আজ মেলামেশা ও ছোঁয়াছুঁয়ির খুব কড়াকড়ি না থাকলেও

বামুনবাড়ীর ঝি-বৌরা নদীর ধার ঘেঁষে খাওয়ার পাত পাতে, অন্যান্য বাড়ীর মেয়েরা মাঠের দিকে ঘেঁষে খেতে বসে। যতীনের বৌ এনেচে চালভাজা ও ঘোল, দুটি মাত্র পাকা কলা ও একঘটি ঘোল। তাই খাবে ওর ননদ নন্দরাণী আর ও নিজে। তুলসী এসে বললে—ও স্বর্ণ, কেমন আছ ভাই।

—ভালো দিদি। খোকা আসে নি?

—না, তাকে রেখে এ্যালাম বাড়ীতি। বড্ড দুষ্টুমি করবে এখানে আনলি। কি খাবা ও স্বর্ণ?

—এই যে। ঘোলটুকু আমার বাড়ীর। আজ তৈরী করিচি সকালে। তিনদিনের পাতা সর। একটু খাস তো নিয়ে যা দিদি।

তুলসী ঘোল নেওয়ার জন্যে একটা পাথরের খোরা নিয়ে এল, ওর হাতে দু'খানা বড় ফেনি বাতাসা আর চারটি মর্ত্তমান কলা।

—ও আবার কি দিদি?

—নাও ভাই, বাড়ীর কলা। বড় কাঁদি পড়েল আষাঢ় মাসে, বর্ষার জল পেয়ে ছড়া নষ্ট হয়ে গিয়েল।

তিলু বিলু খেতে এসেচে বনে, নিলু খোকাকে নিয়ে রেখেচে বাড়ীতে। ওদের সবাই এসে জিনিস দিচ্চে, খাতির করচে, মিষ্টি কথা বলচে। দুধ, চিনির মঠ, আখের গুড়ের মুড়কি, খই, কলা, নানা খাবার। ওরা যত বলে নেবো না, ততই দিয়ে যায় এ এসে, ও এসে। ওরাও যা এনেছিল, নীলমণি সমাদ্দারের পুত্রবধূর (ওদের অবস্থা গ্রামের মধ্যে বড় হীন) সঙ্গে সমানে ভাগ করেচে।

—ও দিদি, কি খাবি ভাই?

—দুটো চালভাজা এনেলাম তাই। আর একটা শসা আছে।

—দুধ নেই?

—দুধ ক'নে পাবো? গাই এখনো বিয়োয় নি।

—এখনো না? কবে বিয়োবে?

—আশ্বিন মাসের শেষাগোসা।

তিলুর ইঙ্গিতে বিলু ওদের দুজনকে চিঁড়ে, মুড়কি, বাতাসা, চিনির মঠ এনে দিলে। ষষ্ঠি চৌধুরীর স্ত্রী ওদের পাকাকলা দিয়ে গেলেন ছ' সাতটা।

ফণি চক্কত্তির পুত্রবধূ বললে—আমার অনেকখানি খেজুরের গুড় আছে, নিয়ে আসচি ভাই।

তিলু বললে—আমি নেবো না ভাই, ওই ছোট কাকীমাকে দাও। অনেক মঠ আর বাতাসা জমেচে। বিধু দিদি এবার ছড়া কাটলে না যে? ছড়া কাটো শুনি।

বিধু ফণি চক্কত্তির বিধবা বোন, পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস—একসময়ে সুন্দরী বলে খ্যাতি ছিল এ গ্রামে। বিধু হাত নেড়ে বলতে আরম্ভ করলে:—

আজ বলেচে যেতে
পান সুপুরি খেতে
পানের ভেতর মৌরি-বাটা
ইস্কে বিস্কে ছবি আঁটা
কলকেতার মাথা ঘষা
মেদিনীপুরের চিরুণী
এমন খোঁপা বেঁধে দেবো
চাঁপাফুলের গাঁথুনি
আমার নাম সরোবালা
গলায় দেবো ফুলের মালা···

বিলু চোখ পাকিয়ে হেসে বললে—কি বিধুদিদি, আমার নামে বুঝি ছড়া বানানো হয়েচে? তোমায় দেখাচ্চি মজা—বলে,

চালতে গাছে ভোমরার বাসা
সব কোণ নেই তার এক কোণ ঠাসা—

তোমারে আমি—আচ্ছা, একটা গান কর না বিধুদিদি? মাইরি নিধুবাবুর টপ্পা একখান গাও শুনি—

বিধু হাত-পা নেড়ে ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগলো—

ভালোবাসা কি কথার কথা সই, মন যার সনে গাঁথা
শুকাইলে তরুবর বাঁচে কি জড়িতা লতা
মন যার সনে গাঁথা।

ও পাড়ার একটি অল্পবয়সী লাজুক বৌকে সবাই বললে—একটা শ্যামা-বিষয়ক গান গাইতে। বৌটি ভজগোবিন্দ বাঁড়ুয্যের পুত্রবধূ, কামদেবপুরের রত্নেশ্বর গাঙ্গুলীর তৃতীয়া কন্যা, নাম নিস্তারিণী। রত্নেশ্বর গাঙ্গুলী এদিকের মধ্যে একজন ভালো ডুগি-তবলা বাজিয়ে। অনেক আসরে বৃদ্ধ রত্নেশ্বরের বড় আদর। নিস্তারিণী শ্যামবর্ণা, একহারা, বড় সুন্দর ওর চোখদুটি, গলার সুর মিষ্টি। সে গাইলে বড় সু-স্বরে :—

নীলবরণী নবীনা বরুণী নাগিনী-জড়িত-জটা বিভূষিণী
নীলনয়নী জিনি ত্রিনয়নী কিবা শোভে নিশানাথ নিভাননী।

গান শেষ হোলে তিলু পেছন থেকে গিয়ে ওর মুখে একখানা আস্ত চিনির মঠ গুঁজে দিলো। বৌটির লাজুক চোখের দৃষ্টি নেমে পড়লো, বোধ হয় একটু অপ্রতিভ হোলো অতগুলি আমোদপ্রিয় বড় বড় মেয়েদের সামনে।

বললে—দিদি, ঠাকুরজামাইকে দিয়ে যান গে—

—তোর ঠাকুরজামাইকে তুই দেখেচিস নাকি?

বিলু এগিয়ে এসে বললে—কেন রে ছোট বৌ, ঠাকুরজামাইয়ের নাম হঠাৎ কেন? তোর

লোভ হয়েচে নাকি? খুব সাবধান। ওদিকি তাকাবি নে। আমরা তিন সতীনে ঝাঁটা নিয়ে দোরগোড়ায় বসে পাহারা দেবো, বুঝলি তো? ঢুকবার বাগ পাবি ক্যামন করে?

কাছাকাছি সবাই হি হি করে হেসে উঠলো।

এমন সময়ে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেল—ঠিক কি সেই সময়েই দেখা গেল স্বয়ং ভবানী বাঁড়ুয্যে রাঙা গামছা কাঁধে এবং কোলে খোকাকে নিয়ে আবির্ভূত।

নালু পালের স্ত্রী তুলসী বললে—ঐ রে! ঠাকুরজামাই বলতে বলতেই ওই যে এসে হাজির—

ভবানী বাঁড়ুয্যে কাছে এসে বললেন—বেশ! আমাদের ঘাড়ে ওকে চাপিয়ে দিয়ে—বেশ! ও বুঝি থাকে? ঘুম ভেঙেই মা মা চীৎকার ধরলো। অ'ত কষ্টে বোঝাই—তাই কি বোঝে?

খোকা জনতার দিকে বিভ্রান্তদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে বললে—মা—

বিলু ছুটে গিয়ে খোকাকে কোলে নিয়ে বললে—কেন, নিলু কোথায়? আপনার ঘাড়ে চাপানো হয়েচে কে বললে? নিলুর কোলে বসিয়ে দিয়ে আমি—

—বৌদিদিরা ডেকে পাঠালেন নিলুকে। বড়দাদার শরীর অসুখ করেচে—ও চলে গেল আমার ঘাড়ে চাপিয়ে—

বৌঝিরা ভবানীকে দেখে কি সব ফিস্‌ফিস্ করতে লাগলো জটলা করে। কেউ কথা বলবে না। সে নিয়ম এ সব অঞ্চলে নেই। প্রবীণা বিধু এগিয়ে এসে বললে—ও বড়-মেজ ছোটজামাইবাবু, সব বৌঝিরা বলচে, ঠাকুরজামাইকে আজ যখন আমরা পেয়ে গিইচি তখন আজ আর ছাড়্‌চি নে—আমাদের—

ভবানী বাঁড়ুয্যে কথা শেষ করতে না দিয়েই তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বললেন—না, মাপ করুন বিধুদিদি, আমি একা পেরে উঠবো না—বয়েস হয়েচে—

এই কথাতে একটা হাসির বন্যা এসে গেল বৌঝিদের মধ্যে। কারো চাপা হাসি, কেউ খিল খিল করে হেসে উঠলো- কেউ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ওদিকে, কেউ ঘোমটার আড়ালে খুক্ খুক্ করে হাসতে লাগলো—হাসির সেই প্লাবনের মধ্যে ভাদ্র অপরাহ্ণে নদীর ধারের কদম ডালে রাঙা রোদ আর ইছামতীর ওপারে কাশফুলের দুলুনি। কোথাও দূরে ঘুঘুর ডাক। নিস্তারিণীর কোলে খোকার অর্থহীন বকুনি। সব মিলিয়ে তেরের পালুনি আজ ভালো লাগলো নিস্তারিণীর। ঠাকুরজামাই কি আমুদে মানুষটি! আর বয়েস হোলেও এখনো চেহারা কি চমৎকার!

নতুন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নীলকুঠি পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। মিঃ ডক্কিন্‌সন্ বদলি হয়ে যাওয়ার পরে অনেক দিন কোনো ম্যাজিস্ট্রেট নীলকুঠিতে পদার্পণ করেন নি। কাজেই অভ্যর্থনার আড়ম্বর একটু ভালো রকমই হোলো। খুব খানাপিনা, নাচ ইত্যাদি হয়ে গেল। যাবার সময় নতুন ম্যাজিস্ট্রেট কেলম্যান্ সাহেব বড়সাহেবকে নিভৃতে কয়েকটি সদুপদেশ দিয়ে গেলেন।

—Do you read native newspapers ? You do ? Hard times are ahead, Mr. Shipton. Stuff some wisdom into the brains of your men. You understand ? I hope you will not mind my saying so ?

—Explain that to me.

—I will, presently.

আসল কথা ক্রমশঃ দিন খারাপ হচ্চে। দেশি কাগজওয়ালারা খুব হৈ চৈ আরম্ভ করেচে, হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজে হরিশ মুখুয্যে গরম গরম প্রবন্ধ লিখচে, রামগোপাল ঘোষ নীলকরদের বিরুদ্ধে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করচে, নেটিভরা মানুষ হয়ে উঠলো, সে দিন আর নেই, একটু সাবধানে সব কাজ করে যাও। আমাদের ওপর গবর্ণমেণ্টের গোপন সার্কুলার আছে—নীলসংক্রান্ত বিবাদে আমরা যেন, যতদূর সম্ভব, প্রজাদের পক্ষে টানি।

কোলম্যান্ সাহেবের মোট বক্তব্য হোলো এই।

পরদিন বড়সাহেব ডেভিড্ সাহেবকে ডেকে বললে সব কথা। ডেভিড্ বোধ হয় একটু অসন্তুষ্ট হোলো। বললে—You see, I can work and I can do with very little sleep and I have never wasted time on liking people. Perhaps I am not clever enough—

—No David, we have a stake down here, in this god-forsaken land. You see ? What I want to drive at is this :—

এমন সময়ে শ্রীরাম মুচি এসে বললে—সায়েব, বাইরে দপ্তরখানায় প্রজারা বসে আছে। খুব হাঙ্গামা বেধেচে। হিংনাড়া, রসুলপুরের বাগদিরা খেপেচে। তারা নাকি নীলির মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে নীলির চারা খেইয়ে ফেরেচে—

ডেভিড্ লাফিয়ে উঠে বললে—কনেকার প্রজা ? হিংনাড়া ? সাদেক মোড়ল আর ছিহরি সর্দ্দার ওই দুটো বদমাইশের দিকি আমার অনেকদিন থেকে নজর আছে; শাসন কি করে করতি হয় তা আমি জানি।

শিপ্‌টন্ সাহেব ভয়ানক রেগে বলে উঠলেন—The devil that is ! I will come in with you this time. Will you like to come on a mouse-hunt to-morrow morning ?

—Sure I will.

—I wonder whether I ever told you these thieving people drove off some of our horses from the village ?

—My stomach ! You never did.

—Will, be ready to-morrow morning. May be we would kill off the mice right away.

—Sure.

পরদিন সকালে এক অভিনব দৃশ্য দেখা গেল।

দুই ঘোড়ায় দুই সাহেব, পিছনে আর এক সাদা বড় ঘোড়ায় দেওয়ান রাজারাম রায়, আর একটা বাদামী রংয়ের ঘোড়ায় প্রসন্ন চক্কত্তি আমীন এক লম্বা সারিতে চলেছে—ওদের পিছনে কুঠির লাঠিয়ালদের সর্দ্দার রসিক মল্লিক। লোকে বুঝলে আজ একটা ভয়ঙ্কর দাঙ্গা-হাঙ্গামার ব্যাপার না হয়ে আর যায় না। হঠাৎ একস্থানে প্রসন্ন আমীন টুক করে নেমে পড়লো। হেঁকে রাজারামকে বললে—দেওয়ানজি, একটু এগিয়ে যান, ঘোড়ার জিন্‌টা ঢল হয়ে গেল, কষে নি—

তারপর মুখ উঁচু করে দেখলে, ওরা বেশ দু'কদম দূরে চলে গিয়েচে। প্রসন্ন চক্কত্তি ঘোড়াটা কাদের একটা সোঁদালি গাছে বেঁধে রাস্তা থেকে সামান্য কিছু দূরে অবস্থিত একখানা চালা-ঘরের বাইরে গিয়ে ডাকলে—গয়া, ও গয়া—

ভিতর থেকে গয়ার মা বরদা বাগ্‌দিনীর গলা শোনা গেল—কেডা গা বাইরে?

প্রসন্ন চক্কত্তি প্রমাদ গণলো। এ সময়ে বুড়ী থাকে না বাড়ীতে, কুঠিতে মেমসাহেবদের কাজ করতে যায়—ছেলে ধরা, ছেলেদের স্নান করানো এই সব। ও আপদ আজ এখন আবার—আঃ যতো হাঙ্গাম কি—প্রসন্ন চক্কত্তি গলা ছেড়ে বললে—এই যে আমি, ও দিদি—

—কেডা গা? আমীনবাবু? কি—এমন অসময়ে?

বলতে বলতে বরদা বাগ্‌দিনী এসে বাইরে দাঁড়ালো, বোধ হয় ধান সেদ্ধ করছিল—ধানের হাঁড়ির কালি হাতে মাখানো। মাথার ঝাঁটার মত চুলগুলো চুড়ো'র আকারে বাঁধা। মুখ অপ্রসন্ন।

প্রসন্ন চক্কত্তি বললে—কে? দিদি? আঃ, ভালোই হোলো। ঘোড়াটার পায়ে কি হয়েচে, হাঁটতে পারচে না। একটু নারকোল তেল আছে?

—না নেই। নারকোল তেল বাড়ন্ত—

—ও! তবে যাই।

বরদা বাগ্‌দিনী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রসন্ন আমীনের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে। প্রসন্ন চক্কত্তির কৈফিয়ৎ সে বিশ্বাস করেচে কিনা কে জানে। মেয়ের পেছনে যে লোকজন ঘোরাফেরা করে, সে বুঝি তা জানে না? কত অবাঞ্ছিত আবেদন ও প্রার্থনার জঞ্জাল সরিয়ে রাখতে হয় ঝাঁটা হাতে। কচি খুকি নয় বরদা বাগ্‌দিনী। আমীন মশায় বলে সন্দেহের অতীত এরা নয়, বয়স বেশি হয়েচে বলেও নয়। অনেক প্রৌঢ়, অনেক অল্পবয়সী, অনেক আত্মীয়কেও সে দেখলো। কাউকে বিশ্বাস নেই।

প্রসন্ন চক্কত্তি জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল।

ছিংনাড়া গ্রামের বাইরে চারিধারে নীলের ক্ষেত। এ সময় নীলের চারা বেশ বড় বড় হয়েচে। বড়সাহেব ছোটসাহেবকে ডেকে দেখিয়ে বললে—See what they are up to.

এমন সময়ে দেখা গেল লাঠি হাতে একটি জনতা বাগ্‌দিপাড়া থেকে বেরিয়ে মাঠের আলে আলে ক্রমশ এদিকে এগিয়ে আসচে।

দেওয়ান রাজারাম বললেন—সায়েব, ওরা ঘিরে ফেলবার মতলব করচে। চলুন আরও এগিয়ে—

ডেভিড্‌ বললেন—তুমি ফিরে যাও, এদের ঘরে আগুন দিতি হবে, লোকজন নিয়ে এসো।

রসিক মল্লিক লাঠিয়াল বললে—কিছু লাগবে না সায়েব। মুই এগিয়ে যাই, দাঁড়ান আপনারা—

বড়সাহেব বললে—You stay, আমি আর ছোটসায়েব যাইবেন। সড়কি আনিয়াছ?

—না সায়েব, সড়কি লাগবে না। মোর লাঠির সামনে একশো লোক দাঁড়াতে পারবে না। আপনি হঠে আসুন।

দেওয়ান রাজারাম ততক্ষণ ঘোড়া এগিয়ে হিংনাড়া গ্রামের উত্তর কোণের দিকে ছুটিয়েচেন। বড়সাহেব চেঁচিয়ে বললেন—রসিক তোমার সহিট যাইবে ডেওয়ান—

কিছুক্ষণ পরে খুব একটা চীৎকার ও আর্ত্তনাদ শোনা গেল। বাগ্‌দি পাড়ার ছোট ছেলেমেয়ে ও ঝি-বৌয়েরা প্রাণপণে চেঁচাচ্চে ও এদিক ওদিক দৌড়চ্চে। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ রামধন বাগ্‌দি রাস্তার ধারের একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে তামাক খাচ্ছিল, তার মাথায় লাঠির বাড়ি পড়তেই চীৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল, তার স্ত্রী চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো, লোকজন ছুটে এল, হৈ চৈ আরম্ভ হোলো।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল বাগ্‌দিপাড়ায় আগুন লেগেচে। লোকজন ছুটোছুটি করতে লাগলো। লাঠি-হাতে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে দৌড় দিল—নিজের নিজের বাড়ী অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে সামলাতে। এটা হোলো দেওয়ান রাজারামের পরামর্শ। বড়সায়েবকে ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখে জনতা আগেই পলায়নপর হয়েছিল, কারণ বড়সায়েবকে সবাই যমের মত ভয় করে। ছোটসায়েব যতই বদমাইশ হোক, অত্যাচারী হোক, বড়সায়েব শিপ্‌টন্‌ হোলো আসল কূটবুদ্ধি শয়তান। কাজ উদ্ধারের জন্য সে সব করতে পারে। জমি বেদখল, জাল, ঘর জ্বালানি, মানুষ-খুন কিছুই তার আটকায় না। তবে বড়সায়েবের মাথা হঠাৎ গরম হয় না। ছোটসায়েবের মত সে কাণ্ডজ্ঞানহীন নয়, হঠাৎ যা তা করে না। কিন্তু একবার যদি সে বুঝতে পারে যে এই পথে না গেলে কাজ উদ্ধার হবে না, সে পথ সে ধরবেই। কোনো হীন কাজই তখন তার আটকাবে না।

আগুন তখুনি লোকজন এসে নিভিয়ে ফেললে। আগুন দেওয়ার আসল উদ্দেশ্য ছিল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা, সে উদ্দেশ্য সফল হোলো। রসিক মল্লিককে সকলে বড় ভয় করে, সে জাতিতে নমঃশূদ্র, দুর্দ্ধর্ষ লাঠিয়াল ও সড়কি-চালিয়ে। আজ বছর আট-দশ আগে ও নিজের এক ছেলেকে শিয়াল ভেবে মেরে ফেলেছিল সড়কির খোঁচায়। সেটা ছিল পাকা কাঁটালের সময়। ওদের গ্রামের নাম নূরপুর, মহম্মদপুর পরগণার অধীনে। ঘরের মধ্যে পাকা কাঁটাল ছিল দরমার বেড়ায় গায়ে ঠেস দেওয়ানো। ন' বছরের ছোট ছেলে সন্দেবেলা ঘরের বেড়ার

বাইরে বসে বেড়া ফুটো করে হাত চালিয়ে কাঁটাল চুরি করে খাচ্ছিল। রসিক খস্‌খস্‌ শব্দ শুনে ভাবলে শিয়ালে কাঁটাল চুরি করে খাচ্চে। সেই ছিদ্রপথে ধারালো সড়কির কাঁটাওয়ালা ফলা নিপুণ চালনায় অব্যর্থভাবে লক্ষ্যবিদ্ধ করলো। বালক-কণ্ঠের মরণ-আর্ত্তনাদে সকলে রেড়ির তেলের পিদীম হাতে ছুটে গেল। হাতে-মুখে কাঁটালের ভুতুড়ি আর চাঁপি মাথা ছোট্ট ছেলে চিৎ হয়ে পড়ে আছে, বুক দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত উঠে মাটি ভাসিয়ে দিচ্চে। চোখের দৃষ্টি স্থির, হাতের বাঁধন আল্‌গা কেবল ছোট্ট পা দুখানা তখনো কোনো কিছুকে বাধা দেওয়ার ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্চে আবার পিছিয়ে আসছে। সব শেষ হয়ে গেল তখুনি।

রসিক মল্লিক সে রাত্রের কথা এখনো ভোলে নি। কিন্তু আসলে সে দস্যু, পিশাচ। টাকা পেলে সে সব করতে পারে। রামু সর্দ্দারকে সে-ই সড়কির কোপে খুন করেছিল বাঁধালের দাঙ্গায়। নেবাজি মণ্ডলের ভাই সাতু মণ্ডলকে চালকী গ্রামের খড়ের মাঠে এক লাঠির ঘায়ে শেষ করেছিল।

এ হেন রসিক মল্লিক ও বড়সাহেবকে একত্র দেখে বাগ্‌দিপাড়ার লোক একটু পিছিয়ে গেল।

রসিক হাঁক দিয়ে ডেকে বললে—কোথায় রে তোদের ছিহরি সর্দ্দার! পাঠিয়ে দে সামনে। বড়সায়েবের হুকুম, তার মুণ্ডুটা সড়কির আগায় গিঁথে কুঠিতি নিয়ে যাই! মায়ের দুধ খেয়ে থাকিস তো সামনে এসে দাঁড়া ব্যাটা শেয়ালের বাচ্চা! এগিয়ে আয় বুনো শুওরের বাচ্চা! এগিয়ে আয় নেড়ি কুকুরের বাচ্চা! তোর বাবারে ডেকে নিয়ে আয় মোর সামনে, ও হারামজাদা!

ছিহরি সর্দ্দার লাঠি হাতে এগিয়ে আসছিল, তার বৌ গিয়ে তাকে কাপড় ধরে টেনে না রাখলে সে এগিয়ে আসতে ভয় পেতো না—তবে খুব সম্ভবতঃ প্রাণটা হারাতো। রসিক মল্লিকের সামনে সে দাঁড়াতে পারতো না। খুন-জখম যার ব্যবসা, তার সামনে নিরীহ গৃহস্থ লাঠিয়াল কতক্ষণ দাঁড়াবে?

ছোটসাহেব বললে—রসিক, ব্যাটা ছিহরি আর সাদেককে ধরে আনতি পারবা?

বড়সাহেবের মেজাজ এতক্ষণে কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে, সে বললে—I am afraid that would not be quite within the bounds of law. Let us return.

পরে হেসে বললেন—Sufficient unto the day—the evil thereof

ছোটসাহেব মনে মনে চটলো বড়সাহেবের ওপর—ভাবলে সে বড়সাহেবের কথার শেষে বলে—Amen! কিন্তু সাহসে কুলিয়ে ওঠে না।

দেওয়ান রাজারাম ততক্ষণে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়েচেন কুঠির দিকে। প্রসন্ন চক্কত্তিও সেই সঙ্গে ফিরছিল, কিন্তু সে একটি সুঠাম তন্বী ষোড়শী বধূকে আলুথালু অবস্থায় বাঁশবনের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে দেখে সেখানে ঘোড়া দাঁড় করালে। কাছে লোকজন ছিল না কেউ। বৌটি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বাঁশবনের ওদিকে ঘুরে যাবার চেষ্টা করতে প্রসন্ন চক্কত্তি গলার সুরকে যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে জিজ্ঞেস্ করলে—কেডা গা তুমি?

উত্তর নেই।

—বলি, ভয় কি গা? আমি কি সাপ না বাঘ! তুমি কেডা?

উত্তর নেই। আর্ত্ত কান্নার শব্দ শোনা গেল।

প্রসন্ন আমীন চট্ করে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখে ঘোড়াটা বাঁশঝাড়ের ওপারে বৌটির কাছ ঠেসে চালিয়ে দিলে। কিন্তু সেও বাগ্‌দিপাড়ার বৌ, বেগতিক বুঝে সে এক মরীয়ার চীৎকার ছেড়ে দৌড়ে বেশি জঙ্গলের দিকে পালালো। সে কাঁটাবনের মধ্যে ঘোড়া চালানো সম্ভব নয়। সুতরাং ফিরতেই হোল প্রসন্ন চক্কত্তিকে। বাগ্‌দিপাড়ার বৌ-ঝি এমন সুঠাম দেখতে কেন যে হয়? ওদের মধ্যে দু'একটা যা চোখে পড়ে এক-এক সময়! না, সত্যি। ভদ্রলোকের মধ্যে অমন গড়ন-পিটন—হ্যাঁ, ঢাকের কাছে টেমটেমি।

বড়সাহেব ছিহরি সর্দ্দারকে বললে—টোমার মতলব কি আছে?

—নীল মোরা আর বোনবো না সায়েব। মোদের মেরেই ফেলুন আর যে সাজাই ছান।

—ইহার কারণ কি আছে?

—কারণ কি বলবো, মোদের ঘরে ভাত নেই, পরনে বস্তর নেই ঐ নীলির জন্যি। মা কালীর দিব্যি নিয়ে মোরা বলিচি, নীল আর বোনবো না।

—কি পাইলে নীল বুনিটে ইচ্ছা আছে?

—নীল আর বোনবো না, ধান করবো। যত ধানের জমিতি আপনাদের আমীন গিয়ে দাগ মেরে আসবে, মোরা ধান বুনতি পারিনে। আপনারা নিজেদের জমিতি লাঙ্গল গরু কিনে নীলের চাষ করো—কেউ আপত্য করবে না। প্রজার জমি জোর করে বেদখল করে নীল করবা কেন সায়েব?

—টোমারে পাঁচশো টাকা বকশিশ দিবো। তুমি নীল বুনিটে বাধা দিও না। প্রজা হাট করিয়া ডাও।

—মাপ করবেন সায়েব। মোর একার কথায় কিছু হবে না। মুই আপনারে বলচি শুনুন, তেরোখানা গাঁয়ের লোক একস্তরে হয়ে জোট পেকিয়েচে। ভবানীপুর, নাটাবেড়ে, হুদো-মানিককোলির নীলকুঠির রেয়েতেরাও জোট পেকিয়েচে। হাওয়া এসেচে পূবদেশ থেকে আর দক্ষিণ থেকে।

বড়সাহেব এ সমস্ত সংবাদ জানেন। সেদিনকার সেই অভিযানের পর তাই তিনি আজ ছিহরি সর্দ্দারকে কুঠিতে ডেকেছিলেন অনেক কিছু আশ্বাস দিয়ে। ছিহরি এ রকম বেঁকে দাঁড়াবে তা বড়সাহেব ভাবেন নি।

তবুও বললেন—টুমি আমার কাছে চলিয়া আসিবে। চেষ্টা করিয়া ডেখো। অনেক টাকা পাইবে। কাছারিতে চাকুরী করিতে চাও?

—না সায়েব। মোর সাত পুরুষ কখনো চাকুরী করি নি। আর আপনাদের এট্টা কথা

বলি সায়েব। মুই একা এ ঝড় সামলাতি পারবো না। জেলা জুড়ে ঝড় উঠেছে, একা ছিহরি সর্দার কি করবে? আপনি বুঝে ভাখো সায়েব—একা মোরে দোষ দিও না। মুই কুঠির অনেক নুন খেইচি—তাই সব কথা খুলে বললাম।

ডেভিড্ সাহেবকে ডেকে বড়সাহেব বললে—I say, David, this man swims in shallow water. Let him go safely out and see that no harm is done to him. Not worth the trouble.

সেদিন সন্ধ্যার পরে নীলকুঠিতে একটি গুপ্ত বৈঠক আহূত হোলো।

অনেক খবর এনে দিয়েচে নীলকুঠির চরের দল। জেলার প্রজাবর্গ ক্ষেপে উঠেচে, তারা নীলের দাদন আর নেবে না। সতেরোটা নীলকুঠি বিপন্ন। গ্রামে গ্রামে প্রজাদের সভা হচ্চে, পঞ্চায়েৎ বৈঠক বসচে। কোনো কোনো মৌজায় নীলের জমি ভেঙে প্রজারা ডাঁটা-শাক আর তিল বুনেচে—এ খবরও পাওয়া গিয়েচে। বৈঠকে ছিলেন কাছাকাছি নীলকুঠির কয়েকজন সাহেব ম্যানেজার, এ কুঠির শিপ্‌টন্ আর ডেভিড্। কোনো গোপনীয় ও জরুরী বৈঠকে ওরা কোনো নেটিভকে ডাকে না। ম্যাপিসন্ সাহেব বলেচে—No native need be called, we shall make our decision known to them if necessary.

কোল্ডওয়েল্ সাহেব বললে—ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আরো বন্দুকের জন্যে বলো। এ সময়ে বেশী আগ্নেয়াস্ত্র রাখা উচিত প্রত্যেক কুঠিতে, অনেক বেশ করে।

কোল্ডওয়েল্ ভবানীপুর নীলকুঠির অতি দুর্দান্ত ম্যানেজার। প্রজার জমি বেদখল করবার অমন নিপুণ ওস্তাদ আর নেই। খুন এবং বেপরোয়া কাজে ওর জুড়ি মেলা ভার। তবে কিছুদিন আগে ওর মেম চলে গিয়েচে ওর এক বন্ধুর সঙ্গে, তার কোনো পাত্তাই নেই, সেজন্যে ওর মন ভালো নয়।

শিপ্‌টন্ সাহেব বললে—These blooming native leaders should be shot like pigs.

কোল্ডওয়েল্ বললে—I say, you can go on with your pig-sticking afterwards. Now decide what we should do with our Impression Registers. That is why we have met to-day.

এই সময়ে শ্রীরাম মুচি বেয়ারা শেরির বোতল ও অনেকগুলো ডিক্যাণ্টার ট্রেতে সাজিয়ে এনে ওদের সামনে রেখে দিলে।

কোল্ডওয়েল্ বললে—No sherry for me. I will have a peg of neat brandy. Now, Shipton, old boy, let us see how you keep your Impression Registers. This man of your is reliable? Now a-days, walls have ears, you see.

শিপ্‌টন্ শ্রীরামের দিকে চেয়ে বললে—Oh, he is all right.

দাদন খাতা নীলকুঠির অতি দরকারী দলিল। সমস্ত প্রজার টিপসই নিয়ে অনেক যত্নে

এই খাতা তৈরি করা হয়। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট এসে এই দাদন খাতা পরীক্ষা করে থাকেন। অধিকাংশ কুঠিতে দাদন খাতা দু'খানা করে রাখা থাকে, ম্যাজিস্ট্রেটকে আসল খাতাখানা দেখানো হয় না।

শিপ্‌টন্ দাদন-খাতা পূর্ব্বেই আনিয়ে রেখেছিল টেবিলে, খুলে সবাইকে দেখালে।

ম্যালিসন্ বললে—This is your original register ?

—Yes. The other one is in the office. This I keep always under lock and key.

—Sure. You have got this week's Englishman ?

—Sure I have,

কোল্‌ডওয়েল্ বললে—It is funny, a deputation waited on the Lieutenant Governor the other day. The blooming old fellow has given them a benediction.

শিপ্‌টন বললে—As he always does, the old padre !

তারপর খুব জোর পরামর্শ হোলো সাহেবদের। পরামর্শের প্রধান ব্যাপার হোলো, প্রজাবিদ্রোহ শুরু হয়ে গিয়েচে—সাহেবদের নীলকুঠি আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কতটা। হোলে স্ত্রীলোক ও শিশুদের চুয়াডাঙ্গার বড় কুঠিতে রাখা হবে, না কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হবে।

শিপ্‌টন্ বললে—I don't think the beggars would dare as much, I will keep them here all right.

কোল্‌ডওয়েল্ বললে—Please yourself, old boy. You are the same bull-headed Johnny Shipton as ever. Pass me a glass of sherry, Mallison, will you.

ম্যালিসন্ ভুরু কুঁচকে হেসে বললে—Funny, is it not ? You said you would have to do nothing with sherry, did you not ?

—Sure I did, I was feeling out of sorts, with the worries and troubles and also with the long ride throuh drenching rain. বেয়ারা, ইদারে আইসো। লেবো আনিটে পারিবে ?

শিপ্‌টন্ শ্রীরাম মুচির দিকে চেয়ে বললে—বাগান হইটে লেবো লইয়া আসিবে সাহেবের জন্ম। এক ডজন, দশটা আর দুইটা, লেবো লইয়া আসিবে। বুঝিলে ?

—হাঁ সায়েব।

শ্রীরাম মুচি চলে গেলে সাহেবদের আরো কিছুক্ষণ পরামর্শ চললো। ঠিক হোলো চুয়াডাঙ্গার বড় কুঠির ম্যানেজারের কাছে লোক পাঠানো হবে কাল সকালেই। আগ্নেয়াস্ত্র সেখানে কি পরিমাণে আছে। সকল কুঠির মেম ও শিশুদের সেখানে পাঠানো ঠিক হয়েচে,

সে কথা জানিয়ে দিতে হবে—সেজন্যে যেন বড়-কুঠির ম্যানেজার তৈরি থাকে।

ম্যালিসন্ শিপ্‌টন্‌কে বললে—You oughtn't to be alone at present.

শিপ্‌টন্ মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললে—What do you mean ? Alone ? Why, heven't I my own men ? I must fight this out by myself. Leave everything to me.

—Well, all right then.

সেদিন রাত্রে সাহেবেরা সকলেই কুঠিতেই থাকলো। অন্য সময় হোলে চলে যেতো যে যার ঘোড়ায় চড়ে—কিন্তু এসময় ওরা সাহস করলে না একা একা যেতে।

শেষরাত্রে খবর এল রামনগরের কুঠি লুঠ করতে এসেছিল বিদ্রোহী প্রজার দল। বন্দুকের গুলির সামনে দাঁড়াতে না পেরে হটে গিয়েচে। রামনগরের কুঠি এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে, তার ম্যানেজার এ্যানড্রু সায়েব কত মেয়ের যে সতীত্ব নষ্ট করেচে তার ঠিক নেই। স্বজাতি মহলেও সেজন্য তাকে অনেকে সুনজরে দেখে না। ম্যালিসন্ শুনে মুখ বিকৃত করে ভুরু কুঁচকে বললে—Oh, the old beggar !

শিপ্‌টনের দিকে তাকিয়ে বললে—You don't see anything singnificant in that ?

শিপ্‌টন্ বললে—I don't see what you mean. I cannot carry on this indigo business here without my men, without that wily old dewan to help us, you see ? They will not fail me at least, I know.

—Very kind of them, if they don't.

সাহেবরা ছোট-হাজারি খেলে বড় অদ্ভুত ধরণের। এক এক কাঁসি পান্তা ভাত এক ডজন লেবুর রস মেখে। রাত্রের টেবিলের ঠাণ্ডা হ্যাম। একটা ক'রে আস্ত শসা জল-পিছু। চার-পাঁচটা করে খয়রা মাছ সর্ষের তেলে ভাজা। বহুদিন বাংলা দেশের গ্রামে থাকবার ফলে ওদের সকলেরই আহার বিহার এদেশের গ্রাম্য লোকের মত হয়ে গিয়েচে। ওরা আম-কাঁটালের রস দিয়ে ভাত খায়। অনেকে হুঁকোয় তামাক খায়। নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে মেশে, অনেককে ঘরেও রাখে। ওদের দেখে বিলেত থেকে নবাগত বন্ধুবান্ধবেরা মুখ বেঁকিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে—'Gone native !' ওরা গ্রাহ্যও করে না।

বেলা বাড়লে সাহেবরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। দিন চারেকের মধ্যে সংবাদ এল, আশপাশের কুঠির সব সাহেব স্ত্রীপুত্রদের সরিয়ে দিয়েচে চুয়াডাঙ্গার কুঠিতে অথবা কলকাতায়। দেওয়ান রাজারাম সর্ব্বদা ঘোড়ায় করে কুঠির চারিদিকের গ্রামে বেড়িয়ে সংবাদ সংগ্রহ করেন। তিনিই একদিন সন্ধান পেলেন আজ সাতখানা গ্রামের লোক একত্র হয়ে নীলকুঠি লুঠ করতে আসবে গভীর রাত্রে। খবরটা তাঁকে দিলে নবু গাজি। একসময়ে সে বড়সাহেবের কাছ থেকে সুবিচার পেয়েছিল, সেটা সে বড় মনে রেখেছিল। বললে—দেওয়ান বাবু, আর যে সায়েবের যা খুশি হোক গে, এ সায়েব লোকটা মন্দ নয়। এর কিছু না হয়—

দেওয়ান সাহেবদের বলে লোকজন তৈরি করে রাখলেন। দুই সাহেব বন্দুক নিয়ে এগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। থানায় কোনো সংবাদ দিতে বড় সাহেবের হুকুম ছিল না। সুতরাং পুলিস আসে নি।

রাত দশটার পরে ইছামতীর ধারের পথে একটা হল্লা উঠলো। সাহেবেরা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করলো। দেওয়ান রাজারাম দাঁড়িয়েছিলেন বালাখানা ও সমাধিস্থানের মাঝখানের ঝাউগাছের শ্রেণীর অন্ধকারে, সঙ্গে ছিল সড়্‌কি-হাতে রসিক মল্লিক ও তার দলবল।

রসিক মল্লিক বললে—দোহাই দেওয়ানমশাই, এবার আমারে একটু দেপতি ভান। ওদের একটু সাম্‌পানা করি। ওদের চুলুহুনি মাঠো যদি না করি এবাব, তবে মোর বাবার নাম তিরভঙ্গ মল্লিক নয়—

—দূর ব্যাটা, থাম্‌। কতকগুলো মানুষ খুন হোলেই কি হয়? অন্য জায়গায় হলি চলতো, এ যে কুঠির বুকির ওপরে। পুলিস তদন্ত করলি, তখন মুশ্‌কিল।

—লাশ রাতারাতি গুম্‌ ক'রে ফেলে দেবানি। সে ভারটা মোর ওপর দেবেন দেওয়ানমশাই—

—আচ্ছা, থাম এখন—যখন হুকুম দেবো, তার আগে সড়কি চালাবি নে—

দিব্যি জ্যোৎস্নারাত। রাজারামের মনে কেমন একটা অদ্ভুত ভাব। যা কখনো তাঁর হয় না। ঝাউগাছের ডালের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েচে মাটির রাস্তার বুকে। তিলু বিলু নিলুর বিয়ে দিয়েচেন, ভাগ্নের মুখ দেখেচেন। জীবনের সব দায়িত্ব শেষ করেচেন। আজ যদি এই দাঙ্গায় এ পথের ওপর তাঁর দেহ সড়কি-বিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে, কোনো অপূর্ণ সাধ থাকবে তাঁর মনে? কিছু না। জগদম্বার ব্যবস্থা তিনি যথেষ্ট করেচেন। শত লুক, বিষয় ধানীজমি যা আছে, একটা বড় সংসার চলে। জমিদারির আয় বছরে—তা তিনশো-চারশো টাকা। রাজার হাল। নিভাবনায় মরতে পারবেন তিনি। সাহেবদের এতটুকু বিপদ আসতে দেবেন না। অনেক দিনের নুন খেয়েচেন।

বললেন—রসিক, ব্যাটা তৈরি থাক। তবে খুনটা, বুঝলি নে?—যখন গায়ের ওপর এসে পড়বে।

ঝাউতলার অন্ধকার ও জ্যোৎস্নার জালবুনুনি পথে অনেক লোকের একটা দল এগিয়ে আসচে, ওদের হাতে মশাল—সড়্‌কি ও লাঠিও দেখা যাচ্ছে। রসিক হাঁকার দিয়ে বললে—এগিয়ে আয় ব্যাটারা—সামনে এগিয়ে আয়—তোদের ভুঁড় ফাঁসাই—

কতকগুলো লোক এগিয়ে এসে বললে—কেডা? রসিকদাদা?

—দাদা না তোদের বাবা—

—অমন কথা বলতি নেই—ছিঃ, এগিয়ে এসো দাদা—

রসিককে হঠাৎ দেওয়ান রাজারাম আর পাশে দেখতে পেলেন না, ইতিমধ্যে সে কখন অদৃশ্য হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল আধ-জ্যোৎস্না আধ-অন্ধকারে। অল্পক্ষণ পরে দেখলেন সামনের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক ছুটচে—আর ওদের মাঝখানে চর্কির মত কি একটা

ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্চে, কিসের একটা ফলকে দু'চার বার চকচকে জ্যোৎস্না খেলে গেল! কি ব্যাপার? রসিক মল্লিক নাকি? ইস্! করে কি?

খুব একটা হল্লা উঠলো কুঠির হাতার বাইরে। তারপরেই সব নিস্তব্ধ। দূরে শব্দ মিলিয়ে গেল। কেউ কোথাও নেই। সাহেবদের ঘোড়ার শব্দ একবার যেন রাজারাম শুনলেন বালাখানার উত্তরের পথে। এগিয়ে গেলেন রাজারাম। ঝাউতলার পথে, এখানে ওখানে লোক কি ঘাপ্‌টি মেরে আছে নাকি? না। ওগুলো কি?

মানুষ মরে পড়ে আছে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ! রসিক ব্যাটা এ করেচে কি! সব সড়কির কোপ। শেষ হয়ে গিয়েচে সব ক'টা।

—ও রসিক? রসিক?

রাজারামের মাথা ঝিম-ঝিম করে উঠলো। হাঙ্গামা বাধিয়ে গিয়েচে রসিক মল্লিক। এই সব লাশ এখনই গুম করে ফেলতে হবে। সাহেবদের একবার জানানো দরকার।

আধঘণ্টা পরে। গভীর পরামর্শ হচ্চে দেওয়ান ও ছোটসাহেবের মধ্যে।

ডেভিড্ বললে—পাঁচটা লাশ লুকুবে কনে? সেটা বোঝো আগে। বাঁওড়ের জলে হবে না। বাঁধালের মুখে লাশ বাধবে এসে।

—তা নয়, সায়েব। কোথাও ভাসাবো না। হীরে ডোম আর তার শালা কালুকে আপনি হুকুম দিন। আমি এক ব্যবস্থা ঠিক করিচি—

—কি?

—আগে করে আসি। তারপর এত্তেলা দেবো। আপনি ওদের হুকুম দিন। রাত থাকতি থাকতি কাজ সারতি হবে। ভোরের আগে সব শেষ করতি হবে। রক্ত থাকলি ধুয়ে ফেলতে হবে পথের ওপর। রসিক ব্যাটাকে কিছু জরিমানা করে দেবেন কাল।

সেই রাত্রেই সব কাজ মিটিয়ে ভোরের আগে রাজারাম বাড়ী এসে শুয়ে রইলেন। জগদম্বা জিগ্যেস করলেন—বাবা এত কাজের ভিড়? রাত তো শেষ হতি চললো—

রাজারাম বললেন—হিসেব নিকেশের কাজ চলচে কিনা। খাতাপত্তরের ব্যাপার। এ কি সহজে মেটে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে খোকাকে নিয়ে পাড়ায় মাছ খুঁজতে বার হয়েছিলেন। খোকা বেশ সুন্দর ফুটফুটে দেখতে। অনেক কথা বলে, বেশ টরটরে।

ভবানী খোকাকে বলেন—ও খোকন, মাছ খাবি?

খোকা ঘাড় নেড়ে বলে—মাছ।

—মাছ?

—মাছ।

আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখলেন যদু জেলে মাছ নিয়ে আসচে। যদু তাঁকে দেখে প্রণাম করে বললে—মাছ নেবেন গা?

—কি মাছ ?

—একটা ভেটকি মাছ আছে, সের দেড়েক হবে।

—কত দাম দেবো ?

—তিন আনা দেবেন।

—বড্ড বেশি হয়ে গেল না ?

যদু জেলে কাঁধ থেকে বোঠেখানা নামিয়ে বললে—বাবু, বাজারডা কি পড়েছে ভেবে দেখুন দিকি। ছেলেবেলায় আউশ চালের পালি ছেল দু'পয়সা। তার থেকে উঠলো এক আনা। এখন ছ'পয়সা। মোর সংসারে দু'টি প্রাণী খেতি। এককাঠা চালির কম একবেলা হয় না। দু'বেলা তিন আনা চালেরই দাম যদি দিই, তবে নুন তেল, তরকারি, কাপড়, কবিরাজ, এসোজন-বোসোজন কোথেকে করি ? সংসার আর চালাবার জো নেই জামাই-ঠাকুর, আমাদের মত গরীব লোকের আর চলবে না—

ভবানী বাঁড়ুয্যে দ্বিরুক্তি না করে মাছটা হাতে নিয়ে ফিরলেন বাড়ীর দিকে। বিলু ও নিলু আগে ছুটে এল। বিলু স্বামীর হাত থেকে মাছটা ছিনিয়ে নিয়ে বললে—কি মাছ ? ভেটকি না চিতল ? বাঃ—

নিলু বললে—চমৎকার মাছটা। ও খোকা মাছ খাবি ? আয় আমার কোলে—

খোকা বাবার কোলেই এঁটে রইল। বললে—বাবা—বাবা—

সে বাবাকে বড্ড ভালোবাসে। বাবার কোলে সব সময় উঠতে পারে না বলে বাবার কোলের প্রতি তার একটি রহস্যময় আকর্ষণ বিদ্যমান। বিলু চোখ পাকিয়ে বললে—আসবি নে ?

—না।

—থাক, তোর বাবা যেন তোরে খেতি দ্যায় ভাত রেঁধে।

—বাবা।

—মাছ খাবি নে তো ?

—খাই।

—খাই তো আয়—

খোকা আবেদনের সুরে কাঁদো কাঁদো মুখে বাবার দিকে তাকিয়ে বললে—ওই দ্যাখো—

অর্থাৎ আমায় জোর করে নিয়ে যাচ্চে তোমার কোল থেকে। ভবানী জানেন খোকা এই কথাটি আজ অল্পদিন হোলো শিখেচে, এককথা বড্ড ব্যবহার করে। বললেন—থাক আমার কাছে, ওকে একটু বেড়িয়ে আনি মহাদেব মুখুয্যের চণ্ডীমণ্ডপ থেকে।

নিলু বললে—মাছটার কি করবো বলে যান—

—যা হয় কোরো—তিলু কোথায় ?

—বড়ি দিতি গিয়েচে বড়দার বাড়ীর ছাদে। আপনার বাড়ীর তো আর ছাদ নেই, বড়ি দেবে কোথায় ? কবে কোঠা করবেন ?

—যাও না, দাদাকে গিয়ে বলো না, কুলীন কুমারী উদ্ধার করেচি, কিছু টাকা বার করতে লোহার সিন্দুক থেকে। দোতলা কোঠা তুলে ফেলচি। বিয়ে যদি না করতাম, থাকতে যে থুবড়ি হয়ে, কে বিয়ে করতো?

—এর চেয়ে আমাদের দাদা গলায় কলসী বেঁধে ইছামতীর জলে ডুবিয়ে দিলি পারতেন। কি. বিয়েই দিয়েচেন—আহা মরি মরি! বুড়ো বর, তিন কাল গিয়েচে, এককালে ঠেকেচে—

—বিয়ে দিলেই পারতেন তো যুবো বর ধরে। তবে থুবড়ি হয়ে ঘরে ছিলে কেন এতকাল? উদ্ধার হোলেই তো পারতে। আমি পায়ে ধরে তোমাদের সাধতে গিয়েছিলাম?

—কান মলে দেবো আপনার—

বলেই নিলু ক্ষিপ্রবেগে হাত বাড়িয়ে স্বামার কানটার অস্বস্তিকর সান্নিধ্যে নিয়ে এসে হাজির করতেই বিলু ধমক দিয়ে বলে—এই! কি হচ্চে?

নিলু ফিক্ ক'রে হেসে মাছটা নিয়ে ছুটে পালালো। ভবানী খোকাকে নিয়ে পথে বার হয়েই বললেন—কোথায় যাচ্চি বল তো?

খোকা ঘাড় নেড়ে বললে—যাই—

—কোথায়?

—মাছ।

মহাদেব মুখুয্যের চণ্ডীমণ্ডপে যাবার পথে একটা বাবলাছের ওপর লতার ঝোপ, নিবিড় ছায়া সে স্থানটিতে, বাবলাগাছের ডালে কি একটা পাখী বাসা বেঁধেচে। ভবানী গাছতলার ছায়ায় গিয়ে খোকাকে কোল থেকে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন।

—ঐ স্থাখ খোকা, পাখী—

খোকা বলে—পাখী—

—পাখী নিবি?

—পাখী—

—খুব ভালো। তোকে দেবো।

খোকা কি সুন্দর হাসে বাবার মুখের দিকে চেয়ে। না, ভবানীর খুব ভালো লাগে এই নিষ্পাপ, সরল শিশুর সঙ্গ। এর মুখের হাসিতে ভবানী খুব বড় কি এক জিনিস দেখতে পান।

—নিবি খোকা?

—হ্যাঁ—

খোকা ঘাড় নেড়ে বলে। ভবানীর খুব ভালো লাগলো এই 'হ্যাঁ' বলা ওর। এই প্রথম ওর মুখে এই কথা শুনলেন। তাঁর কানে প্রথম উচ্চারিত ঋক্‌মন্ত্রের ন্যায় ঋদ্ধিমান ও সুন্দর।

—কটা নিবি?

—আক্‌খানা—

—বেশ একখানাই দেবো। নিবি?

খোকা ঘাড় দুলিয়ে বলে—হাঁ।

পরক্ষণেই বলে—বাবা—

—কি ?

—মা—

—তার মানে ?

—বায়ি—

—এই তো এলি বাড়ী থেকে। মা এখন বাড়ী নেই।

খোকা যে ক'টি মাত্র শব্দ শিখেচে তার মধ্যে একটা কথা হোলো 'ওখেনে'। এই কথাটা কারণে অকারণে সে প্রয়োগ ক'রে থাকে। সম্প্রতি সে হাত দিয়ে সামনের দিকে দেখিয়ে বললে—ওখেনে—

—ওখেনে নেই। কোথাও নেই।

—ওখেনে—

—না, চল বেড়িয়ে আসি—কোল থেকে নামবি ? হাঁটবি ?

—আঁটি—

খোকা ভবানীর আগে আগে বেশ গুট্ গুট্ ক'রে হাঁটতে লাগলো। খানিকটা গিয়ে আর যায় না। ভয়ের সুরে সামনের দিকে হাত দেখিয়ে বললে—ছিয়াল !

—কই ?

শিয়াল নয়, একটা বড় শামুক রাস্তা পার হচ্চে। ভবানী খোকার হাত ধরে এগিয়ে চললেন—চলো, ও কিছু নয়। খোকা তখনও নড়ে না, হাত দুটো তুলে দিলে কোলে উঠবে বলে। ভবানী বললেন—না, চলো, ওতে ভয় কি ? এগিয়ে চলো—

খোকার ভাবটা হোলো ভক্তের অভিযোগহীন আত্মসমর্পণের মত। সে বাবার হাত ধরে এগিয়ে চললো শামুকটাকে ডিঙিয়ে, ভয়ে ভয়ে যদিও, তবুও নির্ভরতার সঙ্গে। ভবানী ভাবলেন —আমরাও যদি ভগবানের ওপর এই শিশুর মত নির্ভরশীল হতে পারতাম ! কত কথা শেখায় এই খোকা তাঁকে। বৈষয়িক লোকদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে বাজে কথায় সময় নষ্ট করতে তাঁর যেন ভালো লাগে না আর।

এক মহান শিল্পীর বিরাট প্রতিভার অবদান এই শিশু। ওপরের দিকে চেয়ে বিরাট নক্ষত্রলোক দেখে তিনি কত সময় মুগ্ধ হয়ে গিয়েচেন। সে দিকে চেয়ে থাকাও একটি নীরব ও অকপট উপাসনা। পশ্চিমে তাঁর গুরুর আশ্রমে থাকবার সময় চৈতন্যভারতী মহারাজ কতবার আকাশের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতেন—ঐ দেখ সেই বিরাট অক্ষর পুরুষ—

অগ্নির্মূর্দ্ধা চাক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং
পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা—

অগ্নি যাঁর মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য, চক্ষু, দিকসকল কর্ণ, বেদসমূহ বাক্য, বায়ু প্রাণ, হৃদয় বিশ্ব, পাদদ্বয় পৃথিবী—ইনিই সমুদয় প্রাণীর অন্তরাত্মা।

তিনিই আকাশ দেখতে শিখিয়েছিলেন। তিনি চক্ষু ফুটিয়ে দিয়ে গিয়েচেন। তিনি শিখিয়েছিলেন যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বার হয়, তেমনি সেই অক্ষর পুরুষ থেকে অসংখ্য জীবের উৎপত্তি হয় এবং তাঁতেই আবার বিলীন হয়।

উপনিষদের সেই অমর বাণী।

এই শিশু সেই অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ, সুতরাং সেই অগ্নিই নয় কি? তিনি নিজেও তাই নয় কি? এই বনঝোপ, এই পাখীও তাই নয় কি?

এই নিষ্পাপ শিশুর হাসি ও অর্থহীন কথা অন্য এক জগতের সন্ধান নিয়ে আসে তাঁর কাছে। এই শিশু যেমন ভালোবাসলে তিনি খুশি হন, তিনিও তো ভগবানের সন্তান, তিনি যদি ভগবানকে ভালোবাসেন, ভগবানও কি তাঁর মত খুশি হন না?

তিনি বহুদিন চলে এসেচেন সাধুসঙ্গ ছেড়ে, সেখানে অমৃতনিস্যন্দিনী ভাগবতী কথা ব্যতীত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অন্য প্রসঙ্গ ছিল না, অসীম তারাভরা যামিনীর বিভিন্ন যামগুলি ব্যেপে, বিনিদ্র জ্ঞানী ও ভক্ত অপ্রমত্ত মন সংলগ্ন করে রাখতেন বিশ্বদেবের চরণকমলে। হিমালয়ের বনভূমির প্রতি বৃক্ষপত্রে যুগযুগান্তব্যাপী সে উপাসনার রেখা আঁকা আছে, আঁকা আছে তুষারধারার রজতপটে। তাঁদের অন্তর্মুখী মনের মৌন প্রশান্তির মধ্যে যে নিভৃতবনকুঞ্জ, সেখানে সেই পরম সুন্দর দেবতার উদ্দেশ্যে প্রেমার্ঘ্য নিবেদিত হোতো আকুল আবেগের সুরভিতে।

আরও উচ্চ স্তরের ভক্তদের স্বচক্ষে তিনি দেখেন নি, কিন্তু তাঁদের সন্ধান নেমে এসেচে তুষার স্রোত বেয়ে বেয়ে উচ্চতর পর্ব্বত শিখর থেকে, সে গম্ভীর সাধন-গুহার গহনে রথনাভির মত অবিচলিত ও সংযত আত্মা সকল অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন করেচেন জ্ঞানের শক্তিতে, প্রেমের শক্তিতে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বিশ্বাস করেন তাঁরা আছেন। তিনি সাধুদের মুখে শুনেচেন।

তাঁরা আছেন বলেই এই জুয়াচুরি, শঠতা, মিথ্যাচার, অর্থাসক্তি ভরা পৃথিবীতে আজও পাপপুণ্যের জ্ঞান আছে, ভগবানের নাম বজায় আছে, চাঁদ ওঠে, তারা ফোটে, বনকুসুমের গন্ধে অন্ধকার সুবাসিত হয়।

এই সব পাড়াগাঁয়ে এসে তিনি দেখচেন সবাই জমিজমা, টাকা, খাজনা, প্রজাপীড়ন, পরচর্চ্চা নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কখনো ভগবানের কথা তাঁকে জিজ্ঞেসও করে না, কেউ কোনোদিন সৎপ্রসঙ্গের অবতারণা করে না। ভগবান সম্বন্ধে এরা একেবারে অজ্ঞ। একটা আজগুবি, অবাস্তব বস্তুকে ভগবানের সিংহাসনে বসিয়ে পুজো করে কিংবা ভয়ে কাঁপে, কেবলই হাত বাড়িয়ে প্রার্থনা করে, এ দাও, ও দাও—সেই পরমদেবতার মহান সত্তাকে, তাঁর অবিচল করুণাকে জানবার চেষ্টাও করে না কোনদিন। কার বৌ কবে ঘোমটা খুলে পথ দিয়ে চলেচে, কোন্ ষোড়শী মেয়ে কার সঙ্গে নিভৃতে কথা বলেচে—এই সব এদের

আলোচনা। এমন একটা ভালো লোক নেই, যার সঙ্গে বসে দুটো কথা বলা যায়।—কেবল রামকানাই কবিরাজ আর বটতলার সেই সন্ন্যাসিনী ছাড়া। ওদের সঙ্গে ভগবানের কথা বলে সুখ পাওয়া যায়, ওরা তা শুনতেও ভালোবাসে। আর কেউ না এ গ্রামে। কখনো কোনো দেশ দেখে নি, কূপমণ্ডূকের দর্শন ও জীবনবাদ কি সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েচে এদের হাব-ভাবে, আচরণে, চিন্তায়, কার্য্যে।

এই শিশুর সঙ্গ ওদের চেয়ে কত ভালো, এ মিথ্যা বলতে জানে না, বিষয়ের প্রসঙ্গ ওঠাবে না। পরনিন্দা পরচর্চ্চা এর নেই, একটি সরল ও অকপট আত্মা ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে এসে সবেমাত্র ঢুকেচে কোন্ অনন্তলোক থেকে, পৃথিবীর কলুষ এখনো যাকে স্পর্শ করে নি। কত দুর্ল্লভ এদের সঙ্গ। সাধারণ লোকে কি জানে?

রাস্তার দু'দিকে বেশ বনঝোপ। শিশু গুট্ গুট্ করে দিব্যি হেঁটে চলেচে, এক জায়গায় আকাশের দিকে চেয়ে কি একটা বললে আপনার মনে।

ভবানী বললেন—কি রে খোকা, কি বলচিস?

—আচিনি।

—কি আসিনি রে? কি আসবে?

—চান।

—চাঁদ এখন কি আসে বাবা? সে আসবে সেই রাত্তিরে। চলো।

খোকা ভয়ের সুরে বললে—ছিয়াল।

—না, কোনো ভয় নেই—শেয়াল নেই।

—ও বাবা!

—কি?

—মা—

—চলো যাবো। মা এখন বাড়ী নেই, আসুক। আমরা সেখানে যাচ্চি, সেখানে কি খাবি রে?

—মুকি।

—বেশ চলো—কি খাবি?

—মুকি।

মহাদেব মুখেয্যের চণ্ডীমণ্ডপে অনেক লোক জুটেচে, ভবানীকে দেখে ফণি চক্কত্তি বলে উঠলেন—আরে এসো বাবাজী, সকালবেলাই যে! খোকনকে নিয়ে বেরিয়েচ বুঝি? একহাত পাশা খেলা যাক এসো—

ভবানী হাসতে হাসতে বললেন—বেশিক্ষণ বসব না কাকা। আচ্ছা, খেলি এক হাত। খোকা বড্ড দুষ্টুমি করবে যে! ও কি খেলতে দেবে?

মহাদেব মুখুয্যে বললেন—খোকাকে বাড়ীর মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্চি দাঁড়াও,ও মুংলি—মুংলি—

—না থাক, কাকা। ও অন্য কোথাও থাকতে চাইবে না। কাঁদবে।

চণ্ডীমণ্ডপ হচ্ছে পল্লীগ্রামের একটি প্রতিষ্ঠান। এইখানেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিষ্কর্ম্মা, ব্রহ্মোত্তর বৃত্তিভোগী, মূর্খ ব্রাহ্মণের দল জুটে কেবল তামাক পোড়ায় আর দাবা পাশা (তাসের প্রচলন এ সব পাড়াগাঁয়ে আদৌ নেই, ওটা বিলিতি খেলা বলে গণ্য) চালে। প্রত্যেক গৃহস্থের একখানা করে চণ্ডীমণ্ডপ আছে সকাল থেকে সেখানে আড্ডা বসে। তবে সম্পন্ন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে আড্ডা জোর বসে থাকে, কারণ সারাদিনে অন্ততঃ আধসের তামাক যোগাবার ক্ষমতা সব গৃহস্থের নেই। গ্রামের মধ্যে চন্দ্র চাটুয্যে ফণি চক্কত্তি ও মহাদেব মুখুয্যের চণ্ডীমণ্ডপই প্রথম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান, রাজারাম রায় যদিও সম্পন্ন গৃহস্থ তিনি নীলকুঠির কাজে অধিকাংশ সময়েই বাড়ীর বাইরে থাকেন বলে তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে আড্ডা বসে না।

এরা সারাদিন এখানে বসে শুধু গল্প করে ও পাশা দাবা খেলে। জীবনসংগ্রাম এদের অজ্ঞাত, ব্রহ্মোত্তর জমিতে বছরের ধান হয়, প্রজাদের কাছ থেকে কিছু খাজনা মেলে, আম-কাঁটালের বাগান আছে, লাউ কুমড়োর মাচা আছে, আজ মাছ ধারে কিনে গ্রামের জেলেদের কাছে, দু'মাস পরে দাম দেওয়াই বিধি। সুতরাং ভাবনা কিসের? গ্রাম্য কলু ধারে তেল দিয়ে যায় বাকারির গায়ে দাগ কেটে। সেই বাকারির দাগ গুণে মাসকাবারি দাম শোধ হয়। এত সহজ ও সুলভ যেখানে জীবনযাত্রা, সেখানে অবকাশ যাপনের এই সব অলস ধারাই লোকে বেছে নিয়েচে। আলস্য ও নৈষ্কর্ম্য থেকে আসে ব্যর্থতা ও পাপ। পল্লীবাংলার জীবনধারার মধ্যে শেওলার দাম আর ঝাঁজি জমে উঠে জলের স্বচ্ছতা নেই, স্রোতে কলকল্লোল নেই, নেই তার নিজের বক্ষপটে অসীম আকাশের উদার প্রতিচ্ছবি।

ভবানী এসব লক্ষ্য করেচেন অনেকদিন থেকেই। এখানে বিবাহ করার পর থেকেই। তিনি পরিচিত ছিলেন না এমন জীবনের সঙ্গে। জানতেন না বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের মানুষের জীবনধারাকে। চিরকাল তিনি পাহাড়ে প্রান্তরে, জাহ্নবীর স্রোতোবেগের সঙ্গে, পাহাড়ী ঝর্ণার প্রাণচঞ্চল গতিবেগের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের আনন্দে কাল কাটিয়েচেন —পড়ে গিয়েচেন ধরা এখানে এসে বিবাহ করে। বিশেষ করে এই কূপমণ্ডূকদের দলে মিশে।

এদের জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই, অন্ধকারে আবৃত এদের সারাটা জীবনপথ। তার ওদিকে কি আছে, কখনও দেখার চেষ্টাও করে না।

মহাদেব মুখুয্যে বললেন—ও খোকন তোমার নাম কি?

খোকা বিস্ময় ও ভয় মিশ্রিত দৃষ্টিতে মহাদেব মুখুয্যের দিকে বড় বড় চোখ তুলে চাইলে। কোনো কথা বললে না।

—কি নাম খোকন?

—খোকন।

—খোকন? বেশ নাম। বাঃ, ওহে, এবার হাতটা আমার—দানটা কি পড়লো?

কিছুক্ষণ খেলা চলবার পরে সকলের জন্যে মুড়ি ও নারকোলকোরা এল বাড়ীর মধ্যে থেকে। খাবার খেয়ে আবার সকলে দ্বিগুণ উৎসাহে খেলায় মাতলো। এমন ভাবে খেলা

করে এরা, যেন সেটাই এদের জীবনের লক্ষ্য।

এমন সময় সত্যধর চাটুয্যের জামাই শ্রীনাথ ওদের চণ্ডীমণ্ডপে ঢুকলো। সে কলকাতায় চাকুরী ক'রে, সুতরাং এ অঞ্চলের মধ্যে একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি। এ গ্রামের কোনো ব্রাহ্মণই এ-পর্য্যন্ত কলকাতা দেখেন নি। এমন কি স্বয়ং দেওয়ান রাজারাম পর্য্যন্ত এই দলের। কেন-না কোনো দরকার হয় না কলকাতা যাওয়ার, কেন যাবেন তাঁরা একটা অজানা শহরের সাত অসুবিধা ও নানা কাল্পনিক বিপদের মাঝখানে! ছেলেদের লেখাপড়ার বালাই নেই, নিজেদের জীবিকার্জ্জনের জন্যে পরের দোরে ধর্ণা দিতে হয় না।

ফণি চক্কত্তি বললেন—এসো বাবাজি, কলকেতার কি খবর?

শ্রীনাথ অনেক আজগুবি খবর মাঝে মাঝে এনে দেয় এ গাঁয়ে। বাইরের জগতের খানিকটা হাওয়া ঢোকে এরই বর্ণনার বাতায়ন পথে। সম্প্রতি এখনি সে একটা আজগুবি খবর দিলে। বললে—মস্ত খবর হচ্চে, আমাদের বড়লাটকে একজন লোক খুন করেচে।

সকলে এক সঙ্গে বলে উঠলো—খুন করলে? কে খুন করলে?

—একজন ওহাবি জাতীয় পাঠান।

মহাদেব মুখুয্যে বললেন—আমাদের বড়লাট কে যেন ছিল?

—লাড মেও।

—লাড মেও?

চণ্ডীমণ্ডপে পাশাখেলা আর জমলো না। লর্ড মেয়ো মরুন বা বাঁচুন তাতে এদের কোনো কিছু আসে-যায় না—এই নামটাই সবাই প্রথম শুনলো। তবে নতুন একটা যা-হয় ঘটলো এদের প্রাত্যহিক একঘেয়েমির মধ্যে—সেটাই পরম লাভ। শ্রীনাথ খুব সবিস্তারে কলকাতার গল্প করলে—আপিস আদালত কি ভাবে বন্ধ হয়ে গেল সংবাদ আসা মাত্রই। বেলা দুপুর ঘুরে গেল, খোকাকে নিয়ে ভবানী বাঁড়ুয্যে বাড়ী ফিরতেই তিলুর বকুনি খেলেন।

—কি আক্কেল আপনার জিজ্ঞেস করি? কোথায় ছিলেন খোকাকে নিয়ে দুপুর পজ্জন্ত! ও খিদেয় যে টা-টা করচে? কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?

খোকা দু'হাত বাড়িয়ে বললে—মা, মা—

ভবানী বললেন—রাখো তোমার ও সব কথা। লাড মেও খুন হয়েচেন শুনেচ?

—সে আবার কে গা?

—বড়লাট। ভারতবর্ষের বড়লাট।

—কে খুন করলে?

—একজন পাঠান।

—আহা কেন মারলে গো? ভারি দুঃখু লাগে।

লর্ড মেয়ো খুন হবার কিছুদিন পরেই নীলকরদের বড় সংকটের সময় এল। নীলকর সাহেবদের ঘন-ঘন বৈঠক বসতে লাগলো। ম্যাজিস্টেট সাহেব নিজের আরদালি পাঠিয়ে

যখন তখন পরোয়ানা জারি করতে লাগলেন।

রাজারাম ঘোড়ায় করে যাচ্ছিলেন নীলকুঠির দিকে, রামকানাই কবিরাজ একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে, বললে—একটু দাঁড়াবেন দেওয়ানবাবু?

রাজারাম ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন—কি?

. —একটু দাঁড়ান। একটা কথা শুনুন। আপনি আর এগোবেন না। কানসোনার বাগ্‌দিরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ষষ্ঠীতলার মাঠে। আপনাকে মারবে, লাঠি নিয়ে তৈরি আছে। আমি জানি কথাটা তাই বললাম। অনেকক্ষণ থেকে আপনার জন্যি দাঁড়িয়ে আছি।

—কে কে আছে দলে?

—তা জানিনে বাবু। আমি গরীব লোক। কানে আমার কথা গেল, তাই বলি, অধর্ম্ম করতি পারবো না। ভগবানের কাছে এর জবাব দিতি হবে তো একদিন? আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে সাবধান করে দেবার ভার তিনিই দিয়েচেন আমার ওপর।

তবুও রাজারাম ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে যেতে উদ্যত হয়েচেন দেখে রামকানাই কবিরাজ হাতজোড় করে বললে—দেওয়ানবাবু, আমার কথা শুনুন—বড্ড বিপদ আপনার। মোটে এগোবেন না—বাবু শুনুন—ও বাবু কথাটা—

ততক্ষণে রাজারাম অনেকদূরে এগিয়ে চলে গিয়েচেন। মনে মনে ভাবতে লাগলেন, রামকানাই লোকটা মাথা-পাগলা না কি? এত অপমান হোলো নীলকুঠির লোকের হাতে, তিনিই তার মূল—অথচ কি মাথাব্যথা ওর পড়েছিল তাঁকেই সাবধান করে দিতে? মিথ্যে কথা সব।

ষষ্ঠীতলার মাঠে তাঁর ঘোড়া পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপদ শুরু হোলো। মস্ত বড় একটি দল লাঠি-সোঁটা নিয়ে তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে। রাজারাম দেখলেন এদের মধ্যে বাঁধালের দাঙ্গায় নিহত রামু বাগ্‌দির বড় ছেলে হারু আর তার শালা নারাণ বড় সর্দ্দার।

পলকে প্রলয় ঘটলো। একদল চেঁচিয়ে হেঁকে বললে—ও ব্যাটা, নাম এখানে। আজ তোরে আর ফিরে যেতি হবে না—

নারাণ বললে—ও ব্যাটা সাহেবের কুকুর—তোর মুণ্ডু নিয়ে আজ ষষ্ঠীতলার মাঠে ভাঁটা খেলবো ছাখ্—

অনেকে একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললে—অত কথায় দরকার কি? ঘাড় ধরে টেনে নামা—নেমিয়ে নিয়ে বুকে হাঁটু দিয়ে জেতে বসে কাতানের কোপে মুণ্ডুটা উড়িয়ে দে—

হারু বললে—তোরা সর্—মুই দেখি—মোর বাবারে ওই শালা ঠেঙিয়ে মেরেল লেঠেল পেটিয়ে—

একজন বললে—তোর সেই রসিকবাবা কোথায়? তাকে ডাক—সে এসে তোকে বাঁচাক—যমালয়ে যে এখুনি যেতে হবে বাছাধন।

সাঁই করে একটা হাত-সড়কি রাজারামের বাঁ দিকের পাঁজরা ঘেঁষে চলে গেল।

রাজারামের ঘোড়া ভয় পেয়ে ঘুরে না দাঁড়ালে সেই ধাক্কাতেই রাজারাম কাবার হয়েছিলেন। তাঁর মাথা তখন ঘুরচে, চিন্তার অবকাশ পাচ্ছেন না, চোখে সর্ষের ফুল দেখচেন, নারকোল গাছে যেন ঝড় বাধচে, কি যেন সব হচ্চে তাঁর চারদিকে। রামকানাই কবিরাজ গেল কোথায়? রামকানাই?

তাঁর মাথায় একটা লাঠির ঘা লাগলো। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠলো।

আবার তাঁর বাঁ দিকের পাঁজরে খুব ঠাণ্ডা একটা তীক্ষ্ণ স্পর্শ অনুভূত হোলো। কি হচ্চে তাঁর? এত জল কোথা থেকে আসচে? কে একজন যেন বললে—শালা, রামুর কথা মনে পড়ে?

রাজারাম হাত উঠিয়েচেন সামনের একজন লোকের লাঠি আটকাবার জন্যে। এত লোকের লাঠি তিনি ঠেকাবেন কি করে? এত জল এল কোথা থেকে। অতি অল্পক্ষণের জন্যে একবার চেয়ে দেখলেন নিজের কাপড়ের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে রাজারামের যেন বমির ভাব হোলো। খুব জ্বর হোলে যেমন মাথা ঘোরে, দেহ দুর্ব্বল হয়ে বমির ভাব হয়, তেমনি। পৃথিবীটা যেন বন্ বন্ করে ঘুরচে।…

তিলুর সুন্দর খোকাটা দূর মাঠের ওপ্রান্তে বসে যেন আনমনে হাসচে। কেমন হাসে! রাজারাম আর কিছু জানেন না। চোখ বুজে এল।

অমাবস্যার অন্ধকার নেমে এসেছে গোটা দুনিয়াটায়।…

রামকানাই কবিরাজের ভীত ও আকুল আবেদনে সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা যখন লাঠিসোঁটা নিয়ে দৌড়ে গেল ষষ্ঠীতলার মাঠে, তখন রাজারামের রক্তাপ্লুত দেহ ধুলোতে লুটিয়ে পড়ে আছে। দেহে প্রাণ নেই।

বছর খানেক পরে।

রাজারামের খুন হওয়ার পর এ অঞ্চলে যে হৈ-চৈ হয়েছিল দিনকতক তা থেমে গিয়েছে। রাজারামের পরে জগদম্বা সহমরণে যাবার জন্যে জিদ ধরেছিলেন, তিলু, বিলু ও নিলু অনেক বুঝিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করে। কিন্তু তিনি বেশিদিন বাঁচেন নি। ভেবে ভেবে কেমন মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর এ অবস্থায় খুব সেবা করেছিল তিন ননদে মিলে। গত ৺দুর্গোৎসবের পর তিন দিনের মাত্র জ্বর ভোগ করে জগদম্বা কদমতলার শ্মশানে স্বামীর চিতার পাশে স্থান গ্রহণ করেচেন। নিঃসন্তান রাজারামের সমুদয় সম্পত্তির এখন তিলুর খোকাই উত্তরাধিকারী। গ্রামের সবাই এদের অনুরোধ করেছিল রাজারামের পৈতৃক ভিটেতে উঠে গিয়ে বাস করতে, কেন ভবানী বাঁড়ুয্যে রাজি হন নি, তিনিই জানেন।

অতএব রাজারাম প্রদত্ত সেই একটুকরো জমিতে, সেই খড়ের ঘরেই ভবানী এখনো বাস করচেন। অবশেষে একদিন তিলু স্বামীকে কথাটা বললে।

ভবানী বললেন—তিলু, তুমিও কেন এ অনুরোধ কর।

—কেন বলুন বুঝিয়ে? কেন বাস করবেন না আপনার নিজের শ্বশুরের ভিটেতে?

—না। আমার ছেলে ঐ সম্পত্তি নেবে না।

—সম্পত্তিও নেবে না?

—না, তিলু রাগ কোরো না, বহু লোকের ওপর অত্যাচারের ফলে ঐ সম্পত্তি গড়ে উঠেছে—আমি চাইনে আমার ছেলে ওই সম্পত্তির অন্ন খায়। শোনো তিলু, আমি অনেক ভালো লোকের সঙ্গ করেছিলাম। এইটুকু জেনেচি, বিলাসিতা যেখানে, বাড়তি যেখানে, সেখানেই পাপ, সেখানেই আবর্জ্জনা। আত্মা সেখানে মলিন। চৈতন্যদেব কি আর সাধে রঘুনাথ দাসকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "ভালো নাহি খাবে আর ভালো নাহি পরিবে।"

—আপনি যা ভালো বোঝেন।—

—আমি তোমাকে অনেকদিন বলেচি তো, আমি অন্য পথের পথিক। তোমার দাদার—কিছু মনে কোরো না—কাজকর্ম্ম আমার পছন্দ ছিল না কোনোদিন। রামু বাগ্‌দিকে খুন করিয়েছিলেন উনিই। রামকানাই কবিরাজের ওপর অত্যাচার উনিই করেন। সেই রামকানাই কিন্তু তাঁকে বিপদের ইঙ্গিত দেয়। ভবিতব্য, কানে যাবে কেন? যাক গে ওসব কথা। আমার খোকা যদি বাঁচে, সে অন্য ভাবে জীবন যাপন করবে। নির্লোভ হবে। সরল, ধার্ম্মিক, সত্যপরায়ণ হবে। যদি সে ভগবানকে জানতে চায়, তবে সরলতা ও দীনতার মধ্যে ওকে জীবন যাপন কর্‌তে হবে। মলিন, বিষয়াসক্ত মনে ভগবদ্দর্শন হয় না। আমি ওকে সেইভাবে মানুষ করবো।

—ও কি আপনার মত সন্নিসি হয়ে যাবে?

—তুমি জানো, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করি নি। আমার গুরুদেব মহারাজ (ভবানী যুক্তকরে প্রণাম করলেন) বলেছিলেন—বাচ্চা, তেরা আবি ভোগ হ্যায়। সন্ন্যাস দেন নি। তিনি আমার ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন ছবির মত। তবে তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, সংসারে থেকেও আমি যেন ভগবানকে ভুলে না যাই। অসত্য পথে, লোভের পথে, পাপের পথে পা না দিই। শ্রীমদ্ভাগবতে যাকে বলেচে 'বিত্তশাঠ্য', অর্থাৎ বিষয়ের জন্যে জালজুয়োচুরি, তা কোনোদিন না করি। আমার ছেলেকে আমি সেই পথে পা দিতে এগিয়ে ঠেলে দোবো? তোমার দাদার সম্পত্তি ভোগ করলে তাই হবে।

—তবে কি হবে দাদার সম্পত্তি?

—কেন তুমি?

—আমার ছেলে নেবে না আমি নেবো? আমাকে কি যে ভেবেচেন আপনি?

—তবে তোমার দুই বোন?

—তাদেরই বা কেন ঠেলে দেবেন বিষয়ের পথে?

—যদি তারা চায়?

—চাইলেও, আপনি স্বামী, পরমগুরু তাদের। তারা নির্ব্বুদ্ধি মেয়েমানুষ, আপনি তাদের বোঝাবেন না কেন?

—তা হয় না তিলু। তাদের ইচ্ছে যদি থাকে, তারা বড় হয়ে গিয়েচে, ভোগের ইচ্ছে

যদি থাকে তবে ভোগ করুক। জোর করে নিবৃত্ত করা যায় না।

—জোর করবেন কেন, বোঝাবেন। আমিই আগে তাদের মন বুঝি, তারপর বলবো আপনাকে।

—বেশ তো, যদি কেউ না নেয়, ও সম্পত্তি গরিবদুঃখীর সেবায় অর্পণ করগে তোমার দাদার নামে, বৌদিদির নামে। তাঁদের আত্মার উন্নতি হবে, তৃপ্তি হবে এতে।

সেই দিনেই বিকেলে হঠাৎ হলা পেকে এসে হাজির। দূর থেকে ডেকে বললে—ও বড়দি, খোকা কই?

খোকাকে ডেকে তিলু বললে—ও কে রে?

খোকা চেয়ে বললে—দাদা—

—দাদা না রে মামা।

—মামা।

হলা পেকে দু'গাছা সোনার বালা নিয়ে পরাতে গেল খোকার হাতে, তিলু বললে—না দাদা, ও পরাতি দেবো না।

—কেন দিদি?

—উনি আগে মত না দিলি আমি পারিনে।

—সেবারেও নিতি দ্যাও নি। এবার না নিলি মোর মনে কষ্ট হবে না দিদিমণি?

—তা কি করবো দাদা। ও সব তুমি আন কেন?

—ইচ্ছে করে তাই আনি। খোকন, তোর মামাকে তুই ভালোবাসিস্?

খোকা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে হলা পেকের মুখের দিকে চেয়ে বললে—হাঁ।

—কতখানি ভালোবাসিস্?

—আক্‌খানা।

—একখানা ভালোবাসিস্! বেশ তো।

খোকা এবার হাত বাড়িয়ে হলা পেকের বালা দুটো দু'হাতে নিলে। হলা পেকে হাততালি দিয়ে বললে—ওই দ্যাখো, ও নিয়েচে। খোকামণি পরবে বালা, তুমি দেবা না, বুঝলে না?

ঠিক এই সময় ভবানী বাঁড়ুয্যে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে হলা পেকেকে দেখে বলে উঠলেন—আরে তুমি কোথা থেকে?

হলা পেকে উঠে ভবানীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে। ভবানী হেসে বললেন—খুব ভক্তি দেখচি যে! এবার কি রকম আদায় উশুল হোলো? ও কি, ওর হাতে ও বালা কিসের?

তিলু বললে—হলা দাদা খোকনের জন্যে এনেচে—

হলা পেকের মুখ শুকিয়ে গেল। তিলু হেসে বললে—শোনো তোমার খোকার কথা। হ্যাঁরে, তোর মামাকে কতখানি ভালোবাসিস্ রে?

খোকা বললে—আক্‌খানা।

—তুই বুঝি বালা নিবি?

—হ্যাঁ।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—না না, ও বালা তুমি ফেরৎ নিয়ে যাও। ও আমরা নেবো কেন?

হলা পেকে ভবানীর সামনে কথা বলতে সাহস পেলে না, কিন্তু তার মুখ ম্লান হয়ে গেল। তিলু বললে—আহা, দাদার বড় ইচ্ছে। সেবারও এনেছিল, আপনি নেন নি। ওর অন্নপ্রাশনের দিন।

ভবানী বললেন—আচ্ছা, তুমি এসব কেন নিয়ে এসে বিপদে ফেল বল তো?

হলা পেকে নিরুত্তর। বোবার শত্রু নেই।

—যাও, রেখে দাও এ যাত্রা। কিন্তু আর কক্ষণো কিছু—

হলা পেকের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল দেখালো। সে ভবানীর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—আচ্ছা, আর মুই আনচি নে কিছু। মোর আক্কেল হয়ে গিয়েচে। তবে এ সে জিনিস নয়। এ আমার নিজের জিনিস।

ভবানী বললেন—আক্কেল তোমাদের হবে না না—আক্কেল হবে মলে। বয়েস হয়েচে, এখনো কুকাজ কেন? পরকালের ভয় নেই?

তিলু বললে—এখন ওকে বকাঝকা করবেন না। ওর মুখ খিদেতে শুকিয়ে গিয়েচে। এসো তুমি দাদা রান্নাঘরের দিকি।

হলা পেকে সাহস পেয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে গিয়ে বসলো তিলুর পিছু পিছু।

এই দুর্দান্ত দস্যুকে তিলু আর তার ছেলে কি ক'রে বশ করেছে কে জানে। পোষা কুকুরের মত সে দিব্যি তিলুর পেছনে পেছনে ঘুরতে লাগলো সসঙ্কোচ আনন্দে।

বেশ নিকানো-গুছানো মাটির দাওয়া। উচ্ছেলতার ফুল ফুটে ঝুলছে খড়ের চাল থেকে। পেছনে শ্যাম চক্কত্তিদের বাঁশঝাড়ের নিবিড় ছায়া। শালিখ ও ছাতারে পাখী ডাকচে। একটা বসন্তবৌরি উড়ে এসে বাঁশগাছের কঞ্চির ওপরে দোল খাচ্ছে। শুকনো বাঁশপাতার বালির সুগন্ধ বেরুচ্ছে। বনবিছুটির লতা উঠেছে রান্নাঘরের জানালা বেয়ে। তিলু হলা পেকের সামনে রাখলে এক খুঁচি চালভাজা, কাঁচা লঙ্কা ও এক মালা ঝুনো নারকোল। এক থাবা খেজুরের গুড় রাখলে একটা পাথর বাটিতে।

হলা পেকের নিশ্চয় খুব ক্ষিদে পেয়েছিল। সে এক খুঁচি চালভাজা নিমেষে নিঃশেষ করে বললে—থাকে তো আর দুটো ছান, দিদিঠাকরুণ—

—বোসো দাদা। দিচ্চি। একটা গল্প করো ডাকাতির, করবে দাদা?

হলা পেকে আবার একধামি চালভাজা নিয়ে খেতে খেতে গল্প শুরু করলে ভাণ্ডারখোলা গ্রামের নীলমণি মুখুয্যের বাড়ী অঘোর মুচি আর সে রণ-পা পরে ডাকাতি করতে গিয়েছিল। তাদের বাড়ী গিয়ে দেখলে বাড়ীতে তাদের চার-পাঁচজন পুরুষমানুষ মেয়েমানুষও আট-

দশটা। দুজন বাইরের চাকর, ওদের একজন আবার স্ত্রীপুত্র নিয়ে গোয়ালঘরের পাশের ঘরে বাস করে। ওদের মধ্যে পরামর্শ হোলো বাড়ীতে চড়াও হবে কিনা। শেষ পরে 'লুঠ'করাই ধার্য্য হোলো। ঢেঁকি দিয়ে বাইরের দরজা ভেঙে ওরা ঘরে ঢুকে ছাখে পুরুষেরা লাঠি নিয়ে, সড়কি নিয়ে তৈরি। মেয়েরা প্রাণপণে আর্ত্তনাদ শুরু করেছে।

তিলু বললে—আহা!

—আহা নয়। শোনো আগে দিদিমণি। প্রাণ সে রাত্রে যাবার দাখিল হয়েছিল। মোরা জানিনে, সে বাড়ীর দাক্ষায়ণী বলে একটা বিধবা মেয়ে গোয়ালঘর থেকে এমন সড়কি চালাতে লাগলো যে নিবারণ বুনোকে হার মানাতি পারে। একখানা হাত দেখালে বটে! পুরুষগুলোকে মোরা বাড়ীর বার হতি দেখলাম না।

—ওমা, তারপর?

—পুরুষগুলো দোতালার চাপা সিঁড়ি ফেলে দেলে, তারপর ওপর থেকে ইঁট ফেলতে লাগলো, আর সড়কি চালাতে লাগলো। মোদের দলের একটা জখম হোল—

—মরে গেল?

—তখন মরে নি। মোল মোদের হাতে। যখন দাক্ষায়ণী অসম্ভব সড়কি চালাতি লাগলো, মোরা ছাখলাম ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ালি মোরা দাঁড়িয়ে মরবো সব ক'টা। তখন মুখে ঝম্প বাজিয়ে দেলাম—

—সে আবার কি?

—এমন শব্দ করলাম যে মেয়েমানুষের পেটের ছেলে পড়ে যায়—করবো শোনবা? না থাক, খোকা ভয় পাবে। পুরুষ ক'টা যাতে ছাদ থেকে নামতি না পারে সে ব্যবস্থা করলাম। সাপের জিবের মত লিক্‌লিকে সড়কির ফলা একবার এগোয় আর একবার পেছোয়—এক একটানে এক একটা ভুঁড়ি হস্‌কে দেওয়া যাচ্চে—ওদের তিন চারটে জখম হোলো। মোদের তখন গাঁয়ের লোক ঘিরে ফেলেচে, পালাবার পথ নেই—ওদিকে দাক্ষায়ণী গোয়ালঘর থেকে সড়কি চালাচ্চে। অঘোর পালাবার ইশারা করলে—কিন্তু তখন পালাই মোরা কোন্ রাস্তা দিয়ে। তখন মোদের শেষ অস্ত্র চালালাম—দুই হাত্তা বলে লাঠির মার চালিয়ে তামেচা বাহেরা শির ঠিক রেখে পন্ পন্ ক'রে কুমোরের চাকের মত ঘুরতি ঘুরতি ভিড় কেটে বার হয়ে এসে পথ ক'রে দিই দলের সবাইয়ের। মোদের দলের যে লোকটা জখম হয়েল, তার মুণ্ডুটা কেটে নিয়ে সরে পড়ি—আহা লোকটার নাম বংশীধর সর্দ্দার, ভারি সড়কিবাজ ছেল—

—সে আবার কি কথা? নিজেরা মারলে কেন?

—না মারলি সনাক্ত হবে লাশ দেখে। বেঁচে থাকে তো দলের কথা ফাঁস করে দেবে।

—কি সর্ব্বনাশ!

—সর্ব্বনাশ হোতো আর একটু হলি। তবে খুব পালিয়ে এয়েলাম। সোনার গহনা লুঠ করেলাম ত্রিশ ভরি।

—কি ক'রে? কোথা থেকে নিলে? মেয়েমানুষদের তো ওপরের ঘরে নিয়ে চাপা সিঁড়ি ফেলে দিল?

—তার আগেই কাজ হাসিল হয়েল। ডাকাতি করতি গেলে কি বিলম্ব করলি চলে? যেমন দেখা, অমনি গহনা ছিনিয়ে নেওয়া। তারপর যত খুশি চেঁচাও না—সারা রাত্তির পড়ে আছে তার জন্যি।

—এ রকম কোরো না দাদা। বড্ড পাপের কাজ। এ ভাত তোমাদের মুখি যায়? কত লোকের চোখের জল না মিশিয়ে আছে ঐ ভাতের সঙ্গে। ছিঃ ছিঃ—নিজের পেটে খেলেই হোলো?

হলা পেকে খানিকটা চুপ করে থেকে বললে—পাপ পুণ্যির কথা বলবেন না। ও আমাদের হয়ে গিয়েচে, সে রাজাও নেই, সে দেশও নেই। জানো তো ছড়া গাইতাম আমরা ছেলেবেলায় :—

ধন্য রাজা সীতারাম বাংলা বাহাদুর
যাঁর বলেতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেল দূর।
বাঘে মানুষে একই ঘাটে সুখে জল খাবে
রামী শামী পোঁটলা বেঁধে গঙ্গাস্নানে যাবে।

তিলু হেসে বললে—আহা, ও ছড়া আমরা যেন আর জানিনে। ছেলেবেলায় দীনু বুড়ি বলতো শুনিচি—

—জানবা না কেন, সীতারাম রাজা ছেলো নলদী পরগণার। মামুদপুর হোলো তাঁর কেল্লা—মোর মামার বাড়ী হোলো হরিহরনগর, মামুদপুরির কাছে। মুই সীতারামের কেল্লার ভাঙ্গা ইট পাথর, সীতারামের দীঘি, তার নাম সুখসাগর, ও সব দেখিচি। এখন অরুণ্যি-বিজেবন, তার মধ্যি বড় বড় সাপ থাকে, বাঘ থাকে—এট্টা পুরনো মস্ত মাদার গাছ ছেল জঙ্গলের মধ্যি, তার ফল খেতি যাতাম ছেলেবেলায়—ভারি মিষ্টি—

খোকা বললে—মিট্টি। আমি খাই—

—খেও বাবা খোকা—এনে দেবানি—আম পাকলে দেবানি—

—আম খাই—

—খেও। কেন খাবানা?

ভবানী বাঁড়ুয্যে স্নান ক'রে আহ্নিক করতে বসলেন। তিলু দু'চার খানা শসাকাটা, আধমালা নারকোলকোরা ও খানিকটা খেজুরের গুড় তাঁর জন্যে ওঘরে রেখে এল। হলা পেকে এককাঠা চালের ভাত খেলে ভবানীর খাওয়ার পরে। খেতেও পারে। ডাল খেলে একটি গামলা। খেয়ে দেয়ে সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে একটা কান্নাকাটির শব্দ পাওয়া গেল মুখুয্যে পাড়ার দিকে। তিলু হলা পেকের দিকে তাকিয়ে বললে—দেখে এসো তো পেকে দা, কে কাঁদচে? ভবানীও তাড়াতাড়ি দেখতে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বললেন—ফণিকাকার বড় জ্যাঠাই

জাহাজ-ডুবি হয়ে মারা গিয়েচেন, গণেশ খবর নিয়ে এল—

তিলু বললে—ও মা, সে কি? জাহাজ-ডুবি?

—হাঁ। সার জন লরেন্স বলে একখানা জাহাজ—

—জাহাজের আবার নাম থাকে বুঝি?

—থাকে বৈকি। তারপর শোনো, সেই সার জন লরেন্স জাহাজ ডুবেচে সাগরে, পুরীর পথে। বহু লোক মারা গিয়েচে।

—ওগো, এ গাঁয়েরই তো লোক রয়েচে সাত-আটজন। টগর কুমোরের মা, পেঁচো গয়লার শাশুড়ি আর বিধবা বড় মেয়ে ক্ষেন্তি, রাজু সর্দ্দারের মা, নীলমণি কাকার বড়বৌদিদি। আহা, পেঁচো গয়লার মেয়ে ক্ষেন্তির ছোটো ছেলেটা সঙ্গে গিয়েচে মায়ের—সাত বছর মাত্তর বয়েস—

গ্রামে সত্যিই একটা কান্নার রোল পড়ে গেল। নদীর ঘাটে, গৃহস্থদের চণ্ডীমণ্ডপে, চাষীদের খামারে, বাজারে, নালু পালের বড় মুদিখানার দোকানে ও আড়তে 'সার জন লরেন্স' ডুবি ছাড়া আর অন্য কথা নেই।

বাংলার অনেক জেলার বহু তীর্থযাত্রী এবার এই জাহাজ ডুবে মারা গিয়েছিল। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে সার জন লরেন্স জাহাজ ডুবির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এ-জন্যে।

গয়ামেম সবে বড়সাহেবের কুঠি থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এসেছে, এমন সময় প্রসন্ন আমীন তাকে ডেকে বললে—ও গয়া, শোনো—ও গয়া—

গয়া পেছন দিকে চেয়ে মুখ ঘুরিয়ে বললে—আমার এখন ন্যাকরা করবার সময় নেই।

—শোনো একটা কথা বলি—

—কি?

—ওবেলা বাড়ী থাকবা?

—থাকি না থাকি আপনার তাতে কি?

—না, তাই এমনি বলচি।

—এখানে কোনো কথা না। যদি কোনো কথা বলতি হয়, সন্দের পর আমাদের বাড়ী যাবেন, মার সামনে কথা কবে—

প্রসন্ন চক্কত্তি এগিয়ে এসে একগাল হেসে বলে—না না, আমি এখানে কি কথা বলতি যাচ্চি—বলচি যে তুমি কেমন আছ, একটু রোগা দেখাচ্চে কি না তাই।

—থাক, পথেঘাটে আর ঢং করতি হবে না—

না! এই গয়াকে প্রসন্ন চক্কত্তি ঠিকমত বুঝে উঠতেই পারলে না। যখন মনে হয় ওর ওপর একটু বুঝি প্রসন্ন হোলো হোলো, অমনি হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়! প্রসন্ন হতবুদ্ধি হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

পেছন দিকে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনে প্রসন্ন চেয়ে দেখল বড়সাহেব শিপ্‌টন্ কোথায়

বেরিয়ে যাচ্ছে। বড় ভয় হোলো তার। বড়সাহেব দেখে ফেললে না-কি তার ও গয়ামেমের কথাবার্ত্তা? নাঃ—

সন্দে হবার এত দেরিও থাকে আজকাল! বাঁওড়ের ধারের বড় চটকা গাছে রোদ রাঙা হয়ে উঠলো, চড়ার ক্ষেতে ক্ষেতে ঝিঙের ফুল ফুটলো, শামকুট পাখীর ঝাঁক ইছামতীর ওপার থেকে উড়ে আকাইপুরের বিলের দিকে চলে গেল, তবুও সন্দে আর হয় না। কতক্ষণ পরে বাগ্দিপাড়ায়, কলু পাড়ায় বাড়ী বাড়ী সন্দের শাঁক বেজে উঠলো, বটতলার খেপী সন্নিসিনীর মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ শোনা গেল।

প্রসন্ন চক্কত্তি গিয়ে ডাকলে একটু ভয়ে ভয়ে—ও বরদা দিদি—

প্রথমেই গয়ার নাম ধরে ডাকতে সাহস হয় না কি না!

মেঘ না চাইতেই জল। প্রসন্ন চক্কত্তিকে মহাখুশি করে গয়ামেম ঘরের বাইরে এসে বললে —কি খুড়োমশাই?

—বরদাদিদি বাড়ী নেই?

—না, কেন?

—তাই বলচি।

গয়ামেম মুখ টিপে হেসে বললে—মার কাছে আপনার দরকার? তাহ'লি মাকে ডেকে আনি? যুগীদের বাড়ী গিয়েচে—

—না, না। বোসো গয়া। তোমার সঙ্গে ছটো কথা বলি—

—কি?

—আচ্ছা, আমাকে তোমার কেমনডা লাগে?

—বুড়োমানুষ, কেমন আবার লাগবে?

—খুব বুড়ো কি আমি? অন্যাই কথাডা বোলো না গয়া। বড়সাহেবের বয়েস হইনি বুঝি?

—ওদের কথা ছাড়ান দ্যান। আপনি কি বলচেন তাই বলুন—

—আমি তোমারে না দেখি থাকতি পারিনে কেন বলো তো?

—মরণের ভগ্নদশা। এ কথা বলতি লজ্জা হয় না আমারে?

—লজ্জা হয় বলেই তো এতদিন বলতি পারি নি—

—খুব করেলেন। এখন বুঝি মুখি আর কিছু আটকায় না—

—না সত্যি গয়া, এত মেয়ে দ্যাখলাম কিন্তু তোমার মত এমন চুল, এমন ছিরি আর কোনোডা চকি পড়লো না—

—ও সব কথা থাক। একটা পরামর্শ দিই শুনুন—

—কি?

—কাউকে বলবেন না বলুন?

প্রসন্ন চক্কত্তির মুখ উজ্জল দেখালো। এত ঘনিষ্ঠ ভাবে প্রসন্ন চক্কত্তির সঙ্গে কোনদিন গয়া

কথা বলে নি। কি বাঁকা ভঙ্গিমা ওর কালো ভুরু জোড়ার। কি মুখের হাসির আলো। স্বর্গ আজ পৃথিবীতে এসে ধরা দিল কি এই শরৎ দিনের অপরাহ্ণে?

কি বলবে গয়া? কি বলবে ও?

বুক টিপ টিপ করে প্রসন্ন আমীনের। সে আগ্রহের অধীরতায় ব্যগ্রকণ্ঠে বললে—বলো না গয়া, জিনিসটা কি? আমি আবার কার কাছে বলতে যাচ্চি তোমার আমার দুজনের মধ্যিকার কথা?

শেষ দিকের কথাগুলো খুব জোর দিয়ে উচ্চারণ করলে প্রসন্ন চক্কত্তি। গয়া কিন্তু ওর কথার ইঙ্গিতটুকু সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সহজ সুরেই বললে···শুনুন বলি। আপনার ভালোর জন্যি বলচি। সাহেবদের ভেতর ভাঙন ধরেচে। ওরা চলে যাচ্চে এখান থেকে। বড়সাহেবের মেম এখান থেকে শীগ্‌গির চলে যাবে। মেম লোকটা ভালো। যাবার সময় ওর কাছে কিছু চেয়ে নেন গিয়ে। দেবে। লোক ভালো। কথাডা শোনবেন।

প্রসন্ন চক্কত্তি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সে আগে থেকে কিছু-কিছু এ সম্বন্ধে যে অনুমান না করেছিল এমন নয়, সায়েবরা চলে যাবে···সায়েবরা চলে যাবে···জানে সে কিছু কিছু। কিন্তু গয়া এ ভাবের কথা তাকে আজ এতদিন পরে বললে কেন? তার সুখ-দুঃখে, উন্নতি-অবনতিতে গয়ামেমের কি? প্রসন্ন চক্কত্তির সারা শরীরে পুলকের শিহরণ বয়ে গেল, সন্দেবেলার পাঁচমিশেলি আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আজ এতকাল পরে জীবনের শেষ প্রহরের দিকে যেন কি একটা নতুন জিনিসের সন্ধান পেলে প্রসন্ন।

সে বললে—সায়েবরা চলে যাচ্চে কেন?

গয়া হেসে বললে—ওদের ঘুণি ডাঙায় উঠে গিয়েচে যে খুড়োমশাই! জানেন নি না?

—শুনিচি কিছু কিছু।

—সমস্ত জেলার লোক ক্ষেপে গিয়েচে। রোজ চিঠি আসচে মাজিস্টর সায়েবের কাছ থেকে। সাবধান হতি বলচে। হাজার হোক সাদা চামড়া তো। মেমেদের আগে সরিয়ে দেচ্চে। আপনারেও বলি, একটু সাবধান হয়ে চলবেন। খাতক প্রজার ওপর আগের মত আর করবেন না। করলি আর চলবে না—

—কেন, আমি মলি তোমার কি গয়া?

প্রসন্ন চক্কত্তির গলার সুর হঠাৎ গাঢ় হয়ে উঠলো।

গয়া খিল খিল করে হেসে উঠে বললে—নাঃ, আপনারে নিয়ে আর যদি পারা যায়। বলতি গ্যালাম একটা ভালো কথা, আর অমনি আপনি আরম্ভ করে দেলেন যা তা—

—কি খারাপ কথাডা আমি বললাম গয়া?

কণ্ঠস্বর পূর্ব্ববৎ গাঢ়, বরং গাঢ়তর।

—আবার যতো সব বাজে কথা। বলি, যে কথাডা বললাম, কানে গেল না? দাঁড়ান —দাঁড়ান—

বলেই প্রসন্ন চক্কত্তিকে অবাক্ ও স্তম্ভিত করে গয়া তার খুব কাছে এসে তার পিঠে একটা

চড় মেরে বললে—একটা মশা—এই দেখুন—

সমস্ত দেহ শিউরে উঠলো প্রসন্ন আমীনের। পৃথিবী ঘুরছে কি বন্ বন্ করে? গয়া বল্লে—যা বললাম, সেইরকম চলবেন—বোঝলেন? কথা কানে গেল?

—গিয়েচে। আচ্ছা গয়া, না যদি চলি, তোমার কি? তোমার ক্ষেতিডা কি?

গয়া রাগের সুরে বললে—আমার কলা। কি আবার আমার? না শোনেন, মরবেন দেওয়ানজির মত।

—রাগ করচো কেন গয়া? আমার মরণই ভালো। কে-ই বা কাঁদবে মলি পরে?··· প্রসন্ন চক্কত্তি ফোঁস করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

—আহাহা! ঢং! রাগে গা জলে যায়! গলার সুর যেন কেষ্ট যাত্রা—বললাম একটা সোজা কথা, না—কে কাঁদবে মলি পরে, কে হেন করবে, তেন করবে। সোজা পথে চললি হয় কি জিগ্যেস্ করি?

—যাকগে।

—ভালোই তো।

—আমারে দেখলি তোমার রাগে গা জলে, না?

—আমি জানিনে বাপু। যত আজগুবি কথার উত্তুর আমি বসে বসে এখন দিই। খেয়ে দেয়ে আমার আর তো কাজ নেই—আসুন গিয়ে এখন, মা আসবার সময় হোলো—

—বেশ চললাম এখন গয়া।

—আসুন গিয়ে।

প্রসন্ন চক্কত্তি ক্ষুন্নমনে কিছুদূর যেতেই গয়া পেছন থেকে ডাকলে—ও খুড়োমশাই—

প্রসন্ন ফিরে চেয়ে বললে—কি?

—শুনুন।

—বল না কি?

—রাগ করবেন না যেন?

—না। যাই এখন—

—শুনুন না!

—কি?

—আপনি একটা পাগল!

—যা বলো গয়া। শোনো একটা কথা—কাছে এসো—

—না, এখান থেকে বলুন আপনি?

—নিধু বাবুর একটা টপ্পা শোনবা?

—না, আপনি যান, মা আসচে—

প্রসন্ন চক্কত্তি আবার কিছুদূর যেতে গয়া পেছন থেকে বললে—আবার আসবেন এখন একদিন—কানে গেল কথাডা? আসবেন—

—কেন আসবো না। নিশ্চয় আসবো। ঠিক আসবো।

দূরের মাঠের পথ ধরলো প্রসন্ন চক্কত্তি। অনেক দূর সে চলে এসেচে গয়াদের বাড়ী থেকে। বরদা দেখে ফেলে নি আশা করা যাচ্চে। কেমন মিষ্টি সুরে কইলে গয়া, কেমন ভাবে তাকে সরিয়ে দিলে পাছে মা দেখে ফেলে!

কিন্তু তার চেয়েও অদ্ভুত, তার চেয়েও আশ্চর্য্য হচ্চে, ওঃ, ভাবলে এখনো সারা দেহে অপূর্ব্ব আনন্দের শিহরণ বয়ে যায়, সেটা হচ্চে গয়ার সেই মশা মারা।

এত কাছে এসে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। অমন সুন্দর ভঙ্গিতে।

সত্যিই কি মশা বসেছিল তার গায়ে? মশা মারবার ছলে গয়া কি তার কাছে আসতে চায় নি?

কি একটা দেখিয়েছিল বটে গয়া, প্রসন্ন চক্কত্তির তখন কি চোখ ছিল একটা মরা মশা দেখবার? সন্দে হয়ে এসেছে। ভাদ্রের নীল আকাশ দূর মাঠের উপর উপুড় হয়ে আছে। বাঁশের নতুন কোঁড়াগুলো সারি সারি সোনার সড়কির মত দেখাচ্ছে রাঙা রোদ পড়ে বনো-জোলার যুগীপাড়ার বাঁশবনে বনে। ওখানেই আছে গয়ার মা বরদা। ভাগ্যিস বাড়ী ছেড়ে গিয়েছিল! নইলে বরদা আজ উপস্থিত থাকলে গয়ার সঙ্গে কথাই হোতো না। দেখাই হোতো না। বৃথা যেতো এমন চমৎকার শরতের দিন, বৃথা যেতো ভাদ্রের সন্ধ্যা…

সারা জীবনের মধ্যে এই একটি দিন তার। চিরকাল যা চেয়ে এসেছিল, আজ এতদিন পরে তা কি মিললো। নারীর প্রেমের জন্য সারা জীবনটা বুভুক্ষু ছিল না কি ওর?

প্রসন্ন চক্কত্তি অনেক দেরি করে আজ বাসায় ফিরলো। নীলকুঠির বাসা, ছোট্ট একখানা ঘর, তার সঙ্গে খড়ের একটা রান্নাঘর। সদর আমীন নকুল ধাড়া আজ অনুপস্থিত তাই রক্ষে, নতুবা ব'কিয়ে বকিয়ে মারতো এতক্ষণ। বক্‌বার মেজাজ নেই তার আজ। শুধু বসে বসে ভাবতে ইচ্ছে করছে · গয়া তার কাছ ঘেঁষে এসে মশা মারলে…হুম, হুম। ধরা দেয়। স্বর্গের উর্ব্বশী মেনকা রম্ভাও ধরা দেয়, সে চাইচে যে…

বর্ষা নামলো হঠাৎ। ভাদ্র সন্ধ্যা অন্ধকার ক'রে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি নামলো। খড়ের চালার ফুটো বেয়ে জল পড়ছে মাটির উনুনে। ভাত চড়িয়েছে উচ্ছে আর কাঁচকলা ভাতে দিয়ে। আর কিছু নেই, আর কিছু রান্না করবার দরকার কি? খাবার ইচ্ছে নেই। শুধু ভাবতে ভালো লাগে…শুধু গয়া-মেমের সেই অদ্ভুত ভঙ্গি, তার সে মুখের হাসি…গয়া তার কাছে ঘেঁষে এসে এক চড় মেরেছে তার গায়ে মশা মারতে…

মশা কি সত্যিই তার গায়ে বসেছিল?

আচ্ছা, এমন যদি হোতো—

সে ভাত রান্না করচে, গয়া হাসি হাসি মুখে উঁকি দিয়ে বলতো এসে—খুড়োমশাই, কি করচেন?

—ভাত রাঁধচি গয়া।

—কি রান্না করচেন ?

—ভাতে ভাত।

—আহা আপনার বড় কষ্ট!

—কি করবো গয়া, কে আছে আমার। কি খাই না-খাই দেখচে কে ?

—আপনার জন্যি মাছ এনেচি। ভালো খয়রা মাছ।

—কেন গয়া তুমি আমার জন্যি এত ভাবো ?

—বড্ড মন-কেমন করে আপনার জন্যি। একা থাকেন, কত কষ্ট পান···

ভাত হয়ে গেল। ধরা গন্ধ বেরিয়েচে। সর্ষের তেলে ভাতে ভাত মেখে খেতে বসলো প্রসন্ন চক্কত্তি। রেড়ির তেলের জল বসানো দোতলা মাটির পিদিমের শিখা হেলছে তুলছে জোলো হাওয়ায়। খাওয়ার শেষে—যখন প্রায় হয়ে এসেচে, তখন প্রসন্ন আবিষ্কার করলে পাতে সে নুন নেয় নি, উচ্ছে ভাতে কাঁচকলা ভাতে আলুনি খেয়ে চলেছে এতক্ষণ।

আচ্ছা, মশাটা কি সত্যিই ওর গায়ে বসেছিল ?

রামকানাই কবিরাজ সকালে উঠে ইছামতীতে স্নান ক'রে আসবার সময় দেখলেন কি চমৎকার নাক-জোয়ালে ফুল ফুটেছে নদীর ধারের ঝোপের মাথায়। বেশ পুজো হবে। বড় লোভ হোলো রামকানাইয়ের। কাঁটার জঙ্গল ভেদ করে অতি কষ্টে ফুল তুলে রাম-কানাইয়ের দেরি হয়ে গেল নিজের ছোট্ট খড়ের ঘরে ফিরতে।

রামকানাই রোজ প্রাতঃস্নান করে এসে পুজো ক'রে থাকেন গ্রাম্যকুমোরের তৈরি রাধাকৃষ্ণের একটা পুতুল। ভালো লেগেছিল বলে ভাসান-পোতার চড়কের মেলায় কেনা। বড় ভালো লাগে ঐ মূর্ত্তির পায়ে নাক-জোয়ালে ফুল সাজিয়ে দিতে, চন্দন ঘষে মূর্ত্তির পায়ে মাখিয়ে দিতে, দু'একটা ধূপকাঠি জেলে দিতে পুতুলটার আশে পাশে। নৈবেদ্য দেন, কোনো দিন পেয়ারা কাটা কোনোদিন পাকা পেঁপের টুকরো, এক ডেলা খাঁড় আখের গুড়।

পুজো শেষ করবার আগে যদি কেউ না আসে তবে অনেকক্ষণ পুজো চলে রাম-কানাইয়ের। চেয়ে চেয়ে এক-একদিন জলও পড়ে। লাজুক হাতে মুছে ফেলে দেন রামকানাই।

কে বাইরে থেকে ডাকলে—কবিরাজমশাই ঘরে আছেন ?

—কে ? যাই।

—সবাইপুরির অম্বিক মণ্ডলের ছেলের জ্বর। যেতি হবে সেখানে।

—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি—বোসো!

পুজো আচ্ছা শেষ করে প্রসাদ নিয়ে বাইরে এসে কামকানাই সেই লোকটার হাতে কিছু দিলেন।

—কি অসুখ।

—আজ্ঞে, জ্বর আজ তিনদিন।

—তুমি চলে যাও, আমি আরো দুটো রুগী দেখে যাব এখন—

রামকানাই দু'টুকরো শসা খেয়ে রোগী দেখতে বেরিয়ে পড়েন। নানা জায়গা ঘুরে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সবাইপুর গ্রামের অম্বিকা মণ্ডলের বাড়ী গিয়ে ডাক দিলেন। অম্বিকা মণ্ডল বেগুনের চাষ করে, অবস্থা খুব খারাপ। ছেলেটির আজ কয়েকদিন জ্বর, ওষুধ নেই, পথ্য নেই। রামকানাই কবিরাজ খুব যত্ন ক'রে দেখে বললেন—এর নাড়ির অবস্থা ভালো না! একবার টাল খাবে—

বাড়ীসুদ্ধ সকলে মিলে কবিরাজকে সেদিনটা সেখানে থাকতে বললে। তখনো যে তাঁর খাওয়া হয় নি, সেকথা কেউ জানে না, কেউ কিছু বললেও না। রামকানাই কবিরাজ না খেয়ে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বালকের শিয়রে বসে রইলেন। তারপর বাড়ী এসে সন্ধ্যা-আরাধনা ও রান্না করে রাত এক প্রহরের সময় আবার গেলেন রোগীর বাড়ী।

রামকানাইয়ের নাড়িজ্ঞান অব্যর্থ। রাত দুপুরের সময় রোগী যায় যায় হোলো। সুচিকাভরণ প্রয়োগ ক'রে টাল সামলাতে হোলো রামকানাইয়ের। ওদের ঘরের মধ্যে জায়গা নেই, পিঁড়েতে একটা মাদুর দিলে বিছিয়ে। ভোর পর্য্যন্ত সেখানে কাটিয়ে তিনি পুনরায় রোগীর নাড়ী দেখলেন। মুখ গম্ভীর করে বললেন—এ রুগী বাঁচবে না। বিষম সান্নিপাতিক জ্বর, বিকার দেখা দিয়েছে। আমি চললাম। আমাকে কিছু দিতে হবে না তোমাদের।

এতটা পরিশ্রমের বদলে একটি কানাকড়িও পেলেন না রামকানাই, সেজন্য তিনি দুঃখিত নন্, রোগীকে যে বাঁচাতে পারলেন না তার চেয়ে বড় দুঃখ হ'লো তাঁর সেটাই।

আজকাল একটি ছাত্র জুটেছে রামকানাইয়ের। ভজন ঘাটের অক্রূর চক্রবর্ত্তীর ছেলে, নাম নিমাই, বাইশ তেইশ বছর বয়স। সে ঘরের বাইরে দূর্ব্বাঘাসের ওপরে মাধব নিদানের পুঁথি হাতে বসে আছে। অধ্যাপক আসতেই উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলে।

রামকানাই তাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন—বাপ নিমাই। বোসো। নাড়ির ঘা কি রকম রে?

—আজ্ঞে নাড়ির ঘা কি, বুঝতে পারলাম না।

—ক' ঘা দিলে সঙ্কটের নাড়ি?

—তিন-এর পর এক ফাঁক। চারের পর এক ফাঁক।

—তা কেন, সাত-এর পর, আটের পর হলি হবে না?

—আজ্ঞে তাও হবে।

—তাই বল। আজ একটা রুগী দেখলাম সাতের পর ফাঁক। সেখান থেকেই এ্যালাম।

—বাঁচলো?

—স্বয়ং ধন্বন্তরির অসাধ্য—কৃতি সাধ্যা ভবেৎ সাধ্য—সুশ্রুতে বলচে। বাবা, একটা কথা বলি। কবিরাজি তো পড়বার জন্যি এসেচ। শরীরে কোনো দোষ রাখবা না। মিথ্যে কথা বলবা না। লোভ করবা না। অল্পে সন্তুষ্ট থাকবা। দুঃখী গরিবদের বিনা মূল্যে

চিকিৎসা করবা। ভগবানে মতি রাখবা। নেশা-ভাঙ করবা না। তবে ভালো কবিরাজ হতি পারবা। আমার গুরুদেব (উদ্দেশে প্রণাম করলেন রামকানাই) মঙ্গলগঞ্জের গঙ্গাধর সেন কবিরাজ সর্ব্বদা আমাদের একথা বলতেন। আমি তাঁর বড় প্রিয় ছাত্র ছেলাম কিনা। তাঁর উপযুক্ত হই নি। আমরা কুলাঙ্গার ছাত্র তাঁর। নাড়ি ধরে যাকে যা বলবেন, তাই হবে। তিনি বলতেন, মনডা পবিত্র না রাখলি নাড়িজ্ঞান হয় না। কিছু খাবি ?

ছাত্র সলজ্জমুখে বললে—না, গুরুদেব।

—তোর মুখ দেখে মনে হচ্চে কিছু খাস নি। কি-বা খেতি দি, কিছু নেই ঘরে—একটা নারকোল আছে, ছাড়া দিকি।

—দা আছে ?

—ঐ বটকৃষ্ট সামন্তদের বাড়ী থেকে নিয়ে আয়, ওই নদীর ধারে বাঁশতলায় যে বাড়ী, ওটা। চিনতি পারবি, না সঙ্গে যাবো ?

—না, পারবো এখন—

গুরুশিষ্য কাঁচা নারকোল ও অল্প দুটি ভাজা কড়াইয়ের ডাল চিবিয়ে খেয়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা কাজে মন দিলে—বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত। ছাত্রের যদি বা হুঁশ থাকে তো গুরুর একেবারে নেই। 'মাধব নিদান' পড়াতে পড়াতে এল চরক, চরক থেকে এল কলাপ ব্যাকরণ, অবশেষে এসে পড়ে শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীরামকানাই কবিরাজ ভালো সংস্কৃতজ্ঞ, ব্যাকরণের উপাধি পর্য্যন্ত পড়েছিলেন।

ছাত্রকে বললেন—অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদার ধী।

তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত: পুরুষং পরং ॥

অকাম অর্থাৎ বিষয়কামনাশূন্য হয়ে ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরকে ভজনা করবে। বুঝলে বাবা ? তাঁর অসীম দয়া—চৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

সকাম ভক্ত অজ্ঞ জানি দয়ালু ভগবান

স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার নিধান—

তিনিই কৃপা করেন—একবার তাঁর চরণে শরণ নিলেই হোলো। মানুষের অজ্ঞতা দেখে তিনি দয়া না করলি কে করবে ?

শিষ্য কাঠ সংগ্রহ করে আনলে বাঁশবন থেকে। গুরু বললেন—একটা ওল তুলে আনলি নে কেন বাঁশবন থেকে ? আছে ?

—অনেক আছে।

—নিয়ে আয়। বটকৃষ্টদের বাড়ী থেকে শাবল একখানা চেয়ে নে, আর ওদের দাখানা দিয়ে এসেচিস ? দিয়ে আয়। বড় দেখে ওল তুলবি, খাবার কিছু নেই ঘরে। ওল-ভাতে সর্ষেবাটা দিয়ে আর—ওরে অমনি দুটো কাঁচা নংকা নিয়ে আসিস বটকেষ্টদের বাড়ী থেকে—

—মুখ চুলকোবে না, গুরুদেব ?

—ওরে না না। সর্বে বাটা মাখলি আবার মুখ চুলকোবে—

—ওল টাটকা তুলে খেতি নেই, রোদে শুকিয়ে নিতি হয় দু'একদিন—

—সে সব জানি, আজ ভাত দিয়ে খেতি হবে তো? তুই নিয়ে আয় গিয়ে, যা—তুইও এখানে খাবি—

ওল-ভাতে দিয়ে গুরুশিষ্য আহার সমাপ্ত ক'রে আবার পড়াশুনো আরম্ভ ক'রে দিলে। বিকেলবেলা হয়ে গেল, বাঁশবনে পিড়িং পিড়িং ক'রে ফিঙে পাখী ডাকচে, ঘরের মধ্যে অন্ধকারে আর দেখা যায় না, তখন গুরুর আদেশে শিষ্য নিমাই চক্রবর্ত্তী পুঁথি বাঁধলে। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললে—তাহোলে যাই গুরুদেব।

—ওরে, কি ক'রে যাবি। বাঁশবনের মাথায় বেজায় মেঘ করেচে—ভীষণ বৃষ্টি আসবে—ছাতিটাও তো আজ আনিস নি—

—বাঁটটা ভেঙে গিয়েচে। আর একটা ছাতি তৈরি করচি। ভালো কচি তালপাতা এনে কাদায় পুঁতে রেখে দিইচি। সাত-আট দিনে পেকে যাবে। সেই তালপাতায় পাকা ছাতি হয়—

—কেন, কেয়াপাতায় ভালো ছাতি হয়—

—টেঁকে না গুরুদেব। তালপাতার মত কিছু না—

—কে বললে—টেঁকে না? কেয়াপাতার ছাতি সবাই বাঁধতি জানে না। আমি তোরে দেবো একখানা ছাতি—দেখবি—

শিষ্য বিদায় নিয়ে চলে যাবার কিছু পরেই গয়ামেম ঘরে ঢুকলো, হাতে তার একছড়া পাকা কলা। সে দূর থেকে রামকানাইকে প্রণাম করে দোরের কাছেই দাঁড়িয়ে রইলো। রামকানাই বললে—এসো মা, বোসো বোসো, দাঁড়িয়ে কেন? হাতে ও কি?

গয়া সাহস পেয়ে বললে—এ ছড়া গাছের কলা। আপনার চরণে দিতি এ্যালাম—আপনি সেবা করবেন।

—ও তো নিতি পারবো না—আমি কারো দান নিই নে—

—এক কড়া কড়ি দিয়ে নিন—

—রুগীদের বাড়ী থেকে নিই। ওতে দোষ হয় না। বটকেষ্ট সামন্ত আমার রুগী। হাঁপানিতে ভুগচে, ওর বাড়ী থেকে নিই এটা-ওটা। তুমি তো আমার রুগী নও মা—অবিশ্যি আশীর্ব্বাদ করি রুগী না হতি হয়।

—রোগের জন্যি তো এ্যালাম, জ্যাঠামশাই—

—কি রোগ?

গয়া ইতস্ততঃ করে বললে—সর্দ্দি মত হয়েচে। রাত্তিরে ঘুম হয় না।

—ঠিক তো?

—ঠিক বলচি বাবা। আপনি সাক্ষাৎ শিবতুল্য লোক। আপনার সঙ্গে মিথ্যে বললে নরকে পচে মরতি হবে না?

রামকানাই দুঃখিত সুরে বললেন—না মা, ওসব কথা বলতি নেই। আমি তুচ্ছ লোক। আচ্ছা একটু ওষুধ তোমারে দিই। আদার রস আর মধু দিয়ি মেড়ি খাবা।

—আচ্ছা, বাবা—

—কি ?

—সব লোক আপনার মত হয় না কেন ? লোকে এত দুষ্টু, বদমাইশ হয় কেন ?

—আমিও ওই দলের। আমি কি করে দলছাড়া হলাম ? এ গাঁয়ে একজন ভালো লোক আছে, দেওয়ানজির জামাই ভবানী বাঁড়ুয্যে। মিথ্যা কথা বলে না, গরিবের উপকার করে, লক্ষ্মীর সংসার, ভগবানের কথা নিয়ে আছে।

—আমি দেখিচি দূর থেকি। কাছে যেতি সাহসে কুলোয় না—সত্যি কথা বলচি আপনার কাছে। আমাদের জন্মো মিথ্যে গেল। জানেন তো সবি জ্যাঠামশাই—

—তাঁকে ডাকো। তাঁর কৃপা হোলি সবই হয়। তুমি তো তুমি, কত বড় বড় পাপী তরে গেল।

—জ্যাঠামশাই এক এক সময় মনে বড্ড খেদ হয়। ইচ্ছে হয় সব ছেড়ে ছুড়ে বেরিয়ে যাই—মার জন্যি পারিনে। মা-ই আমাকে নষ্ট করলে। মা আজ মরে গেলি আমি একদিক গিয়ে বেরোতাম, সত্যি বলচি, এক এক সময় হয় এমনি মনটা জ্যাঠামশাই—

রামকানাই চুপ করে রইলেন। তাঁর মন সায় দিল না এসময়ে কোনো কথা বলতে।

গয়া বললে—কলা নেবেন ?

—দিয়ে যাও। ওষুধটা দিয়ে দিই মা, দাঁড়াও। মধু আছে তো ? না থাকে আমার কাছে আছে, দিচ্চি—

গয়া প্রণাম করে চলে গেল ওষুধ নিয়ে। পথে যেতে যেতে প্রসন্ন চক্কত্তির সঙ্গে হঠাৎ দেখা। গয়ার আসবার পথে সে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে।

—এই যে গয়া, কোথায় গিয়েছিলে ? হাতে কি ?

—ওষুধ খুড়োমশাই। এখানে দাঁড়িয়ে ?

—ভাবচি তুমি তো এ পথ দিয়ে আসবে।

—আপনি এমন আর করবেন না—সরে যান পথের ওপর থেকে—

—কেন, আমার ওপর বিরূপ কেন ? কি হয়েচে ?

—বিরূপ-সরূপের কথা না। আপনি সরুন তো—আমি যাই—

গয়া হন হন করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। প্রসন্ন চক্কত্তি তেমন সাহস সঞ্চয় করতে পারলে না যে পেছন থেকে ডাকে। ফিরেও চাইলে না গয়া।

নাঃ, মেয়েমানুষের মতির যদি কিছু—

•

নীলবিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেল সারা যশোর ও নদীয়া জেলায়। কাছারীতে সে খবরটা নিয়ে এল নতুন দেওয়ান হরকালী সুর।

শিপ্‌টন সাহেব কুঠির পশ্চিম দিকের বারান্দায় বসে বন্দুকের নল পরিষ্কার করছিল। হরকালী সুর সেলাম করে বললে—তেয়ো খানা গাঁয়ের প্রজা ক্ষেপেচে সায়েব। ছোটলাট আসচেন এই সব জায়গা দেখতে। প্রজারা তাঁর কাছে সব বলবে—

শিপ্‌টন্ মাথা নাড়া দিয়ে বললে—Hear me ডেওয়ান। প্রজাশাসন কি করিয়া করিটে হয় টাহা আমি জানে। আগের ডেওয়ানকে যাহারা খুন করিয়াছিল, টাহাদের ঘর-বাড়ী জালাইয়া দিয়াছি—these people want a revolt—do they? সব নীলকুঠির সাহেব লোক মিলিয়া সভা হইয়াছিল, টুমি জানে?

—জানি হুজুর। তখন আমি রণবিজয়পুরের কুঠিতে—

—ও, that রণবিজয়পুর। যেখানে জেক্রিজ সাহেব খুন হইলো?

—খুন হন নি হুজুর। মদ খেয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে গেলেন—

—ওসব নেটিভ আমলাদের কারসাজি আছে। It was a plot against his life—আমি সব জানে। কে ম্যানেজার ছিল? রবিন্‌সন্?

—আজ্ঞে হুজুর।

—এখন কান পাতিয়া শোনো। I want a very intrepid দেওয়ান, যেমন রাজারাম ছিলো। But—

নিজের মাথায় হাত দিয়ে দেখিয়ে বললে—He was not a brainy chap—something wrong with his think-box—বুদ্ধি ছিলো না। সাবধান হইয়া চলিটে জানিট না। সেজন্যে মরিলো। বওুক দেখিলে?

—হাঁ হুজুর।

—সাতটা নতুন গান আসিয়াছে। আমার নাম শিপ্‌টন্ আছে—কি করিয়া শাসন করিটে হয় তাহা জানে—I will shoot them like pigs.

—হুজুর।

—আমাদের সভাতে ঠিক হইয়াছে, আমরা হঠিব না। গভর্ণমেণ্টের কঠা শুনিব না। প্রয়োজন বুঝিলে খুন করিবে। মেমসাহেবদের এখানে রাখা হইবে না—আমি মেমসাহেবকে পাঠাইয়া ডিটেছি—

—কবে হুজুর?

—Monday next, by boat from here to মঙ্গলগঞ্জ। সোমবারে নৌকা করিয়া যাইবেন। নৌকা ঠিক রাখিবে।

—যে আজ্ঞে হুজুর। সব ঠিক থাকবে—সঙ্গে কে যাবে হুজুর?

—কি প্রয়োজন? I don't think that is necessary—

দেওয়ান হরকালী সুর ঘুঘু লোক। অনেক কিছু ভেতরের খবর সে জানে। কিন্তু কতটা বলা উচিত কতটা উচিত নয়, তা এখনো বুঝে উঠতে পারে নি। মাথা চুলকে

বললে—হুজুর, সঙ্গে আপনি গেলে ভালো হয়—

শিপ্‌টন্ ভুরু কুঁচকে বললে—She can take care of herself—তিনি নিজেকে রক্ষা করিটে জানেন। আমার যাইটে হইবে না—টুমি সব ঠিক কর।

—হুজুর, করিম লাঠিয়ালকে সঙ্গে দিতে চাই—

· —What ? Is it as worse as that ? কিছু ডরকার নাই। তুমি যাও। অত ভয় করিলে নীলকুঠি চালাইটে জানিবে না। ঠিক আছে।

—যে আজ্ঞে হুজুর—

—একটা কথা শুনিয়া যাও। Are you sure there's as much as that ? খবর লইয়া কি জানিলে ?

—সাহস দেন তো বলি হুজুর—মেমসাহেবের সঙ্গে করিম লাঠিয়াল আর পাইক যেন যায়। ষড়যন্ত্র অনেক দূর গড়িয়েচে—

সাহেব শিস্ দিতে দিতে বললে—ও। This I never imagined possible ! It will make me feel different—ইহা বিশ্বাস করা শক্ট। আচ্ছা, টুমি যাও। Leave ever,thing to me—আমি যা-যা করিটে হইবে, সব করা হইবে, বুঝিলো ?

হরকালী সুর বহুদিন বহু সাহেব ঘেঁটে এসেচে, উল্‌টো পাল্‌টা ভুল বাংলা আন্দাজে বুঝে বুঝে ঘুণ হয়ে গিয়েচে।

বললে—একটা কথা বলি হুজুর। আমার বন্দোবস্ত আমি করি, আপনার বন্দোবস্ত আপনি করুন। সেলাম, হুজুর—

তিন দিন পরে বড়সাহেবের মেম নীলকুঠির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কুলতলার ঘাটে বজরায় চাপলো। সঙ্গে দশজন পাইক সহ করিম লাঠিয়াল, নিজে হরকালী সুর পৃথক নৌকায় বজরার পেছনে।

পুরানো কর্ম্মচারীদের মধ্যে প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী আমীন হাতজোড় করে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে—মা, জগদ্ধাত্রী মা আমার! আপনি চলে যাচ্চেন, নীলকুঠি আজ অন্ধকার হয়ে গেল।···

প্রসন্ন আমীন হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে।

মেমসাহেব বললে—Don't you cry my good man—আমীনবাবু, কাঁদিও না—কেন কাঁদে ?

—মা, আমার অবস্থা কি করে গেলে ? আমার গতি কি হবে মা ? কার কাছে দুঃখ জানাবো, জগদ্ধাত্রী মা আমার—

চতুর হরকালী সুর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসি চেপে রাখলে।

মেমসাহেব দ্বিরুক্তি না করে নিজের গলা থেকে সরু হাড়ছাড়াটা খুলে প্রসন্ন আমীনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

প্রসন্ন শশব্যস্ত হয়ে সেটা লুকে নিলে দু'হাতে।

সকলে অবাক। হরকালী সুর স্তম্ভিত। করিম লেঠেল হাঁ করে রইল।

বজরা ঘাট ছেড়ে চলে গেল।

প্রসন্ন আমীন অনেকক্ষণ বজরার দিকে চেয়ে চেয়ে ঘাটে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর উড়ানির খুঁটে চোখের জল মুছে ধীরে ধীরে ঘাটের ওপরে উঠে চলে গেল।

বড়সাহেবের মেম চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীলকুঠির লক্ষ্মী চলে গেল।

গয়ামেম হাসতে হাসতে বললে—কেমন খুড়োমশাই ? আদ্দেক ভাগ কিন্তু দিতি হবে—

দুপুর বেলা। নীল আকাশের তলায় উঁচু গাছে গাছে বহু ঘুঘুর ডাকে মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা ঘনতর করে তুলেচে। শ্যাম-লতার সুগন্ধি ফুল ফুটেচে অদূরবর্ত্তী ঝোপে। পথের ধারে বটতলায় দুজনের দেখা। দেখাটা খুব আকস্মিক নয়, প্রসন্ন চক্কত্তি অনেকক্ষণ থেকে এখানে অপেক্ষা করছিল। সে হেসে বললে—নিও, তোমার জন্যেই তো হোল—

—কেমন, বলেছিলাম না ?

—তুমিই নাও ওটা। তোমারেই দেবো—

—পাগল! আমারে অত বোকা পালেন ? সায়েবসুবোর জিনিস আমি ব্যাভার করতি গেলে কি বলবে সবাই ? ওতে আমি হাত দিই কখনো ?

—তোমারে বড় ভালো লাগে গয়া—

—বেশ তো।

—তোমারে দেখলি এত আনন্দ পাই—

—এই সব কথা বলবার জন্তি বুঝি এখানে দাঁড়িয়ে ছেলেন ?

—তা—তা—

—বেশ, চললাম এখন। শুনুন আর একটা কথা বলি। আপনি অন্য জায়গায় চাকরীর চেষ্টা করুন—

—সে আমি সব বুঝি। এদের দাপট কমেচে তা আমি দেখতে পাচ্চিনে এত বোকা নই। শুধু তোমারে ফেলে কোনো জায়গায় যেতি মন সরে না—

—আবার ওই সব কথা!

—চলো না কেন আমার সঙ্গে ?

—কনে ?

—চলো যেদিকি চোখ যায়—

গয়া খিল্ খিল্ করে হেসে বললে—এইবার তা'হলি ষোলকলা পুন্ন্ হয়। যাই এবার আপনার সঙ্গে যেদিকি দুই চোখ যায়—

প্রসন্ন চক্কত্তি ভাব বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল। গয়া হাসিমুখে বললে—কথা বলচেন না যে ? ও খুড়োমশাই ?

—কি বলবো ? তোমার সঙ্গে কথা বলতি সাহস হয় না যে।

—খুব সাহস দেখিয়েচেন, আর সাহসে দরকার নেই। আপনারে একটা কথা বলি। মারে ফেলে ক'নে যাবো বলুন। এতদিনে যাদের নুন খেলাম, তাদের ফেলে কোথায় যাবো? ওরা এতদিন আমারে খাইয়েচে, মাখিয়েচে, যত্ন-আত্যি কম করে নি—ওদের ফেলে গেলি ধম্মে সইবে না। আপনি চলে যান—ভাত খাচ্চেন ক'নে আজকাল? রেঁধে দিচ্চে কেডা?

. প্রসন্ন চক্কত্তি কথার উত্তর দিতে পারে না? অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। এ সব কি ধরনের কথা? কেউ তাকে এমন ধরনের কথা বলেচে কখনো?··· আবার সেই আনন্দের শিহরণ নেমেচে ওর সর্ব্বাঙ্গে। কি অপূর্ব্ব অনুভূতি। গা ঝিম-ঝিম করে ওঠে যেন। চোখে জল এসে পড়ে। অন্যমনস্কভাবে বলে—ভাত?···ভাত রান্না···ও ধরো···না, নিজেই রাঁধি আজকাল!

—একবার দেখতি ইচ্ছে হয় কি রকম রাঁধেন—

—প্রসাদ পাবা?

—সে আপনার দয়া। কি রান্না করবেন?

—বেগুন ভাতে, মুগির ডাল। খয়রা মাছ যদি খোলার গাঙে পাই, তবে ভাজবো—

—আপনি সত্যি সত্যি এত বেলায় এখনো খান নি?

—না। তোমার জন্যি অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি। কুঠি থেকে কখন বেরুবে তাই দাঁড়িয়ে আছি—

গয়া রাগের সুরে বললে—ওমা, এমন কথা আমি কখনো শুনি নি। সে কি কথা? আমি কি আপনার পায়ে মাথা কুটবো? এখুনি চলে যান বাড়ী। কোনো কথা শুনচিনে। যান—

—এই যাচ্চি—তা—

—কথা টথা কিছু হবে না। চলে যান আপনি—

গয়া চলে যেতে উদ্যত হোলে প্রসন্ন চক্কত্তি ওর কাছ ঘেঁষে (যতটা সাহস হয়, বেশি কাছে যেতে সাহসে কুলোয় কৈ?) গিয়ে বললে—তুমি রাগ করলে না তো? বলো গয়া—

—না রাগ করলাম না, গা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল—এমন বোকামি কেন করেন আপনি?···যান এখন—

—রাগ কোরো না গয়া, তুমি রাগ করলি আমি বাঁচবো না।

ওর কণ্ঠে মিনতির সুর।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বিকেলে বেড়াতে বেরুবেন, খোকা কাঁদতে আরম্ভ করলে—বাবা যাবো—

তিলু ধমক দিয়ে বললে—না, থাকো আমার কাছে।

খোকা হাত বাড়িয়ে বললে—বাবা যাবো—

ভবানী বাঁড়ুয্যের ছাতি দেখিয়ে বলে—কে ছাতি?

—অর্থাৎ কার ছাতি।

ভবানী বললেন—আমার ছাতি। চল, আবার বিষ্টি হবে—

খোকা বললে—বিষ্টি হবে।

—হাঁ হবেই তো।

ভবানীর কোলে উঠে খোকা যখন যায়, তখন তার মুখের হাসি দেখে ভাবেন এর সঙ্গ সত্যিই সৎসঙ্গ। খোকাও তাঁকে একদণ্ড ছাড়তে চায় না। বাপছেলের সম্বন্ধের গভীর রসের দিক ভবানীর চোখে কি স্পষ্ট হয়েই ফুটলো।

কোলে উঠে যেতে যেতে খোকা হাসে আর বলে—কাণ্ড! কাণ্ড!

এ কথার বিশেষ কি অর্থ সে-ই জানে। বোধ হয় এই বলতে চায় যে কি মজার ব্যাপারই না হয়েছে। ভবানী জানেন খোকা মাঝে মাঝে দুই হাত ছড়িয়ে বলে—কাণ্ড!

কাণ্ড!—মানে তিনিও ঠিক জানেন না, তবে উল্লাসের অভিব্যক্তি এটুকু বোঝেন। কৌতুকের সুরে ভবানী বললেন—কিসের কাণ্ড রে খোকা?

—কাণ্ড! কাণ্ড!

—কোথায় যাচ্চিস রে খোকা?

—মুকি আনতে!

—মুড়কি খাবে বাবা?

—হুঁ?

—চল কিনে দেবো।

ইছামতী নদী বর্ষার জলে কূলে-কূলে ভর্ত্তি। খোকাকে নিয়ে গিয়ে একটা নৌকোর ওপর বসলেন ভবানী। দুই তীরে ঘন সবুজ বনঝোপ, লতা দুলচে জলের ওপর, বাবলার সোনালী ফুল ফুটেচে তীরবর্ত্তী বাবলা গাছের নত শাখায়; ওপার থেকে নীল নীরদমালা ভেসে আসে, হলদে বসন্তবৌরি এসে বসে সবুজ বননিকুঞ্জের এ ডাল থেকে ও ডালে।···

ভবানী বাঁড়ুয্যে মুগ্ধ হয়ে ভাবেন, কোন্ মহাশিল্পীর সৃষ্টি এই অপরূপ শিল্প, এই শিশুও তার অন্তর্গত। এই বিপুল কাকলীপূর্ণ অপরাহ্নে, নদীজলের স্নিগ্ধতায় শ্রীভগবান বিরাজ করছেন জলে স্থলে, উর্দ্ধে, অধঃ, দক্ষিণে উত্তরে, পশ্চিমে, পুবে। যেখানে তিনি, সেখানে এমন সুন্দর শিশু অনাবিল হাসি হাসে, অমন সুন্দর বসন্তবৌরি পাখীর হলুদ রংয়ের দেহের ঝলক ফুটে ওঠে। ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে বনকলমী ফুল ওইরকম ফোটে জলের ধারে ঝোপে ঝোপে। তাঁর বাইরে কি আছে? জয় হোক তাঁর।

খোকা হাত ছাড়িয়ে বলে—কি জল! কি জল!

এগুলো সে সম্প্রতি কোথা থেকে যেন শিখেচে—সর্ব্বদা প্রয়োগ করে।

ভবানী বললে—খোকা, নদী বেশ ভালো?

খোকা ঘাড় নেড়ে বললে—ভালো।

—বাড়ী যাবি?

—হুঁ!

—তবে যে বললি ভালো?

—মার কাছে যাবো…

অন্ধকার বাঁশবনের পথে ফিরতে খোকার বড় ভয় হয়। দু'বছরের শিশু, কিছু ভালো বুঝতে পারে না…সামনের বাঁশঝাড়টার ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তার হঠাৎ বড় ভয় হয়। বাবাকে ভয়ে জড়িয়ে ধরে বলে…বাবা ভয় করবে, ওতা কি?

—কই কি, কিছু না।

খোকা প্রাণপণে বাবার গলা জড়িয়ে থাকে। তাকে ভয় ভুলিয়ে দেবার জন্যে ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—এগুলো কি জ্বলচে বনে?

খোকা চোখ খুলে চাইলে, এতক্ষণে চোখ বুজিয়ে রেখেছিল ভয়ে। চেয়ে দেখে বললে—জোনা পোকা।

ভবানী বললেন—কি পোকা বললি? চেয়ে দেখে বল্—

—জোনা পোকা।

—মাকে গিয়ে বলবি?

—হুঁ।

—কোন্ মাকে বলবি?

—তিলুকে।

—কেন, নিলুকে না?

—হুঁ।

—আর এক মায়ের নাম কি?

—তিলু।

—তিলু তো হোলো, আর?

—নিলু।

—আর একজন?

—মা।

—আর এক মায়ের নাম বল—

—তিলু মা—

—দূর, তুই বুঝতে পারলি নে, তিলু মা হোলো, নিলু মাও হোলো—আর একজন কে?

—বিলু।

—ঠিক।

এখনো সামনে অগাধ বাঁশবনের মহাসমুদ্র। বড্ড অন্ধকার হয়ে এসেচে, আলোর ফুলের মত জোনাকী পোকা ফুটে উঠচে ঘন অন্ধকারে এ বনে ও বনে, এ ঝোপে ও ঝোপে। একটা পাখী কুস্বরে ডাকচে জিউলি গাছটায়। বনের মধ্যে ধুপ করে একটা শব্দ হোলো, একটা পাকা তাল পড়লো বোধ হয়। ঝিঁঝিঁ ডাকচে নাটা-কাঁটার বনে।

খোকা আবার ভয়ে চুপ করে আছে।···

এমন সময়ে কোথায় দূরে সন্ধ্যার শাঁখ বেজে উঠলো। খোকা চোখ ভালো করে না চেয়ে দেখেই বললে—দুগ্‌গা, দুগ্‌গা—নম নম—

ওর মায়েদের দেখাদেখি ও শিখেচে। একটুখানি চেয়ে দেখলে চারদিকের অন্ধকার নিবিড়তর হয়েচে। ভয়ের সুরে বললে—ও ভবানী—

—কি বাবা ?

—মার কাছে যাবো—ভয় করবে।

—চলো যাচ্চি তো—

—ভবানী—

—কি ?

—ভয়!

—কিসের ভয়! কোনো ভয় নেই—

এই সময়ে কোথায় আবার শাঁখ বেজে উঠলো। খোকা অভ্যাসমত তাড়াতাড়ি দু'হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বললে—দুগ্‌গা, দুগ্‌গা, নম নম।

ভবানী হেসে বললেন—ছাখো বাবা। এবার দুর্গানামে যদি ভয় কাটে···

সত্যি দুর্গা নামে ভয় কেটে গেল। বনবাদাড় ছাড়িয়ে পাড়া আরম্ভ হয়ে গেল। ঘরে-ঘরে প্রদীপ জলচে, গোয়ালে-গোয়ালে সাঁজাল দিয়েচে, সাঁজালের ধোঁয়া উঠচে চালকুমড়োর লতাপাতা ভেদ করে, ঝিঙের ফুল ফুটেচে বেড়ায় বেড়ায়।

ভবানা বললেন—ওই ছাখো আমাদের বাড়ী—

ঠিক সেই সময় আকাশের ঘন মেঘপুঞ্জ থেকে বৃষ্টি পড়তে শুরু করলে। ঠাণ্ডা বাতাস বইলো। নিলু ছুটে এসে খোকাকে কোলে নিলে।

—ও আমার সোনা, ও আমার মানিক, কোথায় গিইছিলি রে? বিষ্টিতে ভিজে—আচ্ছা আপনার কি কাণ্ড, 'এই ভরা সন্দে মাথায়' মেঘে অন্ধকার বনবাদাড় দিয়ে ছেলেটাকে কি বলে নিয়ে এলেন? অমন আসত্তি আছে? তার ওপর আজ শনিবার—

খোকা খুব খুশি হয়ে মায়ের কোলে গেল এক গাল হেসে।

তারপর দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে বিস্ময়ের সুরে বললে—কাণ্ড। কাণ্ড।

আজ বিলুর পালা। রাত অনেক হয়েচে। তিলু লাল-পাড় শাড়ি পরে পান সেজে দিয়ে গেল ভবানীকে। বললে—শিওরের জানালা বন্ধ করে দিয়ে যাবো? ধড়ো হাওয়া দিচ্চে বাদলার—

—তুমি আজ আসবে না?

—না, আজ বিলু থাকবে।

—খোকা?

—আমার কাছে থাকবে।

ভবানীর মন খারাপ হয়ে গেল। তিলুর পালার দিন খোকা এঘরেই থাকে, আজ তাকে দেখতে পাবেন না—ঘুমের ঘোরে সে তাঁর দিকে সরে এসে হাত কি পা দু'খানা ওঁর গায়ে তুলে দিয়ে ছোট্ট সুন্দর মুখখানি উঁচু করে ঈষৎ হাঁ করে ঘুমোয়। কি চমৎকার যে দেখায়!…

আবার ভাবেন… কি অদ্ভুত শিল্প! ভগবানের অদ্ভুত শিল্প!

বিলু পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা করে এসে বিছানার একপাশে বসলো। হাতে পানের ডিবে।

ভবানী বললেন—এসো বিলুমণি, এসো—

বিলুর মুখ যেন ঈষৎ বিষণ্ণ। বললে—আমারে তো আপনি চান না!

—চাই নে?

—চান না, সে আমি জানি। আপনি এখুনি দিদির কথা ভাবছিলেন।

—ভুল। খোকনের কথা ভাবছিলাম।

—খোকনকে নিয়ে আসবো?

—না। তোমার কাছে সে রাতে থাকতে পারবে?

—দাঁড়ান, নিয়ে আসি। খুব থাকতি পারবে।

একটু পরে ঘুমন্ত খোকাকে কোলে নিয়ে বিলু ঘরে ঢুকলো। হেসে বললে—দিদি ঘুমিয়ে পড়েছিল, তার পাশ থেকি খোকাকে চুরি করে এনেচি—

—সত্যি?

—চলুন দেখবেন। অঘোরে ঘুমুচ্চে দিদি।

—ঘর বন্ধ করে নি?

—ভেজিয়ে রেখে দিয়েচে—নিলু যাবে বলে। নিলু এখনো রান্নাঘরের কাজ সারচে। নিলু তো দিদির কাছেই আজ শোবে—দিদি ওবেলা বড়ীর ডাল বেটে বড় নেতিয়ে পড়েচে। সোজা খাটুনিটা খাটে—

—খাটতে দ্যাও কেন? ও হোলো খোকার মা। ওকে না খাটিয়ে তোমাদের তো খাটা উচিত।

—খাটতি দেয় কিনা? আপনি জানেন না আর? আপনার যত দরদ দিদির জন্যি। আমরা কেডা? কেউ নই। বানের জলে ভেসে এসেচি। নিন, পান খাবেন?

—খোকনের গায়ে কাঁথাখানা বেশ ভালো করে দিয়ে দাও। বড্ড ঠাণ্ডা আজ। পান সাজলে কে?

—নিলু। জানেন, আজ নিলুর বড্ড ইচ্ছে ও আপনার কাছে থাকে।

—বাঃ, তুমি দিলে না কেন?

—ঐ যে বললাম, আপনি সব তাতে আমার দোষ দেখেন। দিদির সব ভালো, নিলুর সব ভালো। আমার মরণ যদি হোতো—

ভবানী জানেন, বিলু এরকম অভিমান আজকাল প্রায়ই প্রকাশ করে।

ওর মনে কেন যে এই ধরনের ক্ষোভ। মনে মনে হয়তো বিলু অসুখী। খুব শান্ত, চাপা স্বভাব—তবুও মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে বেরিয়ে যায় মনের দুঃখ। তাই তো, কেন এমন হয়? তিনি বিলুকে কখনো অনাদর করেন নি সজ্ঞানে। কিন্তু মেয়েমানুষের সূক্ষ্ম সতর্ক দৃষ্টি হয়তো এড়ায় নি, হয়তো সে বুঝতে পেরেচে তাঁর সামান্য কোনো কথায়, বিশেষ কোনো ভঙ্গিতে—যে তিনি সব সময় তিলুকে চান। মুখে না বললেও হয়তো বুঝতে পারে।

দুঃখ হোলো ভবানীর। তিন বোনকে এক সঙ্গে বিয়ে করে বড ভুল করেচেন। তখন বুঝতে পারেন নি—এ অভিজ্ঞতা কি করে থাকবে সন্ন্যাসী পরিব্রাজক মানুষের। তখন একটা ভাবের ঝোঁকে করেছিলেন, বয়স্থা কুলীন কুমারীদের উদ্ধার করবার ঝোঁকে। কিন্তু উদ্ধার করে তাদের সুখী করতে পারবেন কিনা, তা তখন মাথায় আসে নি।

মনে ভেবে দেখলেন, সত্যি তিনি বিলুকে অনাদর করে এসেচেন। সজ্ঞানে করেন নি, কিন্তু যে ভাবেই করুন, বিলু তা বুঝেচে। দুঃখ হয় সত্যিই ওর জন্যে।

ভবানী দেখলেন, বিলু দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে কাঁদচে।

ওকে হাত ধরে মুখ ফিরিয়ে বললেন—ছিঃ বিলু, ও কি? পাগলের মত কাঁদচ কেন?

বিলু কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমার মরণই ভালো সত্যি বলচি, আপনি পরম গুরু, এক এক সময় আমার মনে হয়, আমি পথের কাঁটা সরে যাই, আপনি দিদিকে নিয়ে, নিলুকে নিয়ে সুখী হোন।

—ও রকম কথা বলতে নেই, বিলু। আমি কবে তোমার অনাদর করিচি বলো?

—ও কথা ছেড়ে দিন, আমি কিছু বলচি নে তো আপনাকে। সব আমার অদেষ্ট। কারো দোষ নেই—সরুন তো, খোকার ঘাড়টা সোজা করে শোয়াই—

ভবানী বিলুর হাত ধরে বললেন—হয়তো আমার ভুল হয়ে গিয়েচে বিলু। তখন বুঝতে পারি নি—

বিলু সত্যি ভবানীর আদরে খানিকটা যেন দুঃখ ভুলে গেল। বললে—না অমন বলবেন না—

—না, সত্যি বলচি—

—খান, একটা পান খান। আমার কথা ধরবেন না, আমি একটা পাগল—

এত অল্পেই বিলু সন্তুষ্ট। ভবানীর বড় দুঃখ হয় আজ ওর জন্যে। কত হাসিখুশি ওর মুখে দেখেছিলেন বিয়ের সময়ে, কত আশার ফুল ফুটে উঠেছিল ওর চোখের তারায় সেদিন। কেন এর জীবনটা তিনি নষ্ট করলেন?

ইচ্ছে করে কিছুই করেন নি। কেন এমন হোলো কি জানি?

বিলুকে অনেক মিষ্টি কথা বললেন সে রাত্রে ভবানী। কত ভবিষ্যতের ছবি এঁকে সামনে

ধরেন। তিনি যা পারেন নি, খোকা তা করবে। খোকা তার মাদের সমান চোখে দেখবে। বিলু মনে যেন কোনো ক্ষোভ না রাখে।

মেঘ ভাঙা চাঁদের আলো বিছানায় এসে পড়েচে। অনেক রাত হয়েচে। ডুমুর গাছে রাত-জাগা কি পাখী ডাকচে।

হঠাৎ বিলু বললে—আচ্ছা, আমি যদি মরে যাই, তুমি কাঁদবে নাগর?

—ও আবার কি কথা?

হেসে বিলু খোকার কাছে এসে বললে—কেমন সুন্দর দেয়ালা করচে দেখুন—স্বপ্ন দেখে কেমন সুন্দর হাসচে? ··

সেবার পূজার পর বর্ষাশেষে কাশফুল ফুটেচে ইছামতীর দু'ধারে, গাঙের জল বেড়ে মাঠ ছুঁয়েচে, সকালবেলার সূর্য্যের আলো পড়েচে নাটা-কাঁটা বনের ঝোপে।

ছেলেমেয়েরা নদীর ধারে চোদ্দ শাক তুলতে গিয়েচে কালীপুজোর আগের দিন। একটি ছোট মেয়ে ভবানীর ছেলে টুলুর কাছে এসে বললে—তুই কিছু তুলতে পারচিস নে—দে আমার কাছে—

টুলু বললে—কি দেব? আমিও তুলবো। কৈ দেখি—

—এই ছাখ কত শাক, গাঁদামনি, বৌ-টুনটুনি, শাদা নটে, রাঙা নটে, গোয়ালনটে, ক্ষুদে ননী, শাস্তি শাক, মটরের শাক, কাঁচড়াদাম, কলমি, পুনর্ণবা—এখনো তুলবো রাঙা আলুরশাক, ছোলারশাক আর পালংশাক—এই চোদ্দ। তুই ছেলেমানুষ, শাকের কি চিনিস্?

—আমায় চিনিয়ে ছাও, বা:—ও সয়ে দিদি—

অপেক্ষাকৃত একটি বড় মেয়ে এসে টুলুকে কাছে নিয়ে বললে—কেন ওকে ওরকম করচিস বীণা? ও ছেলেমানুষ, শাক চিনবে কি করে? আয় আমার সঙ্গে রে টুলু—

ফণি চক্কত্তির নাতি অন্নদা বললে—এত লোক জমচে কেন রে? ওপারে? এই সকাল বেলা?

সত্যিই, সকলে চেয়ে দেখলে নদীর ওপারে বহুলোক এসে জমেচে, কারো কারো হাতে কাপড়ের নিশেন। দেখতে দেখতে এপারেও অনেক লোক আসতে আরম্ভ করলে। অন্নদা ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটু বড়, সে এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলে—ও কাপালী কাকা, আজ কি এখেনে?

যারা জমেচে এসে, তারা সবাই চাষী লোক, বিভিন্ন গ্রামের। ওদের অনেককে এরা চেনে, দু'দশবার দেখেচে, বাকি লোকদের আদৌ চেনে না। একজন বললে—আজ ছোটলাটের কলের নৌকো যাবে নদী দিয়ে—নীলকুঠির অত্যাচার হচ্চে, তাই দেখতি আসচে। সব পেরজা খেপে গিয়েচে, যশোরনদের জেলায় একটা নীলির গাছ কেউ বুনবে না। তাই মোরা এসে দাঁড়িয়েচি ছোটলাট সায়েবরে জানাতি যে মোরা নীলচাষ করবো না—

টুলু শুনে অবাক হয়ে নদীর দিকে চেয়ে রইল। খানিকটা কি ভেবে অন্নদাকে জিগ্যেস করলে—নীল কি দাদা?

—নীল একরকম গাছ। নীলকুঠির সায়েব টম্‌টম্‌ হাকিয়ে যায় দেখিস নি?

—কলের নৌকো দেখবো আমি—টুলু ঘাড় দুলিয়ে বললে।

—চোদ্দশাক তুলবি নে বুঝি? ওরে দুষ্টু—

অন্নদা ওকে আদর করে এক টানে এতটুকু ছেলেকে কোলে তুলে নিলে।

কিন্তু শুধু টুলু নয়, চোদ্দশাক তোলা উল্টে গেল সব ছেলেমেয়েরই। লোকে-লোকারণ্য হয়ে গেল নদীর দু'ধার। দুপুরের আগে ছোটলাট আসচেন কলের নৌকোতে। চাষা লোকেরা জিগীর দিতে লাগলো মাঝে মাঝে। গ্রামের বহু ভদ্রলোক—নীলমণি সমাদ্দার, ফণি চক্কত্তি, শ্যাম গাঙ্গুলী, আরও অনেকে এসে নদীর ধারের কদমতলায় দাঁড়ালো।

ভবানী বাঁড়ুয্যে এসে ছেলেকে ডাকলেন—ও খোকা—

টুলু হাসি মুখে বাবার কাছে ছুটে গিয়ে বললে—এই যে বাবা—

—চোদ্দশাক তুলেচিস? তোর মা বলছিল—

—উঁহু বাবা। কে আসচে বাবা?

—ছোটলাট সার উইলিয়াম গ্রে—

—কি নাম? সার উইলিয়াম গ্রে?

—বাঃ, এই তো তোর জিবে বেশ এসে গিয়েচে।

—আমি এখন বাড়ী যাবো না। ছোটলাট দেখবো।

—দেখিস এখন। বাড়ী যাবি? তোকে মুড়ি খাইয়ে আনি—

—না বাবা। আমি দেখি।

বেলা অনেকটা বাড়লো। রোদ চড়-চড় করচে। টুলুর খিদে পেয়েচে—কিন্তু সে সব কষ্ট ভুলে গিয়েচে লোকজনের ভিড় দেখে।

খোকা বললে—ও বাবা—

—কি রে?

—কলের নৌকো কি রকম বাবা?

—তাকে ইস্টিমার বলে। দেখিস্‌ এখন। ধোঁয়া ওড়ে—

—খুব ধোঁয়া ওড়ে?

—হুঁ।

—কেন বাবা?

—আগুন দেয় কিনা তাই।

এমন সময় বহু দূরের জনতা থেকে একটা চীৎকার শব্দ উঠলো। টুলু বললে—বাবা আমাকে কোলে কর—

ভবানী খোকাকে কাঁধে বসিয়ে উচু করে ধরলেন। বললেন—দেখতে পাচ্চিস?

খোকা ঘাড় দুলিয়ে চোখ সামনে থেকে আদৌ না ফিরিয়ে বললে—হুঁ—উঁ—উঁ—

—কি দেখচিস্?

—ধোঁয়া উঠচে বাবা—

—কলের নৌকো দেখতে পেলি?

—না বাবা, ধোঁয়া—ও, কি ধোঁয়া।

অল্পক্ষণ পরে টুলুকে স্তম্ভিত করে দিয়ে মস্ত বড় কলের নৌকোটা এক রাশ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ওর সামনে এসে উপস্থিত হোলো। জনতা "নীল মোরা করবো না লাটসায়েব, দোহাই মা মহারাণীর!" বলে চীৎকার করে উঠলো। কলের নৌকোর সামনে কাঠের কেদারায় বসে আছে অনেকগুলো সায়েব। নীলকুঠির যেমন একটা সায়েব নদীর ধারে পাখী মারছিল সেদিন—অমনি দেখতে। ওদের মধ্যে একটা সাহেব ও কি করচে?

টুলু বললে—বাবা—

—চুপ কর—

—বাবা—

—আঃ কি?

—ও সায়েব অমন করচে কেন?

—সবাইকে নমস্কার করচে।

—ওই কে বাবা?

—ওই সেই ছোটলাট। কি নাম বলে দিয়েচি?

—মনে নেই বাবা।

—মনে থাকে না কেন খোকা? ভারি অন্যায়। সার—

টুলু খানিকটা ভেবে নিয়ে বললে—উলিয়াম গ্রে—

—উইলিয়াম গ্রে—চলো এবার বাড়ী যাই—

—আর একটু দেখি বাবা—

—আর কি দেখবে? সব তো চলে গেল।

—কোথায় গেল বাবা?

—ইছামতী বেয়ে চূর্ণীতে গিয়ে পড়বে, সেখান থেকে গঙ্গায় পড়বে তারপর কলকাতায় ফিরবে।

টুলু বাবার কাঁধ থেকে নেমে গুটগুট করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়ী চললো। সামনে পেছনে গ্রাম্যলোকের ভিড়। সকলেই কথা বলতে বলতে যাচ্চে। টুলু এমন জিনিস তার ক্ষুদ্র চার বছরের জীবনে আর দেখে নি। সে একেবারে অবাক হয়ে গিয়েচে আজকার ব্যাপার দেখে। কি বড় কলের নৌকোখানা! কি জলের আছড়ানি ডাঙার ওপরে, নৌকোখানা যখন চলে গেল! কি ধোঁয়া! কেমন সব সাদা সাদা সায়েব!

তিলু বললে—কি দেখলি রে খোকা?

খোকা তখন মার কাছে বর্ণনা করতে বসলো। দু'হাত নেড়ে কত ভাবে সেই আশ্চর্য্য ঘটনাটি মাকে বোঝাতে চেষ্টা করলে।

নিলু বললে—রাখ্—এখন চল আগে গিয়ে খেয়ে নিবি—আয়—

বিলু নেই। গত আষাঢ় মাসের এক বৃষ্টিধারামুখর বাদল রাত্রে স্বামীর কোলে মাথা রেখে স্বামীর হাত দুটি ধরে তিন দিনের জ্বরবিকারে মারা গিয়েচে।

মৃত্যুর আগে গভীর রাত্রে তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলো—তুমি কে গো?

ভবানী মাথায় বাতাস দিতে দিতে বললে—আমি। কথা বোলো না। চুপটি করে শুয়ে থাকো, লক্ষ্মী—

—একটা কথা বলবো?

—কী?

—আমার ওপর রাগ করনি? শোনো—কত কথা তোমায় বলি নাগর—

—কাঁদচ নাকি? ছিঃ ও কি?

—খোকনকে আমার পাশে নিয়ে এসে শুইয়ে দাও। দাও না গো?

—আনচি, এই যাই—তিলু তো এই বসেছিল, দুটো ভাত খেতে গেল এই উঠে—তুমি কথা বোলো না।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে থাকার পর ভবানীর মনে হোলো বিলুর কপাল বড় ঘামচে। এখন কপাল ঘামচে, তবে কি জ্বর ছেড়ে যাচ্চে? তিলু খেয়ে এলে রামকানাই কবিরাজের কাছে তিনি একবার যাবেন। খানিক পরে বিলু হঠাৎ তাঁর দিকে ফিরে বললে—ওগো, কাছে এসো না—আপনারে তুমি বলচি, আমার পাপ হবে? তা হোক্, বলি। আর বলতি পারবো না তো? তুমি আবার আমার হবে, সামনে জন্মে হবে?—হয়ো, হয়ো—খোকাকে দুধ খাওয়ায় নি দিদি, ডাকে—

—কি সব বাজে কথা বকচো? চুপ ক'রে থাকতে বললাম না?

—খোকন কই? খোকন?

এই তার শেষ কথা। সেই যে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল, যখন খোকনকে নিয়ে এসে তিলু-নিলু ওর পাশে শুইয়ে দিলে, তখনো আর ফিরে চায় নি। ভবানী বাঁড়ুয্যে রামকানাই কবিরাজের বাড়ী গেলেন তাঁকে ডাকতে। রামকানাই এসে নাড়ি দেখে বললেন—অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েচে—খোকাকে তুলে নিন মা—

নীলবিদ্রোহ তিন জেলায় সমান দাপটে চললো। সার উইলিয়ম গ্রে সব দেখে গিয়ে যে রিপোর্ট পাঠালেন, নীলকরদের ইতিহাসে সে একখানা বিখ্যাত দলিল। তিন জেলার বহু নীলকুঠি উঠে গেল এর দু'বছরের মধ্যে। বেশির ভাগ নীলকর সাহেব কুঠি বিক্রি করে

কিংবা এদেশী কোনো বড়লোককে ইজারা দিয়ে সাগর পাড়ি দিলে। দু' একটা কুঠির কাজ পূর্ব্ববৎ চলতে লাগলো, তবে সে দাপটের সিকিও কোথাও ছিল না।

শেষোক্ত দলের একজন হচ্ছে শিপ্‌টন্ সায়েব। ডেভিড্ সায়েব চলে গিয়েছিল স্ত্রীপুত্র নিয়ে, কিন্তু শিপ্‌টন্ ছাড়বার পাত্র নয়—হরকালী সুরের সাহায্য নিয়ে মিঃ শিপ্‌টন্ কুঠি চালাতে লাগলো আগেকার মত। পুরাতন কর্ম্মচারীরা সবাই আগের মত কাজ চালাতে লাগলো।

নীলকর সাহেবদের বিষদাঁত ভেঙে গিয়েচে আজকাল। আশপাশে কোনো নীলকুঠিতে আর সাহেব নেই, কুঠি বিক্রি করে চলে গিয়েচে। দু'একটা কুঠিতে সাহেব আছে, কিন্তু তারা নীলচাষ করে সামান্য, জমিদারী আছে—তাই চালায়।

এই পল্লীর নিভৃত অন্তরালে পুরনো সাহেব শিপ্‌টন্ পূর্ব্ববৎ দাপটেই কিন্তু কাজ চালাচ্ছিল, ওকে আগের মত ভয়ও করে অনেকে। নীলবিদ্রোহের উত্তেজনা থেমে যাবার পরে সাহেবের প্রতি ভয়-ভক্তি আবার ফিরে এসেছিল। হরকালী সুরও গোঁপে চাড়া দিয়েই বেড়ায়। সাহেব টম্‌টম্ হাঁকিয়ে গেলে এখনো লোক সম্ভ্রমের চোখে দেখে। একদিন শিপ্‌টন্ তাকে ডেকে বললে—দেওয়ান, এবার ডুর্গা পূজা কবে হইবে?

হরকালী সুর বললেন—আশ্বিন মাসের দিকে, হুজুর।

—এবার কুঠিতে পূজা করো—

—খুব ভালো কথা হুজুর। বলেন তো সব ব্যবস্থা করি—

—যা টাকা খরচ হইবে, আমি দিবে। কাবর গান দিটে হইবে।

—আজ্ঞে গোবিন্দ অধিকারীর ভালো যাত্রার দল বায়না করে আসি হুকুম করুন।

—সে কি আছে?

—যাত্রা, হুজুর। সেজে এসে, এই ধরুন রাম, সীতা, রাবণ—

—Oh, I understand, like a theatre. বেশ টুমি ঠিক কর—আমি টাকা দিবে।

—কোথায় হবে?

—হলঘরে হইটে পারে।

—না হুজুর, বড় মাঠে পাল টাঙিয়ে আসর করতে হবে। গোবিন্দ অধিকারীর দল, অনেক লোক হবে।

—টুমি লইয়া আসিবে।

সেবার পূজার সময় এক কাণ্ডই হোলো গ্রামে। নীলকুঠিতে প্রকাণ্ড বড় দুর্গাপ্রতিমা গড়া হোলো। মনসাপোতার বিশ্বম্ভর ঢুলি এসে তিন দিন বাজালে। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা শুনতে সতেরোখানা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়লো।

তিলু স্বামীকে বললে—শুনুন, নিলু যাত্রা দেখতে যাবে বলচে কুঠিতি।

—সেটা কি ভালো দেখায়? মেয়েদের বসবার জায়গা হয়েচে কি না,—গাঁয়ের আর কেউ যাবে?

—নিস্তারিণী যাবে বলছিল। নালু পালের বৌ তুলসী যাবে ছেলে-মেয়ে নিয়ে—

—তারা বড় লোক, তাদের কথা ছেড়ে দাও। নালু পালের অবস্থা আজকাল গ্রামের মধ্যে সেরা। তারা কিসে যাবে ?

—বোধহয় পালকিতি। ওর বড় পালকি, নিলু ওতে যেতে পারে।

—গরুর গাড়ী ক'রে দেবো এখন। তুমিও যেও।

—আমি আর যাবো না—

—না কেন, যদি সবাই যায়, তুমিও যাবে—

খোকার ভারি আনন্দ অত বড় ঠাকুর দেখে, অমন সুন্দর যাত্রা দেখে। গাঁয়ের মেয়েরা কেউ যাবার অনুমাত পায় নি সমাজপতি ৺চন্দ্র চাটুয্যের ছেলে কৈলাস চাটুয্যের।

হেমন্তের প্রথমে একদিন বিকালে শিপ্‌টন্ সাহেব ডাকালে হরকালী সুরকে। বললে—ডেওয়ান, বড় গোলমাল হইলো—

—কি সায়েব ?

—এবার নীলকুঠি উঠিলো—

—কেন হুজুর ? আবার কোনো গোলমাল—

—কিছু না। সে গোলমাল আছে না, এ অন্য গোলমাল আছে! এক দেশ আছে জার্মানী টুমি জানে ? ও দেশ হইটে নীল রং ইণ্ডিয়ায় আসিলো, সব দেশে বিক্রয় হইলো।

—সে দেশে কি নীলের চাষ হচ্ছে, হুজুর ?

—সে কেন ? টুমি বুঝিলে না। কেমিক্যাল নীল হইটেছে—আসল নীল নয়, নকল নীল। গাছ হইটে নয়,—অন্য উপায়ে—by synthetic process—টুমি বুঝিবে না।

—ভালো নীল ?

—চমট্‌কার। আমি সেইজন্যই টোমাকে ডাকাইলাম—এই ডেখো—

হরকালী সুরের সামনে শিপ্‌টন্ একটা নীলরংয়ের বড়ী রেখে দিলে। অভিজ্ঞ হরকালী নেড়েচেড়ে দেখে সেটার রং পরীক্ষা করে অবাক হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কোনো কথা বললে না।

—ডেখিলে—

—হাঁ সায়েব।

—এ রং চলিলে আমাদের নীল রং কেন লোক কিনিবে ?

—এর দাম কত ?

শিপ্‌টন্ হেসে বললে—টাহা আগে জিজ্ঞাসা করিলে না কেন ? আমি ভাবিটেছি ডেওয়ানের কি মাথা খারাপ হইলো ? কত হইটে পারে ?

—চারটাকা পাউণ্ড।

—একটাকা পাউণ্ড, জোর দেড় টাকা পাউণ্ড। হোলসেল হাণ্ড্রেড-ওয়েট নাইনটি রুপীজ—নব্বুই টাকা। আমাদের ব্যবসা একডম gone west—মাটি হইলো। মারা যাইলো।

হরকালী সুর এ ব্যাপারে অনেকদিন লিপ্ত আছে। নীল সংক্রান্ত কাজে বিষম ঘুণ। সে বুঝে-সুজে চুপ করে গেল। সে কি বলবে? সে ভবিষ্যতের ছবি বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে।

চাষের নীল বাজারে আর চলবে না। খরচ না পোষালে নীলচাষ অচল ও বাতিল হয়ে যাবে...সে ভাবলে—এবার ঘুনি ডাঙায় উঠে যাবে সায়েবের!

সেদিন হেমন্ত অপরাহ্ণে বড়সাহেব জেন্‌কিন্‌স শিপ্‌টন্‌ সুন্দর ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছিল। রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতা, হরিশ মুখুয্যের হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজ, পাদ্রি লংয়ের আন্দোলন, (দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' এ সময়ের পরের ব্যাপার), নদীয়া যশোরের প্রজাবিদ্রোহ, সার উইলিয়ম গ্রে'র গুপ্ত রিপোর্ট যে কাজ হাসিল করতে পারে নি, জার্মানি থেকে আগত কৃত্রিম নীলবড়ী অতি অল্পদিনের মধ্যেই তা বাস্তবে পরিণত করলে। কয়েক বছরের মধ্যে নীলচাষ একদম বাংলাদেশ থেকে উঠে গিয়েছিল।

শিপ্‌টন্‌ সাহেবের মেম বিলাতে গিয়ে মারা গিয়েছিল। একটিমাত্র মেয়ে, সে সেখানেই তার ঠাকুরদাদার বাড়ী থাকে। শিপ্‌টন্‌ সাহেব এ দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে চাইলে না।

একদিন এই নীলকুঠির বড় বারান্দার পাশে ছোট ঘরটাতে শুয়ে শুয়ে ইণ্ডিয়ান কর্ক গাছের সুগন্ধি শ্বেত পুষ্পগুচ্ছের দিকে চেয়ে সে পুরনো দিনের কথা ভাবছিল। অন্তদিনের কথা।—

অনেকদূরে ওয়েস্টমোর ল্যাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র পল্লী। কেউ নেই আজ সেখানে। বৃদ্ধা মাতা ছিলেন, কয়েক বৎসর আগে মারা গিয়েছেন। এক ভাই অস্ট্রেলিয়াতে থাকে, ছেলেপুলে নিয়ে।—

তাদের গ্রামের সেই ছোট্ট হোটেল—আগে ছিল একটা সরাইখানা, উইলিয়ম রিট্‌সন ছিল ল্যাণ্ডলর্ড তখন—কত লোকের ভিড় হোতো সেখানে। ল্যাঙডেল পাইক্‌স্ আর গ্রেট গেব্‌ল্ সামনে পড়তো···পনেরো শো ফুট উঁচু পাহাড়—ঐ সরাইখানায় কি ভিড় জমতো যারা পাহাড় ছুটোতে উঠবে তাদের··

জলের ধারে উইলো আর মাউণ্টেন সেজ—বরোডেল গ্রামের পাশ কাটিয়ে বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে চলে গেল পথটা—কতবার ছেলেবেলায় মস্ত একটা বড় কুকুর সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে একা গিয়েচে বেড়াতে।—একটা বড় জলাশয়ে মাছ ধরতেও গিয়েচে কতদিন—এল্‌টার ওয়াটার—নামটা কত পুরনো শোনাচ্চে যেন। এল্‌টার ওয়াটার—এত বড় বড় পাইক আর স্যামন মাছ—কি মজা করেই ধরতো—রাইনোজ পাস যখন অন্ধকারে ঢেকে গিয়েচে, তখন মাছ ঝুলিয়ে হাতে করে আসচে এল্‌টার ওয়াটার থেকে—পেছনে পেছনে আসচে ভালো ব্রীডের গ্রেট ডেন কুকুরটা, মনে পড়ে—The eagles is screamin' around us, the river's a-moanin' below—

গ্রাম্য ছাড়া। এ্যাণ্ডি গাইত ছেলেবেলায়। মাছ ধরতে বসে এল্‌টার ওয়াটারের তীরে সে নিজেও কতবার গেয়েচে!

পুরানো দিনের স্বপ্ন—

—গয়া, গয়া ?—

গয়া এসে বলে—কি সায়েব ?

—কাছে বসিয়া থাকো ডিয়ারি—what have you up-to all day ? কোথায় ছিলে ? কি করিটেছিলে ?

—বসে আছি তো। কি আবার করবো।

—If I die here, যডি মরিয়া যাই, টুমি কি করিবে ?

—ও কি কথা ? অমন বলে না। ছি—

—টোমাকে কিছু টাকা ডিটে চাই। কিনটু রাখিবে কোথায় ? চুরি ডাকাটি হইয়া যাইবে।

শিপ্‌টন্‌ সাহেব হিঃ হিঃ ক'রে হেসে উঠলো, বললে—একটা গান শোনো গয়া—listen carefully to the word—কঠা শুনিয়া যাও। Modern, you know ?

গয়া বললে—আঃ, কি গাইবে গাও না ? কটর মটর ভালো লাগে না—

—Well, শোনো—

Yes, yes, the arm-y
How we love the arm-y
When the swallows come again
See them fly—the arm-y—

গয়া কানে আঙুল দিয়ে বললে—ঃ বাবা, কান গেল, অত চেঁচায় না। ওর নাম কি সুর!

সাহেব বললে—ভালো লাগিল না। আচ্ছা টুমি একটা গাও—সেই যে—টোমার বডন চাঁদে যদি ঢরা নাহি পাবো—

—না সাহেব। গান এখন থাক।

—গয়া—

—কি ?

—আমি মরিলে টুমি কি করিবে ?

—ও সব কথা বলে না, ছিঃ—

—No, I am no milksop, I tell you—আমি কাজ বুঝি। নীলকুঠির কাজ শেষ হইলো। আমি চলিয়া যাইব—না এখানে ঠাকিব ?

—কোথায় যাবে সায়েব ? এখানেই থাকো।

—টুমি আমার কাছে ঠাকিবে ?

—থাকবো সায়েব।

—কোথাও যাইবে না ?

—না, সায়েব।

—ঠিক? May I take it as a pledge? ঠিক মনের কথা বলিলে?

—ঠিক বলচি সায়েব। চিরকাল তোমার কাছে আছি, অনেক খাইয়েচ মাখিয়েচ—আজ তোমার অসময়ে তোমারে ফেলে কনে যাবো? গেলি ধম্মে সইবে, সায়েব!

গয়া মেমকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে শিপ্‌টন বললে—Oh, my dear, dearie—you are not afraid of the Big Bad Wolf···I call it a brave girl!

নিস্তারিণী নাইতে নেমেছিল ইছামতীর জলে। কূলে কূলে ভরা ভাদ্রের নদী, তিৎপল্লার বড় বড় হলুদ ফুল ঝোপের মাথা আলো করেচে, ওপারের চরে সাদা কাশের গুচ্ছ দুলচে সোনালী হাওয়ায়, নীল বনকলমীর ফুলে ছেয়ে গিয়েছে সাঁইবাবলা আর কেঁয়েঝাঁকার জঙ্গল, জলের ধারে বনকচুর ফুলের শিষ, জলজ চাঁদা ঘাসের বেগুনী ফুল ফুটে আছে তটপ্রান্তে, মটরলতা দুলচে জলের ওপরে, ছপাৎ ছপাৎ করে ঢেউ লাগচে জলে অর্দ্ধমগ্ন বন্থেবুড়ো গাছের ডালপালায়।

কেউ কোথাও নেই দেখে নিস্তারিণীর বড় ইচ্ছে হলো ঘড়া বুকে দিয়ে সাঁতার দিতে। খরস্রোতা ভাদ্রের নদী, কুটো পড়লে দুখানা হয়ে যায়—কামট, কুমীরের ভয়ে এ সময়ে কেউ নামতে চায় না জলে। নিস্তারিণী এসব গ্রাহ্যও করে না, ঘড়া বুকে দিয়ে সাঁতার দেওয়ার আরাম যে কি, যারা কখনো তা আস্বাদ করে নি তাদের নিস্তারিণী কি বোঝাবে এর মর্ম্ম? তুমি চলেচ জলের স্রোতে নীত হয়ে ভাটির দিকে, পাশে পাশে চলেচে কচুরিপানার ফুল, টোপাপানার দাম, তেলাকুচো লতার টুকটুকে পাকা ফল সবুজের আড়াল থেকে উঁকি মারচে, গাঙশালিখ পানা-শেওলার দামে কিচ্ কিচ্ করচে—কি আনন্দ! মুক্তির আনন্দ! নিয়ে যাবে কুমীরে, গেলই নিয়ে। সেও যেন এক অপূর্ব্বতর, বিস্তৃততর মুক্তির আনন্দ!

অনেকদূর এসে নিস্তারিণী দেখলে গাঁয়ের ঘাটগুলো সব পেরিয়ে এসেচে। সামনে কিছু দূরে পাঁচপোতা গ্রাম শেষ হয়ে ভাসানপোতা গ্রামের গয়লাপাড়ার ঘাট। ডাইনে বনাবৃত তীরভূমি, বাঁয়ে ওপারে পটলের ক্ষেত, ঝিঙের ক্ষেত—আরামডাঙার চাষীদের। সে ভুল করেচে, এতদূর আসা উচিত হয় নি একা একা। কে কি বলবে। এখন খরস্রোতা নদীর উজানে স্রোত ঠেলে সাঁতার দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর এগুনোও উচিত নয়। দক্ষিণ তীরের বনজঙ্গলের মধ্যে নামা যুক্তিসঙ্গত হবে কি? হেঁটে বাড়ী যেতে হবে ডাঙায় ডাঙায়। পথও তো সে চেনে না।

সাঁতার দিয়ে ডাঙার দিকে সে এল এগিয়ে। বন্থেবুড়ো গাছের সারি সেখানে নত হয়ে পড়েচে নদীর জলের উপর ঝুঁকে, গাছে-পালায় লতায় পাতায় নিবিড়তর জড়াজড়ি, বন্য বিহঙ্গের দল জুটে কিচ্ কিচ্ করচে ঝোপের পাকা তেলাকুচো ফল খাওয়ার লোভে। বনের মধ্যে শুকনো পাতার ওপর কিসের খস্‌খস্ শব্দ—কি একটা জানোয়ার যেন ছুটে পালালো, বোধ হয় খেঁকশিয়ালী।

ডাঙায় ওঠবার আগে হাতের বাউটি জোড়া উঠিয়ে নিলে কব্জির দিকে, সিক্ত বসন ভালো ক'রে এঁটে পরে, কালো চুলের রাশ কপালে ওপর থেকে দু'পাশে সরিয়ে যখন সে ডান পা খানা তুলেচে বালির ওপর, অমনি একটা ঝিনুকের ওপর পা পড়লো ওর। ঝিনুকটা সে পায়ের তলা থেকে কুড়িয়ে শক্ত করে মুঠি বেঁধে নিলে। তারপর ভয়ে ভয়ে বনের মধ্যেকার সুঁড়ি পথ দিয়ে, বিছুটিলতার কর্কশ স্পর্শ গায়ে মেখে, সেঁয়াকুল কাঁটায় শাড়ির প্রান্ত ছিঁড়ে অতিকষ্টে এসে সে গ্রাম-প্রান্তের কাওরা পাড়ার পথে পা দিলে। কাওরাদের বাড়ীর ঝি-বৌয়ের দল ওর দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো, খানিকটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতেও বটে। ব্রাহ্মণ-পাড়ার বৌ, একা কোথায় এসেছিল এতদূর। ভিজে কাপড়, ভিজে চুলে ?

বাড়ী পৌছে নিস্তারিণী দেখলে বাড়ীতে ও পাড়ায় গোলমাল চলেচে, কান্নাকাটির রব শোনা যাচ্চে তার শাশুড়ির, পিসশাশুড়ির। সে জলে ডুবে গিয়েচে বা তাকে কুমীরে নিয়ে গিয়েচে সিদ্ধান্ত। ফিরতে দেরি হচ্চে দেখে যারা স্নানের ঘাটে ওকে দৌড়ে দেখতে গিয়েছিল তারা ফিরে এসে বলেচে কোনো চিহ্নই ওর নেই কোনো দিকে। ওকে দেখে সবাই খুব খুশি হোলো। শাশুড়ি এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বুকে জড়িয়ে আদর করলেন। প্রতিবেশিনীরা এসে স্নেহের অনুযোগ করলে কত রকম।

ভাত খাওয়ার পরে ননদ সুধামুখীকে সঙ্গে নিয়ে রান্নাঘরের পেছনের কুলতলায় সেই ঝিনুকখানা খুললে নিস্তারিণী। ঝিনুকের শাঁখ দুজনে ঘেঁটে ঘেঁটে দেখতে লাগলো। এ সব গাঁয়ের সকলেই দেখে ঝিনুক পেলে। কুলের বীচির মত একটা জিনিস হাতে ঠেকলো ওর।

—কি রে ঠাকুরঝি, এটা ছাখ তো ?

—ওরে, এ ঠিক মুক্তো।

—দূর—

—ঠিক বলচি বৌদিদি। মাইরি মুক্তো।

—তুই কি ক'রে জানলি মুক্তো ?

—চল দেখাবি মাকে।

—না ভাই ঠাকুরঝি, এসব কাউকে দেখাস নে।

—চল না, তোর লজ্জা কিসের ?

পাড়ায় জানাজানি হয়ে গেল এ বাড়ীর বৌ ইছামতীতে দামী মুক্তো পেয়েচে। চণ্ডী-মণ্ডপে বৃদ্ধদের মজলিশে দিনকতক একথা ছাড়া আর অন্ত কথা রইল না। একদিন বিধু স্যাকরা এসে মুক্তোটা দেখে শুনে দর দিলে যাট টাকা। নিস্তারিণীর স্বামী কখনো এত টাকা একসঙ্গে দেখে নি। বিধু স্যাকরা মুক্তোটা নিয়ে চলে যাবার কিছু আগে নিস্তারিণীর কি মনে হোলো, সে বললে—ও মুক্তো আমি বেচবো না—

সেইদিনই একজন মুসলমান ওদের বাড়ী এসে মুক্তোটা দেখতে চাইলে। দেখে শুনে দাম দিলে একশো টাকা। নিস্তারিণী তবুও মুক্তো বিক্রি করতে চাইলে না।

এদিকে গাঁয়ের মধ্যে হুলুস্থুল। অমুকের বৌ একশো টাকা দামের মুক্তো পেয়েচে ইছামতীর জলে। একশো টাকা এক সঙ্গে কে দেখেচে এই পাঁচপোতা গ্রামের মধ্যে? ভাগ্যিটা বড় ভালো ওদের। বৌয়ের দল ভিড় ক'রে ওর কপালে সিঁদুর দিতে এল, ওর শাশুড়ি নরহরিপুরের শ্যামরায়ের মন্দিরে মানতের পুজো দিয়ে এল। এ পাকা কলা পাঠিয়ে দেয়, ও পেঁপে পাঠিয়ে দেয়।

তিলুর সঙ্গে একদিন নিস্তারিণী দেখা করতে এলো। মুক্তোটা সে নিয়েই এসেচে। খোকা সেটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বললে—কি এটা?

—মুক্তো।

—মুক্তো কি মা?

—ঝিনুকের মধ্যে থাকে।

নিস্তারিণী খোকাকে কোলে নিয়ে বললে—ওকে আমি এটা দিয়ে দিতে পারি, দিদি।

—না, ও কি করবে ওটা ভাই?

—সত্যি দেবো? ওর মুখ দেখলি আমি সব যেন ভুলে যাই—

তিলু নিস্তারিণীকে অতি কষ্টে নিবৃত্ত করলে। নিস্তারিণী খুব সুন্দরী নয় কিন্তু ওর দিক থেকে হঠাৎ চোখ ফেরানো যায় না। গ্রাম্যবধূর লজ্জা ও সংকোচ ওর নেই, অনেকটা পুরুষালি ভাব, ছেলেবেলায় গাছে চড়তে আর সাঁতার দিতে পটু ছিল খুব। ওর আর একটা দোষ হচ্চে, কাউকে ভয় করে না, শাশুড়িকে তো নয়ই, স্বামীকেও নয়।

তিলু ওকে ভালোবাসে। এই সমস্ত গ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মূর্খ, ভীরু গতানুগতিকতা এই অল্পবয়সী বধূকে তার জালে জড়াতে পারে নি। এ যেন অন্য যুগের মেয়ে, ভুল করে অর্দ্ধ শতাব্দী পিছিয়ে এসে জন্মেচে।

তিলু বললে—কিছু খাবি?

—না।

—খই আর শসা?

—দ্যাও দিনি। বেশ লাগে।

এই নিস্তারিণীকেই একদিন তিলু অদ্ভুত ভাবে নদীর ধারে আবিষ্কার করলে ঝোপের আড়ালে রায়পাড়ার কৃষ্ণকিশোর রায়ের ছেলে গোবিন্দর সঙ্গে গোপনীয় আলাপে মত্ত অবস্থায়।

তিলু গিয়েছিল খোকাকে নিয়ে নদীতে গা ধুতে। বিকেলবেলা, হেমন্তের প্রথম, নদীর জল সামান্য কিছু শুকুতে আরম্ভ করেচে, শুকনো কালো ঘাসের গন্ধে বাতাস ভরপুর, নদীর ধারের পলিমাটির কাদায় কাশফুল উড়ে পড়ে বীজসুদ্ধ আটকে যাচ্চে, নদীর ধারের ছাতিম গাছটাতে থোকা থোকা ছাতিম ফুল ফুটে আছে, সপ্তপর্ণ পুষ্পের সুরভি ভুর ভুর করচে হেমন্ত অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ ও একটুখানি ঠাণ্ডার আমেজ লাগা বাতাসে।

এই সময় ভবানী স্ত্রী ও খোকার সঙ্গে নদীর ধারে প্রায়ই যান। নদীর এই শান্ত, শ্যাম পরিবেশের মধ্যে ভগবানের কথা খুব জমে। সেদিনও ভবানী আসবেন। তাঁর মত এই, খোকাকে নির্জ্জনে এই সময় বসে বসে ভগবানের কথা বলতে হবে। ওর মন ও চোখ ফোটাতে হবে, উদার নীল আকাশের তলে, বননীল-দিগন্তের বাণী শুনিয়ে। ভবানী এলেন একটু পরে। তিলু বললে—ওই শ্লোকটা বুঝিয়ে দিন—

—সেই প্রশ্নোপনিষদেরটা? স এনং যজমানমহরহর্ব্রহ্ম গময়তি?

—হুঁ।

—তিনি যজমানকে প্রতিদিন ব্রহ্মভাব আস্বাদ করান।

—তিনি কে?

—ভগবান।

—যজমান কে?

—যে তাঁকে ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করে।

—এখানে মনই যজমান, এরকম একটা কথা আগে আছে না?

—আছেই তো—ও কারা কথা বলচে? ঝোপের মধ্যে? দাঁড়াও—দেখি—

—এগিয়ে যাবেন না। আগে দেখুন কি—আমিও যাবো?

ওরা গিয়ে দেখলে নিস্তারিণী আর গোবিন্দ ওদের দিকে পেছন ফিরে বসে একমনে আলাপে মত্ত—এবং দেখে মনে হচ্ছিল না যে ওরা উপনিষদ বা বেদান্তের আলোচনা করছিল নিভৃতে বসে। কারণ গোবিন্দ ডানহাতে নিস্তারিণীর নিবিড় কৃষ্ণ কেশপাশ মুঠি বেঁধে ধরেচে, বাঁ হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কি বলছিল। নিস্তারিণী ঘাড় ঈষৎ হেলিয়ে ওর মুখের দিকে হাসি-হাসি মুখে চোখ তুলে চেয়ে ছিল।

পেছনে পায়ের শব্দ শুনে নিস্তারিণী মুখ ফিরিয়ে ওদের দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। গোবিন্দ বনের মধ্যে হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল। ভবানী বাঁড়ুয্যে পিছু হঠে চলে এলেন। নিস্তারিণী অপরাধীর মত মুখ নীচু করে রইল তিলুর সামনে। তিলু বনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—কে ওখানে চলে গেল রে? এখানে কি করচিস?

নিস্তারিণীর মুখ শুকিয়ে গিয়েচে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েচে। সে কোনো উত্তর দিল না।

—কে গেল রে? বল না?

—গোবিন্দ।

—তোর সঙ্গে কি?

নিস্তারিণী নিরুত্তর।

—আর বাড়ী থেকে এতখানি এসে এই জঙ্গলের মধ্যি—বাঃ রে মেয়ে!

—আমার ভালো লাগে।

নিস্তারিণী অত্যন্ত মৃদুস্বরে উত্তর দিলে।

তিলু রাগের সুরে বললে—মেরে হাড় ভেঙে দেবো, তুই মেয়ে কোথাকার! ভালো লাগাচ্চি তোমার? উনি এসেচেন নদীর ধারে এই বনের মধ্যি আধকোশ তফাত বাড়ী থেকে—কি, না ভালো লাগে আমার! সাপে খায় কি বাঘে খায়, তার ঠিক নেই! ধিঙ্গি মেয়ে, বলতি লজ্জা করে না? যা—বাড়ী যা—

ভবানী বাঁড়ুয্যে তিলুর ক্রোধব্যঞ্জক স্বর শুনে দূর থেকে বললেন—ওগো, চলে এসো না—

তিলু তার উত্তর দিলে—থামুন আপনি।

নিস্তারিণীর দিকে চেয়ে বললে—তোর একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই, এখুনি যে গাঁয়ে ঢি ঢি পড়ে যাবে! মুখ দেখাবি কেমন করে, ও পোড়ারমুখী?

নিস্তারিণী নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো।

—আয় আমার সঙ্গে—চল্—পোড়ারমুখী কোথাকার! গুণ কত? সে মুক্তোটা আছে না ইতিমধ্যে গোবিন্দকে দিয়েচিস?

—না। সেটা শাশুড়ির কাছে আছে।

—আয় আমার সঙ্গে। বিছুটির লতার মধ্যি এখানে বসে আছে দুজনে! তোর মতো এমন নির্ব্বোধ মেয়ে আমি যদি দুটি দেখেচি—কুন্তীঠাকরুন যদি একবার টের পায়, তবে গাঁয়ে তোমাকে তিষ্টুতি দেবে?

—না দেয়, ইছামতীর জল তো আর কেউ কেড়ে নেয় নি!

—আবার সব বাজে কথা বলে! মেরে হাড় ভেঙে দেবো বলে দিচ্চি—মুখের ওপর আবার কথা? নে—ডুব দিয়ে নে নদীতে একটা। চল, আমি কাপড় দেবো এখন।

তিলু ওকে বাড়ী নিয়ে এসে ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে শুকনো কাপড় পরালে। কিছু খাবার খেতে দিলে। ওকে কথঞ্চিৎ সুস্থ ক'রে বললে—কতদিন থেকে ওর সঙ্গে দেখা করচিস?

—পাঁচ ছ'মাস।

—কেউ টের পায় নি?

—লুকিয়ে ওই বনের মধ্যি ও-ও আসে, আমিও আসি।

—বেশ কর! বলতি একটু মুখে বাধচে না ধিঙ্গি মেয়ের? আর দেখা করবিনে, বল।

—আর দেখা না করলি ও থাকতি পারবে না।

—ফের্। তুই আর যাবি নে। বুঝলি?

—হুঁ।

—কি হুঁ? যাবি, না যাবি নে?

নিস্তারিণী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ঘাড় দুলিয়ে বললে—গোবিন্দ আমাকে একটা জিনিস দিয়েচে—

—কি জিনিস?

—নিয়ে এসে দেখাবো? কানে পরে, তারে মাকড়ি বলে—

—কোথায় আছে ?

নিস্তারিণী ভয়ে ভয়ে বললে—আমার কাছেই আছে। আঁচলে বাঁধা আছে আমার ওই ভিজে শাড়ির। আজই দিয়েচে নতুন গয়না। ওরকম এ গাঁয়ে আর কারো নেই। কলকেতা শহরে নতুন উঠেচে। ও গড়িয়ে এনে দিয়েচে ওর মামাতো ভাই—কলকেতায় কোথায় যেন কাজ করে।

নিস্তারিণী নিয়ে এসে দেখালে নতুন গয়না ভিজে কাপড়ের খুঁট থেকে খুলে এনে। তিলু উল্টে পাল্টে দেখে বললে—নতুন জিনিস, ভালো জিনিস। কিন্তু তুই এ জিনিস নিতি পারবি নে। এ তোকে ফেরত দিতি হবে। ফেরত দিয়ে বলবি, আর কখনো দেখা হবে না। এবার আমি একথা চেপে দেবো। আর তো কেউ দেখে নি, আমরাই দেখেচি। কারুরি বলতি যাবো না আমরা। কিন্তু তোমারে এরকম মহাপাপ করতি দেবো না কিন্তু। স্বামীকে ভালো লাগে না তোমার ? স্বামীর চোখে ধুলো দিয়ে—

নিস্তারিণী মুখ নিচু ক'রে বললে—সে আমায় ভালোবাসে না—

—মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবো। ভালোবাসবে কি করে ? উনি এখানে ওখানে—

—তা না। আগে থেকেই। সে এ সব কিছু জানে না।

—স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে এ সব করতি মনে মায়া হয় না।

—তুমি দিদি স্বামী পেয়েচ শিবির মত। অমন শিবির মত স্বামী আমরা পেলি আমরাও অমন কথা বলতাম। আহা—তিনি যে গুণবান! একখানা কাপড় চেয়েছিলাম বলে কি বকুনি, যেমন শাশুড়ির, তেমনি সেই গুণবানের। বাপের বাড়ীর এক জোড়া গুজরীপঞ্চম ছিল, তা সেবার বাঁধা দিয়ে নালু পালের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল—আজও ফিরিয়ে আনার নাম নেই। এত বলি, কথা শোনে না। আনবে কোথা থেকি ? ঐ তো সংসারের ছিরি! ধান এবার হয় নি, যা হয়েছিল তিনটে মাস টেনেটুনে চলেছিল। ঢেঁকিতে পাড দিয়ে দিয়ে কোমরে বাত ধরবার মত হয়েচে। এত করেও মন পাবার জো নেই কারো। কেন আমি থাকবো অমন শ্বশুরবাড়ী ? বলে দাও তো দিদি।

সুন্দরী বিদ্রোহিণীর মুখ রাঙা হয়ে উঠেচে। মুখে একটি অদ্ভুত গর্ব্ব ও যৌবনের দীপ্তি, নিবিড় কেশপাশ পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে সারা পিঠ জুড়ে। বড় মায়া হোলো এই অসমসাহসী বধূটির ওপর তিলুর। গ্রামে কি হুলুস্থুল পড়ে যাবে জানাজানি হয়ে গেলে এ কথা—তা এ কিছুই জানে না।

অনেক বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে তিলু ওকে সন্দের আগে নিজে গিয়ে ওদের বাড়ী রেখে এল। বলে এল, তার সঙ্গে নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছিল এতক্ষণ তাদের বাড়ী বসেই গল্প করছিল। শাশুড়ি সন্দিগ্ধ সুরে বললেন—ওমা, আমরা দু' দুবার নদীর ঘাটে খোঁজ নিয়ে এ্যালাম—এ পাড়ার সব বাড়ী খোঁজলাম—বৌ বটে বাবা বলিহারি! বেরিয়েচে তিন পহর বেলা থাকতি আর এখন সন্দের অন্ধকার হোলো, এখন ও এল। আর কি বলবো মা, ভাজা-ভাজা হয়ে গ্যালাম ও বৌ নিয়ে। আবার কথায় কথায় চোপা কি!

নিস্তারিণী সামান্য নিচু স্বরে অথচ শাশুড়িকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে—হাঁ, তোমরা সব গুণের গুণমণি কিনা? তোমাদের কোনো দোষ নেই—থাকতি পারে না—

—শুনলে তো মা, শুনলে নিজের কানে? কথা পড়তি ভস্ সয় না, অমনি সঙ্গে সঙ্গে চোপা!

বৌ বললে—বেশ।

তিলু ধমক দিয়ে বললে—ও কি রে? ছিঃ—শাশুড়িকে অমন বলতি আছে?

সন্দের দেরি নেই। তিলু বাড়ী চলে গেল। বাঁশবনের তলায় অন্ধকার জমেচে, জোনাকি জ্বলচে কালকাসুন্দে গাছের ফাঁকে ফাঁকে।

এসে ভবানীকে বললে—দিন বদলে যাচ্ছে, বুঝলেন? নিস্তারিণীর ব্যাপার দেখে বুঝলাম। কখনো শুনি নি ভদ্দর ঘরের বৌ বনের মধ্যে বসে পরপুরুষের সঙ্গে আলাপ করে। আমাদের যখন প্রথম বিয়ে হোলো, আপনার সঙ্গে কথা কওয়ার নিয়ম ছিল না দিনমানে। এ গাঁয়ে এখনো তা নিয়ম নেই। অল্পবয়সী বৌরা দুপুর রাত্তিরি সবাই ঘুমুলি তবে স্বামীর ঘরে যায়—এখনো।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—আমি বলেছিলাম না তোমাকে, খোকা তার বৌ নিয়ে এই গাঁয়ের রাস্তায় দিনমানে পাশাপাশি বেড়াবে—

—ওমা, বল কি?

—ঠিক বলচি। সে দিন আসচে। তোমাদের ওই বৌটিকে দিয়েই দেখলে তো। দিনকাল বড্ড বদ্‌লাচ্চে।

প্রসন্ন চক্কত্তি আজকাল গয়ামেমের দেখা বড় একটা পায় না। মেমসাহেব চলে যাওয়ার পরে গয়া একরকম স্থায়ী ভাবেই বড়সাহেবের বাংলায় বাস করচে। যদি বা বাইরে আসে, পথে-ঘাটে দেখা মেলে কখনো কখনো, আগের মত যেন আর নেই। আবার কখনো কখনো আছেও। খামখেয়ালী গয়ামেমের কথা কিছু বলা যায় না। মন হোলো তো প্রসন্ন চক্কত্তির সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত গল্পই করলে। খেয়াল না হোলো, ভালো কথাই বললে না।

নীলকুঠির কাজ খুব মন্দা। নীলের চাষ ঠিকই হচ্চে বা হয়ে এসেচেও এতদিন। প্রজারা ঠিক আগের মতই মানে বড়সাহেবকে বা দেওয়ানকে। কিন্তু নীলের ব্যবসাতে মন্দা পড়েচে। মজুদ নীল বাইরের বাজারে আর তেমন কাটে না। দাম এত কম যে খরচ পোষায় না। আর বছরের অনেক নীল গুদামে মজুদ রয়েছে কাটতির অভাবে। নীলকুঠির চাকরিতে আর আগের মত জুত নেই, কিন্তু এরা এখন নতুন চাকরী পাবেই বা কোথায়। বড়সাহেব নীলকুঠি থেকে একটি লোককেও বরখাস্ত করে নি, মাইনেও ঠিক আগের মত দিয়ে যাচ্চে কিন্তু তেমন উপরি পাওনা নেই ততটা, হাঁকডাক কমে গিয়েচে, নীলকুঠির চাকরীর সে জলুস অন্তর্হিতপ্রায়।

শ্রীরাম মুচি একদিন প্রসন্ন চক্কত্তিকে বললে—ও আমীনবাবু, আমার জমিটা আমাকে দিয়ে দিতি বলেন সায়েবকে।

—বলবো। সব চাকরদের জমি দিচ্চে নাকি?

—বড়সায়েব বলেচে, ভজা, নফর আর আমাকে জমি দিতি। আপনি মেপে কুঠির খাসজমি থেকে তিন বিঘে করে জমি এক এক জনকে দিয়ে দেবেন।

—সায়েবের হুকুম পেলেই দেবো। আমরা পাবো না?

—আপনি বলে নিতি পারেন সাহেবকে। শুধু চাকর-বাকরকে দেবে বলেচে। আপনাদের দেবে না। গয়ামেমকে দেবে পনেরো বিঘে।

—অ্যাঁ, বলিস কি?

—সে পাবে না তো কি আপনি পাবা? সে হোলো পেয়ারের লোক সায়েবের।

ঠিক দুদিন পরে দেওয়ান হরকালী সুর পরোয়ানা পেলেন বড়সাহেবের—গয়ামেমের জমি আমীনকে দিয়ে মাপিয়ে দিতে। আমীনকে ডাকিয়ে বলে দিলেন। গয়ামেম নিজের চোখে গিয়ে জমি দেখে নেবে।

—কোন্ জমি থেকে দেওয়া হবে?

—বেলেডাঙার আঠারো নম্বর থাক নক্সা দেখুন। ধানী জমি কতটা আছে আগে ঠিক করুন।

—সেখানে মাত্র পাঁচ বিঘে ধানের জমি আছে দেওয়ানজি। আমি বলি ছুতোরঘাটার কোল থেকে নতিডাঙার কাঠের পুল পজ্জন্ত যে টুকরো আছে, শশী মুচির বাজেয়াপ্তী জমির দরুন তাতে জলি ধান খুব ভালো হয়। সেটা ও যদি নেয়—

হরকালী সুর চোখ টিপে বললেন—আঃ, চুপ করুন।

—কেন বাবু?

—খাসির মাথার মত জমি। সায়েব এর পরে খাবে কি? নীলকুঠি তো উঠে গেল। ও জমিতি ষোল মণ আঠারো মণ উড়ি ধানের ফলন। সায়েব খাসখামারে চাষ করবে এর পরে। গয়াকে দেবার দায় পড়েচে আমাদের। না হয়, এর পর আপনি আর আমি ও জমি রাখবো।

হায় মূর্খ বৈষয়িক হরকালী সুর, প্রণয়ের গতি কি ক'রে বুঝবে তুমি?

তার পরদিনই নিমগাছের তলায় দুপুর বেলায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে প্রসন্ন চক্কত্তি গয়ামেমের সাক্ষাৎ পেলে। গয়া কোনো দিন সাহেবের বাংলায় ভাত খায় না—খাওয়ার সময় নিজেদের বাড়ীতে মায়ের কাছে গিয়ে খায়। আর একটা কথা, রাত্রে সে কখনো সাহেবের বাংলায় কাটায় নি, বরদা নিজে আলো ধরে মেয়েকে বাড়ী নিয়ে যায়।

গয়া বললে—কি খুড়োমশাই, খবর কি?

—দেখাই তো আর পাইনে। ডুমুরের ফুল হয়ে গিয়েচ।

গয়ামেম হেসে প্রসন্ন আমীনের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে—কেন, এমন ক'রে

দাঁড়িয়ে আছেন এখেনে দুপুরের রদ্দুরি ?

—তোমার জন্যি।

—যান, আবার সব বাজে কথা খুড়োমশায়ের।

—পাঁচদিন দেখি নি আজ।

—এ পোড়ারমুখ আর নেই বা দেখলেন।

—তার মানে ?

—আপনাদের কোন্ কাজে আর লাগবো বলুন।

—আচ্ছা গয়া—

—কি ?

বলেই গয়া মুখে আঁচল দিয়ে খিল খিল ক'রে হেসে চলে যেতে উদ্যত হোলো।

প্রসন্ন ব্যস্ত হয়ে বললে—শোনো শোনো, চললে যে ? কথা আছে।

গয়া যেতে যেতে থেমে গেল, পেছন ফিরে প্রসন্ন চক্কত্তির দিকে চেয়ে বললে—আপনার কথা খুড়োমশাই শুধু হেনো আর তেনো। শুধু তোমাকে দেখতি ভালো লাগে আর তোমার জন্যি দাঁড়িয়ে আছি আর তোমার কথা ভাবচি—এই সব বাজে কথা। যত বলি, খুড়োমশাই বলে ডাকি, আমারে অমন বলতি আছে আপনার ? অমন বলবেন না। ততই মুখির বাঁধন দিন দিন আলগা হচ্চে যেন !

প্রসন্ন চক্কত্তি হেসে বললে—কোথায় দেখলে আলগা ? কি বলিচি আমি ?

—শুধু তোমারে দেখতি ভালো লাগে, তোমারে কতকাল দেখি নি, তোমারে না দেখলি থাকতি পারিনে—

—মিথ্যে কথা একটাও না।

—যান, বাসায় যান দিনি। এ দুপুরবেলা রদ্দুরি দাঁড়িয়ে থাকবেন না। ভারি দুক্খু হবে আমার—

—সত্যি, গয়া, সত্যি তোমার দুক্খু হবে ? ঠিক বলচো গয়া ?

—হবে, হবে, হবে। বাসায় যান, পাগলামি করবেন না পথে দাঁড়িয়ে—

—একটা কথা—

—আবার একটা কথা আর একটা কথা, আর ও গয়া শোনো আর একটু, ও গয়া এখানটায় বসে একটু গল্প করা যাক—

—না। ও কথা না—

—কি তবে ? হাতী না ঘোড়া ?

—ও সব কথাই না। মাইরি বলচি গয়া। শোনো খুব দরকারি কথা তোমার পক্ষে। কিন্তু খুব লুকিয়ে রাখবে, কেউ যেন না শোনে—

এই দেখাশোনার কয়েকদিনের মধ্যে প্রসন্ন চক্কত্তি শশী মুচির বাজেয়াপ্তী জমির মধ্যে উৎকৃষ্ট জলি ধানের পনেরো বিঘে জমি গয়ামেমকে মেপে শ্রীরাম মুচিকে দিয়ে খোঁটা পুঁতিয়ে

সীমানার বাবলা গাছের চারা পুঁতে একেবারে পাকা ক'রে গয়াকে দিয়ে দিলে। গয়া মাঠে উপস্থিত ছিল। একটা ডুমুর গাছ দেখে গয়া বললে—খুড়োমশাই, ওই ডুমুর গাছটা আমার জমিতি করে গান না? ডুমুর খাবো—

—যদি দিই, আমার কথা মনে থাকবে গয়া—

—হি হি—হি হি—ওই আবার শুরু হোলো।

—সোজা কথাডা বললি কি এমন দোষ হয়ে যায়? কথাডার উত্তর দিতি কি হচ্ছে? ও গয়া—

—হি হি হি—

—যাক্ গে। মরুক গে। আমি কিছুটি আর বলচি নে। দিলাম চেন ঘুরিয়ে, ডুমুর গাছ তোমার রইল।

—পায়ের ধূলো নেবো, না নেবো না? বেরাহ্মণ দেবতা, তার ওপর খুড়োমশাই। কত পাপ যে আমার হবে।

গয়া এগিয়ে গিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করলে দূর থেকে। কি প্রসন্ন হাসি ওর মুখের। কি হাসি! কচি ডুমুর গাছটা এখনো কতকাল বাঁচবে। প্রসন্ন চক্কত্তি আমীনের আজকার সুখের সাক্ষী রইল ওই গাছটা। প্রসন্ন আমীন মরে যাবে কিন্তু আজ দুপুরের ওই কচি পাতা-ওঠা গাছটার ছায়ায় যাদের অপরূপ সুখের বার্ত্তা লেখা হয়ে গেল, চাঁদের আলোয় যাদের চোখের জল চিক চিক করে, ফাল্গুন দুপুরে গরম বাতাসে যাদের দীর্ঘশ্বাস ভেসে বেড়ায়—তাদের মনের সুখ-দুঃখের কথা পঞ্চাশ বছর পরে কেউ আর মনে রাখবে কি?

মাস কয়েক পরের কথা

ভবানী ছেলেকে নিয়ে ইছামতীর ধারে বনাসমতলার ঘাটের বাঁকে বসে আছেন। বেলা তিন প্রহর এখনো হয় নি, ঘন বনজঙ্গলের ছায়ায় নিবিড় তীরভূমি পানকৌড়ি আর বালি-হাঁসের ডাকে মাঝে মাঝে মুখর হয়ে উঠচে। জেলেরা ডুব দিয়ে যে সব ঝিনুক আর জোংড়া তুলেছিল গত শীতকালে, তাদের স্তূপ এখনো পড়ে আছে ডাঙায় এখানে ওখানে। বন্যলতা দুলচে জলের ওপর বাবলাগাছ ও বন্য যজ্ঞিডুমুর গাছ থেকে। কাকজঙ্ঘার থোলো থোলো রাঙা ফল সবুজ পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারছে।

ভবানী বললেন—খোকা, আমি যদি মারা যাই, মাদের তুই দেখবি?

—না বাবা, আমি তাহোলে কাঁদবো।

—কাঁদবি কেন, আমার বয়েস হয়েচে, আমি কতকাল বাঁচবো।

—অনেকদিন।

—তোর কথায় রে? পাগলা একটা—

খোকা হি হি ক'রে হেসে উঠলো। তারপরেই বাবাকে এসে জড়িয়ে ধরলে ছোট্ট ছোট্ট দুটি হাত দিয়ে। বললে—আমার বাবা—

—আমার কথা শোন। আমি মরে গেলে তুই দেখবি তোর মাদের?

—না। আমি কাঁদবো তাহোলে।

—বল দিকি ভগবান কে?

—জানি নে।

—কোথায় থাকেন তিনি?

—উই ওখানে—

খোকা আঙুল দিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে দিলে।

—কোথায় রে বাবা, গাছের মাথায়?

—হুঁ।

—তাঁকে ভালোবাসিস?

—না।

—সে কি রে! কেন?

—তোমাকে ভালোবাসি।

—আর কাকে?

—মাকে ভালোবাসি।

—ভগবানকে ভালোবাসিস্ নে কেন?

—চিনি নে।

—খোকা, তুই মিথ্যে কথা বলিস নি। ঠিক বলেচিস। না চিনে না বুঝে কাউকে ভালোবাসা যায় না। চিনে বুঝে ভালোবাসলে সে ভালোবাসা পাকা হয়ে গেল। সেই জন্যেই সাধারণ লোকে ভগবানকে ভালোবাসতে পারে না। তারা ভয় করে, ভালোবাসে না। চিনবার বুঝবার চেষ্টা তো করেই না কোনদিন। আচ্ছা, আমি তোকে বোঝাবার চেষ্টা করবো। কেমন?

খোকা কিছু বুঝলে না, কেবল বাবার শেষের প্রশ্নটি উত্তরে বললে—হুঁ-উ-উ।

—খোকন, ওই পাখী দেখতে কেমন রে?

—ভালো।

—পাখী কে তৈরী করেচে জানিস? ভগবান। বুঝলি?

খোকা ঘাড় নেড়ে বললে—হুঁ-উ।

—তুই কিছু বুঝিস নি? এই যা কিছু দেখছিস, সব তৈরী করেচেন ভগবান।

—বুঝেচি বাবা। মা বলেচে, ভগবান নক্ষত্র করেচে।

—আর কি?

—আর চাঁদ।

—আর?

—আর সূর্য্যি।

—হুঁ, তুই এত কথা কার কাছে শিখলি? মার কাছে? বেশ! চাঁদ ভালো লাগে?

—হুঁ-উ।

—তবে ছাখ তো, এমন জিনিস যে তৈরী করেচেন, তাঁকে ভালোবাসা যায় না?

—আমি ভালোবাসবো।

—নিশ্চয়। কিছু কিছু ভালবেসো?

—তুমি ভালোবাসবে?

—হুঁ।

—মা ভালোবাসবে?

—হুঁ।

—আমি ভালোবাসবো।

—বেশ।

—ছোট মা ভালোবাসবে?

—হুঁ।

—তাহলে আমি ভালোবাসবো।

—নিশ্চয়। আজ আকাশের চাঁদ তোকে ভালো করে দেখাবো।

—চাঁদের মধ্যে কে বসে আছে?

—চাঁদের মধ্যে কিছু নেই রে। ওটা চাঁদের কলঙ্ক।

—কলঙ্ক কি বাবা? কলঙ্ক?

—ওই হোলো গিয়ে পেতলে যেমন কলঙ্ক পড়ে তেমনি।

ছেলে অবাক হয়ে বাপের মুখের দিকে তাকায়। কি সুন্দর, নিষ্পাপ অকলঙ্ক মুখ ওর। চাঁদে কলঙ্ক আছে, কিন্তু খোকার মুখে কলঙ্কের ভাঁজও নেই।

ভবানী বাঁড়ুয্যে অবাক হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকান।

কোথায় ছিল এ শিশু এতদিন?

বহুদূরের ও কোন্ অতীতের মোহ তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করে। যে পৃথিবী অতি পরিচিত, প্রতিদিন দৃষ্ট—যেখানে বসে ফণি চক্কত্তি সুদ কষেন, চন্দ্র চাটুয্যের ছেলে জীবন চাটুয্যে সমাজপতিত্ব পাবার জন্তে দলাদলি করে—অজস্র পাপ, ক্ষুদ্রতা ও লোভে যে পৃথিবী ক্লেদাক্ত—এ যেন সে পৃথিবী নয়। অত্যন্ত পরিচিত মনে হোলেও এ অত্যন্ত অপরিচিত, গভীর রহস্যময়। বিরাট বিশ্বযন্ত্রের লয়-সঙ্গতির একটা মনোমুগ্ধকর তান।

পিছনকার বাতাস আকন্দ ফুলের গন্ধে ভরপুর। স্তব্ধ নীল শূন্য যেন অনন্তের ধ্যানে মগ্ন।

আজকার এই যে সঙ্গীত, জীবজগতের এই পবিত্র অনাহত ধ্বনি আজ যে সব কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্চে পাঁচশত কি হাজার বছর পরে সে সব কণ্ঠ কোথায় মিলিয়ে যাবে! ইছামতীর জলের স্রোতে নতুন ইতিহাস লেখা হবে কালের বুকে।

আজ এই যে ক্ষুদ্র বালক ও তার পিতা অপরাহ্ণে নদীর ধারে বসে আছে, কত স্নেহ,

মমতা, ভালোবাসা ওদের মধ্যে—সে কথা কেউ জানবে না।

কেবল থাকবেন তিনি। সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয়, সমস্ত গতির মধ্যে স্থিতিশীল তিনি। ঈশ্বর, ব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ এ মানুষের মন-গড়া কথা। সেই জিনিস যা এমন সুন্দর অপরাহ্নে, ফুলে-ফলে, বসন্তে, লক্ষ-লক্ষ জন্ম-মৃত্যুতে, আশায়, স্নেহে, দয়ায়, প্রেমে আবছায়া আবছায়া ধরা পড়ে, জগতের কোনো ধর্ম্মশাস্ত্রে সে জিনিসের স্বরূপ কি তা বলতে পারে নি, কোনো ঋষি, মুনি, সাধু যদি বা অনুভব করতে পেরেও থাকেন, মুখে প্রকাশ করতে পারেন নি···কি সে জিনিস তা কে বলবে?

তবু মনে হয় তিনি যত বড় হোন, আমাদের সগোত্র। আমার মনের সঙ্গে, এই শিশুর মনের সঙ্গে সেই বিরাট মনের কোথায় যেন যোগ আছে। ভগবান যে আমাকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তা নয়—আমি তাঁর আত্মীয়—খুব আপন ও নিকটতম সম্পর্কের আত্মীয়। কোটি কোটি তারার দ্যুতিতে দ্যুতিমান সে মুখের দিকে আমি নিঃসঙ্কোচে ও প্রেমের দৃষ্টিতে চেয়ে দেখবার অধিকার রাখি, কারণ তিনি যে আমার বাবা। হাতে গড়া পুতুলই নয় শুধু তাঁর—তাঁর সন্তান। এই খোকা তাঁরই এক রূপ। এর অর্থহীন হাসি, উল্লাস তাঁরই নিজের লীলা উচ্ছল আনন্দের বাণীমূর্ত্তি।

এই ছেলে বড় হয়ে যখন সংসার করবে, বৌ আনবে, ছেলেপুলে হবে ওদের—তখন ভবানী থাকবেন না। দশ বছর আগে বিস্মৃত কোনো ঘটনার মত তিনি নিজেও পুরনো হয়ে যাবেন এ সংসারে। ঐ বেতসকুঞ্জ, ঐ প্রাচীন পুষ্পিত সপ্তপর্ণ টা হয়তো তখনও থাকবে—কিন্তু তিনি থাকবেন না।

জগতের রহস্যে মন ভরে ওঠে ভবানীর, ঐ সান্ধ্যসূর্য্যরক্তচ্ছটা···নিস্তারিণীর বুদ্ধি-প্রোজ্জ্বল কৌতুকদৃষ্টি,···তিলুর সপ্রেম চাহনি, এই কচি ছেলের নীল শিশুনয়ন—সবই সেই রহস্যের অংশ। কার রহস্য? সেই মহারহস্যময়ের গহন গভীর শিল্পরহস্য।

তিলু পিছন থেকে এসে কি বলতেই ভবানীর চমক ভাঙলো। তিলুর কাঁধে গামছা, কাঁকে ঘড়া—নদীতে সে গা ধুতে এসেচে।

হেসে বললে—আমি ঠিক জানি, খোকাকে নিয়ে উনি এখানে রয়েচেন—

ভবানী ফিরে হেসে বললেন—নাইতে এলে?

—আপনাদের দেখতিও বটে।

—নিলু কোথায়?

—রান্না চড়াবে এবার।

—বসো।

—কেউ আসবে না তো?

—কে আসবে সন্ধেবেলা?

তিলু ভবানীর গা ঘেঁষে বসলো। ঘড়া অদূরে নামিয়ে রেখে এসে স্বামীকে প্রায় জড়িয়ে ধরলে।

ভবানী বললেন—খোকা যেন অবাক হয়ে গিয়েচে, অমন কোরো না, ও না বড় হোলো ?

তিলু বললে—খোকা, ভগবানের কথা কি শুনলি ?

খোকা মায়ের কাছে সরে এসে মার মুখের দিকে চেয়ে বললে—মা, ওমা, আমি চান করবো; আমি চান করবো—

—আমার কথার উত্তর দে—

—আমি চান করবো।

তিলু এদিক ওদিক চেয়ে হেসে বললে—খোকাকে গা ধুইয়ে নেবো, আমরাও নামি জলে। আসুন, সাঁতার দেবো।

ভবানী বললেন—বোসো তিলু। আমার কেমন মনে হচ্ছিল আজ। খোকাকে ভগবানের কথা শেখাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল এই আকাশ বাতাস নদীজলের পেছনে তিনি আছেন। এই খোকার মধ্যেও। ওকে আনন্দ দিয়ে আমি ভাবি তাঁকেই খুশী করছি।

তিলু স্বামীর কথা মন দিয়ে শুনলে, বেশ গভীর ভাবে। ও স্বামীর কোনো কথাই তুচ্ছ ভাবে না। ঘাড় হেলিয়ে বললে—আপনার ব্রহ্মের অনুভূতি হয়েছিল ?

—তুমি হাসালে।

—তবে ও অনুভূতিটা কি বলুন।

—তাঁর ছায়া এক একবার মনে এসে পড়ে। তাঁকে খুব কাছে মনে হয়। আজ যেমন মনে হচ্ছিল—আমরা তাঁর আপন, পর নই। তিনি যত বড়ই হোন, বিরাটই হোন, আমাদের পর নয়, আমাদের বাবা তিনি। 'দিব্যোহ্যমূর্ত্ত পুরুষঃ' মনে আছে তো ?

—ওই তো ব্রহ্মানুভূতি। আপনার ঠিক হয়েচে আমি জানি। যাতে ভগবানকে অত কাছে বলে ভাবতি পারলেন, তাকে ব্রহ্মানুভূতি বলতি হবে বই কি ?

—রোজ নদীর ধারে বসে খোকাকে ভগবানের কথা শেখাবো। এই বয়েস থেকে ওর মনে এসব আনা উচিত। নইলে অমানুষ হবে।

—আপনি যা ভালো বোঝেন। চলুন, এখন নেয়ে একটু সাঁতার দিয়ে ফিরে। খোকা ডাঙায় বোসো—

খোকা খুব বাধ্য সন্তান। ঘাড় নেড়ে বললে—হুঁ।

—জলে নেমো না।

—না।

স্বামী স্ত্রী দুজনে মনের আনন্দে সাঁতার দিয়ে স্নান করে খোকাকে গা ধুইয়ে নিয়ে চাঁদ-ওঠা জোনাকী-জ্বলা সন্ধ্যার সময় মাঠের পথ দিয়ে বাড়ী ফিরলো।

চৈত্র মাস যায় যায়।* মাঠ বন ফুলে ফুলে ভরে গিয়েচে। নির্জ্জন মাঠের উঁচু ডাঙায় ফুলে-ভরা ঘেঁটুবন ফুরফুরে দক্ষিণে বাতাসে মাথা দোলাচ্চে। স্তব্ধ, নীল শূন্য যেন অনন্তের ধ্যানমগ্ন—ভবানী বাঁড়ুয্যের মনে হোলো দিকহারা দিক্‌চক্রবালের পেছনে যে অজানা দেশ,

যে অজ্ঞাত জীবন, তারই বার্ত্তা যেন এই সুন্দর, নির্জ্জন সন্ধ্যাটিতে ভেসে আসচে। তিনি গুরুর আশ্রয় পেয়েও ছেড়েচেন ঠিক, সন্ন্যাসী না হয়ে গৃহস্থ হয়েচেন, তিনটি স্ত্রী একত্রে বিবাহ ক'রে জড়িয়ে পড়েছিলেন একথাও ঠিক—কিন্তু তাতেই বা কি? মাঠ, নদী, বনঝোপ, ঋতুচক্র, পাখী, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্নারাত্রির প্রহরগুলির আনন্দবার্ত্তা তাঁর মনে এক নতুন উপনিষদ রচনা করেচে।...এখানেই তাঁর জীবনের সার্থকতা। এই খোকার মধ্যে তাঁকে তিনি দেখতে পান।

নদীর ঘাট থেকে মেয়েরা এই মাত্র জল নিয়ে ফিরে গেল, মাটির পথের ওপর ওদের জলসিক্ত চরণচিহ্ন এই খানিক আগে মিলিয়ে গিয়েছে, নদীর ধারের বনে বনে গাঙশালিকের আর দোয়েলের দল এই খানিক আগে তাদের গান গাওয়া শেষ করেচে। ঘাটের ওপরকার নাগকেশর গাছের ফুলে ভরা ডালটি নুইয়ে কোন রূপসী গ্রামবধূ সন্ধ্যার আগে বোধ হয় ফুল পেড়ে থাকবে, গাছতলায় সোনালি রংয়ের গন্ধকেশরীর বিচ্ছিন্ন দল ছড়ানো, মরকত মণির মত ঘন সবুজ রং-এর পাতা তলা বিছিয়ে পড়ে আছে—

হঠাৎ বিলুর কথা মনে পড়ে মনটা উদাস হয়ে যায় ভবানীর। হয়তো তিনি খানিকটা অবহেলা করে থাকবেন, তবে জ্ঞাতসারে নয়। মেয়েদের মনের কথা সব সময়ে কি বুঝতে পারা যায়? দুঃখকে বাদ দিয়ে জগতে সুখ নেই—প্রকৃত সুখের অবস্থা গভীর দুঃখের পরে··· দুঃখের পূর্ব্বের সুখ অগভীর, তরল, খেলো হয়ে পড়ে—দুঃখের পরে যে সুখ—তার নির্ম্মল ধারায় আত্মার স্নানযাত্রা নিষ্পন্ন হয়, জীবনের প্রকৃত আস্বাদ মিলিয়ে দেয়। জীবনকে যারা দুঃখময় বলেছে, তারা জীবনের কিছুই জানে না, জগৎটাকে দুঃখময় মনে করা নাস্তিকতা। জগৎ হোলো সেই আনন্দময়ের বিলাস-বিভূতি। তবে দেখার মত মন ও চোখ দরকার। আজকাল তিনি কিছু কিছু বুঝতে পারেন।

খোকা হাত উঁচু করে বললে—বাবা, ভয় করচে!

—কেন রে?

—শিয়াল! আমাকে কোলে নাও—

—না। হেঁটে চলো—

—তাহোলে আমি কাঁদবো—

তিলু বললে—বাবা, ভিজে কাপড় আমাদের দুজনেরই। সর্ব্বশরীর ভেজাবি কেন এই সন্দেবেলা। হেঁটে চলো।

নিলু সন্দে দেখিয়ে বসে আছে। ভবানীর আহ্নিকের জায়গা ঠিক করে রেখেছে। নিকোনো গুছোনো ওদের ঝকঝকে তকতকে মাটির দাওয়া। আহ্নিক শেষ করতেই নিলু এসে বললে—জলপান দিই এবার? তারপর সে একটা কাঁসার বাটিতে দুটি মুড়কি আর দু'টুকরো নারকোল নিয়ে এসে দিলে, বললে—আমার সঙ্গে এবার একটু গল্প করতি হবে কিন্তু—

—বোসো নিলু। কি রাঁধচ?

—না, আমার সঙ্গে ও রকম গল্প না। চালাকি? দিদির সঙ্গে যেমন গল্প করেন—ওই রকম।

—তোমার বড্ড হিংসে দিদির ওপর দেখচি। কি রকম গল্প শুনি—

—সম্স্কৃতো টম্স্কৃতো। ঠাকুরদেবতার কথা। ব্রহ্ম না কি—

ভবানী হো হো করে হেসে উঠে সস্নেহে ওর দিকে চাইলেন। বললেন—শুনতে চাও নি কোনোদিন তাই বলি নি। বেশ তাই হবে। তুমি জানো কার মত করলে? প্রাচীন দিনে এক ঋষি ছিলেন, তাঁর দুই স্ত্রী—গার্গী আর মৈত্রেয়ী—তুমি করলে গার্গীর মত, সতীন-কাঁটা যখন ভূমা চাইবে, তখন বুঝি আর না বুঝি, আমাকে সেই ভূমাই নিতে হবে—এই ছিল গার্গীর মনে আসল কথা—তোমারও হোলো সেই রকম।

এমন সময়ে খোকা এসে বললে—বাবা, কি খাচ্ছ? আমি খাবো—

—আয় খোকা—

ভবানী দুটি মুড়কি ওর মুখে তুলে দিলেন। খোকা বাটীর দিকে তাকিয়ে বললে—নারকোল।

—না। পেট কামড়াবে।

—পেট কামড়াবে?

—হ্যাঁ বাবা।

—ও বাবা—বাবা—পেট কামড়াবে?

—হ্যাঁ রে বাবা।

—বাবা—

—কি?

—পেট কামড়াবে?

নিলু ধমক দিয়ে বললে—থাম রে বাবা। যা একবার ধরলেন তো তাই ধরলেন—

খোকা একবার চায় নিলুর দিকে, একবার চায় বাবার দিকে অবাক দৃষ্টিতে। বাবার দিকে চেয়ে বললে—কাকে বলচে বাবা?

নিলু বললে—ওই ও পাড়ার নীলে বাগ্‌দিকে। কাকে বলা হচ্চে এখন বুঝিয়ে দাও—বলেই ছুটে গিয়ে খোকাকে কোলে তুলে নিলে। খোকা কিন্তু সেটা পছন্দ করলে না, সে বার বার বলতে লাগলো—আমায় ছেড়ে দাও—আমি বাবার কাছে যাবো—

—যায় না।

—না, আমায় ছেড়ে দাও—আমি বাবার কাছে যাবো—

ভবানী বললেন—দাও, নামিয়ে দাও—এই নে, একখানা নারকোল—

খোকা বাবার বেজায় ন্যাওটো। বাবাকে পেলে আর কাউকে চায় না। সে এসে বাবার হাত থেকে নারকোল নিয়ে বাবার কোলে মাথা রেখে বলতে লাগলো বাবার মুখের দিকে চেয়ে—ও বাবা, বাবা!

—কি রে খোকা ?

খোকা বাবার গায়ে হাত বুলিয়ে বলে—ও বাবা, বাবা !

—এই তো বাবা।

এমন সময়ে প্রবীণ শ্যামচাঁদ গাঙ্গুলী এসে ডেকে বললেন—বাবাজি বাড়ী আছ ?

ভবানী শশব্যস্তে বললেন—আসুন মামা, আসুন—

—আসবো না আর, আলো আমার আছে। চলো একবার চন্দন-দাদার চণ্ডীমণ্ডপে। ভানী গয়লানীর সেই বিধবা মেয়েটার বিচার হবে। শক্ত বিচার আজগে।

—আমি আর সেখানে যাবো না মামা—

—সে কি কথা ? যেতেই হবে। তোমার জন্যি সবাই বসে। সমাজের বিচার, তুমি হোলে সমাজের একজন মাথা। তোমরা আজকাল কর্ত্তব্য ভুলে যাচ্চ বাবাজি, কিছু মনে কোরো না।

নিলু খোকাকে নিয়ে এর আগেই রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল। শ্যামচাঁদ গাঙ্গুলীকে প্রত্যাখ্যান করা চলবে না, দুর্ব্বাসা প্রকৃতির লোক। এখনই কি বলতে কি বলে বসবেন।

রান্নাঘরে ঢুকে তিলু-নিলুকে কথাটা বলতে গেলেন ভবানী, জটিল গ্রাম্য হাঙ্গামা, ফিরতে রাত হবে। খোকা এসে মহাখুশির সঙ্গে বাবার হাত ধরে বললে—বাবা এসো, খাই—

—কি খাবো রে ?

—এসো বাবা, বসো—মজা হবে।

—না রে, আমি যাই, দরকার আছে। তুমি খাও—

—আমি তাহোলে কাঁদবো। তুমি যেও না, যেও না—বোসো এখানে। মজা হবে।

খোকার মুখে সে কি উল্লাসের হাসি। বাবাকে সে মহা আগ্রহে হাত ধরে এনে একটা পিঁড়িতে বসিয়ে দিলে। যেটাতে বসিয়ে দিলে সেটা রুটি বেলবার চাকি, ঠিক পিঁড়ি নয়।

—বোসো এখেনে। তুমি খাবে ?

—হুঁ।

—আমি খাবো।

—বেশ।

—তুমি খাবে ?

কিন্তু দুর্ব্বাসা শ্যাম গাঙ্গুলী বাইরে থেকে হেঁকে বললেন ঠিক সেই সময়—বলি, দেরি হবে নাকি বাবাজির ?

আর থাকা যায় না। দুর্ব্বাসা ঋষিকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা চলে না। ভবানীকে উঠতে হোলো। খোকা এসে বাবার কাপড় চেপে ধরে বললে—যাস নে, এ বাবা। বোসো ও বাবা। আমি তাহোলে কাঁদবো—

খোকার আগ্রহশীল ছোট্ট দুর্ব্বল হাতের মুঠো থেকে তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে ভবানীকে চলে যেতে হোলো। সমস্ত রাস্তা শ্যাম গাঙ্গুলী সমাজপতি বক বক বকতে

লাগলেন, ৺চন্দ্র চাটুয্যের চণ্ডীমণ্ডপে কাদের একটি যুবতী মেয়ের গুপ্ত প্রণয়ঘটিত কি বিচার হোতে লাগলো—এসব ভবানী বাঁড়ুয্যের মনের এক কোণেও স্থান পায় নি—তাঁর কেবল মনে হচ্ছিল খোকার চোখের সেই আগ্রহভরা আকুল সপ্রেম দৃষ্টি, তার দুটি ছোট্ট মুঠির বন্ধন অগ্রাহ্য করে তিনি চলে এসেচেন। মনে পড়লো খোকনের আরো ছেলেবেলার কথা।…কোথায় যেন সেদিন তিনি গিয়েছিলেন, সেদিন অনেকক্ষণ খোকাকে দেখেন নি ভবানী বাঁড়ুয্যে। মনে হয়েছিল সন্দেবেলায় হয়তো বাড়ী ফিরে দেখবেন সে ঘুমিয়ে পড়েচে। আজ সারারাতে আর সে জাগবে না। তাঁর সঙ্গে কথাও বলবে না।

বাড়ীর মধ্যে ঢুকে দেখলেন সে ঘুমোয় নি। বাবার জন্যে জেগে বসে আছে। ভবানী বাঁড়ুয্যে ঘ'র ঢুকতেই সে আনন্দের সুরে বলে উঠল—ও বাবা, আয় না—ছুবি—

—তুমি শোও। আমি আসচি ওঘর থেকে—

—ও বাবা, আয়, তাহলে আমি কাঁদবো—

ভবানীর ভালো লাগে বড় এই শিশুকে। এখনো দু'বছর পোরে নি। কেমন সব কথা বলে এবং কি মিষ্টি সুরে, অপূর্ব্ব ভাঙতেই না বলে।

শিশুর প্রতি গাঢ় মমতা-রসে ভবানীর প্রাণ সিক্ত হোলো। তিনি ওর পাশে শুয়ে পড়লেন। শিশু ভবানীর গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে—আমার বড়দা, আমার বড়দা—

—সে কি রে?

—আমার বড়দা—

—আমি বুঝি তোর বড়দা? বেশ বেশ।

শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে বাস করার দরুন এ গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের এবং অধিকাংশ লোকেরই তিনি ভগ্নিপতি সম্পর্কের লোক। তাঁরা অনেকেই তাঁকে 'বড়দা' কেউবা 'মেজদা' বলে ডাকে। শিশু সেটা শুনে শুনে যদি ঠাউরে নেয়, যে লোকটাকে বাবা বলা হয়, তার অন্য নাম কিন্তু 'বড়দা,' তবে তাকে দোষ দেওয়া চলে না।

ভবানী ওকে আদর করে বললেন—খোকন, আমার খোকন—

—আমার বড়দা—

ভবানীর তখুনি মনে হোলো এ এক অপূর্ব্ব প্রেমের রূপ দেখতে পাচ্চেন এই ক্ষুদ্র মানবকের হৃদয়রাজ্যে। এত আপন তাঁকে এত অল্পদিনে কেউ করে নিতে পারে নি, এত নির্ব্বিচারে, এত নিঃসঙ্কোচে। আপন আর পরে তফাতই এই।

তিনি বললেন—তোকে একটা গল্প করি খোকন, একটা জুজুবুড়ি আছে ওই তাল গাছে—কুলোর মত তার কান, মূলোর মত—

এই পর্য্যন্ত বলতেই খোকা তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললে—আমার ভয় করবে—আমার ভয় করবে—তাহোলে আমি কাঁদবো—

—তুমি কাঁদবে?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা থাক থাক।

খানিকটা পরে খোকা বড় মজা করেচে। ছোট্ট মাথাটি দুলিয়ে, দুই হাত ছড়িয়ে ক্ষুদ্র মুঠি পাকিয়ে সে ভয় দেখানোর সুরে বললে—একতা জুজুবুড়ি আছে—মট্ট বড় কান—

—বলিস্ কি খোকন?

—ই-ই-ই! একতা জুজুবুড়ি আছে।

—ভয় পেয়েচি খোকা। বলিস নে, বলিস নে! বড্ড ভয় করচে—

—হি হি—

—বড্ড ভয় করচে—

—একতা জুজুবুড়ি আছে—

—না না। আর বলিস নে, বলিস নে—

খোকার সে কি অবোধ আনন্দের হাসি। ভবানীর ভারি মজা লাগলো—ভয়ের ভান করে বালিশে মুখ লুকুলেন। বাবার ভয় দেখে খোকা বাবার গলা জড়িয়ে মমতার সুরে বললে—আমার বড়দা, আমার বড়দা—

—হ্যাঁ আমায় আদর করো, আমার বড্ড ভয় করচে—

—আমার বড়দা—

—শোও খোকন, আমার কাছে শোও—

—জস্তি গাছটা বলো—

ভবানী ছড়া বলতে লাগলেন—

ও পারের জস্তি গাছটি জস্তি বড় ফলে
গো জস্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে
প্রাণ করে আইঢাই গলা করে কাঠ
কতক্ষণে যাব রে এই হরগৌরীর মাঠ।

হঠাৎ খোকা হাত দুটো ছড়িয়ে চোখ বড় বড় করে বললে—একতা জুজুবুড়ি আছে—

—ও বাবা—

—মট্ট বড় কান—একতা জুজুবুড়ি আছে—

—আর বলিস নে—খোকন, আর বলিস নে—

—হি হি—

—বড্ড ভয় করচে—খোকন আমায় ভয় দেখিও না—

—আমার বড়দা, আমার বড়দা—

আজ সন্ধ্যাবেলায় শ্যাম গাঙ্গুলীর মান রাখতে গিয়ে খোকাকে বড় অবহেলা করেচেন তিনি।

গ্রামে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল। নালু পাল বেশী অর্থবান হয়ে উঠলো।

সামান্ত মুদীখানার দোকান থেকে ইদানীং অবিশ্যি সে বড় গোলদারী দোকান খুলেছিল এবং ধান, সর্ষে, মুগকলাইয়ের আড়ত কেঁদে মোকাম ও গঞ্জ থেকে মাল কেনা-বেচা করত।

একদিন ফণি চক্কত্তির চণ্ডীমণ্ডপে সংবাদটা নিয়ে এলেন দীনু ভট্‌চাজ। ৺শিবসত্য চক্রবর্ত্তীর আমলে তৈরী সেই প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপ দা-কাটা তামাকের ধোঁয়ায় অন্ধকারপ্রায় হয়ে গিয়েচে। পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণের-দল সবাই নিষ্কর্ম্মা, জীবনে মহকুমার বাইরে কেউ কখনো পা দেয় নি—কারণ, দরকারও হয় না। ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি প্রায় সব ব্রাহ্মণেরই আছে, ধানের গোলা প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই, দু'-পাঁচটা গরুও আছে, আম কাঁটাল বাঁশঝাড় আছে। সুতরাং সকাল-সন্দে ফণি চক্কত্তি, ৺চন্দর চাটুয্যে কিংবা শ্যাম গাঙ্গুলীর চণ্ডীমণ্ডপে এই সব অলস নিষ্কর্ম্মা গ্রাম্য ব্রাহ্মণদের সময় কাটাবার জন্তে তামাকু সেবন, পাশা, দাবা, আজগুবি গল্প, দুর্ব্বলের বিরুদ্ধে সামাজিক ঘোঁট ইত্যাদি পুরো মাত্রায় চলে। মাঝে মাঝে এর ওর ঘাড়-ভেঙে খাওয়া চলে কোনো সমাজবিরুদ্ধ কাজের জরিমানা স্বরূপ।

সুতরাং দীনু ভট্‌চাজ যখন চোখ বড় বড় ক'রে এসে বললে—শুনেচ হে আমাদের নালু পালের কাণ্ড ?...

সকলে আগ্রহের সুরে এগিয়ে এসে বললে—কি, কি হে শুনি ?

—সতীশ কলু আর নালু পাল তামাক কিনে মোটা টাকা লাভ করেচে, দু'দশ নয়, অনেক বেশি। দশ বিশ হাজার !

সকলে বিস্ময়ের সুরে বলে উঠলো—সে কি ? সে কি ?

দীনু ভট্‌চাজ বললেন—অনেকদিন থেকে ওরা তলায় তলায় কেনাবেচা করচে মোকামের মাল। এবার ধারে ভাজনঘাট মোকাম থেকে এক কিস্তি মাল রপ্তানী দেয় কলকাতায়। সতীশ কলুর শালা বড় আড়তদারি করে ওই ভাজনঘাটেই। তারই পরামর্শে এটা ঘটেচে। নয়তো এরা কি জানে, কি বোঝে ? ব্যস, তাতেই লাল।

ফণি চক্কত্তি বললেন,—হ্যাঁ, আমিও শুনিচি। ও সব কথা নয়। সতীশ কলুর শালা-টালা কিছু না। নালু পালের শ্বশুরের অবস্থা বাইরে একরকম ভেতরে একরকম। সে-ই টাকাটা ধার দিয়েচে।

হরি নাপিত সকলকে কামাতে এসেছিল, সে গ্রাম্য নাপিত, সকালে এখানে এলে সবাইকে একত্র পাওয়া যায় বলে বারের কামানোর দিন সে এখানেই আসে। এসেই কামায় না, তামাক খায়। সে কল্কে খেতে খেতে নামিয়ে বললে—না খুড়োমশাই। বিনোদ প্রামাণিকের অবস্থা ভালো না, আমি জানি। আড়তদারি করে ছোটখাটো, অত পয়সা ক'নে পাবে ?

—তলায় তলায় তার টাকা আছে। জামাইকে ভালোবাসে, তার ওই এক মেয়ে। টাকাটা যে করেই হোক জোগাড় ক'রে দিয়েচে জামাইকে। টাকা না হলি ব্যবসা চলে ?

জিনিসটার কোনো মীমাংসা হোক আর না হোক নালু পাল যে অর্থবান হয়ে উঠেচে—ছ'মাস এক বছরের মধ্যে সেটা জানা গেল ভালোভাবে, যখন সে মস্ত বড় ধান চালের সায়ের বসালে পটপটিতলার ঘাটে। জমিদারের কাছে ঘাট ইজারা নিয়ে ধান ও সর্ষের মরসুমে

দশ বিশ খানা মহাজনী কিস্তি রোজ তার সায়েরে এসে মাল নামিয়ে উঠিয়ে কেনা-বেচা করে। দুজন কয়াল জিনিস মাপতে হিমশিম খেয়ে যায়। অন্তত পঁচিশ হাজার টাকা সে মুনফা করলে এই এক মরসুমে পটপটিতলার সায়ের থেকে। লোকজন, মুহুরী, গোমস্তা রাখলে, মুদীখানার দোকান বড় গোলদারী দোকানে পরিণত করলে, পাশে একখানা কাপড়ের দোকানও খুললে।

আগের নালু পাল ছিল সম্পন্ন গৃহস্থ, এখন সে হোলো ধনী মহাজন।

কিন্তু নালু পালকে দেখে তুমি চিনতে পারবে না। খাটো ন' হাত ধুতি পরনে, খালি গা, খালি পা। ব্রাহ্মণ দেখলে ঘাড় নুইয়ে দুই হাত জোড় ক'রে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নেবে। গলায় তুলসীর মালা, হাতে হরিনামের ঝুলি—নাঃ, নালু পাল যা একজীবনে করলে, অনেকের পক্ষেই তা স্বপ্ন।

যদি তুমি জিজ্ঞেস করলে—পালমশায়, ভালো সব ?

বিনীত ভাবে হাত জোড ক'রে নালু পাল বলবে—প্রাতো পেন্নাম হই। আসুন, বসুন। না, ঠাকুরমশাই, ব্যবসার অবস্থা বড্ড মন্দা। এ সব ঠাট-বাট তুলে দিতি হবে। প্রায় অচল হয়ে এসেচে। চলবে না আর। মুখের দীনভাব দেখলে অনভিজ্ঞ লোকে হয়তো নালু পালের অবস্থার বর্ত্তমান অবনতির জন্যে দুঃখ বোধ করবে। কিন্তু ওটা শুধু বৈষ্ণব-সুলভ দীনতা মাত্র নালু পালের, বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই নেই। সায়েরেই বছরে চোদ্দ পনেরো হাজার টাকা কেনাবেচা হয়। ত্রিশ হাজার টাকা কাপড়ের কারবারের মূলধন।

নালু পালের একজন অংশীদার আছে, সে হচ্ছে সেই সতীশ কলু। দুজনে একদিন মাথায় মোট নিয়ে হাটে হাটে জিনিসপত্র বিক্রী করতো, নালু পাল সুপুরি, সতীশ কলু তেল। তারপর হাতে টাকা জমিয়ে ছোট এক মুদির দোকান করলে নালু পাল। সতীশের পরামর্শে নালু তেঘরাশেখহাটি আর বাঁধমুড়া মোকাম থেকে সর্ষে, আলু আর তামাক কিনে এনে দেশে বেচতে শুরু করে। সতীশ এতে শুধু বখরাদার ছিল, মোকাম সন্ধান করতো। কাঁটায় মাল খরিদ করতে ওস্তাদ-ঘুঘু সতীশ কলু। কৃতিত্ব এই একবার তাকালে বিক্রেতা মহাজন বুঝতে পারবে, হাঁ খদ্দের বটে। সতীশ কলুর কৃতিত্ব এই উন্নতির মূলে—নালু পাল গোড়া থেকেই সততার জন্যে নাম কিনেছিল। দুজনের সম্মিলিত অবদানে আজ এই দৃঢ় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেচে।

স্বামী বাড়ী ফিরলে তুলসী বললে—হ্যাগা, এবার কালীপুজোতে অমন হিম হয়ে বসে আছ কেন ?

—বড্ড কাজের চাপ পড়েচে বড় বৌ। মোকামে পাঁচশো মন মাল কেনা পড়ে আছে, আনবার কোনো বন্দোবস্ত করে উঠতি পাচ্চিনে—

—ও সব আমি শুনচিনে। আমার ইচ্ছে, গাঁয়ের সব বেরাহ্মণদের এবার লুচি চিনির ফলার খাওয়াবো। তুমি বন্দোবস্ত করে দাও। আর আমার সোনার যশম চাই।

—বাবা, এবার যে মোটা খরচের ফর্দ্দ!

—তা হোক। খোকাদের কল্যেণে এ তোমাকে ক'ত্ত হবে। আর ছোট খোকার বোর, পাটা, নিমফল ওই সঙ্গে দিত্তি হবে।

—দাঁড়াও বড় বৌ, এক সঙ্গে অমন গড়গড় করে বলো না। রয়ে বসে—

—না, রত্তি বসত্তি হবে না। ময়না ঠাকুরঝিকে শ্বশুরবাড়ী থেকে আনাত্তি হবে—আমি আজই সয়ের মাকে পাঠিয়ে দিই।

—আরে, তারে তো কালীপুজোর সময় আনত্তিই হবে—সে তুমি পাঠিয়ে দাও না যখন ইচ্ছে। আবার দাঁড়াও, ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা কোথায় ফলার খাবেন তার ঠিক করি। চন্দর চাটুয্যে তো মারা গিয়েচেন—

—আমি বলি শোনো, ভবানী বাঁড়ুয্যের বাড়ী যদি করত্তি পারো। আমার দুটো সাধের মধ্যি এ হোলো একটা।

—আর একটা কি শুনত্তি পাই?

—খুব শুনত্তি পারো। রামকানাই কবিরাজকে তন্ত্রধার করে পুজো করাত্তি হবে। অমন লোক এ দিগরে নেই।

—বোঝলাম—কিন্তু সে বড্ড শক্ত বড় বৌ। পয়সা দিয়ে তেনারে আনা যাবে না. সে চীজ না। ও ভবানী ঠাকুরেরও সেই গতিক। তবে তিলু দিদিমণি আছেন সেখানে, সেই ভরসা। তুমি গিয়ে তেনাকে ধরে রাজি করাও। ওঁদের বাড়ী হলি সব বেরাহ্মণ খেত্তি যাবেন।

স্বামী স্ত্রীর এই পরামর্শের ফলে কালীপুজার রাত্রে এ গ্রামের সব ব্রাহ্মণ ভবানী বাঁড়ুয্যের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হোলো। তিলুর খোকা যাকে ছাখে, তাকেই বলে—কেমন আছেন?

কাউকে বলে—আসুন, আসুন। তুমি ভালো আছেন?

তিলু ও নিলু সকলের পাতে নুন পরিবেশন করচে দেখে খোকা বায়না ধরলে সেও নুন পরিবেশন করবে। সকলের পাতে নুন দিয়ে বেড়ালে, দেবার আগে প্রত্যেকের মুখের দিকে বড় বড় জিজ্ঞাসু চোখে চায়। বলে, তুমি নেবে? তুমি নেবে?

দেখতে বড় সুন্দর মুখখানি, সকলেই ওকে ভালোবাসে। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, তা হবে না, মাও সুন্দরী, বাপও সুপুরুষ। লোকে ঘাঁটিয়ে তার কথা শোনবার জন্যে, আর সুন্দর মুখখানি দেখবার জন্যে অকারণে বলে ওঠে—খোকন, এই যে এদিকি লবণ দিয়ে যাও বাবা—

খোকা ব্যস্ত সুরে বলে—যাই—ই—

কাছে গিয়ে বলে—তুমি ভালো আছেন? নুন নেবে?

রামকানাই কবিরাজ কালীপুজার মন্ত্রধারক ছিলেন। তিনিও এক পাশে খেতে বসেচেন। তিলু তাঁর পাতে গরম গরম লুচি দিচ্ছিল বার বার এসে। রামকানাই বললেন—নাঃ দিদি, কেন এত দিচ্ছ? আমি খেতে পারিনে যে অত।

রামকানাই কবিরাজ বুড়ো হয়ে পড়েচেন আগেকার চেয়ে। কবিরাজ ভালো হোলে

কি হবে, বৈষয়িক লোক তো নন, কাজেই পসার জমাতে পারেন নি। যে দরিদ্র, সেই দরিদ্র। বড়সাহেব শিপ্‌টন একবার তাঁকে ডাকিয়ে পূর্ব্ব অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কিছু টাকা দিতে চেয়েছিল কিন্তু ম্লেচ্ছের দান নেবেন না বলে রামকানাই সে অর্থ প্রত্যাখ্যান করে চলে এসেছিলেন।

ভোজনরত ব্রাহ্মণদের দিকে চেয়ে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল লালমোহন পাল। আজ তার সৌভাগ্যের দিন, এতগুলি কুলীন ব্রাহ্মণের পাতে সে লুচি-চিনি দিতে পেরেচে। আধমন ময়দা, দশসের গব্যঘৃত ও দশসের চিনি বরাদ্দ। দীয়তাং ভুজ্যতাং ব্যাপার। দেখেও সুখ।

—ও তুলসী, দাঁড়িয়ে দ্যাখোসে—চক্ষু সার্থক করো—

তুলসী এসে লজ্জায় কাঁটালতলায় দাঁড়িয়ে ছিল—স্ত্রীকে সে ডাক দিলে। তুলসী একগলা ঘোমটা দিয়ে স্বামীর অদূরে দাঁড়ালো। একদৃষ্টে স্বামী-স্ত্রী চেয়ে রইল নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের দিকে। নালু পালের মনে কেমন এক ধরনের আনন্দ, তা বলে বোঝাতে পারে না। কিশোর বয়সে ও প্রথম যৌবনে কম কষ্টটা করেছে মামার বাড়ীতে? মামীমা একটু বেশি তেল দিত না মাখতে। শখ করে বাব্‌রি চুল রেখেছিল মাথায়, কাঁচা বয়সের শখ। তেল অভাবে চুল রুক্ষ থাকতো। দুটি বেশি ভাত খেলে বলতো, হাতীর খোরাক আর বসে বসে কত জোগাবো! অথচ সে কি বসে বসে ভাত খেয়েচে মামার বাড়ীর? দু' ক্রোশ দূরবর্ত্তী ভাতছালার হাট থেকে সমানে চাল মাথায় করে এনেচে। মামীমা ধান সেদ্ধ শুকনো করবার ভার দিয়েছিল ওকে। রোজ আধমন বাইশসের ধান সেদ্ধ করতে হোতো। হাট থেকে আসবার সময় একদিন চাদরের খুঁট থেকে একটা রূপোর দুয়ানি পড়ে হারিয়ে গিয়েছিল নালুর। মামীমা তিনদিন ধরে রোজ ভাতের থালা সামনে দিয়ে বলতো—আর ধান নেই, এবার ফুরলো। মামার জমানো গোলার ধান আর ক'দিন খাবা? পথ দ্যাখো এবার। সেদিন ওর চোখ দিয়ে জল পড়েছিল।

সেই নালু পাল আজ এতগুলি ব্রাহ্মণের পাতে লুচি-চিনির পাকা ফলার দিতে পেরেচে!

ইচ্ছে হয় সে চেঁচিয়ে বলে—তিলু দিদি, খুব দ্যাও, যিনি যা চান দ্যাও—একদিন বড্ড কষ্ট পেয়েচি দুটো খাওয়ার জন্যি।

ব্রাহ্মণের দল খেয়েদেয়ে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল, তুলসী আবার গিয়ে ঘোমটা দিয়ে দূরে কাঁটালতলায় দাঁড়ালো। লালমোহন হাত জোড় করে প্রত্যেকের কাছে বললে—ঠাকুরমশাই, পেট ভরলো?

গ্রামের সকলেই নালু পালকে ভালোবাসে। সকলেই তাকে ভালো ভালো কথা বলে গেল। শম্ভু রায় (রাজারাম রায়ের দূর সম্পর্কের ভাইপো, সে কলকাতায় আমুটি কোম্পানীর হৌসে নকলনবিশ) বললে—চলো নালু আমার সঙ্গে সোমবারে কলকাতা, উৎসব হচ্চে সামনের হপ্তাতে—খুব আনন্দ হবে দেখে আসবা—এ গাঁয়ের কেউ তো কিছু দেখলে না—সব কুয়োর ব্যাং—রেলগাড়ী খুলেচে হাওড়া থেকে পেঁড়ো বর্দ্ধমান পজ্জন্ত, দেখে আসবা—

—রেলগাড়ী জানি। আমার মাল সেদিন এসেচে রেলগাড়ীতে ওদিকের কোন জায়গা থেকে। আমার মুহুরী বলছিল।

—দেখেচ?

—কলকাতায় গেলাম কবে যে দেখবো?

—চলো এবার দেখে আসবা।

—ভয় করে। শুনিচি নাকি বেজায় চোর জুয়োচোরের দেশ।

—আমার সঙ্গে যাবা। তোমরা টাকার লোক, তোমাদের ভাবনা কি, ভাল বাঙালী সরাইখানায় ঘর ভাড়া করে দেবো। জীবনে অমন কখনো দেখবা না আর। কাবুল যুদ্ধে জিতে সরকার থেকে উৎসব হচ্চে।

এইভাবে নালু পাল ও তার স্ত্রী তুলসী উৎসব দেখতে কলকাতা রওনা হোলো। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ায় যথেষ্ট আপত্তি উঠেছিল নালু পালের পরিবারে। সায়েবেরা খৃষ্টান করে দেয় সেখানে নিয়ে গেলে গোমাংস খাইয়ে। আরও কত কি। শম্ভু রায় এ গ্রামের একমাত্র ব্যক্তি যে কলকাতার হালচাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। সে সকলকে বুঝিয়ে ওদের সঙ্গে নিয়ে গেল।

কলকাতায় এসে কালীঘাটে পাণ্ডার ছোট্ট খোলার ঘর ভাড়া করলে ওরা, ভাড়াটা কিছু বেশি, দিন এক আনা। আদি গঙ্গায় স্নান করে জোড়া পাঁঠা দিয়ে সোনার বেলপাতা দিয়ে পুজো দিলে তুলসী।

সাতদিন কলকাতায় ছিল, রোজ গঙ্গাস্নান করতো, মন্দিরে পুজো দিত।

তারপর কলকাতার বাড়ীঘর, গাড়ীঘোড়া তার কি বর্ণনা দেবে নালু আর তুলসী? চার-ঘোড়ার গাড়ী করে বড় বড় লোক গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে আসে, তাদের বড় বড় বাগান-বাড়ী কলকাতার উপকণ্ঠে, শনি রবিবারে নাকি বাইনাচ হয় প্রত্যেক বাগানবাড়ীতে। এক একখানা খাবারের দোকান কি! অত সব খাবার চক্ষেও দেখে নি ওরা। লোকের ভিড় কি বড় রাস্তায়, যেদিন গড়ের মাঠে আতস বাজি পোড়ানো হোলো! সাহেবেরা বেত হাতে করে সামনের লোকদের মারতে মারতে নিজেরা বীরদর্পে চলে যাচ্চে। ভয়ে লোকজন পথ ছেড়ে দিচ্চে, তুলসীর গায়েও এক ঘা বেত লেগেছিল, পেছনে চেয়ে দেখে দুজন সাহেব আর একজন মেম, দুই সাহেব বেত হাতে নিয়ে শুধু ডাইনে বাঁয়ে মারতে মারতে চলেচে।—তুলসী 'ও মাগো' বলে সভয়ে পাশ দিয়ে দাঁড়ালো। শম্ভু রায় ওদের হাত ধরে সরিয়ে নিয়ে এল। নালু পাল বাজার করতে গিয়ে লক্ষ্য করলে এখানে তরিতরকারী বেশ আক্রা দেশের চেয়ে। তরিতরকারী সের দরে বিক্রয় হয় সে এই প্রথম দেখলে! বেগুনের সের দু পয়সা। এখানকার লোক কি খেয়ে বাঁচে! দুধের সের এক আনা ছ পয়সা। তাও খাঁটি দুধ নয়, জল মেশানো। তবে শম্ভু রায় বললে, এই উৎসবের জন্যে বহু লোক কলকাতায় আসার দরুন জিনিসপত্রের যে চড়াদর আজ দেখা যাচ্ছে, এটাই কলকাতার সাধারণ বাজার-দর নয়। গোল আলু যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং সস্তা। এই জিনিসটা গ্রামে নেই, অথচ খেতে

খুব ভালো। মাঝে মাঝে মুদিখানার দোকানীরা শহর থেকে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে বটে, দাম বড্ড বেশি। নালু পাল তুলসীকে বললে—কিছু গোল আলু কিনে নিয়ে যেতি হবে দেশে। পড়তায় পোষায় কিনা দেখে আমার দোকানে আমদানী করতি হবে।

তুলসী বললে, ও সব সায়েবদের খাবার হাঁড়িতে দেওয়া যায় না সব সময়।

—কে তোমাকে বলেচে সায়েবদের খাবার? আমাদের দেশে চাষ হচ্ছে যথেষ্ট। আমি মোকামের খবর রাখি। কালনা কাটোয়া মোকামে আলু সস্তা, অনেক চাষ হয়। আমাদের গাঁ-ঘরে আনলি তেমন বিক্রি হয় না, নইলে আমি কালনা থেকে আলু আনতে পারিনে, না খবর রাখিনে! শহরে চলে, গাঁয়ে কিনবে কেডা?

তুলসী বললে—ঢেঁকি কিনা? স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। ব্যবসা আর কেনা-বেচা! এখানে এসেও তাই।

এই তাজ্জব ভ্রমণের গল্প নালু পালকে কতদিন ধরে করতে হয়েছিল গ্রামের লোকের কাছে। কিন্তু এর চেয়েও একটা তাজ্জব ব্যাপার ঘটে গেল একদিন। শীতকালের মাঝামাঝি একদিন দেওয়ান হরকালী সুর আর নরহরি পেশকার এসে হাজির হোলো ওর আড়তে। নালু পাল ও সতীশ কলু তটস্থ হয়ে শশব্যস্ত হয়ে ওদের অভ্যর্থনা করলে। তখনি পান তামাকের ব্যবস্থা হোলো। নীলকুঠির দেওয়ান, মানী লোক, হঠাৎ কারো কাছে যান না। একটু জলযোগের ব্যবস্থা করবার জন্যে সতীশ কলু নবু ময়রার দোকানে ছুটে গেল। কিছুক্ষণ পরে দেওয়ানজী তাঁর আসার কারণ প্রকাশ করলেন, বড়সাহেব কিছু টাকা ধার চান। বেঙ্গল ইণ্ডিগো কন্সারন্ মোল্লাহাটির কুঠি ছেড়ে দিচ্চে, নীলের ব্যবসা মন্দা পড়েচে বলে তারা এ কুঠি রাখতে চায় না। শিপটন সাহেব নিজ সম্পত্তি হিসেবে এ কুঠি রাখতে চান, এর বদলে পনেরো হাজার টাকা দিতে হবে বেঙ্গল ইণ্ডিগো কন্সারনকে। ওই কুঠিবাড়ী বন্ধক দিয়ে বড়সাহেব নালু পালের কাছে টাকা চায়।

নরহরি পেশকার বললে—কুঠিটা বজায় রাখার এই একমাত্র ভরসা। নইলে চৈত্র মাস থেকে নীলকুঠি উঠে গেল। আমাদের চাকরি তো চলে গেলই, সায়েবও চলে যাবে।

দেওয়ান হরকালী বললেন—বড়সায়েবের খুব ইচ্ছে নিজে কুঠি চালিয়ে একবার দেখবেন। এতকাল এদেশে কাটিয়ে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। দেশে কেউ নেইও তো, মেমসায়েব তো মারা গিয়েছেন। একটা মেয়ে আছে, সে এদেশে কখনো আসে নি।

নালু পাল হাত জোড় ক'রে বললে—এখন কিছু বলতি পারবো না দেওয়ানবাবু। ভেবে দেখতি হবে—তা ছাড়া আমার একার ব্যবসা না, অংশীদারের মত চাই। তিন-চারদিন পরে আপনাকে জানাবো।

দেওয়ান হরকালী সুর বিদায় নিয়ে যাবার সময় বললেন—তিনদিন কেন, পনেরো দেন সময় আপনি নিন পালমশাই। মার্চ মাসে টাকার দরকার হবে, এখনো দেরি আছে—

তুলসী শুনে বললে—বল কি!

—আমিও ভাবচি। কিসে থেকে কি হোলো!

—টাকা দেবে?

—আমার খুব অনিচ্ছে নেই। অত বড় কুঠিবাড়ী, দেড়শো বিঘে খাস জমি, বড় বড় কলমের আমের বাগান, ঘোড়া, গাড়ী, মেজ কেদারা, ঝাড়লণ্ঠন সব বন্ধক থাকবে। কুঠির নেই-নেই এখনো অনেক আছে। কিন্তু সতে কলুর স্থাখলাম ইচ্ছে নেই। ও বলে—আমরা আড়তদার লোক, হ্যাংগামাতে যাওয়ার দরকার কি? এরপর হয়তো ওই নিয়ে মামলা করতি হবে।

সমস্ত রাত নালু পালের ঘুম হোলো না। বড়সায়েব শিপ্‌টন্‌···টমটম করে যাচ্চে···কুঠির পাইক লাঠিয়াল···দব্‌দবা রব্‌রবা···মারো শামচাঁদ · দাও ঘর জ্বালিয়ে · সে মোল্লাহাটির হাটে পান সুপুরির মোট নিয়ে বিক্রি করতে যাচ্চে।

টাকা দিতে বড্ড ইচ্ছে হয়।

এই বছরে আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেল। আফগান যুদ্ধ জয়ের উৎসব ছাড়াও।

মাত্র কয়েক দিনের জ্বরে বড়সায়েব হঠাৎ মারা গেল মার্চ মাসের শেষে।

সায়েব যে অমন হঠাৎ মারা যাবে, তা কেউ কল্পনা করতে পারে নি।

অসুখের সময় গয়ামেম যেমন সেবা করেচে, অমন দেখা যায় না। রোগের প্রথম অবস্থা থেকেই সে রোগীর কাছে সর্ব্বদা হাজির-থাকে। জ্বরের ঝোঁকে শিপ্‌টন্‌ বকে, কি সব গান গায়। গয়া বোঝে না সাহেবের কি সব কিচির মিচির বুলি।

ওকে বললে—গয়া শুনো—

—কি গা?

—ব্র্যাণ্ডি ডাও। ডিটে হইবে টোমায়।

গয়া ক'দিন রাত জেগেচে। চোখ রাঙা, অসম্বৃত কেশপাশ, অসম্বৃত বসন। সাহেবের লোকলশ্‌কর দেওয়ান আরদালি আমীন সবাই সর্ব্বদা দেখাশুনা করচে তটস্থ হয়ে, কুঠির সেদিন যদিও এখন আর নেই, তবুও এখনো ওরা বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানীর বেতনভোগী ভৃত্য। কিন্তু গয়া ছাড়া মেয়েমানুষ আর কেউ নেই। সে-ই সর্ব্বদা দেখাশুনো করে, রাত জাগে। গয়া মদ খেতে দিলে না। ধমকের সুরে বললে—না, ডাক্তারে বারণ করেচে—পাবে না।

শিপ্‌টন্‌ ওর দিকে চেয়ে বললে—Dearie, I adore you, বুঝিলে? I adore you.

—বকবে না।

—ব্র্যাণ্ডি ডাও, just a little, won't you? একটুখানা—

—না। মিছরির জল দেবানি।

—Oh, to the hell with your candy water! When I am getting my peg? ব্র্যাণ্ডি ডাও—

—চুপ করো। কাশি বেড়ে যাবে। মাথা ধরবে।

শিপ্‌টন্ সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। দু'দিন পরে অবস্থা খারাপ হয়ে পড়লো। দেওয়ান হরকালি সুর সাহেবকে কলকাতায় পাঠাবার খুব চেষ্টা করলেন। সাহেবের সেটা দেখা গেল একেবারেই ইচ্ছে নয়। মহকুমার শহর থেকে প্রবীণ অক্ষয় ডাক্তারকে আনানো হোলো, তিনিও রোগীকে নাড়ানাড়ি করতে বারণ করলেন।

একদিন রামকানাই কবিরাজকে আনালে গয়া মেম।

রামকানাই কবিরাজ জড়িবুটির পুঁটুলি নিয়ে রোগীর বিছানার পাশে একখানা কেদারার ওপর বসে ছিলেন, সায়েব ওর দিকে চেয়ে চেয়ে বললে—Ah! The old medicine man! When did I meet you last, my old medicine man? টোমাকে জবাব দিতে হইটেছে—আমি জবাব চাই—

তারপর খানিকটা চুপ করে থেকে আবার বললে—You will not be looking at the moon, will you? Your name and profession?

গয়া বললে—বুঝলে বাবা, এই রকম করচে কাল থেকে। শুধু মাথামুণ্ডু বকুনি।

রামকানাই একমনে রোগীর নাড়ী দেখছিল। রোগীর হাত দেখে সে বললে—ক্ষীণে বলবতী নাড়ী, সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা—একটু মৌরীর জল খাওয়াবে মাঝে মাঝে। আমি যে ওষুধ দেবো, তার সহপান যোগাড করতি হবে মা, অনুপানের চেয়ে সহপান বেশি দরকারি—আমি দেবো কিছু কিছু জুটিয়ে—আমার জানা আছে—একটা লোক আমার সঙ্গে দিতি হবে।

শিপ্‌টন্ সায়েব খাট থেকে উঠবার চেষ্টা করে বললে—You see, old medicine man, I have too many things to do this summer to have any time for your rigmarole—you just—

শ্রীরামমুচি ও গয়া সাহেবকে আবার জোর করে খাটে শুইয়ে দিলে।

গয়া আদরের সুরে বললে—আঃ, বকে না, ছিঃ—

সায়েব রামকানাইয়ের দিকে চেয়েই ছিল। খানিকটা পরে বলে উঠলো—Shall I get you a glass of vermouth, my good man—এক গ্লাস মড্ খাইবে? ভাল মড্—oh, that reminds me, when I am going to have my dinner? আমার খানা কখন ডেওয়া হইবে? খানা আনো—

পরের দু' রাত অত্যন্ত ছটফট্ করার পরে, গয়াকে বকুনি ও চীৎকারের দ্বারা উত্যক্ত ও অতিষ্ঠ করার পরে, তৃতীয় দিন দুপুর থেকে নিঃঝুম মেরে গেল। কেবল একবার গভীর রাত্রে চেয়ে চেয়ে সামনে গয়াকে দেখে বললে—"Where am I?"

গয়া মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে—কি বলচো সায়েব? আমায় চিনতি পারো?

সায়েব খানিকক্ষণ চেয়ে চেয়ে বললে—What wages do you got here ?

সে-ই সায়েবের শেষ কথা। তারপর ওর খুব কষ্টকর নাভিশ্বাস উঠলো এবং অনেকক্ষণ ধরে চললো। দেখে গয়া বড় কান্নাকাটি করতে লাগলো। সায়েবের বিছানা ঘিরে শ্রীরামমুচি, দেওয়ান হরকালী, প্রসন্ন আমীন, নরহরি পেশ্‌কার, নফর মুচি, সবাই দাঁড়িয়ে। দেওয়ান হরকালী বললে—এ কষ্ট আর দেখা যায় না—কি যে করা যায় !

কিন্তু শিপ্‌টন্ সায়েবের কষ্ট হয় নি। কেউ জানতো না সে তখন বহু দূরে স্বদেশের ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের অ্যাল্ডস্লি গ্রামের ওপরকার পার্ব্বত্যপথ রাইনোজ পাস্ দিয়ে ওক্ আর এল্‌ম্ গাছের ছায়ায় ছায়ায় তার দশ বছর বয়সের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে চলেছিল খরগোশ শিকার করতে, কখনো বা পার্ব্বত্য হ্রদ এল্‌টারওয়াটারের বিশাল বুকে নৌকোয় চড়ে বেড়াচ্ছিল, সঙ্গে ছিল তাদের গ্রেট ডেন কুকুরটা কিংবা কখনো মস্ত বড় পাইক আর কার্প মাছ বঁড়শিতে গেঁথে ডাঙায় তুলতে ব্যস্ত ছিল···আর সব সময়েই ওর কানে ভেসে আসছিল তাদের গ্রামের ছোট্ট গির্জাটার ঘণ্টাধ্বনি, বহুদূর থেকে তুষার-শীতল হাওয়ায় পাতা ঝরা বীচ্ গাছের আন্দোলিত শাখা-প্রশাখার মধ্যে দিয়ে দিয়ে···

তিলু ডুমুরের ডালনার সবটা স্বামীর পাতে দিয়ে বললে—খান আপনি।

ভিজে গামছা গায়ে ভবানী খেতে খেতে বললেন—উঁহু উঁহু, কর কি ?

—খান না, আপনি ভালোবাসেন।

—খোকা খেয়েচে ?

—খেয়ে কোথায় বেরিয়েচে খেলতে। ও নিলু, মাছ নিয়ে আয়। খয়রা ভাজা খাবেন আগে, না চিংড়ি মাছ ?

—খয়রা কে দিলে—

—দেবে আবার কে ? রাজারা সোনা কোথায় পায় ? নিমাই জেলে আর ভীম দিয়ে গেল। দু'পয়সার মাছ। আজকাল আবার কড়ি চলচে না হাটে। বলে, তামার পয়সা দ্যাও।

—কালে কালে কত কি হচ্চে। আরও কত কি হবে। একটা কথা শুনেচো ?

—কি ?

এই সময় নিলু খয়রা মাছ ভাজা পাতে দিয়ে দাঁড়ালো কাছে। ভবানী তাকে বসিয়ে গল্পটা শোনালেন। তাদের দেশে রেল লাইন বসচে, চুয়োডাঙা পর্য্যন্ত লাইন পাতা হয়ে হয়ে গিয়েচে। কলের গাড়ী এই বছর যাবে কিংবা সামনের বছর। তিলু অবাক হয়ে বাউটি-শোভিত হাত দুটি মুখে তুলে একমনে গল্প শুনছিল, এমন সময় রান্নাঘরের ভেতর থেকে ঝন্‌ঝন্ করে বাসনপত্র যেন স্থানচ্যুত হবার শব্দ হোলো। নিলু খয়রা মাছের পাত্রটা নামিয়ে রেখে হাত মুঠো করে চিবুকে দিয়ে গল্প শুনছিল, অমনি পাত্র তুলে নিয়ে দৌড় দিলে রান্নাঘরের দিকে। ঘরের মধ্যে গিয়ে তাকে বলতে শোনা গেল—যাঃ যাঃ, বেরো আপদ—

তিলু ঘাড় উঁচু করে বললে—হ্যাঁরে নিয়েচে ?

—বড় বেলে মাছটা ভেজি রেখেছি ওবেলা খোকাকে দেবো বলে, নিয়ে গিয়েচে।

—ধাড়িটা না মেদিটা ?

—ধাড়িটা।

—ওবেলা ঢুকতি দিবিনে ঘরে, ঝাঁটা মেরে তাড়াবি।

ভবানী বললেন—সেও কেষ্টর জীব। তোমার আমার না খেলে খাবে কার ? খেয়েচে বেশ করেচে! ও নিলু, চলে এসো, গল্প শোনো। আর দু'দিন পরে বেঁচে থাকলে কলের গাড়ী শুধু দেখা নয়, চ'ড়ে শান্তিপুরে রাস দেখে আসতে পারবে!

নিলু ততক্ষণ আবার এসে বসেচে খালি হাতে। ভবানী গল্প করেন! অনেক কুলি এসেচে, গাঁইতি এসেচে, জঙ্গল কেটে লাইন পাতচে! রেলের পাটি তিনি দেখে এসেচেন। লোহার ইঁটের মত, খুব লম্বা। তাই জুড়ে জুড়ে পাতে।

তিলু বললে—আমরা দেখতে যাবো।

—যেও, লাইন পাতা দেখে কি হবে ? সামনের বছর থেকে রেল চলবে এদিকে। কোথায় যাবে বলো।

নিলু বললে—জষ্ঠি যুগল্ল। দিদিও যাবে।

যুগল দেখিলে জষ্ঠি মাসে
পতিসহ থাকে স্বর্গবাসে—

—উঃ, বড্ড স্বামীভক্তি যে দেখচি!

—আবার হাসি কিসের ? খাড়ু পৈছে আর নোয়া বজার থাকুক, তাই বলুন। মেজদি ভাগ্যিমানি ছিল—এক মাথা সিঁদুর আর কস্তাপেড়ে শাড়ি পরে চলে গিয়েচে, দেখতি দেখতি কতদিন হয়ে গেল!

তিলু বললে—ওঁর খাবার সময় তুই বুঝি আর কথা খুঁজে পেলি নে ? যত বয়েস হচ্চে, তত ধাড়ি ধিঙ্গি হচ্চেন দিনদিন।

বিলুর মৃত্যু যদিও আজ চার পাঁচ বছর হোলো হয়েচে, তিলু জানে স্বামী এখনো তার কথায় বড় অন্যমনস্ক হয়ে যান! দরকার কি খাবার সময় সে কথা তুলবার।

নিস্তারিনী ঘোমটা দিয়ে এসে এই সময় উঠোন থেকে বাল্যস্বরে বললে—ও দিদি, বট্ঠাকুরের খাওয়া হয়ে গিয়েচে ?

—কেন রে, কি ওতে ?

—আমড়ার টক আর কচু শাকের ঘণ্ট। উনি ভালোবাসেন বলেছিলেন, তাই বলি রান্না হোলো নিয়ে যাই। খাওয়া হয়ে গিয়েচে—

—ভয় নেই। খেতে বসেচেন, দিয়ে যা—

সলজ্জ স্বরে নিস্তারিনী বললে—তুমি দাও দিদি; আমার লজ্জা—

—ইস্! ওঁর মেয়ের বয়স, উনি আবার লজ্জা—যা দিয়ে আয়—

—না দিদি।

—হ্যাঁ—

নিস্তারিণী জড়িতচরণে তরকারির বাটি নামিয়ে রাখলে এসে ভবানী বাঁড়ুয্যের থালার পাশে। নিজে কোনো কথা বললে না। কিন্তু ওর চোখমুখ আগ্রহে ও উৎসাহে এবং কৌতূহলে উজ্জ্বল। ভবানী বাটি থেকে তরকারি তুলে চেখে দেখে বললেন—চমৎকার কচুর শাক। কার হাতের রান্না বৌমা?

নিস্তারিণী এ গ্রামের মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের বৌ। সে একা সদর রাস্তা দিয়ে হেঁটে এ বাড়ী ও বাড়ী যায়, অনেকের সঙ্গে কথা কয়, অনেক দুঃসাহসের কাজ করে—যেমন আজ এই দুপুরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে তরকারি আনা ওপাড়া থেকে। এ ধরনের বৌ এ গ্রামে কেউ নেই। লোকে অনেক কানাকানি করে, আঙুল দিয়ে দেখায়, কিন্তু নিস্তারিণী খুব অল্প বয়সের বৌ নয়. আর বেশ শক্ত, শ্বশুর শাশুড়ি বা আর কাউকেও তেমন মানে না। সুন্দরী এক সময়ে বেশ ভালোই ছিল, এখন যৌবন সামান্য একটু পশ্চিমে হেলে পড়েছে।

ভবানীর বড় মমতা হয়। প্রাণের শক্তিতে শক্তিময়ী মেয়ে, কত কুৎসা, কত রটনাই ওর নামে। বাংলাদেশের এই পল্লী অঞ্চল যেন ক্লীবের জগৎ—সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, শক্তিমতী মেয়ে যে সৃষ্টির কি অপূর্ব্ব বস্তু, এই মূর্খের ক্লীবের দল তার কি জানে? সমাজ সমাজ করেই গেল এ মহা-মূর্খের দল।

দেখেছেন এদেশে এই নিস্তারিণীকে আর গয়ামেমকে। ওই আর একটি শক্ত মেয়ে। জীবন-সাধনার বড় অভিজ্ঞান ওর চরিত্র।

রামকানাই কবিরাজের কাছে গয়ার কথা শুনেছিলেন ভবানী। নীলকুঠির বড়সাহেবের মৃত্যুর পর রোজ সে রামকানাই কবিরাজের বাড়ী এসে চৈতন্য-চরিতামৃত শুনতো। পরের দুঃখ দেখলে সিকিটা, কাপড়খানা, কখনো এক খুঁচি চাল দিয়ে সাহায্য করতো। কত লোক প্রলোভন দেখিয়েছিল, তাতে সে ভোলে নি। সব প্রলোভনকে তুচ্ছ করেছিল নিজের মনের জোরে। বড় নাকি দুরবস্থাতে পড়েছিল, গ্রামে ওর জাতের লোক ওকে একঘরে করেছিল মুরুব্বি বড়সাহেব মারা যাওয়ার পরে—অথচ তারাই এক কালে কত খোশামোদ করেছিল ওকে, যখন ওর এক কথায় নতুন দাগ-মারা জমির নীলের মার্কা উঠে যেতে পারতো কিংবা কুঠিতে ঘাসকাটার চাকরী পাওয়া যেতো। কাপুরুষের দল।

সন্ধ্যার সময় খেপীর আশ্রমে গিয়ে বসলেন ভবানী। খেপী ওঁকে দেখে খুব খাতির করলে। কিছুক্ষণ পরে ভবানী বললেন—কেমন চলচে?

এই আর একটি মেয়ে, এই খেপী। সন্ন্যাসিনী বেশ, বছর চল্লিশ বয়েস, কোনো কালেই সুন্দরী ছিল না, শক্ত সমর্থ মেয়েমানুষ। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে একা থাকে। বাঘ আছে, দুষ্টু লোক আছে—কিছু মানে না। ত্রিশূলের এক খোঁচায় শক্ত হাতে দেবে উড়িয়ে—যেই দুষ্টু লোক আসুক, এ মনের জোর রাখে।

খেপী কাছে এসে বললে—আজ একটু সৎকথা শোনবো—

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন হেসে—অসৎ কথা কখনো বলেচি ?

—মা-রা ভালো ?

—হুঁ।

—খোকা ভালো ?

—ভালো। পাঠশালায় গিয়েচে। সে এখানে আসতে চায়।

—এবার নিয়ে আসবেন।

—নিশ্চয় আনবো।

—আচ্ছা, আপনার কেমন লাগে—রূপ না অরূপ ?

—ও সব বড় বড় কথা বাদ দাও, খেপী। আমি সামান্য সংসারী লোক। যদি বলতে হয় তবে আমার গুরুভাই চৈতন্য ভারতীর কাছে শুনো।

—একটু বলতি হবে পশ্চিমির কথা। সেই বিষ্টির দিন বলেছিলেন, বড্ড ভালো লেগেছিলো।

ভবানী বাঁড়ুয্যে এখানে মাঝে মাঝে প্রায়ই আসেন। দ্বারিক কর্ম্মকার এখানকার এক ভক্ত, সম্প্রতি সে একখানা চালাঘর তৈরি করে দিয়েচে, সমবেত ভক্তবৃন্দের গাঁজা সেবনের সুবিধের জন্যে। এখানকার আর একজন ভক্ত হাফেজ মণ্ডল নিজে খেটেখুটে ঘরখানা উঠিয়েচে, খড, বাঁশ দড়ির খরচ দিয়েছে দ্বারিক কর্ম্মকার। ওরা সন্দের সময় রোজ এসে জড়ো হয়, গাঁজার ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে যায় অশথ্‌তলা। ভবানী বাঁড়ুয্যে এলে সমীহ করে সবাই, গাঁজা সামনে কেউ খায় না।

ভবানী বললেন—শালবনের মধ্যে নদী বয়ে যাচ্চে, ওপরে পাহাড়, পাহাড়ে আমলকী গাছ, বেলগাছ। দুটো একটা নয়, অনেক। আমার গুরুদেব শুধু আমলকী বেল আর আতা খেয়ে থাকতেন। অনেকদিনের কথা হয়ে গেল দেখতে দেখতে। তোমাদের দেশেই এসেচি আজ প্রায় বারো চোদ্দ বছর হয়ে গেল। বয়েস হোলো ষাট-বাষট্টি। খোকার মা তখন ছিল ত্রিশ, এখন চুয়াল্লিশ। দিন চলে যাচ্চে জলের মত। কত কি ঘটে গেল আমি আসবার পরে। কিন্তু এখনো মনে হয় গুরুদেব বেঁচে আছেন এবং এখনো সকাল সন্দে ধ্যানস্থ থাকেন সেই আমলকীতলায়।

খেপী সন্ন্যাসিনী একমনে শুনতে শুনতে বললে—তিনি বেঁচে নেই ?

—চৈতন্য ভারতী বলে আমার এক গুরুভাই এসেছিলেন আজ কয়েক বছর আগে। তখন বেঁচে ছিলেন। তারপর আর খবর জানিনে।

—মন্ত্রদাতা গুরু ?

—এক রকম। তিনি মন্ত্র দিতেন না কাউকে। উপদেষ্টা গুরু।

—আমার বড্ড ইচ্ছে ছিল দেখতি যাই। তা বয়স বেশী হোলো, অত দূরদেশে হাঁটা কি এখন পোষায় ?

—আমাদের দেশে রেলের গাড়ী হচ্ছে শুনেচ ?

—শোনলাম। রেলগাড়ী হলি আমাদের চড়িত দেবে, না সায়েব সুবো চড়বে ?

—আমার বোধ হচ্চে সবাই চড়বে। পয়সা দিতে হবে।

—আমার দেবতা এই অশ্বথ্ তলাতেই দেখা ছান ঠাকুরমশাই। আমরা গরীব লোক, পয়সা খরচ করে যদি নাই যেতি পারি গয়া কাশী বিন্দাবন, তবে কি গরীব বলে তিনি আমাদের চরণে ঠাঁই দেবেন না ? খুব দেবেন। রূপেও তিনি সব জায়গায়, অরূপেও তিনি সব জায়গায়। এই গাছতলার ছায়াতে আমার মত গরীবির কুঁড়েতে তিনি বসে গাঁজা খান আমাদের সঙ্গে—

—অ্যাঁ।

—বললাম, মাপ করবেন ঠাকুরমশাই। বলাডা ভুল হোলো। এ সব গুহ্য কথা। তবে আপনার কাছে বললাম, অন্য লোকের কাছে বলিনে।

ভবানী হেসে চুপ করে রইলেন। যার যা মনের বিশ্বাস তা কখনো ভেঙে দিতে নেই। ভগবান যদি এদের সঙ্গে বসে গাঁজা খান বিশ্বাস হয়ে থাকে, তিনি কে তা ভেঙে দেবার। এই সব অল্পবুদ্ধি লোক আগে বিরাটকে বুঝতে চেষ্টা করে না, আগে থেকেই সেই অনন্তের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে বসে থাকে। অসীমের ধারণা না হোক, সেই বড় কল্পনাও তো একটা রস। রস উপলব্ধি করতে জানে না—আগেই ব্যগ্র হয় সেই অসীমকে সীমার গণ্ডিতে টেনে এনে তাঁকে ক্ষুদ্র করতে।

খেপী বললে—রাগ করলেন ? আপনারে জানি কি না, তাই ভয় করে।

—ভয় কি ? যে যা ভাবে, ভাববে। তাতে দোষ কি আছে। আমার সঙ্গে মতে না মিললে কি আমি ঝগড়া করবো। আমি এখন উঠি।

—কিছু ফল খেয়ে যান—

—না, এখন খাবো না। চলি—

এই সময়ে দ্বারিক কর্ম্মকার এল, হাতে একটা লাউ। বললে—লাউয়ের সুক্ত রাঁধতে হবে।

ভবানী বললেন—কি হে দ্বারিক, তুমি খাবে নাকি ?

দ্বারিক বিনীতভাবে বললে—আজ্ঞে তা কখনো খাই। ওঁর হাতে কেন, আমি নিজের মেয়ের হাতে খাই নে। ভাজনঘাটে মেয়ের শ্বশুরবাড়ী গিইচি, তা বেয়ান বললে, মুগির ডাল লাউ দিয়ে রেঁধিচি, খাবা ? আমি বললাম, না বেয়ান, মাপ করবা। নিজির হাতে রেঁধে খেলাম তাদের রান্নাঘরের দাওয়ায়।

দ্বারিক কর্ম্মকার এ অঞ্চলের মধ্যে ছিপে মাছ মারার ওস্তাদ। ভবানী বললেন—তুমি তো একজন বড় বর্শেল, মাছ ধরার গল্প করো না শুনি।

দ্বারিক পুনরায় বিনীতভাবে বললে—জামাইঠাকুর, হবো না কেন ? আজ দু' কুড়ি বছর ধরে এ দিগরের বিলি, বাঁওড়ে, নদীতি পুকুরি ছিপ বেয়ে আসচি। কেন বর্শেল হবো না

বলুন। এতকাল ধরে যদি একটা লোক একটা কাজে মন দিয়ে লেগে থাকে, তাতে সে কেন পোক্ত হয়ে ওঠবে না বলুন।

খেপী বললে—এতকাল ধরে ভগবানের পেছনে লেগে থাকলি যে তাঁরে পেতে। মাছ মেরে অমূল্য মানব জন্মো বৃথা কাটিয়ে দিলে কেন?

দ্বারিক অত্যন্ত অপ্রতিভ ও লজ্জিত হয়ে গেল একথা শুনে। এসব কথা সে কখনো ভেবে দেখে নি। আজকাল এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সে নতুন ধরনের কথা যেন সবে শুনচে। লাউটা সে নিরুৎসাহ ভাবে উঠোনের আকন্দগাছের ঝোপটার কাছে নামিয়ে রেখে দিলে। ভবানীর মমতা হোলো ওর অবস্থা দেখে। বললেন—শোন খেপী, দ্বারিকের কথা কি বলচো। আমি যে অমন গুরু পেয়েও এসে আবার গৃহী হোলাম কেন? কেউ বলতে পারে? যে যা করচে করতে দাও। তবে সেটি সে যেন ভালোভাবে সৎভাবে করে। কাউকে না ঠকিয়ে কারো মনে কষ্ট না দিয়ে। সবাই যদি শালগ্রাম হবে, বাটনা বাটবার নুড়ি কোথা থেকে আসবে তবে?

খেপী বললে—আমি মুখ্‌খুমি সহ্য করতে পারিনে মোটে। দ্বারিক যেন রাগ কোরো না। কোথায় লাউটা? সুক্তুনি একটু দেবানি, মা কালীর পেরসাদ চাকলি জাত যাবে না তোমাব।

ভবানী থাকলে সকলে একটু অস্বস্তি বোধ করে, কারণ গাঁজাটা চলে না। হাফেজ মণ্ডল এসে আড়চোখে একবার ভবানীকে চেয়ে দেখে নিলে. ভাবটা এই, জামাইঠাকুর আপদটা আবার কোথা থেকে এসে জুটলো ছাখো। একটু ধোঁয়া টোঁয়া যে টানবো, তার দফা গয়া।

খেপী বললে—ঐ দেখুন, আপদগুলো এসে জুটলো, শুধু গাঁজা খাবে—

—তুমি তো পথ দেখাও, নয়তো ওরা সাহস পায়?

—আমি খাই অবিশ্যি, ওতে মনডা একদিকে নিয়ে যাওয়া যায়।

এই সময় যেন একটু বৃষ্টি এল। ভবানী উঠতে চাইলেও ওরা উঠতে দিলে না। সবাই মিলে বড় চালাঘরে গিয়ে বসা হোলো। ভবানীর মুখে মহাভারতের শঙ্খ-লিখিতের উপাখ্যান শুনে ওরা বড় মুগ্ধ। শঙ্খ ও লিখিত দুই ভাই, দুইজনেই তপস্বী, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আশ্রম স্থাপন করে বাস করেন। ছোটভাই লিখিত একদিন দাদার আশ্রমে বেড়াতে গিয়ে দেখেন দাদা আশ্রমে নেই, কোথাও গিয়েছেন। তিনি বসে দাদার আগমনের প্রতীক্ষা করছেন, এমন সময়ে তাঁর নজরে পড়লো, একটা ফলের বৃক্ষের ঘন ডালপালার মধ্যে একটা সুপক্ব ফল ঝুলছে। মহর্ষি লিখিত সেটা তখুনি পেড়ে মুখে পুরে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে দাদা আসতেই লিখিত ফল খাওয়ার কথাটা বললেন তাঁকে। শুনে শঙ্খের মুখ শুকিয়ে গেল। সে কি কথা। তপস্বী হয়ে পরস্বাপহরণ? হোলোই বা দাদার গাছ, তাহোলেও তাঁর নিজের সম্পত্তি তো নয়, একথা ঠিক তো। না বলে পরের দ্রব্য নেওয়া মানেই চুরি করা। সে যত সামান্য জিনিসই হোক না কেন। আর তপস্বীর পক্ষে তো মহাপাপ। এ দুর্মতি কেন হোলো লিখিতের?

শঙ্কিত স্বরে লিখিত বললেন—কি হবে দাদা?

শঙ্খ পরামর্শ দিলেন রাজার নিকট গিয়ে চৌর্য্যাপরাধের বিচার প্রার্থনা করতে। তাই মাথা পেতে নিলেন লিখিত। রাজসভার সব রকমের অভ্র আহ্বান, আপ্যায়নকে তুচ্ছ করে, সভাসুদ্ধ লোকদের বিস্মিত করে লিখিত রাজার কাছে অপরাধের শাস্তি প্রার্থনা করলেন। মহারাজ অবাক। মহর্ষি লিখিতের চৌর্য্যাপরাধ? লিখিত খুলে বললেন ঘটনাটা। মহারাজ শুনে হেসে সমস্ত ব্যাপারটাকে ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। লিখিত কিন্তু অচল, অটল। তিনি বললেন—মহারাজ, আপনি জানেন না, আমার দাদা জ্ঞানী ও দ্রষ্টা। তিনি যখন আদেশ করেছেন আমাকে শাস্তি নিতে হবে তখন আপনি আমাকে দয়া করে শাস্তি দিন। লিখিতের পীড়াপীড়িতে রাজা তৎকাল-প্রচলিত বিধান অনুযায়ী তাঁর দুই হাত কেটে দিতে আদেশ দিলেন। সেই অবস্থাতেই লিখিত দাদার আশ্রমে ফিরে গেলেন—ছোট ভাইকে দেখে শঙ্খ তো কেঁদে আকুল। তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—ভাই কি কুক্ষণেই আজ তুই এসেছিলি আমার এখানে! কেনই বা লোভের বশবর্ত্তী হয়ে তুচ্ছ একটা পেয়ারা পেড়ে খেতে গিয়েছিলি!

ঠিক সেই সময়ে সূর্য্যদেব অস্তচূড়াবলম্বী হোলেন। সায়ং-সন্ধ্যার সময় সমুপস্থিত। শঙ্খ বললেন—চল ভাই, সন্ধ্যাবন্দনা করি।

লিখিত অসহায়ভাবে বললেন—দাদা, আমার যে হাত নেই!

শঙ্খ বললেন—সত্যাশ্রয়ী তুমি, ভুল করে একটা কাজ করে ফেলেছিলে, তার শাস্তিও নিয়েচ। তোমার হাতে যদি সূর্য্যদেব আজ অঞ্জলি না পান, তবে সত্য বলে, ধর্ম্ম বলে আর কিছু সংসারে থাকবে? চলো তুমি।

নর্ম্মদার জলে অঞ্জলি দেবার সময়ে লিখিতের কাটা হাত আবার নতুন হয়ে গেল। দুই ভাই গলা ধরাধরি করে বাড়ী ফিরলেন। পথঘাট তিমিরে আবৃত হয়ে এসেচে। শঙ্খ হেসে সস্নেহে বললেন—লিখিত, কাল সকালে কত পেয়ারা খেতে পারিস দেখা যাবে!

দ্বারিক কর্ম্মকার বললে—বাঃ বাঃ—

হাফেজ মণ্ডল বলে উঠলো—আহা হা, আহা!

খেপী পেছন থেকে ফুঁপিয়ে কেঁদেই উঠলো।

প্রাচীন ভারতবর্ষের হোমধূমাচ্ছন্ন আশ্রমপদ যেন মূর্ত্তিমান হয়ে ওঠে এই পল্লীপ্রান্তে। মহাতপস্বী সে ভারতবর্ষ, সত্যের জন্যে তার যে অটুট কাঠিন্য, ধর্ম্মের জন্যে তার যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন।—সকলেই যেন জিনিসটা স্পষ্ট বুঝতে পারলে। রক্তাপ্লুত-দেহ, ঊর্দ্ধবাহু লিখিত ঋষি চলেচেন 'দাদা' 'দাদা' বলে ডাকতে ডাকতে বনের মধ্যে দিয়ে রাজসভা থেকে দাদার আশ্রমে।

সেদিনই একখানা কাস্তে বাঁধানোর জন্যে একটা খদ্দেরকে চার আনা ঠকিয়েছে—দ্বারিক কর্ম্মকারের মনে পড়ে গেল।

হাফেজ মণ্ডলের মনে পড়লো গত বুধবারে সন্দেবেলা সে কুড়নরাম নিকিরির ঝাড় থেকে দু'খানা তলদা বাঁশ না বলে কেটে নিয়েছিল ছিপ করবার জন্যে। সে প্রায়ই এমন নেয়।

আর নেওয়া হবে না ওরকম। আহা হা, কি সব লোকই ছিল সেকালে! জামাইঠাকুরের মুখে শুনতে কি ভালোই লাগে!

খেপী ছুটো কলা আর একটা শসার টুকরো ভবানী বাঁড়ুয্যের সামনে নিয়ে এসে রেখে বললে—একটু সেবা করুন। ভবানী খেতে খেতে বলছিলেন—ভগবানের শাসন হোলো মায়ের শাসন। অন্যের ভুল ত্রুটি সহ্য করা চলে, কিন্তু নিজের সন্তানেরও সব আবদার সহ্য করে না মা। তেমনি ভগবানও। ছেলেকে কেউ নিন্দে করবে, এ তাঁর সহ্য হয় না। ভক্ত আপনার জন তাঁর, তাকে শাসন করেন বেশি। এ শাসন প্রেমের নিদান। তাকে নিখুঁত করে গড়তেই হবে তাঁকে। যে বুঝতে পারে, তার চোখের সামনে ভগবানের রুদ্র রূপের মধ্যে তাঁর স্নেহমাখা প্রেমভরা প্রসন্ন দক্ষিণ মুখখানি সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে ফেরবার পথে দেখলেন নিস্তারিণী একা পথ দিয়ে ওদের বাড়ীর দিকে ফিরচে। ওঁকে দেখে সে রাস্তার ধারের একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। রাত হয়ে গিয়েচে। এত রাত্রে কোথা থেকে ফিরচে নিস্তারিণী? হয়তো তিলুর কাছে গিয়েছিল। অন্য কোথাও বড় একটা সে যায় না।

এ সব ভবিষ্যতের মেয়ে, অনাগত ভবিষ্যৎ দিনের আগমনী এদের অলক্তরাগরক্ত চরণ-ধ্বনিতে বেজে উঠচে, কেউ কেউ শুনতে পায়। আজ গ্রাম্য সমাজের পুঞ্জীকৃত অন্ধকারে এই সব সাহসিকা তরুণীর দল অপাংক্তেয়—প্রত্যেক চণ্ডীমণ্ডপে গ্রাম্য বৃদ্ধদের মধ্যে ওদের বিরুদ্ধে ঘোঁট চলচে, জটলা চলচে, কিন্তু ওরাই আবাহন করে আনচে সেই অনাগত দিনটিকে।

দূর পশ্চিমাঞ্চলের কথাও মনে পড়লো। এ রকম সাহসী মেয়ে কত দেখেচেন সেখানে, ব্রজধামে, বিঠুরে, বাল্মীকি-তপোবনে। সেখানে কেলিকদম্বের চিরহরিৎ পল্লবদলের সঙ্গে মিশে আছে যেন পীতাভ নিম্বপত্রের বর্ণ-মাধুরী, গাঢ় নীল কণ্টকক্রমযুক্ত লাল রংয়ের ফুলে ফুলে ঢাকা নিবিড় অতিমুক্ত-লতাঝোপের তলে ময়ূরেরা দল বেঁধে নৃত্য করচে, কালিন্দীর জলরাশিতে গাছের ছায়ায় ঘাগরাপরা সুঠামদেহা তরুণী ব্রজরমণীর দল জলকেলি-নিরতা। মেয়েরা উঠবে কবে বাংলাদেশের? নিস্তারিণীর মত শক্তিমতী কন্যা, বধূ কবে জন্মাবে বাংলার ঘরে ঘরে?

তিলু বললে রাত্রে—হ্যাগো, নিস্তারিণী আবার যে গোলমাল বাধালে?

—কি?

—ও আবার কার সঙ্গে যেন কি রকম বাধাচ্চে—

—গোবিন্দ?

—উঁহু। সে সব নয়, ওর সঙ্গে দেখা করতি আসে মাঝে মাঝে, ওর বাপের বাড়ীর লোক।

—কিছু হবে না, ভয় নেই। বললে কে এসব কথা ?

—ওই বলছিল। সন্দের অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত বসে নিলু আর আমার সঙ্গে সেই সব গল্প করছিল। খোলামেলা সবই বলে, ঢাক-ঢাক নেই। আমার ভালো লাগে। তবে আগে ছিল ছিল, এখন বয়েস হচ্চে। আমি বকিচি আজ।

—না, বেশি বোকো না। যে যা বোঝে করুক।

—আবার কি জানেন, বড্ড ভালোবাসে আপনাকে—

—আমাকে ?

—অবাক হয়ে গেলেন যে! পুরুষ জাতকে বিশ্বাস নেই। কখন কোন্ দিকে চলেন আপনারা। শুনুন, আপনার ওপর সত্যিই ওর খুব ছেদ্দা। ও বলে, দিদি, আপনার মত স্বামী পাওয়া কত ভাগ্যির কথা। যদি বলি বুড়ো, তবে যা চটে যায়। বলে, কোথায় বুড়ো ? উনি বুড়ো বই কি। ঠাকুরজামাইয়ের মত লোক যুবোদের মধ্যি ক'টা বেরোয় আগাও না ?...এই সব বলে—হি হি—ওর আপনার ওপর সোহাগ হোলো নাকি ? আপনাকে দেখতিই আসে এ বাড়ী।

—ছিঃ, ওকথা বলতে নেই, আমার মেয়ের বয়সী না ?

—সে তো আমরাও আপনার মেয়ের বয়সী। তাতে কি ? ওর কিন্তু ঠিক—আপনার ওপর—

—যাক সে। শোনো, খোকা কোথায় ?

—এই খানিকটা আগে খেয়ে এল। শুয়ে পড়েচে। কি বই পড়ছিল। আমাকে কেবল বলছিল, মা আমি বাবার সঙ্গে খেতি বসবো। আমি বললাম আপনার ফিরতি অনেক রাত হবে। জায়গা করি ?

—করো—কিন্তু সন্দে আহ্নিকটা একবার করে নেবো। তিলুকে ডাকো—

নীলমণি সমাদ্দার পড়ে গিয়েচেন বিপদে। সংসার অচল হয়ে পড়েচে। তিন আনা দর উঠে গিয়েচে এক কাঠা চালের। তাঁর একজন বড় মুরুব্বি ছিলেন দেওয়ান রাজারাম। রাজারামের খুন হয়ে যাওয়ার পরে নীলমণি বড় বেকায়দায় পড়ে গিয়েচেন। রাজারামদাদা লোক বড় ভালো ছিল না, কূটবুদ্ধি, সাহেবের তাঁবেদার। তাই করতে গিয়েই মারাও পড়লো। আজকাল একথা সবাই জানে এ অঞ্চলে, শাম বাগ্দীর মেয়ে কুসুমকে তিনি বড়-সাহেবের হাতে সমর্পণ করতে গিয়েছিলেন রাতে চুপিচুপি ওকে ভুলিয়ে-টুলিয়ে ধাপ্পা-ধুপ্পি দিয়ে। কুসুমকে তার বাবা ওঁর বাড়ী রেখে যায় তার চরিত্র শোধরাবার জন্যে। বড়সাহেব কিন্তু কুসুমকে ফেরত দিয়েছিল, ঘরে ঢুকতেও দ্যায় নি। রাজারামকে বলেছিল—এখন সময় অন্যরকম, প্রজাদের মধ্যে গোলমাল দেখা দিয়েচে, এখন কোনো কিছু ছুতো পেলে তারা চটে যাবে, গবর্নমেণ্ট চটে যাবে, নতুন ম্যাজিস্ট্রেটটা নীলকর সাহেবদের ভালো চোখে দেখে না, একে নিয়ে চলে যাও। কে আনতে বলেছিল একে ?

রাজারাম চলে আসেন। কুসুম কিন্তু সে কথা তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে প্রকাশ করে দেয়—সেজন্যে বাগ্‌দী ও দুলে প্রজারা ভয়ানক চটে যায় দেওয়ান রাজারামের ওপর। রাজারাম যে বাগ্‌দিদের দলের হাতেই প্রাণ দিলেন, এও তার একটা প্রধান কারণ।

গ্রামে কোনো কথা চাপা থাকে না। এসব কথা এখন সকলেই জানে বা শুনেচে। নীলমণি সমাদ্দার শুনেচেন কানসোনার বাগ্‌দিরা এ অঞ্চলে ওদের সমাজের প্রধান। তারাই একজোট হয়ে সেই রাত্রে রাজারামকে খুন করে। বড়সাহেব যে কুসুমকে গ্রহণ না করে ফেরত দিয়েছিল, একথাও সবাই জেনেছিল সে সময়। সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণও করেছিল সেজন্যে বড়সাহেব। যাক সে সব কথা। এখন কথা হচ্চে, নীলমণি সমাদ্দার করেন কি? স্ত্রী আন্নাকালী দুবেলা খোঁচাচ্চেন,—চাল নেই ঘরে। কাল ভাত হবে না, যা হয় করো, আমি কথা বলে খালাস।

দুপুরের পর নীলমণি সমাদ্দার সেই কানসোনা গ্রামেই গেলেন। সেই অনেকদিন আগে কুঠির দাঙ্গায় নিহত রামু বাগদির বাড়ী। রামু বাগদির ছেলে হারু পাটের দড়ি পাকাচ্ছিল কাঁটালতলায় বসে। আজকাল হারুর অবস্থা ভালো, বাড়ীতে দুটো ধানের গোলা, একগাদা বিচুলি।

হারু উঠে এসে নীলমণি সমাদ্দারকে অভ্যর্থনা করলে। নীলমণি যেন অকূলে কূল পেলেন হারুকে পেয়ে। বললেন—বাবা হারু, একটু তামাক খাওয়া দিকি।

হারু তামাক সেজে নিয়ে এসে কলার পাতায় কল্কে বসিয়ে খেতে দিলে। বললে—ইদিকি কনে এয়েলেন।

ততক্ষণে নীলমণি সমাদ্দার মনে মনে একটা মতলব ঠাউরে ফেলেচেন। বললেন—তোমার কাছেই।

—কি দরকার?

—কাল রাত্তিরি একটা খারাপ স্বপ্ন দ্যাখলাম তোর ছেলেডার বিষয়ে, নারায়ণ বাড়ী আছে? তাকে ডাক দে।

একটু পরে নারাণ সর্দ্দার এল থেলো হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে। এই নারাণ সর্দ্দারই রাজারাম রায়কে খুন করবার প্রধান পাণ্ডা ছিল সেবার।

দেখতে দুর্দ্ধর্ষ চেহারা, যেমনি জোয়ান, তেমনি লম্বা। এ গ্রামের মোড়ল।

নীলমণি বললেন—এসো নারায়ণ। একটি খারাপ স্বপ্ন দেখে তোমাদের কাছে এ্যালাম। তোমাদের আপন বলে ভাবি, পর বলে তো কখনো ভাবি নি। স্বপ্নটা হারুর ছেলে বাদলের সম্বন্ধে। যেন দ্যাখলাম—

এই পর্য্যন্ত বলেই যেন হঠাৎ থেমে গেলেন।

হারু ও নারাণ সমস্বরে উদ্বেগের সুরে বললেন—কি দ্যাখলেন!

—সে আর শুনে দরকার নেই। আজ আবার অমাবস্যে শুক্কুরবার। ওরে বাবা! বলেচে, তদৰ্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি। সব্বনাশ। সে চলবে না।

নারাণই গ্রামের সর্দ্দার, গ্রামের মধ্যে বুদ্ধিমান বলে গণ্য। সে এগিয়ে এসে বললে, তাহলি এর বিহিত কি খুড়োমশাই ?

নীলমণি মাথা নেড়ে বললেন—আরে সেইজন্তি তো আসা। তোমরা তো পর নও। নিতান্ত আপন বলে ভেবে এ্যালাম চেরডা কাল! আজ কি তার ব্যত্যয় হবে? না বাবা। তেমনি ক্বাপে আমার জন্মো ছায় নি—

এই পর্য্যন্ত বলেই নীলমণি সমাদ্দার আবার চুপ করলেন। নারাণ সর্দ্দার স্বাধ্যপক্ষেই বলতে পারতো যে এর মধ্যেই বাপের জন্ম দেওয়ার কথা কেন এসে পড়লো অবান্তর ভাবে—কিন্তু সে সব কিছু না বলে সে উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললে—তাহলি এখন এর বিহিত কত্তি হবে আপনারে। মোদের কথা বাদ ছান, মোরা চকিও দেখিনে, কানেও শুনিনে। যা হয় কর আপনি।

নীলমণি বললেন—কিন্তু বড্ড গুরুতর ব্যাপার। ষড়ঙ্গ মাতৃসাধন করতি হবে কি না। আজ কি বার? রও। শুক্কুর, শনি, রবিবারে হোলো দ্বিতীয়ে। শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ে। ঠিক হয়ে গিয়েচে—দাঁড়াও ভেবে দেখি—

নীলমণির মুখখানা যেন এক জটিল সমস্তার সমাধানে চিন্তাকুল হয়ে পড়লো। তাঁকে নিরুপদ্রব চিন্তার অবকাশ দেওয়ার জন্তে দুজনে চুপ করে রইল, মামা ও ভাগ্নে।

অল্পক্ষণ পরে নীলমণির মুখ উজ্জ্বল দেখালো। বললেন—হয়েচে। যাবে কোথায়?

—কি খুড়োমশাই ?

—কিছু বলবো না। খোকার কপালে ঠেকিয়ে দুটো মাসকলাই আমারে দাও দিকি!

হারু দৌড়ে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে দুটি মাসকলাইয়ের দানা নিয়ে এসে নীলমণির হাতে দিল। সে-দুটি হাতে নিয়ে নীলমণি প্রস্থানোদ্যত হলেন! হারু ও নারাণ ডেকে বললে—সে কি! চললেন যে?

—এখন যাই। বুধবার অষ্টোত্তরী দশা। ষড়ঙ্গ হোম করতি হবে এই মাসকলাই দিয়ে। নিঃশ্বেস ফ্যালবার সময় নেই।

—খুড়োমশাই, দাঁড়ান। দু'কাঠা সোনামুগ নিয়ে যাবেন না বাড়ীর জন্যি?

—সময় নেই বাবা। এখন হবে না! কাল সকালে আগে মাদুলি নিয়ে আসি, তারপর অন্য কথা।

পথে নেমে নীলমণি সমাদ্দার হন হন করে পথ চলতে লাগলেন। মাছ গেঁথে ফেলেচেন, এই করেই তিনি সংসার চালিয়ে এসেচেন। আজ এ গাঁয়ে, কাল ও গাঁয়ে। তবে সব জলে ডাল সমান গলে না। গাঁয়ের ধারের রাস্তায় দেখলেন তাঁদের গ্রামের ক্ষেত্র ঘোষ এক ঝুড়ি বেগুন মাথায় নিয়ে বেগুনের ক্ষেত থেকে ফিরচে। রাস্তাতে তাঁকে পেয়ে ক্ষেত্র বেগুনের বোঝা নামিয়ে গামছা ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে বললে—বড্ড খরশোগের উপদ্রব হয়েছে—বেগুনে জালি যদি পড়েচে তবে আখো আর নেই। দু'বিঘে জমিতে মোটে এই দশ গণ্ডা বেগুন। এ রকম হলি কি করে চলে। একটা কিছু করে ছান দিনি—আপনাদের কাছে যাবো ভেবেলাম।

নীলমণি বললেন—তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। একটা হত্তুকি নিয়ে আমার বাড়ী যাবা আজ রাত্তির ছু'দণ্ডর সময়। আজ অমাবস্তে, ভালই হোলো।

—বেশ যাবানি। হ্যাদে, ছুটো বেগুন নিয়ে যাবা ?

—তুমি যখন যাবা, তখন নিয়ে যেও। বেগুন আর আমি বইতি পারবো না।

বাড়ীর ভেতরে ঢুকবার আগে কাদের গলার শব্দ পেলেন বাড়ীর মধ্যে। কে কথা বলে ? উঁহু, বাড়ীর মধ্যে কেউ তো যাবে না।

বাড়ী ঢুকতেই ওঁর পুত্রবধূ ছুটে এল দোরের কাছে। বললে—বাবা—

—কি ? বাড়ীতি কারা কথা বলচে বৌমা ?

—চুপ, চুপ। সরোজিনী পিসি এসেচে ভাঁড়ারকোলা থেকে তার জামাই আর মেয়ে নিয়ে! সঙ্গে ছুটো ছোট নাতনী। মা বলে দিলেন চাল বাড়ন্ত। যা হয় করুন।

—আচ্ছা, বলগে সব ঠিক হয়ে যাচ্চে। ওদের একটু জলপান দেওয়া হয়েচে ?

—কি দিয়ে জলপান দেওয়া হবে ? কি আছে ঘরে ?

—তাই তো। আচ্ছা, দেখি আমি।

নীলমণি সমাদ্দার বাড়ীর বাইরের আমতলায় এসে অধীর ভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। কি করা যায় এখন। সরোজিনীরও (তাঁর মাসতুতো বোন) কি আর আসবার সময় ছিল না! আর আসার দরকারই বা কি রে বাপু ? ছুটো হাত বেরুবে! যত সব আপদ। কখনো একবার উদ্দেশ নেয় না একটা লোক পাঠিয়ে—আজ মায়া একেবারে উথলে উঠলো।

একটু পরেই ক্ষেত্র ঘোষ এসে হাজির হোলো। তার হাতে গণ্ডা পাঁচেক বেগুন দড়িতে ঝোলানো, একছড়া পাকা কলা আর একঘটি খেজুরের গুড়। তাঁর হাতে সেগুলো দিয়ে ক্ষেত্র বললে—মোর নিজির গাছের গুড়। বড় ছেলে জ্বাল দিয়ে তৈরী করেচে। সেবা করবেন। আর সেই ছুটো হত্তুকি। বলেলেন আনতি। তাও এনিচি।

—তা তো হোলো, আপাতোক ক্ষেত্তোর, কাঠাছুই চাল বড্ড দরকার যে। বাড়ীতি কুটুম্ব এসে পড়েচেন অথচ আমার ছেলে বাড়ী নেই, কাল আসবার সময় চাল কিনে আনবে ছ'মন কথা আছে। এখন কি করি ?

—তার আর কি ? মুই এখুনি এনে দিচ্চি।

চালের ব্যবস্থা হয়ে গেল। ক্ষেত্র ঘোষ চাষী গৃহস্থ, তার সংসারে কোনো জিনিসের অভাব নেই। তখুনি সে ছু'কাঠা চাল নিয়ে এসে পৌছে দিলে ও নীলমণি সমাদ্দারের হাতে হত্তুকি ছুটোও দিলে। নীলমণি হত্তুকি নিয়ে ও চাল নিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেন। বাইরে আসতে আধঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। ফিরে এসে সেই হত্তুকি ছুটো ক্ষেত্র ঘোষের হাতে দিয়ে বললেন—যাও, এই হত্তুকি ছুটো বেগুন ক্ষেতের পূবদিকের বেড়ার গায়ে কালো সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে দেবা। ব্যস! মন্তর দিয়ে শোধন করে দেলাম। খরগোশের বাবা আসবে না।

পরদিন সকালে কানসোনা গেলেন। একটি পুরোনো মাদুলি পুত্রবধূ খুঁজে-পেতে কোথা থেকে দিয়েচে, উনি সেটা জিউলি গাছের আঠা আর ধুলো দিয়ে ভর্তি করে নিয়েচেন। একটু সিঁদুর চেয়ে নিয়েচেন বাড়ী থেকে। পথে একটা বেলগাছ থেকে বেলপাতা পেড়ে সিঁদুর মাখালেন বেশ করে।

হারু ও নারাণ উদ্বিগ্নভাবে তাঁরই অপেক্ষায় আছে। হারুর তো রাত্রে ভালো ঘুম হয় নি বললে।

নারাণ সর্দার বললে—তবু তো বাড়ীর মধ্যি বলতি বারণ করেলাম। মেয়েমানুষ সব, কেঁদে কেটে অনথ বাধাবে।

নীলমণি সমাদ্দার সিঁদুর মাখানো বেলপাতা আর মাদুলি ওর হাতে দিয়ে বললেন—তুমি গিয়ে হোলে খোকার দাদু। তুমি গিয়ে তার গলায় মাদুলি পরিয়ে দেবা আর এই বেলপাতা ছেঁচে রস খাইয়ে দেবা। কাল সারারাত জেগে বড়ঙ্গ হোম করি নি? বলি, না, ঘুম অনেক ঘুমোবো। হারু আমার ছেলের মত। তার উপকারডা আগে করি। বড্ড শক্ত কাজ বাবা। এখন নিয়ে যাও, যমে ছোঁবে না। আমার নিজেরও একটা দুর্ভাবনা গেল। বাবাঃ—

এরপর কি হোলো, তা অনুমান করা শক্ত নয়। হারুর কৃষাণ গুপে বাগ্‌দি এক ধামা আউশ চাল আর দু'কাঠা সোনা মুগ মাথায় করে বয়ে দিয়ে এল নীলমণি সমাদ্দারের বাড়ী।

নীলমণির সংসার এই রকমেই চলে।

গয়ামেম সকালে সামনের উঠোনে ঘুঁটে দিচ্ছিল, এমন সময়ে দূরে প্রসন্ন আমীনকে আসতে দেখে গোবরের ঝুড়ি ফেলে কাপড় ঠিকঠাক করে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। প্রসন্ন চক্কত্তি কাছে এসে বললে, কি হচ্চে? বলে দিইচি না, এসব কোরো না গয়া। আমার দেখলি কষ্ট হয়। রাজরাণী কি না আজ ঘুঁটেকুড়ুনি!

গয়া হেসে বললে—যা চিরডা কাল করতি হবে, তা যত সত্বর আরম্ভ হয়, ততই ভালো।

—আহা! আজ তোমার মাও যদি থাকতো বেঁচে। হটাৎ মারা গেল কিনা। মরবার বয়েস আজও তা'বলে হইনি ওর।

—সবই অদেষ্ট খুড়োমশাই। তা নলি—

গয়ামেম বিষণ্ণ মুখে মাটির দিকে চেয়ে রইল।

প্রসন্ন চক্কত্তি ঘরটার দিকে চেয়ে দেখলে। দুখানা খড়ের ঘর, একখানাতে সাবেক আমলে রান্না হতো—হুঁশিয়ার বরদা বাগ্‌দিনী মেয়ের কুঠিতে খুব পসার প্রতিপত্তির অবসরে রান্নাঘরখানাকে বড় ঘরে দাঁড় করায়—কাঁঠাল কাঠের দরজা, চৌকাঠ, জানালা বসিয়ে। এইখানাতেই এখন গয়ামেম বাস করে মনে হোলো, কারণ জানালা দিয়ে তক্তপোশের ওপর বিছানা দেখা যাচ্চে। কিন্তু অন্য ঘরখানার অবস্থা খুব খারাপ, চালের খড় উড়ে গিয়েচে, ইঁদুরে মাটি তুলে ভাঁই করেচে দাওয়ায়, গোবর দিয়ে নিকোনো হয় নি। দেওয়ালে ফাটল ধরেচে।

প্রসন্ন চক্কত্তি বললে—ঘরখানার এ আবস্থা কি করে হোলো?

—কি অবস্থা ?

—পড়ে যায় যায় হয়েচে।

—গেল, গেল। একা নোক আমি, ক'খানা ঘরে থাকবো ?

প্রসন্ন চক্কত্তি কতকটা যেন আপন মনেই বললে—সায়েব টায়েব কি জানো, ওরা হাজার হোক ভিন্‌দেশের—আমাদের সুখদুক্‌খু ওরা কি বা বোঝবে ? তোমারও ভুল, কেন কিছু চাইলে না সেই সময়ডা ? তুমি তো সব সময় শিওরে বসে থাকতে—কিছু হাত করে নিতি হয়।

গয়ামেম চুপ করে রইল, বোধ হোলো ওর চোখের জল চিক চিক করচে।

প্রসন্ন চক্কত্তি ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বললে—নাঃ, তোমার মত নির্বোধ মেয়ে গয়া, আজকালকারের দিনি—ঝাঁটা মারো: —একথা বলবার, এবং এত ঝাঁঝের সঙ্গে বলবার হেতুও হচ্চে গয়ামেমের ওপর প্রসন্ন চক্কত্তির আন্তরিক দম। গয়ার চেয়ে সেটুকু কেউ বেশি বোঝে না, চুপ করে থাকা ছাড়া তার আর কি করবার ছিল ?

এমন সময়ে ভগীরথ বাগ্‌দীর মা কোথা থেকে উঠোনে পা দিয়ে বললে—আমীনবাবু না ? এসো বোসো। আপনার কথা আমি সব শোনলাম দাঁড়িয়ে। ঠিক কথা বলেচ। গয়ারে ছ'বেলা বলি, বড়সায়েব তো তোরে মেম বানিয়ে দিয়ে গেল, সবাই বললে গয়ামেম—মেমের মতো সম্পত্তি কি দিয়ে গেল তোরে ? মা'ডা মরে গেল, ঘরে দ্বিতীয় মানুষ নেই—হাতে একটা কানাকড়ি নেই, কুঠির সেই জমিটুকু ভরসা। আর বছর দুটো ধান হয়েচে, তবে এখন খেয়ে বাঁচছ, নয়তো উপোস করতি হোতো না আজ ? ইদিকি বাগ্‌দিদের সমাজে তুই অচল। তোরে নিয়ে কেউ খাবে না। তুই এখন যাবি কোথায় ? ছেলেবেলায় কোলেপিঠে করিচি তোদের, কষ্ট হয়। মা নেই আর তোরে বলবে কে ? সে মাগী শুদ্দ মনের দুঃখি মরে গেল। আমারে বলতো, দিদি, মেয়েডার যদি একটু জ্ঞানগম্যি থাকতো, তবে মোদের ঘরে আজ ও তো রাজরাণী। তা না শুধু হাতে ফিরে আলেন নীলকুঠি থেকে—

গয়া যুগপৎ খোঁচা খেয়ে একটু মরীয়া হয়েও উঠলো। বললে, আমি খাই না খাই তাতে তোমাদের কি ? বেশ করিচি আমি, যা ভালো বুঝিচি করিচি—

ভগীরথের মা মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে উদ্যত হোলো, যাবার সময়ে বললে—মনডা পোড়ে, তাই বলি ! তুই হলি চেরকালের একগুঁয়ে আপদ, তোরে আর আমি জানি নে ? যখন সায়েবের ঘরে জাত খোয়ালি সেই সঙ্গে একটা ব্যবস্থাও করে নে। ওর মা কি সোজা কান্না কেঁদেচে এই একটা বছর। তোর হাতের জল পজ্জন্ত কেউ খাবে না পাড়ায়, তুই অসুখ হয়ে পড়ে থাকলে একঘটি জল তোরে কেডা দেবে এগিয়ে ? আপনি বিবেচনা করে ছাখো আমীনবাবু—নীলকুঠি তো হয়ে গেল অপর লোকের, সায়েবতো পটল তুললো, এখন তোর উপায় ?

প্রসন্ন চক্কত্তি বললে—জমিটুকু বাই করে দিইছিলাম, তবুও মাথা রক্ষে। নয়তো আজ

দাঁড়াবার জায়গা থাকতো না। তাও তো ভাগ দিয়ে পাঁচ বিঘে জমির ধান মোটে পাবে।

ভগীরথের মা বললে—ভাগের ধান আদায় করাও হ্যাংনামা কম বাবু? সে ওর কাজ? ও যে মেমসায়েব কিনা? ফাঁকি দিয়ে নিলি মেয়েমানুষ তুই কি করবি শুনি?

ভগীরথের মা চলে গেল। গয়ামেম প্রসন্ন চক্কত্তির দিকে তাকিয়ে বললে—খুড়োমশাই কি ঝগড়া করতি এ্যালেন? বসবেন, না, যাবেন?

—না ঝগড়া করবো কেন? মনডা বড্ড কেমন করে তোমাকে দেখে, তাই আসি—

গয়ামেম সাবেক দিনের মত হাসতে লাগলো মুখে কাপড় দিয়ে। প্রসন্ন চক্কত্তি দেখলে ওর আগের সে চেহারা আর নেই—সে নিটোল সৌন্দর্য্য নেই, দুঃখে কষ্টে অন্যরকম হয়ে গিয়েচে যেন। তবুও জমিটা সে দিতে পেরেছিল সে নিজের হাতে মেপে, মস্ত বড় একটা কাজ হয়েচে। নইলে গয়ামেম না খেয়ে মরতো আজ।

প্রসন্ন চক্কত্তি বসলো গয়ার দেওয়া বেদে-চেটায়ে অর্থাৎ খেজুর পাতার তৈরী চেটায়।

—কি খাবেন?

—সে আবার কি?

—কেন খুড়োমশাই, ছোট জাত বলে দিতি পারি নি খেতি? কলা আছে, পেঁপে আছে—কেটেও দেবো না। আপনি কেটে নেবেন। সকাল বেলা আমার বাড়ী এসে শুধু মুখে যাবেন?

সত্যিই গয়া দুটো বড় বড় পাকা কলা, একটা আস্ত পেঁপে, আধখানা নারকোল নিয়ে এসে রাখলে প্রসন্ন আমীনের সামনে। হেসে বললে—জলডা আর দিতি পারবো না খুড়োমশাই।

তারপরে ঘরের দিকে যেতে উদ্যত হয়ে বললে—দাঁড়ান, আর একটা জিনিস দেখাই—

—কি?

—আনচি, বসুন।

খানিক পরে ঘর থেকে একখানা ছোট ছাপানো বই হাতে নিয়ে এসে প্রসন্ন আমীনের সামনে দিয়ে বললে—দেখুন। দাঁড়ান, ও কি? একখানা দা নিয়ে আসি, বেশ করে ধুয়ে দিচ্চি। ফল খান।

—শোনো শোনো। এ বই কোথায় পেলে? তোমার ঘরে বই? কি বই এখানা?

—দেখুন। আমি কি লেখাপড়া জানি?

—সেই কবিরাজ বুড়ো দিয়েচে বুঝি? পড়তে জানো না, বই দিলে কেন?

—দেলে, নিয়ে এ্যালাম। কৃষ্ণের শতনাম।

প্রসন্ন আমীন বিস্মিত হয়ে গেল দস্তুরমত। গয়ামেমের বাড়ী ছাপানো বই, তাও কিনা কৃষ্ণের শতনাম। ··নাঃ

বসে বসে ফলগুলো সে খেলে দা দিয়ে কেটে। আধখানা পেঁপে গয়ার জন্যে রেখে দিলে। হেসে বললে—এখানডায় আসতি ভালো লাগে। তোমার কাছে এলি সব দুক্‌খু ভুলে যাই, গয়া।

—ওই সব বাজে কথা· আবার বকতি শুরু করলেন। আসবেন তো আসবেন।

আমি কি আসত্তি বারণ করিচি?

—তাই বলো। প্রাণডা ঠাণ্ডা হোক!

—ভালো। হলেই ভালো।

—কৃষ্ণের শতনাম বই কি করবে?

—মাথার কাছে রেখে শুই। বাড়িতি কেউ নেই। মা থাকলি কথা ছিল না। ভূতপ্রেত অপদেবতার ভয় কেটে যায়। একা থাকি ঘরে।

—তা ঠিক।

—ইদিকি পাড়াশুদ্দু শত্তুর। কুঠির সায়েব বেঁচে থাকতি সবাই খোশামোদ করতো, এখন রাত বিরাতে ডাকলি কেউ আসবে না, তাই ঐ বইখানা দিয়েচেন বাবা, কাছে রেখে শুলি ভয়ভীত থাকবে না বলি দিয়েচেন। বড্ড ভালো লোক।··আজ ধান ভানতি না গেলি খাওয়া হবে না, চাল নেই। তাও কেউ ঢেঁকি দেয় না এ পাড়ায়। ওপাড়ায় কেনারাম সর্দ্দারের বাড়ী যাব ধান ভানতি। তারা ভালো। জাতে বুনো বটে, কিন্তু তাদের মধ্যি মানুষেতো আছে খুড়োমশাই।

প্রসন্ন চক্কত্তি সেদিন উঠে এল একটু বেশি বেলায়। তার মনে বড় কষ্ট হয়েছে গয়াকে দেখে। একটা মাদার গাছতলায় বসলো খানিকক্ষণ গণেশপুরের মাঠে। গণেশপুর হোলো গয়ামেমদের গ্রামের নাম, শুধুই বাগ্‌দী আর ক'ঘর জেলে ছাড়া এ গ্রামে অন্য জাতের বাসিন্দা কেউ নেই। রোদ বড্ড চড়েচে। তবু বেশ ছায়া গাছটার তলায়।

প্রসন্ন ভাবলে বসে বসে—গয়া বড্ড বেকায়দায় পড়ে গিয়েচে। আজ যদি আমার হাতে পয়সা থাকতো, তবে ওরে অমনধারা থাকতি দেতাম? যেদিকি চোখ যায় বেরোতাম দুজনে। সে সাহস আর করতি পারিনে, বয়েসও হয়েচে, ঘরে ভাত নেই।

গাছটায় মাদার পেকেচে নাকি?···

প্রসন্ন মুখ উঁচু করে তাকিয়ে দেখলে। না, পাকে নি।

বিকেলের দিকে ভবানী ভাগবত পাঠ করে উঠলেন। তিনি জানেন, ভাগবত অতি দুরূহ ও দুরাবগাহ গ্রন্থ। যেমন এর চমৎকার কবিত্ব, তেমনি অপূর্ব্ব এর তত্ত্ব। অনেকক্ষণ ভাগবত পাঠ করে পুঁথি বাঁধবার সময় দেখলেন ওপাড়ার নিস্তারিণী এসে উঠানে পা দিলে। নিস্তারিণী আজকাল ভবানীর সঙ্গে কথা বলে। অবশ্য এই বাড়ীর মধ্যেই, বাইরে কোথাও নয়।

নিস্তারিণী কাছে এসে বললে—ও ঠাকুরজামাই?

—এস বৌমা। ভালো?

—যেমন আশীর্ব্বাদ করেচেন। একটা কথা বলতে এইলাম।

—কি বলো?

—বুড়ো কবিরাজমশাইয়ের বাড়ী ধর্ম্ম-কথা হয়, গান হয় আমি যেতি পারি? আমার বড্ড ইচ্ছে করে।

—না বৌমা। সে হোলো গাঁয়ের বাইরে মাঠে। সেখানে কেউ যায় না।

—আচ্ছা, দিদি গেলি ?

—তোমার দিদি যায় না তো।

—যদি আমি তার ব্যবস্থা করি ?

—সেখানে গিয়ে তুমি কি করবে ?

—আমার ভালো লাগে। ছুটো ভালো কথা কেউ বলে না এ গাঁয়ে। তবুও একটু গান হয়, ভালো বই পড়া হয়, আমার বড্ড ভালো লাগে।

—তোমার শ্বশুরবাড়ীতে শাশুড়ি কি তোমার স্বামীর মত নিয়েচ ?

—উনি মত দেবেন। মা মত দেন কি না দেন। বুড়ী বড় খাণ্ডার। না দিলে তো বয়েই গেল, আমি যাবো ঠিক।

—ছিঃ, ওই তো তোমার দোষ বৌমা। অমন করতে নেই।

—আপনার মুখে শাস্তর পাঠ শুনবার বড্ড ইচ্ছে আমার।

পরে একটু অভিমানের সুরে বললে—তা তো আপনি চান না, সে আমি জানি।

—কি জানো ?

—আপনি পছন্দ করেন না যে আমি সেখানে যাই।

—সে কথা আবার কি করে তুমি জানলে ?

—আমি জানি।

—আচ্ছা, তোমার দিদি যদি কখনো যায় তবে যেও।

—যা মন যায়, তা করা কি খারাপ ?

প্রশ্নটি বড় অদ্ভুত লাগলো ভবানীর। বললেন—তোমার বয়েস হয়েচে বৌমা, খুব ছেলেমানুষ নও, তুমিই বোঝো—যা ভাবা যায়, তা কি করা উচিত ? খারাপ কাজও তো করতে পারো।

—পাপ হয় ?

—হয়।

—তবে আর করবো না, আপনি যখন বলচেন, তখন সেটাই ঠিক।

—তুমি বুদ্ধিমতী, আমি কী তোমাকে বলবো।

—আপনি যা বলবেন, আমার কাছে তাই খুব বড ঠাকুরজামাই। আমি অন্ধ পথে পা দিতি দিতি চলে এ্যালাম শুধু দিদির আর আপনার পরামর্শে। আপনি যা বলবেন, আমার দুঃখু হলিও তাই করতি হবে, সুখ হলিও তাই করতি হবে। আমার গুরু আপনি।

—আমি কারো গুরুফুরু নই বৌমা। ওসব বাজে কথা।

—আপনি দো-ভাজা চিঁড়ে খাবেন নারকোল কোরা দিয়ে ? কাল এনে দেবো। নতুন চিঁড়ে কুটিচি।

—এনো বৌমা।

এই সময়ে খোকা খেলা করে বাড়ী ফিরে এল। মাকে বললে,—মা নদীতে যাবে না?

ওর মা বললে—তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

—কপাটি খেলছিলাম হাবুদের বাড়ী। চলো যাই। আমি ছুটে এলাম সেই জন্তি। এসে ইংরিজি পড়বো। পড়তি শিখে গিইচি।

প্রায়ই সন্ধ্যার আগে ভবানী দুই স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে নদীর ঘাটে যান। সকলেই সাঁতার দেয়, গা-হাত-পা ধোয়। তারপর ভগবানের উপাসনা করে। খোকা এই নদীতে গিয়ে স্নান ও উপাসনা এত ভালোবাসে, যে প্রতি বিকেলে মাদের ও বাবাকে ও-ই নিয়ে যায় তাগাদা দিয়ে। আজও সে গেল ওঁদের নিয়ে, উপরন্তু গেল নিস্তারিণী। সে নাছোড়বান্দা হয়ে পড়লো, তাকে নিয়ে যেতেই হবে।

ভবানী নিয়ে যেতে চান না বাইরের কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে, তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। ভগবানের উপাসনা এক হয় নিভৃতে, নতুবা হয় সমধর্মী মানুষদের সঙ্গে। তিলু বিশেষ করে তাঁকে অনুরোধ করলে নিস্তারিণীর জন্যে।

সকলে স্নান শেষ করলে। শেষ সূর্য্যের রাঙা আলো পড়েচে ওপারের কাশবনে, সাঁইবাবলা ঝোপের মাথায়, জলচর পক্ষীরা ডানায় রক্ত-সূর্য্যের শেষ আলোর আবির মাখিয়ে পশ্চিমদিকের কোনো বিল-বাঁওড়ের দিকে চলেচে—সম্ভবতঃ নাকাশিপাড়ার নিচে সামটার বিলের উদ্দেশে।

ভবানী বললেন—বৌমা, এদের দেখাদেখি হাত জোড় করো—তারপর মনে মনে বা মুখে বলো—কিংবা শুধু শুনে যাও—

ওঁ যো দেবা অগ্নৌ যো অপ্‌সু, যো বিশ্বং ভুবনং আবিবেশ।
যঃ ওষধিষু যো বনস্পতিষু, তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যিনি অগ্নিতে, যিনি জলেতে
যিনি শোভনীয় ক্ষিতিতলেতে
যিনি তৃণতরু ফুলফলেতে
তাঁহারে নমস্কার।
যিনি অন্তরে যিনি বাহিরে
যিনি যে দিকে যখন চাহিরে
তাঁহারে নমস্কার।

খোকাও তার মা বাবার সঙ্গে সুললিত কণ্ঠে এই মন্ত্রটি গাইলে।

তারপর ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—খোকা, এই পৃথিবী কে সৃষ্টি করেচে?

খোকা নামতার অঙ্ক মুখস্থ বলবার সুরে বললে—ভগবান।

—তিনি কোথায় থাকেন?

—সব জায়গায়, বাবা।

—আকাশেও?

—সব জায়গায়।

—কথা বলেন ?

—হ্যাঁ বাবা।

—তোমার সঙ্গেও বলবেন ?

—হ্যাঁ বাবা। আমি চাইলে, তিনিও চান। আমা ছাড়া নন তিনি।

এসব কথা অবিশ্যি ভবানীই শিখিয়েচেন ছেলেকে।

ছেলেকে বিশেষ কোনো বিত্ত তিনি দিয়ে যেতে পারবেন না। তাঁর বয়েস হয়েচে, এই ছেলেকে নাবালক রেখেই তাঁকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে মহাপ্রস্থানের পথে। কি জিনিস তিনি দিয়ে যাবেন একে—আজকার অবোধ বালক তার উত্তরজীবনের জ্ঞানবুদ্ধির আলোকে একদিন পিতৃদত্ত যে সম্পদকে মহামূল্য বলে ভাবতে শিখবে, চিনতে শিখবে, বুঝতে শিখবে ?

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। ঈশ্বরের প্রতি গভীর অনুরাগ।

এর চেয়ে অন্য কোনো বেশি মূল্যবান সম্পদের কথা তাঁর জানা নেই।

খুব বেশি বুদ্ধির প্যাঁচের দরকার হয় না, সহজ পথে সহজ হয়েই সেই সহজের কাছে পৌঁছানো যায়। দিনের পর দিন এই ইছামতীর তীরে বসে এই সত্যই তিনি উপলব্ধি করেচেন। সন্ধ্যায় ওই কাশবনে, সাঁইবাবলার ডালপালায় রাঙা ঝোপটি ম্লান হয়ে যেতো, প্রথম তারাটি দেখা দিত তাঁর মাথার ওপরকার আকাশে, ঘুঘু ডাকতো দূরের বাঁশবনে, বনসিমফুলের সুগন্ধ ভেসে আসতো বাতাসে—তখনই এই নদীতটে বসে কতদিন তিনি আনন্দ ও অনুভূতির পথ দিয়ে এসে তাঁর মনের গহন গভীরে প্রবেশ করতে দেখেছিলেন এই সত্যকে—এই চির পুরাতন অথচ চির নবীন সত্যকে। বুঝেচেন এই সত্যটি যে, ভগবানের আসল তত্ত্ব শুধু স্বরূপে সীমাবদ্ধ নয়, স্বরূপ ও লীলাবিলাস দুটো মিলিয়ে ভগবৎতত্ত্ব। কোনোটা ছেড়ে কোনোটা পূর্ণ নয়। এই শিশু, এই নদীতীর সেই তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত জিনিস। সে থেকে পৃথক নয়—সেই মহা-একের অংশ মাত্র।

নিস্তারিণী খুব মুগ্ধ হোলো। তার মধ্যে জিনিস আছে। কিন্তু গৃহস্থ ঘরের বৌ, শুধু রাঁধা-খাওয়া, ঘর সংসার নিয়েই আছে। কোনো একটু ভালো কথা কখনো শোনে না। এমন ধরনের ব্যাপার সে কখনো দেখে নি। তিলুকে বললে—দিদি, আমি আসতে পারি ?

—কেন পারবি নে ?

—ঠাকুরজামাই আসতে দেবেন ?

—না, তোকে মারবে এখন।

—আমার বড্ড ভালো লাগলো আজ। কে এসব কথা এখেনে শোনাবে দিদি ? আমার অদৃষ্টে শুধু ঝ্যাঁটা আর লাথি। শুধু শাশুড়ির গালাগাল দু'বেলা। তাও কি পেট ভরে দুটো খেতি পাই ? হ্যাঁ পাপ করিচি, স্বীকার করচি। তখন বুদ্ধি ছিল না। যা করিচি, তার জন্যি ভগবানের কাছে বলি, আমারে আপনি যা শাস্তি হয় দেবেন।

—থাক, ওসব কথা। তুই রোজ আসবি যখন ভালো লাগবে।

—ঠাকুরজামাই দেবতার তুল্য মানুষ। এ দিগরে অমন মানুষ নেই। আমার বড্ড সৌভাগ্যি যে তোমাদের সঙ্গ প্যালাম। ঠাকুরজামাইকে একদিন নেমতন্ন করে খাওয়াতি বড্ড ইচ্ছে করে।

—তা খাওয়াবি, ওর আর কি ?

—আমার যে বাড়ী সে রকম না। জানোই তো সব। লুকিয়ে লুকিয়ে একটু তরকারি নিয়ে আসি—কেউ জানতি পারে না। জানলি কত কথা উঠবে।

—আমাকে কি নিলুকে সেই সঙ্গে নেমতন্ন করিস, কোনো কথা উঠবে না।

ওরা ঘাটের ওপরে উঠেচে, এমন সময়ে দেখা গেল সেই পথ বেয়ে রামকানাই কবিরাজ এদিকে আসচে। রামকানাই ভিন্ গাঁ থেকে রোগী দেখে ফিরচেন, খালি পা, হাঁটু অবধি ধুলো, হাতে একটা জড়িবুটি-ওষুধের পুঁটুলি। তিলু পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে, দেখাদেখি নিস্তারিণীও করলে। রামকানাই সঙ্কুচিত হয়ে বললে—ওকি, ওকি দিদি ? ও সব কোরো না। আমার বড্ড লজ্জা করে। চলো সবাই আমার কুঁড়েতে। আজ যখন বাঁড়ুয্যে মশাইকে পেইচি তখন সন্দেটা কাটবে ভালো।

রামকানাই চক্রবর্ত্তী থাকেন চরপাড়ায়, এই গ্রামের উত্তর দিকের বড় মাঠ পার হোলেই চরপাড়ার মাঠ। তিলু নিস্তারিণীকে বললে—তুই ফিরে যা বাড়ী—আমরা যাচ্চি চরপাড়ার মাঠে—

—আমিও যাবো।

—তোর বাড়ীতি কেউ বকবে না ?

—বকলে তো বয়েই গেল। আমি যাবো ঠিক।

—চলো। ফিরতি কিন্তু অনেক রাত হবে বলে দিচ্চি।

—তোমাদের সঙ্গে গেলি কেউ কিছু বলবে না। বললিও আমার তাতে কলা। ও সব মানিনে আমি।

অগত্যা ওকে সঙ্গে নিতেই হোলো। রামকানাইয়ের বাড়ী পৌঁছে সবাই মাদুর পেতে বসলো। রামকানাই রেড়ির তেলের দোতালা পিদিম জ্বাললেন। তারপর হাত পা ধুয়ে এসে বসে সন্ধ্যাহ্নিক করলেন। ওদের বললেন—একটু কিছু খেতি হবে—কিছুই নেই, ছুটো চালভাজা। মা লক্ষ্মীরা মেখে নেবে না আমি দেবো ?

সামান্ত জলযোগ শেষ হোলে রামকানাই নিজে চৈতন্যচরিতামৃত পড়লেন এক অধ্যায়। গীতাপাঠ করলেন ভবানী। একখানা হাতের লেখা পুঁথি জলচৌকির ওপর সযত্নে রক্ষিত দেখে ভবানী বললেন—ওটা কিসের পুঁথি ? ভাগবৎ ?

—না, ওখানা মাধব-নিদান। আমার গুরুদেবের নিজের হাতে নকলকরা পুঁথি। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রডা যে জানতি চায়, তাকে মাধব-নিদান আগে পড়তি হবে। বিজয় রক্ষিত কৃত টীকা সমেত পুঁথি ওখানা। বিজয় রক্ষিতের টীকা দুষ্প্রাপ্য। আমার ছাত্র নিমাইকে

পড়াই। সে ক'দিন আসচে না, জর হয়েচে।

পুঁথিখানা রামকানাই ভবানীর সামনে মেলে ধরলেন। মুক্তোর মত হাতের লেখা পঞ্চাশ ষাট বছর আগেকার তুলট কাগজের পাতায় এখনো যেন জলজল করচে। পুঁথির শেষের দিকে সেকেলে শ্যামাসঙ্গীত। এগুলি বোধ হয় গুরুদেব ৺মহানন্দ কবিরাজ স্বয়ং লিখেছিলেন। ভবানীর অনুরোধে তা থেকে একটা গান গাইলেন রামকানাই খুব খারাপ গলায়—

ন্যাংটা মেয়ের এত আদর জটে ব্যাটা তো বাড়ালে
নইলে কি আর এত করে ডেকে মরি জয় কালী বলে।

তারপর ভবানীও গাইলেন একখানা কবি দাশরথি রায়ের বিখ্যাত গান :—

শ্রীচরণে ভার একবার গা তোলো হে অনন্ত।

রামকানাই কবিরাজের বড় ভালো লাগলো গান শুনে। চোখ বুজে বললেন—আহা কি অনুপ্রাস! উঠে বার ভুবন জীবন, এ পাপ জীবনের জীবনান্ত, আহা হা!

উৎসাহ পেয়ে ভবানী বাঁড়ুয্যে তিলুকে দিয়ে আর একখানা গান গাওয়ালেন দাশরথি রায় কবির :—

'ধনি আমি কেবল নিদানে'

তিলুর গলা মন্দ নয়। রামকানাই কবিরাজ বললেন—আজ্ঞে চমৎকার লিখচে দাশরথি রায়। কোথায় বাড়ী এঁর? না, এমন অনুপ্রাস, এমন ভাষা কখনো শুনিনি—বাঃ বাঃ

ওহে ব্রজাঙ্গনা কি কর কৌতুক
আমারি সৃষ্টি করা চতুর্মুখ—
হরি বৈদ্য আমি হরিবারে দুখ,
ভ্রমণ করি ভুবনে।

আমাকে লিখে দেবেন গানটা? ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা না থাকলে এমন লেখা যায় না—আহা হা!

ভবানী বললেন—বাড়ী বর্দ্ধমানের কাছে কোথায়। ও বছর পাঁচালী গাইতে এসেছিলেন উলোতে বাবুদের বাড়ী। এ গান আমি সেখানে শুনি। খোকার মাকে আমি শিখিয়েচি।

আর দু একখানা গানের পর আসর ভেঙে দিয়ে সকলে জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে পাঁচপোতা গ্রামের দিকে রওনা হোলো। চরপাড়ার বড় মাঠটা জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়েচে, খালের জল চকচক করচে চাঁদের নিচে। ভবানী বাঁড়ুয্যে খালটা দেখিয়ে বললেন—ওই ছাখো তিলু, তোমার দাদা যখন নীলকুঠির দেওয়ান তখন এই খালের বাঁধাল নিয়ে দাঙ্গা হয়, তাতে মানুষ খুন করে নীলকুঠির লেঠেলরা। সেই নিয়ে খুব হাঙ্গামা হয় সেবার।

হঠাৎ একটা লোককে মাঠের মধ্যে দিয়ে জোরে হেঁটে আসতে দেখে নিস্তারিণী বলে উঠলো—ও দিদি, কে আসচে ছাখো—

ভবানী বললেন—বড্ড নির্জ্জন জায়গাটা। দাঁড়াও সবাই একটু—

লোকটার হাতে একখানা লাঠি। সে ওদের দিকে তাক ক'রেই আসচে, এটা বেশ বোঝা

গেল। সকলেরই ভয় হয়েচে তখন লোকটার গতিক দেখে। খুব কাছে এসে পড়েচে সে তখন, নিস্তারিণী বলে উঠলো—ও দিদি, খোকার হাত ধরো—ঠাকুরজামাই, এগোবেন না—

লোকটা ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো। পরক্ষণেই ওদের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখেই বিস্ময় ও আনন্দের সুরে বলে উঠলো—একি! দিদিমণি? ঠাকুরমশায় যে! এই যে খোকা…

তিলুও ততক্ষণে লোকটাকে চিনেচে। বলে উঠলো—হলা দাদা? তুমি কোত্থেকে?

হলা পেকে কি যেন একটা ভাব গোপন করে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে। ইতস্ততঃ করে বললে—ওই যাতিছেলাম চরপাড়ায়—মোর—এই—তো। দাঁড়ান সবাই। পায়ের ধুলো খান একটুখানি।

হলা পেকের কিন্তু সে চেহারা নেই। মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েচে কিছু কিছু, আগের তুলনায় বুড়ো হয়ে পড়েচে। তিলু বললে—এতকাল কোথায় ছিলে হলা দাদা? কতকাল দেখিনি!

হলা পেকে বললে—সরকারের জেলে।

—আবার জেলে কেন?

—হবিবপুরের বিশ্বাসদের বাড়ী ডাকাতি হয়েল, ফাঁড়ির দারোগা মোরে আর অঘোর মুচিকে ধরে নিয়ে গেল, বলেল তোমরা করেচ।

—করনি তুমি সে ডাকাতি? কর নি?

হলা পেকে চুপ ক'রে রইল। তিলু ছাড়বার পাত্রী নয়, বললে—তুমি নির্দ্দোষী?

—না। করেলাম।

—অঘোর দাদা কোথায়?

—জেলে মরে গিয়েচে।

—একটা কথা বলবো?

—কি?

—আজ কি মনে করে লাঠি হাতে আমাদের দিকি আসছিলে এই মাঠের মধ্যি? ঠিক কথা বলো? যদি আমরা না হোতাম?

হলা পেকে নিরুত্তর।

তিলু মোলায়েম সুরে বললে—হলা দাদা—

—কি দিদি?

—চলো আমাদের বাড়ী। এসো আমাদের সঙ্গে।

হলা পেকে যেন ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে বললে—না, এখন আর যাবো না দিদি। তোমার পায়ের ধুলোর যুগ্যি নই মুই। মরে গেলি মনে রাখবা তো দাদা বলে?

খোকার কাছে এসে বললে—এই যে, ওমা, এসো আমার খোকা ঠাকুর, আমার চাঁদের ঠাকুর, আমার সোনার ঠাকুর, কত বড়ডা হয়েচে? আর যে চেনা যায় না। বেঁচে

থাকো, আহা, বেঁচে থাকো—লেকাপড়া শেখো বাবার মত—

খোকাকে আবেগভরে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করলে হলা পেকে। তারপর আর কোনো কিছু না বলে কারো দিকে না তাকিয়ে মাঠের দিকে হন্ হন্ করে যেতে যেতে জ্যোৎস্নার মধ্যে মিলিয়ে গেল। খোকা বিস্ময়ের সুরে বললে—ও কে বাবা? আমি তো দেখি নি কখনো। আমার আদর করলে কেন?

নিস্তারিণীর বুক তখনো যেন ঢিপ ঢিপ করছিল। সে বুঝতে পেরেচে ব্যাপারটা। সবাই বুঝতে পেরেচে।

নিস্তারিণী বললে—বাবাঃ, যদি আমরা না হতাম। জনপ্রাণী নেই, মাঠের মধ্যি—

সকলে আবার রওনা হোলো বাড়ীর দিকে। কাঠঠোকরা ডাকচে আম-জামের বনে। বনমরচের ঘন ঝোপে জোনাকি জ্বলচে। বড় শিমুল গাছটায় বাদুড়ের দল ডানা ঝটপট করচে। দু' চারটে নক্ষত্র এখানে ওখানে দেখা যাচ্চে জ্যোৎস্নাভরা আকাশে। ভবানী বাঁড়ুয্যে ভাবছিলেন আর একটা কথা। এই হলা পেকে খারাপ লোক, খুন রাহাজানি করে বেড়ায়, কিন্তু এর মধ্যেও সেই তিনি! এ কোন্ হলা পেকে? এরা খারাপ? নিস্তারিণী খারাপ? এদের বিচার কে করবে? কার আছে সে বিচারের অধিকার? এক মহারহস্যময় মহাচৈতন্যময় শক্তি সবার অলক্ষ্যে,সবার অজ্ঞাতসারে সকলকে চালনা করে নিয়ে চলেচেন। কিলিয়ে কাঁটাল পাকান না তিনি। যার যেটা সহজ স্বাভাবিক পথ, সেই পথেই তাকে অসীম দয়ার চালনা করে নিয়ে যাবেন সেই পরম কারুণিক মাতৃরূপা মহাশক্তি! এই হলা পেকে, এই নিস্তারিণী, কাউকে তিনি অবহেলা করবেন না। সবাইকে তাঁর দরকার।

জন্মজন্মান্তরের অনন্ত পথহীন পথে অ'ত নীচ পাপীরও হাত ধরে অসীম ধৈর্য্যে, অসীম মমতায় তি'ন স্থির লক্ষ্যে পৌঁছে দেবেন। তাঁর এই ছেলের প্রতি যে মমতা, তেমনি সেই মহাশক্তির মমতা সমুদয় জীবকুলের প্রতি। কি চমৎকার নির্ভরতার ভাব সেই মুহূর্ত্তে ভবানী বাঁড়ুয্যে মনের মধ্যে খুঁজে পেলেন সেই মহাশক্তির ওপর। কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। মাভৈঃ। স্তনন্ধয়ানাং স্তনদুগ্ধপানে, মধুব্রতানাং মকরন্দপানে—নেই কি তিনি সর্ব্বত্র? নেই কোথায়?

দেওয়ান হরকালী সুর লালমোহন পালের গদিতে বসে নীলকুঠির চাষ-কাজের হিসেব দিচ্ছিলেন। বেলা দুপুর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে। লালমোহন পাল বললেন, খাস খামারের হিসেবটা ওবেলা দেখলে হবে না দেওয়ানমশাই? বড্ড বেলা হোলো। আপনি খাবেন কোথায়?

—কুঠিতে।

—কে রাঁধবে?

—আমাদের নরহরি পেস্কার। বেশ রাঁধে।

কথায় কথায় লালমোহন পাল বলেন,—ভালো কথা, আমার স্ত্রী আর ভগ্নী একদিন কুঠি

দেখতে চাচ্চে, ওরা ওর ভেতর কখনো দেখে নি।

—যাবেন, কালই যাবেন। আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্চি। কিসি যাবেন?

—গরুর গাড়ীতি।

—কেন, কুঠির পাল্কী আছে তাই পাঠাবো এখন।

আজ দু'বছর হোলো বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানী সাড়ে এগারো হাজার টাকায় তাদের কর্ম্মকর্ত্তা ইনিস্ সাহেবের মধ্যস্থতায় মোল্লাহাটির কুঠি লালমোহন পাল ও সতীশ সাধুখাঁর কাছে বিক্রি করে ফেলেচে। শিপ্‌টনের মৃত্যুর পরে ইনিস সায়েব এই দু'বছর কুঠি চালিয়েছিল, শেষে ইনিস্ সাহেবই রিপোর্ট করে দিলে এ কুঠি রাখা আর লাভজনক নয়। নীলকুঠির খাস জমি দেড়শো বিঘেতে আজকাল চাষ হয় এবং কুঠির প্রাঙ্গণের প্রায় তেরো বিঘে জমিতে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা প্রভৃতির চারা লাগানো হয়েচে। অর্থাৎ কৃষিকার্য্যই হচ্চে আজকাল প্রধান কাজ নীলকুঠির। চাষটা বজায় আছে এই পর্য্যন্ত। দেওয়ান হরকালী সুর এবং নরহরি পেস্কার এই দুজন মাত্র আছেন পুরনো কর্ম্মচারীদের মধ্যে, সব কাজকর্ম্ম দেখাশুনো করেন। প্রসন্ন চক্কত্তি আমীন এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীর জবাব হয়ে গিয়েচে। নীলকুঠির বড় বড় বাংলা ঘর ক'খানার সবগুলিই আসবাবপত্র সমেত এখনো বজায় আছে। না রেখে উপায় নেই—ইণ্ডিগো কোম্পানী এগুলি সুদ্ধ বিক্রি করেচে এবং দামও ধরে নিয়েচে। অবিশ্যি জলের দামে বিক্রি হয়েচে সন্দেহ নেই। এ অজ পল্লীগ্রামে অত বড় কুঠিবাড়ী ও শৌখীন আসবাবপত্রের ক্রেতা কে? গাড়ী করে বয়ে অন্যত্র নিয়ে যাবার খরচও কম নয়, তার হাঙ্গামাও যথেষ্ট। ইণ্ডিগো কোম্পানীর অবস্থা এদিকে টলমল, যা পাওয়া গেল তাই লাভ। ইনিস্ সাহেব কেবল যাবার সময় দুটো বড় আলমারি কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল।

দেওয়ান হরকালী সুর বাড়ী এসে বুঝিয়েছিলেন—খাস জমি আছে দেড়শো বিঘে, একশো বিয়াল্লিশ বিঘে ন' কাটা সাত ছটাক, ঐ দেড়শো বিঘেই ধরুন। ওটবন্দি জমা বন্দোবস্ত নেওয়া আছে সত্তর বিঘে। তা ছাড়া নওয়াদার বিল ইজারা নেওয়া হয়েছিল ম্যাকনিল্ সায়েবের আমলে নাটোর রাজাদের কাছ থেকে। মোটা জলকর। চোখ বুজে কুঠি কিনে নিন পাল মশায়, নীলকুঠি হিসেবে নয়, জমিদারি হিসেবে কিনে নিন, জমিদারি আমি দেখাশুনা করবো, আরও দু'একটি পুরনো কর্ম্মচারী আপনাকে বজায় রাখতে হবে, আমরাই সব চালাবো, আপনি লাভের কড়ি আমাদের কাছ থেকে বুঝে নেবেন।

লালমোহন পাল বলেছিল—কুঠিবাড়ী আসবাবপত্তর সমেত?

—বিলকুল।

—যান, নেবো।

এইভাবে কুঠি কেনা হয়। কেনার সময় ইনিস্ সাহেব একটু গোলমাল বাধিয়েছিল, ঘোড়ার গাড়ী দু'খানা ও দু'জোড়া ঘোড়া দেবে না। এ নিয়ে লালমোহন পালের দিক থেকে আপত্তি ওঠে, অবশেষে আর সামান্য কিছু বেশি দিতে হয়। কুঠি কেনার পরে রায়গঞ্জের

গোসাঁইবাবুদের কাছে গাড়ী ঘোড়াগুলো প্রায় হাজার টাকায় বিক্রি করে ফেলা হয়। খাসজমি ও জলকর ভালোভাবে দেখাশুনো করলে যে মোটা মুনাফা থাকবে, এটা দেওয়ান হরকালী বুঝেছিলেন। সামান্য জমিতে নীলের চাষও হয়।

কুঠি কেনার পরে তুলসী একদিন বলেছিল—দেওয়ানমশাইকে বলো না গো, সায়েবের ঘোড়ার টমটম গাড়ী আমাদের পাঠিয়ে দেবেন, একদিন চড়বো।

লালমোহন বলেছিল—না বড় বৌ। বড়সাহেব ঐ টম্‌টমে চড়ে বেড়াতো, তখন আমরা মোট মাথায় ছুটে পালাতাম ধানের ক্ষেতি। সেই টম্‌টমে তুমি চড়লি লোকে বলবে কি জানো? বলবে ট্যাকা হয়েচে কিনা, তাই বড্ড অংখার হয়েচে! আমারেও একদিন দেওয়ান বলেছিলেন—টম্‌টম্ পাঠিয়ে দেবো কুঠিতি আসবেন। আমি হাতজোড় করে বললাম—মাপ করবেন। ও সব নবাবী করুক গিয়ে বাবুভেয়েরা। আমরা ব্যবসাদার জাত, ওসব করলি ব্যবসা ছিকেয় উঠবে।

অবশেষে একদিন একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ীতে লালমোহনের বড় মেয়ে সরস্বতী, তার মা তুলসী, বোন ময়না ছেলেপিলে নিয়ে কুঠি দেখতে গেল। দেওয়ান হরকালী, প্রসন্ন আমীন ও নরহরি পেস্কার এদের এগিয়ে নিয়ে এসে সব দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালো। সবাই নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলো—

—ও দেওয়ান কাকা, এ ঘরটা কি?

—এখানে সায়েবরা বসে খেতো, মা।

—এত বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন কেন?

—এখানে ওদের নাচের সময় আলো জ্বলতো।

—এটা কি?

—ওটা কাঁচের মগ, সাহেবরা জল খেতো। এই ভাখো এরে বলে ডিক্যাণ্টার, মদ খেতো ওরা।

তুলসী ছেলেমেয়েদের ডেকে বললে—ছুঁসনে ওসব। ওদিকি যাস্ নে, সন্দে বেলা নাইতি হবে—ইদিকি সরে আয়।

কুঠির অনেক চাকর-বাকর জবাব হয়ে গিয়েচে, সামান্য কিছু পাইক-পেয়াদা আছে এই মাত্র। লাঠিয়ালের দল বহু দিন আগে অন্তর্হিত। ওদিকের বাগানগুলো লতাজঙ্গলে নিবিড় ও দুষ্প্রবেশ্য। দিনমানেও সাপের ভয়ে কেউ ঢোকে না। সেদিন একটা গোখুরো সাপ মারা পড়েছিল কুঠির পশ্চিম দিকের হাতার ঘন ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে।

পুরনো চাকর-বাকরদের মধ্যে আছে কেবল কুঠির বহু পুরানো রাঁধুনি ঠাকুর বংশীবদন মুখুয্যে—দেওয়ানজি ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর ভাত রাঁধে।

ময়নার মেয়ে শিবি বললে—ও দাদু, ও দেওয়ানদাদু, সায়েবদের নাকি নাইবার ঘর ছিল? আমি দেখবো—

তখন দেওয়ান হরকালী সুর নিজে সঙ্গে করে ওদের সকলকে নিয়ে গেলেন বড় গোসলখানায়। সেখানে একটা বড় টব দেখে তো সকলে অবাক। ময়নার মেয়ের ইচ্ছে ছিল এই টবে সে একবার নেমে দেখবে কি করে সাহেবরা নাইতো—মুখ ফুটে কথাটা সে বলতে পারলে না। অনেকক্ষণ ধরে ওরা আসবাবপত্তর দেখলে, হাতে করে নাড়লে, টিপে টিপে দেখলে।

সায়েবরা এত জিনিস নিয়ে কি করতো?

বেলা পড়লে ওরা যখন চলে এসে গাড়ীতে উঠলো, কুঠির কর্ম্মচারীরা সসম্ভ্রমে গাড়ী পর্য্যন্ত এসে ওদের এগিয়ে দিয়ে গেল।

রাত্রে খেটে খুটে এসে লালমোহন পাল পশ্চিম দিকের চার-চালা বড় ঘরের কাঁঠাল কাঠের তক্তাপোশে শুয়েচে, তুলসী ডিবেভর্ত্তি পান এনে শিয়রের বালিশের কাছে রেখে দিয়ে বললে—কুঠি দেখে এ্যালাম আজ।

লালমোহন পাল একটু অন্যমনস্ক, আড়াইশো ছালা গাছতামাকের বায়না করা হয়েছিল ভাজনঘাট মোকামে, মালটা এখনো এসে পৌঁছোয় নি, একটু ভাবনায় পড়েচে সে। তুলসী উত্তর না পেয়ে বল্লে—কি ভাবচো?

—কিছু না।

—ব্যবসার কথা ঠিক।

—ধরো তাই।

—আজ কুঠি দেখতি গিয়েছিলাম, দেখে এ্যালাম।

—কি দেখলে?

—বাবাঃ, সে কত কি! তুমি দেখেচ গা?

—আমি? আমার বলে মরবার ফুর্সৎ নেই, আমি যাবো কুঠির জিনিস দেখতি! পাগল আছো বড় বৌ, আমরা হচ্ছি ব্যবসাদার লোক, শখ শৌখীনতা আমাদের জন্যি না। এই ত্যাখো, ভাজনঘাটের তামাক আসি নি, ভাবচি।

—হ্যাঁগা, আমার একটা সাধ রাখবা?

তুলসী ন' বছরের মেয়ের মত আব্দারের সুরে কথাটা শেষ করে হাসিহাসি মুখে স্বামীর কাছে এগিয়ে এল।

লালমোহন পাল বিরক্তির সুরে বললে—কি?

অভিমানের সুরে তুলসী বলে—রাগ করলে গা? তবে বলবো নি।

—বলোই না ছাই!

—না।

—লক্ষি দিদি আমার, বলো বলো—

—ওমা আমার কি হবে! তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকেচে, ও আবার কি কথা! অমন বলতি আছে? ব্যবসা করে টাকা আনতিই শিখেচো, ভদ্দরলোকের কথাও শেখো নি,

ভদ্দরলোকের রীতনীত কিছুই জানো না। ইস্ত্রিকে আবার দিদি বলে কেডা?

লালমোহন বড় অপ্রতিভ হয়ে গেল। সে সত্যি অন্যমনস্ক ছিল, বললে—কি করতি হবে বলো বড় বৌ—

—জরিমানা দিতি হবে—

—কত?

—আমার একটা সাধ আছে, মেটাতি হবে। মেটাবে বলো?

—কি?

—শীত আসচে সামনে, গাঁয়ের সব গরীব দুঃখী লোকদের একখানা করে রেজাই দেবো আর বামুনঠাকুরদের সবাইকে জোনাজাৎ একখানা করে বনাত দেবো। কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন।

—গরীবদের রেজাই দেওয়া হবে কিন্তু বামুনরা তোমার দান নেবে না। আমাদের গাঁয়ের ঠাকুরদের চেন না? বেশ। আমি আগে দেখি একটা ইষ্টিমিট করে। কত খরচ লাগবে। কলকাতা থেকে মাল আনাতি লোক পাঠাতি হবে তার পরে।

—আর একটা কথা—

—কি?

—এক বুড়ো বামুনের চাকরী ছাড়িয়ে দিয়েচে দেওয়ানমশাই, কুঠি থেকে। তার নাম প্রসন্ন চক্কত্তি। বলেচেন, তোমার আর কোনো দরকার নেই।

—এসে ধরেচে বুঝি তোমায়? এ তোমার অন্যায় বড় বৌ। কুঠির কাজ আমি কি বুঝি? কাজ নেই তাই জবাব হয়ে গিয়েচে। কাজ না থাকলি বসে বসে মাইনে গুনতি হবে?

—হ্যাঁ হবে। এ বয়সে তিনি এখন যাবেন কোথায় জিগ্যেস করি? কেডা চাকরী দেবে?

নালু পাল বিরক্তির সুরে বললে—মেয়েমানুষ তুমি, এ সবের মধ্যি থাকো কেন? তুমি কি বোঝো কাজের বিষয়? টাকাটা ছেলের হাতের মোয়া পেয়েচ, না? বললিই হোলো। কেন তোমার কাছে সে আসে জিগ্যেস করি? বিটলে বামুন?

তুলসী ধীর সুরে বললে—ছাখো। একটা কথা বলি। অমন যা তা কথা মুখে এনো না। আজ দুটো টাকা হয়েচে বলে অতটা বাড়িও না।

লালমোহন পাল বললে—কি আর বাড়ালাম আমি? আমি তোমাকে বললাম, নীলকুঠির কাজ আমি কি বুঝি। দেওয়ান যা করেন, যার ওপর তোমার আমার কথা বলা তো উচিত নয়। তুমি মেয়েমানুষ, কি বোঝো এ সবের? কাজের দস্তুর এই।

—বেশ, কাজ তুমি ছাও আর না ছাও গিয়ে—যা তা বলতি নেই লোককে। ওতে লোকে ভাবে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েচে আজ তাই বড্ড অংখার। ছিঃ—

তুলসী রাগ করে অপ্রসন্নমুখে উঠে চলে গেল।

এ হোলো বছর দুই আগের কথা। তারপর প্রসন্ন চক্কত্তি আমীন কোথায় চলে গেল

এতকালের কাছারী ছেড়ে। উপায়ও ছিল না। হরকালী সুর কর্ম্মচারী ছাঁটাই করেছিলেন জমিদারের ব্যয় সঙ্কোচ করবার জন্যে। কে কোথায় ছড়িয়ে পড়লো তার ঠিক ছিল না। ভজা মুচি সহিস ও বেয়ারা শ্রীরাম মুচি চাকরী গেলে চাষবাস করতো। ও বছর শ্রাবণ মাসে মোল্লা-হাটির হাট থেকে ফেরবার পথে অন্ধকারে ওকে সাপে কামড়ায়, তাতেই সে মারা যায়।

নীলকুঠির বড়সাহেবের বাংলোর সামনে আজকাল লালমোহন পালের ধানের খামার। খাস জমি দেড়শো বিঘের ধান সেখানে পৌষ মাসে ঝাড়া হয়, বিচালির আঁটি গাদাবন্দি হয়, যে বড় বারান্দাতে সাহেবরা ছোট হাজরি খেতো সেখানে ধান-ঝাড়াই কৃষাণ এবং জন-মজুরেরা বসে দা-কাটা তামাক খায় আর বলাবলি করে—সুমুন্দির সায়েবগুলো এই ঠানটায় বসে কত মুরগির গোস্ত ধুনেছে আর ইঞ্জিরি বলেচে! ইদিকি কোনো লোকের ঢোকবার হুকুম ছেলো না—আর আজ সেখানডাতে বসে ওই ছাখো রজবালি দাদ চুলকোচ্চে!...

বিকেলবেলা খোকাকে নিয়ে ভবানী বাঁড়ুয্যে গেলেন রামকানাই কবিরাজের ঘরে।

খোকা তাঁকে ছাড়তে চায় না, যেখানে তিনি যাবেন, যাবে তাঁর সঙ্গে। বড় বড় বাবলা আর শিমুল গাছের সারি, শ্যামলতার ঝোপ, বাদুড় আর ভাম হুটপাট করচে জঙ্গলের অন্ধকারে। উইদের ঢিপিতে জোনাকী জ্বলচে, ঠিক যেন একটা মানুষ বসে আছে বাঁশবনের তলায়। খোকা একবার ভয় পেয়ে বললে—ওটা কি বাবা?

চরপাড়া মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে রামকানাই কবিরাজের মাটির ঘর। দোতলা মাটির প্রদীপে আলো জ্বলচে। ওদের দেখে রামকানাই কবিরাজ খুশি হোলেন। খোকার কেমন বড় ভালো লাগে কবিরাজ বুড়োর এই মাটির ঘর। এখানে কি যেন মোহ মাখানো আছে, ওই দোতলা মাটির পিদিমের স্নিগ্ধ আলোয় ঘরখানা বিচিত্র দেখায়। বেশ-নিকনো-পুঁছানো মাটির মেজে। কাছেই বাগ্দি পাড়া, বাগ্দিদের একটি গরীব মেয়ে বিনিপয়সায় ঘর নিকিয়ে দিয়ে যায়, তাকে শক্ত রোগ থেকে রামকানাই বাঁচিয়ে তুলেছিলেন।

দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে কি একটি ঠাকুরের ছবি, ফুল দিয়ে সাজানো। ঘরের মধ্যে তক্তপোশ নেই, মেজেতে মাদুর পাতা, বই কাগজ দু'চারখানা ছড়ানো, তিন-চারটি বেতের পেঁটারি, তাতে রামকানাইয়ের পোশাক-পরিচ্ছদ বা সম্পত্তি নেই, আছে কেবল কবিরাজি ওষুধ ও গাছ-গাছড়া চূর্ণ।

ভবানীরও বড় ভালো লাগে এই নির্লোভ দরিদ্র ব্রাহ্মণের মাটির ঘরে সন্ধ্যাযাপন। এ পাড়াগাঁয়ে এর জুড়ি নেই। রামকানাই চৈতন্যচরিতামৃত পড়েন, ভবানী একমনে শোনেন। শুনতে শুনতে ভবানী বাঁড়ুয্যের পরিব্রাজক দিনের একটা ছবি মনে পড়ে গেল। নর্ম্মদার তীরে একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের ওপর তাঁর এক পরিচিত সন্ন্যাসীর আশ্রম। সন্ন্যাসীর নাম স্বামী কৈবল্যানন্দ—তিনি পুরী সম্প্রদায়ের সাধু। শ্রীশ্রী১০৮ মাধবানন্দ পুরীর সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। একাই থাকতেন ওপরকার কুটিরে। নিচে আর একটা লম্বা চালাঘরে তাঁর দু'তিনটি শিষ্য বাস করতো ও গুরুসেবা করতো। একটা দুগ্ধবতী গাভী ছিল, ওরাই পুষতো, ঘাস

খাওয়াতো, গোবরের ঘুঁটে দিত।

সাধুর কুটিরের বেড়া বাঁধা ছিল শনের পাকাটি দিয়ে। পাহাড়ী ঘাসে ছাওয়া ছিল চাল দুখানা। কি একটা বন্যলতার সুগন্ধী পুষ্প ফুটে থাকতো বেড়ার গায়ে। বনটিয়া ডাকতো তুন্ গাছের সু-উচ্চ শাখা-প্রশাখার নিবিড়তায়। ঝর্ণার কুলুকুলু শব্দ উঠতো নর্মদার অপর পারের মহাদেও শৈলশ্রেণীর সানুদেশের বনস্থলী থেকে। নিচের কুটিরে বসে ভজন গাইতেন কৈবল্যানন্দজীর শিষ্য অনুপ ব্রহ্মচারী। রাত্রে ঘুম ভেঙে ভবানী শুনতেন করুণ তিলককামোদ রাগিণীর সুর ভেসে আসচে নিচের কুটির থেকে, গানের ভাঙা ভাঙা পদ কানে আসতো—

"এক ঘড়ি পল ছিন কল না পরত মোহে।"

সকালে উঠে দাওয়ায় বসে দেখতেন আরো অনেক নিচে একটা মস্ত বড় কুসুমগাছ, তার পাশে একটা তেঁতুলগাছ। বড় বড় পাথরের ফাটলে বাংলাদেশের দশবাইচণ্ডী জাতীয় এক রকম বনফুল অসংখ্য ফুটতো। এগুলোর কোনো গন্ধ ছিল না, সুগন্ধে বাতাস মদির করে তুলতো সেই বন্যলতার হলুদ রংয়ের পুষ্পস্তবক। কেমন অপূর্ব্ব শান্তি, কি সুস্নিগ্ধ ছায়া, পাখীর কি কলকাকলী ছিল বনে, নদীতীরে। কেউ আসত না নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করতে, অবিচ্ছিন্ন নির্জ্জনতার মধ্যে ভগবানের ধ্যান জমতো কি চমৎকার। নেমে এসে নর্মদার স্নান করে আবার পাহাড়ে উঠে যেতেন পাথরে পা দিয়ে দিয়ে।

সেই সব শান্তিপূর্ণ দিনের ছবি মনে পড়ে কবিরাজমশায়ের ঘরটিতে এসে বসলে। কিন্তু ফণি চক্কত্তির চণ্ডীমণ্ডপে গেলে শুধু বিষয়-আশয়ের কথা, শুধুই পরচর্চ্চা। ফণি চক্কত্তি একা নয়, যার কাছে যাবে, সেখানেই অতি সামান্য গ্রাম্য কথা। ভালো লাগে না ভবানীর।

আর একটা কথা মনে হয় ভবানীর। ঠাকুরের মন্দির হওয়া উচিত এই রকম ছোট পর্ণ-কুটিরে, শান্ত বন্য নির্জ্জনতার মধ্যে। বড় বড় মন্দির, পাথর-বাঁধানো চত্বর, মার্ব্বেলে বাঁধানো গৃহতলে শুধু ঐশ্বর্য্য আছে, ভগবান নেই। অনেক ঐ রকম মন্দিরে সাধুদের মধ্যে লোভ ও বৈষয়িকতা দেখেছেন তিনি। শ্বেত পাথর বাঁধানো গৃহতল সেখানে দেবতাশূন্য।

রামকানাই জিগ্যেস করলেন—বাঁড়ুয্যেমশাই, বৃন্দাবন গিয়েচেন?

—যাই নি।

—এত জায়গায় গেলেন, ওখানটাতে গেলেন না কেন?

—বৃন্দাবন লীলা আমার ভালো লাগে না।

—আমার আর কি বুদ্ধি, কি বোঝাবো। সংসারের নানা ঝন্‌ঝাটে ভক্ত আশ মিটিয়ে ভগবানের প্রেমকে উপভোগ করতে পারে না, তাই একটা চিন্ময় ধামের কথা বলা হয়েচে, সেখানে শুধু ভক্ত আর ভগবানের প্রেমের লীলা চলচে। এটাই বৃন্দাবন-লীলা।

—খুব ভালো কথা। যে বৃন্দাবনের কথা বললেন, সেটা বাইরে সর্ব্বত্রই রয়েচে। চোখ থাকলে দেখা যাবে ওই ফুলে, পাখীর ডাকে, ছেলেমানুষের হাসিতে তিনিই রয়েচেন।

—ওই চোখটা কি সকলে পায়?

—সেজন্যে হাতড়ে বেড়ায় এখানে ওখানে। প্রাচীন শাস্ত্র বেদ, যে বেদ প্রকৃতির গায়ে

লেখা আছে। আমার মনে হয় ফুল, নদী, আকাশ, তারা, শিশু এরা বড় ধর্ম্মগ্রন্থ। এদের মধ্যে দিয়ে তাঁর লীলাবিভূতি দর্শন হয় বেশি করে। পাথরে গড়া মন্দিরে কি হবে, যার ভেতর তিনি নিজে থাকেন সেটাই তাঁর মন্দির। ওই চরপাড়ার বিলে আসবার সময় দেখলাম কুমুদ ফুল ফুটে আছে, ওটাই তাঁর মন্দির। বাইরের প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হবে। প্রকৃতির তালে তালে চলে, তাকে ভালোবেসে সেই প্রকৃতিরই সাহায্যে প্রকৃতির অন্তরাত্মা সেই মহান শক্তির কাছে পৌছতে হবে।

—একেই বলেচে বৈষ্ণব শাস্ত্রে 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে'।

—ঠিক কথা, শুধু একটা মন্দিরে বা তীর্থস্থানে তিনি আছেন? পাগল নাকি। 'বনস্পতৌ ভূভৃতি নির্ঝরে বা কূলে সমুদ্রস্য সরিৎতটে বা' সব জায়গায় তিনি। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েচেন, অথচ চোখ খুলে না যদি আমি দেখি, তবে তিনি নাচার। তিনি শিশুবেশে এসে আমার গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন, আমি 'মায়ার বন্ধন' বলে আঁৎকে উঠে ছুটে পালালুম, এ বুদ্ধি নিয়ে, এ চোখ দিয়ে কি ভগবান দর্শন হয়? তাঁর হাতের বন্ধনই তো মুক্তি। মুক্তি-মুক্তি বলে চিৎকার করলে কি হবে? কি চমৎকার মুক্তি!

—আচ্ছা, ভগবান কি আমাদের প্রেম চান বাঁড়ুয্যে মশাই? আপনার কি মনে হয়?

—আজকাল যেন বুঝতে পারি কিছু কিছু। ভগবান প্রেম চান, এটাও মনে হয়। আগে বুঝতাম না। জ্ঞানের ওপরে খুব জোর দিতাম। এখন মনে হয় তিনি আমার বাবা। তাঁর বংশে আমাদের জন্ম। সেই রক্ত গায়ে আছে আমাদের। কখনো কোনো কারণে তিনি আমাদের অকল্যাণের পথে ঠেলে দেবেন না, দিতে পারেন না। তিনি বিজ্ঞ বাবার মতো আমাদের হাত ধরে নিয়ে যাবেন। তিনি যে আমাদের বহু বিজ্ঞ, বহু প্রাচীন, বহু অভিজ্ঞ, বহু জ্ঞানী, বহু শক্তিময় বাবা। আমরা তাঁর নিতান্ত অবোধ, কুসংস্কারগ্রস্ত, ভীরু, অসহায় ছেলে। জেনে শুনে কি আমাদের অমঙ্গলের পথে ঠেলে দিতে পারেন? তা কখনো হয়?

রামকানাই উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন—বাঃ বাঃ—

ভবানী বাঁড়ুয্যে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, যেন পরের কথাটা বলতে ইতস্ততঃ করছেন। তারপর বলেই ফেললেন কথাটা। বললেন—এ আমার নিজের অনুভূতির কথা কবিরাজমশাই। আগে এ সব বুঝতাম না, বলেচি আপনাকে। আসল কথা কি জানেন, অপরের মুখে হাজারো কথার চেয়ে নিজের মনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া এক কণা সত্যের দাম অনেক বেশি। নিজে বাবা হয়ে, খোকা জন্মাবার পরে তবে ভগবানের পিতৃরূপ নিজের মনে বুঝলাম ভালো করে। এতদিন পিতার মন কি জিনিস কি করে জানবো বলুন?

রামকানাই কবিরাজ হেসে বললেন—তাহলে দাঁড়াচ্চে এই—খোকা আপনার এক গুরু?

—যা বলেন। কে গুরু নয় বলতে পারেন? যার কাছে যা শেখা যায়, সেখানে সে আমার গুরু। তিনি তো সকলের মধ্যেই। একটা গানের মধ্যে আছে না?—

জনকরূপেতে জন্মাই সন্তান
জননী হইয়া করি স্তনদান
শিশুরূপে পুনঃ করি স্তনপান
এ সব নিমিত্ত কারণ আমার—

—কার গান? বাঃ—

—এও এক নতুন কবির। নামটা বলতে পারলুম না। গোড়াটা হচ্চে—

আমাতে যে আমি সকলে সে আমি
আমি সে সকল সকলই আমার।

রামকানাই কবিরাজ অতি চমৎকার শ্রোতা। খোকাও তাই। খোকা কেমন একপ্রকার বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে চুপটি করে। রামকানাই উৎসাহের সুরে বললেন—বেশ গান। তবে বড্ড উঁচু। অদ্বৈত বেদান্ত। এ সব সাধারণের জন্যে নয়।

—আপনি যা বলেন। তবে সত্যের উঁচু নিচু নেই। এ সব গুরুতত্ত্ব। আমার গুরু বলতেন—অদ্বৈতবাদী হওয়া অত সহজ নয়। প্রকৃত অদ্বৈতবাদী জীবের আনন্দকে নিজের আনন্দ বলে ভাববে। জীবের দুঃখ নিজের দুঃখ বলে ভাববে। জীবের সেবায় ভোর হয়ে যাবে। সকলের দেহই তার দেহ, সকলের আত্মাই তার আত্মা। আপন পর কিছু থাকে না সে অবস্থায়। নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে জীবের পায়ে এতটুকু কাঁটা তুলতে। তার কাছে জাগ্রতদশায় 'অতো মম জগৎ সর্ব্বং' জগতের সবই আমার, সবই আমি—আবার সমাধি অবস্থায় 'অথবা নচ কিঞ্চন' কিছুই আমার নয়। কিছুই নেই, এক আমিই আছি। জগৎও তখন নেই। বুঝলেন কবিরাজমশাই?

—বড্ড উঁচু কথা। কিন্তু বড্ড ভালো কথা। হজম করা শক্ত আমার পক্ষি। বড়ি বেটে রোগ সারাই, আমি ও বেদান্ত টেদান্ত কি করবো বলুন? সে মস্তিষ্ক কি আছে? তবে বড়ো ভালো লাগে। আপনি আসেন এ গরীবের কুঁড়েতে, কত যে আনন্দ হ্যান এসে সে মুখি আর কি বলবো আপনারে। দাঁড়ান, খোকারে কি এট্টু খেতি দিই। বড় চমৎকার হোলো আজ।

—এই বেশ কথা হচ্চে, আবার খাওয়া কেন। উঠলেন কেন?

—একটুখানি খেতি দিই ওরে। ছানা দিয়ে গিয়েছিল একটা রুগী। তাই একটু দি—এই নাও খোকা—

খোকা বললে—বাবা না খেলি আমি খাবো না। বাবা আগে খাবে।

রামকানাই হাততালি দিয়ে বললে—বাঃ, ও-ও বাপের বেটা! কেডা গা বাইরি?

ঠিক সেই সময়ে গয়ামেম এসে ঘরে ঢুকলো, তার হাতে এক ছড়া কলা, ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁদের প্রণাম করে কলাছড়া এগিয়ে দিয়ে বললে—বাবা খাবেন।

ভবানী ওকে দেখে একটু বিস্মিত হয়েছিলেন। বললেন—এখানে আস নাকি?

গয়া বিনীত স্বরে বললে—মাঝে মাঝে বাবার কাছে আসি। তবে আপনার দেখা পাবো এখানে তা ভাবি নি।

—অতদূর থেকে আস কি করে?

—না বাবা, এখানে যে দিন আসি, চরপাড়াতে আমার এক দূর সম্পক্কো বুনের বাড়ী রাত্তি শুয়ে থাকি।

হঠাৎ তার চোখ গেল কোলে উপবিষ্ট খোকার তন্ময় মূর্ত্তির দিকে। ওর কাছে গিয়ে বললে—এ খোকা কাদের? আপনার? সোনার চাঁদ ছেলেটুকুনি। বেশ বড় সড় হয়ে উঠেচে। আহা বেঁচে থাক—দেওয়ানজির বংশের চূড়ো হয়ে বেঁচে থাকো বাবা—

ভবানী বললেন—কি কর আজকাল?

—কি আর করব বাবা। দুঃখু ধান্দা করি। মা মারা যাওয়ার পর বড্ড কষ্ট। এখানে তাই ছুটে ছুটে আসি বাবার কাছে, একটু চৈতন্যচরিতামৃত শুনতি।

—বল কি! তোমার মুখে যা শুনলাম, অনেক ব্রাহ্মণের মেয়ের মুখে তা শুনি নি।

—সে বাবা আপনাদের দয়া। মা মরে যেত্তি সংসারডা বড্ড ফাঁকা মনে হোলো—তারপর খুব সঙ্কুচিত ভাবে নিতান্ত অপরাধিনীর মতো বললে আস্তে আস্তে—বাবা, কাঁচা বয়সে যা করি ফেলিচি, তার চারা নেই। এখন বয়েস হয়েচে, কিছু কিছু বুঝতি পারি। আপনাদের মত লোকের দয়া একটু পেলি—

—আমরা কে? দয়া করবারই বা কি আছে? তিনি কাউকে ফেলবেন না, তা তুমি তো তুমি। তুমি কি তাঁর পর?

রামকানাই কবিরাজের দিকে চেয়ে বললেন—ওহে কবিরাজমশাই, আপনি যে দেখচি ভবরোগের কবিরাজ সেজে বসলেন শেষে। দেখে সুখী হলাম।

রামকানাই বললে—ভবরোগটা কি?

—সে তো ধরুন, গানেই আছে—

ভবরোগের বৈদ্য আমি
অনাদরে আসিনে ঘরে।

—বোঝলাম। জিনিসটা কি?

—আমার মনে হয়, ভবরোগ মানে অজ্ঞানতা। অর্থের পেছনে অত্যন্ত ছোটাছুটি। কেন, ঘরে দুটো ধান, উঠোনে দুটো ডাঁটাশাক—মিটে গেল অভাব, আপনার মতো। এখন হয়ে দাঁড়াচ্চে মায়ের পেটের এক ভাই গরীব, এক ভাই ধনী।

—আমার কথা বাদ ত্তান। আমার টাকা রোজগার করার ক্ষমতা নেই তাই। থাকলি আমিও করতাম।

—করতেন না। আপনার মনের গড়ন আলাদা। বৈষয়িক কূটবুদ্ধি লোক আপনি দেখেন নি তাই একথা বলচেন। কি জানেন, তত্ত্বকে একটু বেশি সামনে রাখেন তিনি। তাকে আপনার জন ভাবেন। এ বড় গূঢ় তত্ত্ব।

—ও কথা ছেড়ে দ্যান জামাইবাবু। যার যা, তার সেটা সাজে। আমার ভালো লাগে এই মাটির কুঁড়ে, তাই থাকি। যার না লাগে, সে অন্য চেষ্টা করে।

—তারা কি আপনার চেয়ে আনন্দ পায় বেশি? সুখ পায় বেশি। কখনো না। আনন্দ আত্মার ধর্ম্ম, মন যত আত্মার কাছে যাবে, তত সে বেশি আনন্দ পাবে—আত্মার থেকে দূরে যত যাবে, বিষয়ের দিকে যাবে, তত দুঃখ পাবে। বাইরে কোথাও আনন্দ নেই, আনন্দ শান্তির উৎস রয়েচে মানুষের নিজের মধ্যে। মানুষ চেনে না, বাইরে ছোটে। নাভিগন্ধে মত্ত মৃগ ছুটে ফেরে গন্ধ অন্বেষণে। তারা সুখ পায় না।

—সে তারা জানে। আমি কি বলবো? আমি এতেই সুখ পাই, আনন্দ পাই, এইটুকু বলতি পারি। আনন্দ ভেতরেই, এটুকু বুঝিচি। নিজের মধ্যেই সুখ।

খোকা পুনরায় একমনে বসে এই সব জটিল কথাবার্ত্তা শুনছিল। ওর বড় বড় দুই চোখে বুদ্ধি ও কৌতুহলের চাহনি।

গয়ামেমের কি ভালোই লাগলো ওকে। কাছে এসে ডেকে চুপি চুপি বললে—ও খোকা, তোমার নাম কি?

—টুলু।

—মোর সঙ্গে যাবা?

—কোথায়?

—মোর বাড়ী। পেঁপে খেতি দেবানি।

—বাবা বললি যাবো।

—আমি বললি যেতি দেবেন না কেন?

—হুঁ, নিয়ে যেও। অনেকদূর তোমার বাড়ী?

—আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। যাবা ও বাবা? যাবা ঠিক?

খোকা ভেবে ভেবে বললে—পেঁপে আছে?

—নেই আবার! এই এত বড় পেঁপে—

গয়া দুই হাত প্রসারিত করে ফলের আকৃতি যা দেখালে, তাতে লাউ কুমড়োর বেলায় বিশ্বাস হোতো কিন্তু পেঁপের ক্ষেত্রে যেন একটু অতিরঞ্জিত বলে সন্দেহ হয়।

খোকা বললে—বাবা, ও বাবা, মাসীমার বাড়ী যাবো? পেঁপে দেবে—

বাবার বিনা অনুমতিতে সে কোন কাজ করে না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাবার দিকে চেয়ে রইল।

গয়ামেম রাত্রে এসে রইল চরপাড়ার ওর দূর সম্পর্কের এক ভগ্নীর বাড়ী। সকালে উঠে সে চলে যাবে মোল্লাহাটি। ঠিক মোল্লাহাটি নয়, ওর গ্রাম গণেশপুরে। ওর দূর সম্পর্কের বোনের নাম নীরদা, নীরি বাগ্‌দিনী বলে গ্রামে পরিচিতা। তার অবস্থা ভালো না, আজ সন্ধ্যাবেলা গয়া এসে পড়াতে এবং রাত্রে থাকবে বলাতে নীরি একটু বিপদে পড়ে গিয়েছিল।

কি খাওয়ায়? এক সময়ে এই অঞ্চলের নাম করা লোক ছিল গয়ামেম। খেয়েচে দিয়েচেও অনেক। তাকে যা তা দিয়ে ভাত দেওয়া যায়? কুচো চিংড়ি দিয়ে ঝিঙের ঝোল আর রাঙা আউশ চালের ভাত—তাই দিতে হোলো। তারপর একটা মাদুর পেতে একখানা কাঁথা দিলে ওকে শোওয়ার জন্যে।

গয়ার শুয়ে শুয়ে ঘুম এল না।

ওই খোকার মুখখানা কেবলই মনে পড়ে। অমন যদি একটা খোকা থাকতো তার?

আজ যেন সব ফাঁকা, সব ফুরিয়ে গিয়েচে, এ ভাবটা তার মনে আসতো না যদি একটা অবলম্বন থাকতো জীবনের। কি আঁকড়ে সে থাকে?

আজ ক'বছর বড়সাহেব মারা গিয়েচে, নীলকুঠি উঠে গিয়ে নালু পালের জমিদারী কাছারী হয়েচে। এই ক'বছরেই গয়ামেম নিঃস্ব হয়ে গিয়েচে। বড়সায়েব অনেক গহনা দিয়েছিল, মায়ের অসুখের সময় কিছু গিয়েচে, বাকি যা ছিল, এতদিন বেচে বন্ধক দিয়ে চলচে। সামান্যই অবশিষ্ট আছে।

পুরনো দিনগুলোর কথা যেন স্বপ্ন হয়ে গিয়েচে। অথচ খুব বেশি দিনের কথাও তো নয়। এই তো সেদিনের। ক'বছর আর হোলো কুঠি উঠে গিয়েচে। ক'বছরই বা সাহেব মারা গিয়েচে!

এ কঠিন সংসারে কেউ যে বড় একটা কাউকে দেখে না, তা এতদিনে ভালোই বুঝতে পেরেচে সে। আপনার লোক ছিল যে ক'জন সব চলে গিয়েচে।

নীরি এসে কাছে বসলো। দোক্তাপান খেয়ে এসেচে, কড়া দোক্তা-পাতার গন্ধ মুখে। ওসব সহ্য করতে পারে না গয়া। ওর গা যেন কেমন করে উঠলো।

—ও গয়া দিদি—

—কি রে?

—ঘুমুলি ভাই?

—না, গরমে ঘুম আসচে না।

নীরি খেজুরের চাটাই পেতে ওর পাশেই শুলো। বললে—কি বা খাওয়ালাম তোরে। কখনো আগে আসতিস নে—

এটাও বোধহয় ঠেস দিয়ে কথা নীরির। সময় পেলে লোকে ছাড়বে কেন, ব্যাঙের লাথিও খেতে হয়। নীরি তো সম্পর্কে বোন।

গয়া বললে—একটা কথা নীরি। আমার হাত অচল হয়েচে, কিছু নেই। কি করে চালাই বল দিকি?

নীরি সহানুভূতির সুরে বললে—তাই তো দিদি। কি বলি। ধান ভানতি পারবি কি আর? তা হলি পেটের ভাতের চালডা হয়ে যায় গতর থেকে।

—আমার নিজের ধান তো ভানি। তবে পরের ধান ভানি নি। কি রকম পাওয়া যায়?

—পাঁচাদরে।

—সেটা কি? বোঝলাম না।

—ভারি আমার মেমসাহেব আলেন রে!

সত্যি, গয়ামেম এ কখনো শোনে নি। সে চোদ্দ বছর বয়স থেকে বড় গাছের আওতায় মানুষ। সে এ সব দুঃখু-ধান্ধার জিনিসের কোনো খবর রাখে না। বললে—সেডা কি, বুঝলাম না নীরি। বল না।

নীরি হিহি করে উচ্চরবে যে হাসিটা হেসে উঠলো, তার মধ্যেকার শ্লেষের সুর ওর কানে বড় বেশি করে যেন বাজলো। কাল সকালে উঠেই সে চলে যাবে এখান থেকে।

দুঃখিত হয়ে বললে—অত হাসিডা কেন? সত্যি জানি নে। আমি মিথ্যে বলবো এ নিয়ে নীরি?

নীরি তাকে বোঝাতে বসলো জিনিসটা কাকে বলে। বড় পরিশ্রমের কাজ, সকালে উঠে ঢেঁকিতে পাড় দিতে হবে দুপুর পর্যান্ত। ধান সেদ্ধ করতে হবে। তার জন্তে কাঠকুটো কুড়িয়ে জড়ো করতে হবে। চৈত্র মাসে শুকনো বাঁশপাতা কুমোরদের বাজরা পুরে কুড়িয়ে আনতে হবে বাঁশবাগান থেকে। সারা বছর উনুন ধরাতে হবে তাই দিয়ে। চিঁড়ে ঝাড়তে ঝাড়তে দু-হাত ব্যথায় টনটন করবে। কথা শেষ করে নীরি বললে—সে তুই পারবিনে, পারবিনে। পিসিমা তোরে মানুষ করে গিয়েল অন্যভাবে। তোর আখের নষ্ট করে রেখে গিয়েচে। না হলি মেমসাহেব না হলি বাগ্‌দিঘরের ভাঁড়ানী মেয়ে। কি করে তুই চালাবি? দুকুল হারালি।

গয়া আর কোনো কথা বললে না।

তার নিজের কপালের দোষ। কারো দোষ নয়। এরা দিন পেয়েচে, এখন বলবেই। আর কারো কাছে দুঃখু জানাবে না সে। এরা আপন জন নয়। এরা শুধু ঠেস্ দিয়ে কথা বলে মজা দেখবে।

নীরি বললে—দোক্তা খাবি?

—না ভাই।

—ঘুম আসচে?

—এবার একটু ঘুমুই।

—তোমার সুখের শরীর। রাত জাগা অভ্যেস থাকতো আমাদের মত তো ঠ্যালাটি বুঝতে। পূজোর সময় পরবের সময় সারা রাত জেগে চিঁড়ে কুটিচি, ছাতু কুটিচি, ধান ভেনেচি। নইলে খদ্দের থাকে? রাত একটু জাগতি পারো না, তুমি আবার পাঁচাদরে ধান ভানবা, তবেই হয়েচে।

গয়া খুব বেশি ঝগড়া করতে পারে না। সে অভ্যাস তার গড়ে ওঠে নি পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মত। নতুবা এখুনি তুমুল কাণ্ড বেধে যেতো নীরির সঙ্গে। একবার ইচ্ছে হলো নীরির কুটুনির সে উত্তর দেখে ভালো করেহ। কিন্তু পরক্ষণেই তার বহুদিনের অভ্যস্ত

ভদ্রতাবোধ তাকে বললে, কেন বাজে চেঁচামেচি করা? ঘুমিয়ে পড়ো, ও যা বলে, বলুক গে। ওর কথায় গায়ে ঘা হয়ে যাবে না। নীরি কি জানবে মনের কথা?

প্রসন্ন খুড়োমশায়ের সঙ্গে কতকাল দেখা হয় নি। কোথায় চলে গিয়েচেন নীলকুঠির কাছারীতে বরখাস্ত হয়ে। তবুও একজন লোক ছিল, অসময়ে খোঁজখবর নিত। আকাট নিষ্ঠুর সংসারে এই আর একজন যে তার মুখের দিকে চাইতো। অবহেলা হেনস্থা করেচে তাকে একদিন গয়া। আজ নীরির মুখের দোক্তা-তামাকের কড়া গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কেবলই মনটা হু হু করচে সেই কথা মনে হয়ে। আজ তিনিও নেই।

কবিরাজ ঠাকুরের এখানে এসে তবু যেন খানিকটা শান্তি পাওয়া যাচ্চে অনেকদিন পরে। কারা যেন কথা বলে এখানে। সে কথা কখনো শোনে নি। মনে নতুন ভরসা জাগে।

তুলসী সকালে উঠে ছেলেমেয়েদের মুটো মুড়ি আর নারিকেল নাড়ু খেতে দিলে। ঝি এসে বললে, মা, বড় গোয়াল এখন ঝাঁটপস্কার করবো না থাকবে?

—এখন থাক গো। দুধ দোওয়া না হলি, গরু বের না হলি গোয়াল পুঁছে লাভ নেই। আবার যা তাই হবে।

ময়না এখানে এসেছে আজ দু'মাস। তার ছোট ছেলেটার বড্ড অসুখ। রামকানাই কবিরাজকে দেখাবার জন্তেই ময়না এখানে এসে আছে ছেলেপুলে নিয়ে। ময়নার বিয়ে অবস্থাপন্ন ঘরে দিতে পারে নি লালমোহন, তখন তার অবস্থা ভালো ছিল না। সে জন্তে ময়নাকে প্রায়ই এখানে নিয়ে আসে। দাদার বাড়ীতে দু'দিন ভালো খাবে পরবে। তুলসী ভালো মেয়ে বলেই আরও এসব সম্ভব হয়েচে বেশি করে। ময়না বেশি দিন না এলে তুলসী স্বামীকে তাগাদা দেয়—হ্যাঁ গা, হিম হয়ে বসে আছ (এ কথাটা সে খুব বেশি ব্যবহার করে) যে! ময়না ঠাকুরঝি সেই কবে গিয়েচে, মা বাপই না হয় মারা গিয়েচে, তুমি দাদা তো আছ—মাও তো বেশি দিন মারা যান নি, ওকে নিয়ে এসো গিয়ে।

ময়নার মা মারা গিয়েছিলেন—তখন নালুর গোলাবাড়ি, দোকান ও আড়ত হয়েচে, তবে এমন বড় মহাজন হয়ে ওঠে নি। নালু পালের একটা দুঃখ আছে মনে, মা এ সব কিছু দেখে গেলেন না। তুলসী এখানে এলে ময়নাকে আরো বেশি করে যত্ন করে, শাশুড়ির ভাগটাও যেন ওকে দিয়ে দেয়। বরং ময়না খুব ভালো নয়, বেশ একটু ঝগড়াটে, বাল্যকাল থেকেই একটু আদুরে। পান থেকে চুন খসলে তখুনি সতেরো কথা শুনিয়ে দেবে বৌদিকে।

কিন্তু তুলসী কখনো ব্যাজার হয় না। অসাধারণ সহগুণ তার। যেমন আজই হোলো। হঠাৎ মুড়ি খেতে খেতে তুলসীর মেয়ে হাবি ময়নার ছোট ছেলের গালে এক চড় মারলে। ছেলেতে ছেলেতে ঝগড়া, তাতে ময়নার যাবার দরকার ছিল না। সে গিয়ে বললে—কি রে, কেষ্টকে মারলে কেডা?

সবাই বলে দিলে, হাবি মেরেচে, মুড়ি নিয়ে কি ঝগড়া বেধেছিল দুজনে।

ময়না হাবিকে প্রথমে দুড়দাড় করে মারলে, তারপর বকতে শুরু করলে—তোর বড্ড বাড় হয়েচে, আমার রোগা ছেলেটার গায়ে হাত তুলিস, ওর শরীলি আছে কি? ও মরে গেলে তোমাদের হাড় জুড়োয়। ওতে মায়েরও আস্কারা আছে কিনা, নইলে এমন হৃতি পারে?

তুলসী শুনে বাইরে এসে বললে—হ্যাঁ ঠাকুরঝি, আমার এতে কি আস্কারা আছে? বলি, আমি বলবো তোমার ছেলেকে মারতি, কেন—সে কি আমার পর?

ময়না ইতরের মত ঝগড়া শুরু করে দিলে। শেষকালে রোগা ছেলেটাকে ঠাস ঠাস করে গোটাকতক চড় বসিয়ে বললে—মর না তুই আপদ। তোর জন্যিই তো দাদার পয়সা খরচ হচ্চে বলে ওদের এত রাগ। মরে যা না—

তুলসী অবাক হয়ে গেল ময়নার কাণ্ড দেখে। সে দৌড়ে গিয়ে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে বললে—খেপলে না পাগল হ'লে? কেন মেরে মরচিস রোগা ছেলেটাকে অমন করে? আহা, বাছার পিঠটা লাল হয়ে গিয়েচে!

ময়নাও সুর চড়িয়ে বলতে লাগলো—গিয়েচে যাক। আর অত দরদ দেখাতি হবে না, বলে মার চেয়ে যার দরদ তারে বলে ডান।…দাও তুমি ওকে নামিয়ে—

তুলসী বললে—না দেবো না। আমার চকির সামনে রোগা ছেলেডারে তুমি কক্ষনো গায়ে হাত দিতি পারবা না—

ছেলেটাকে কোলে ক'রে তুলসী নিজের ঘরে ঢুকে খিল দিল।

বেশি বেলায় লালমোহন পাল আড়ত থেকে বাড়ী ফিরে দেখলে তুলসী রান্না করচে, ছেলেপুলেদের ভাত দেওয়া হয়েচে। দাদাকে দেখে ময়না পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলো। তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হোক শ্বশুরবাড়ী, বাপের বাড়ীর সাধ তার খুব পুরেচে। যেদিন মা মরে গিয়েচে, সেই দিনই বাপের বাড়ীর দরজায় খিল পড়ে গিয়েচে তার। ইত্যাদি।

লালমোহন বললে—হ্যাগা, আবার আজ কি বাধালে তোমরা? খেটেখুটে আসবো সারাডা দিন ভূতির মতো। বাড়ীতি এসে একটু শান্তি নেই?

তুলসী কোনো কথা বললে না, কারো কোনো কথার জবাব দিলে না। স্বামীর তেল, গামছা এনে দিলে। ঝিকে দিয়ে জলচৌকি পাতিয়ে দু'ঘড়া নাইবার জল দিয়ে বললে—স্নান ক'রে দুটো খেয়ে নাও দিকি।

—না, আগে বলো, তবে খাবো।

—তুমিও কি অবুঝ হলে গা? আমি তবে কার মুখির দিকি তাকাবো। খেয়ে নাও, বলচি।

সব শুনে লালমোহন রেগে বললে—এত অশান্তি সহ্য হয় না। আজই দুটোরে দু'জায়গায় করি। যখন বনে না তোমাদের, তখন—

তুলসী সত্যি ধৈর্য্যশীলা মেয়ে। বোবার শত্রু নেই, সে চুপ করে রইল। ময়না কিছুতেই খাবে না, অনেক খোশামোদ করে হাত জোড় করে তাকে খেতে বসালে। তাকে খাইয়ে তবে তৃতীয় প্রহরের সময় নিজে খেতে বসলো।

সন্ধ্যার আগে ওপাড়ার যতীনের বোন নন্দরাণী এসে বললে—ও বৌদিদি, একটা কথা বলতি এসেছিলাম, যদি শোনো তো বলি—

তুলসী পিঁড়ি পেতে তাকে বসালে। পান সেজে খেতে দিলে নিজে। নন্দরাণী বললে—একটা টাকা ধার দিতি হবে, হাতে কিছু নেই। কাল সকালে কি যে খাওয়াবো ছেলেটাকে—জানো তো সব বৌদি। বাবার খ্যামতা ছিল না, যাকে তাকে ধরে বিয়ে দিয়ে গ্যালেন। তিনি তো চক্ষু বুজলেন, এখন তুই মর—

তুলসী যাচককে বিমুখ করে না কখনো। সেও গরীব ঘরের মেয়ে। তার বাবা ৺অম্বিক প্রামাণিক সামান্য দোকান ও ব্যবসা করে তাদের কষ্টে মানুষ করে গিয়েছিলেন। তুলসী সেকথা ভোলে নি। নন্দরাণীকে বললে—যখন যা দরকার হবে, আমার এসে বলবেন ভাই। এতে লজ্জা করবেন না। পর না ভেবে এসেচেন যে, মনডা খুশি হোলো বড্ড। আর একটা পান খান—দোক্তা চলবে? না? স্বর্ণ দিদি ভালো আছেন?···

নন্দরাণী টাকা নিয়ে খুশি মনে বাড়ী চলে গেল সেদিন সন্দের আগেই। ঝিকে তুলসী বললে—ষষ্ঠীতলা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আয় দিদিকে—

তিলু ও নিলু তেঁতুল কাটছিল বসে বসে। চৈত্র মাসের অপরাহ্ণ। একটা খেজুর পাতার চেটাই বিছিয়ে তার ওপর বসে নিলু তেঁতুল কাটছিল, তিলু সেগুলো বেছে বেছে একপাশে জড়ো করছিল।

—কোন্ গাছের তেঁতুল রে?

—তা জানিনে দিদি। গোপাল মুচির ছেলে ব্যাংটা পেড়ে দিয়ে গেল।

—গাঙের ধারের?

—সে তো খুব মিষ্টি। খেয়ে গ্যাখ্ না?

তিলু একখানা তেঁতুল মুখে ফেলে দিয়ে বললে—বাঃ, কি মিষ্টি! গাঙের ধারের ওই বড় গাছটার।

—তাড়াতাড়ি নে দিদি! খোকা পাঠশালা থেকে এল বলে। এলেই মুখি পুরবে।

—হ্যাঁরে, বিলুর কথা মনে পড়ে? তিনজনে বসে তেঁতুল কুটতাম এ রকম, মনে পড়ে?

—খুব।

দুই বোনই চুপ করে রইল। অনেক কথাই মনে পড়ে। এই তো কয়েক বছর হোল বিলু মারা গিয়েচে। মনে হচ্চে কত দিন, কত যুগ। এই সব চৈত্র মাসের দুপুরে বাঁশবনের পত্র-মর্ম্মরে, পাপিয়ার উদাস ডাকে যেন পুরাতন স্মৃতি ভিড় করে আসে মনের মধ্যে। বাপের মত দাদা—মা বাবা মারা যাওয়ার পরে যে দাদা, যে বৌদিদি বাবা-মায়ের মতই তাদের মানুষ করেছিলেন, তাঁদের কথাও মনে পড়ে।

পাশের বাড়ীর শরৎ বাড়ুয্যের বৌ হেমলতা পান চিবুতে চিবুতে এসে বললে—কি হচ্চে বৌদিদি? তেঁতুল কুটচো?

তিলু বললে—এ আর কখানা তেঁতুল ? এখনো চু'ঝুড়ি ঘরে রয়েচে। তালপাতার চ্যাটাইখানা টেনে বোসো।

—বসবো না, জানতি এয়েলাম আজ কি তিরোদশী ? বেগুন খেতি আছে ?

—খুব আছে। দে য়'দশী পুরো। রাত ছু'পহরে ছাড়বে। তোমার দাদা বলছিলেন।

—দাদা বাড়ী ?

—না। কোথায় বেরিয়েচেন। দাদা কেমন আছেন ?

—ভালো আছেন। বুড়োমানুষের আর ভালো মন্দ। কাশি আর জরডা সেরেচে। টুলু কোথায় ?

—এখনো পাঠশালা থেকে ফেরে নি বৌদি।

—অনেক তেঁতুল কুটিচিস্ তোরা। আমাদের এ বছর ছুটো গাছের তেঁতুল পেড়ে ন দেবা ন ধম্মা। মুড়ি মুড়ি পোকা তেঁতুলির মধ্যি। ছুটো কোটা তেঁতুল দিস্ শ্রাবণ মাসে অম্বলতা খাবার জন্যি। খয়রা মাছ দিয়ে অম্বল খেতি তোমার দাদা বড্ড ভালোবাসেন।

বেলা পড়ে এসেচে। কোকিল ডাকচে বাঁশ ঝাড়ের মগডালে। কোথা থেকে শুকনো কুলের আচারের গন্ধ আসচে। কামরাঙা গাছের তলায় নলে নাপিতদের ছুটো গেলে গরু চরে বেড়াচ্ছে। ওপাড়ার সতে চৌধুরীর পুত্রবধূ বিরাজমোহিনী গামছা নিয়ে নদীতে গা ধুতে গেল সামনের রাস্তা দিয়ে।

নিলু ডেকে বললে—ও বিরাজ, ও বিরাজ—

বিরাজমোহিনী নথ বাঁ হাতে ধরে ওদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—কি ?

—দাঁড়া ভাই।

—যাবে ছোড়দি ?

—যাবো।

বিরাজের বাপের বাড়ী নদে শান্তিপুরের কাছে বাঘ-আঁচড়া গ্রামে। সুতরাং তার বুলি যশোর জেলার মত নয়, সেটা খুব ভালো করে জাহির করতে চায় এ অজ বাঙালদেশের ঝি-বৌদির কাছে। ওর সঙ্গে তিলু নিলু ছুই বোনই গেল ঘরে শেকল তুলে দিয়ে।

এ পাড়ায় ইছামতীতে মাত্র ছুটি নাইবার ঘাট, একটার নাম রায়পাড়ার ঘাট, একটার নাম সায়েবের ঘাট। কিছুদূরে বাঁকের মুখে বনসিমতলার ঘাট। পাড়া থেকে দূরে বলে বনসিমতলার ঘাটে মেয়েরা আদৌ আসে না, যদিও সবগুলো ঘাটের চেয়ে তীরতরুশ্রেণী এখানে বেশি নিবিড়,ধরার অরুণোদয় এখানে অবাচ্য সৌন্দর্য্য ও মহিমায় ভরা, বন্যবিহঙ্গকাকলী এখানে সুস্বরা, কত ধরনের যে বনফুল ফোটে ঋতুতে ঋতুতে এর তীরের বনে বনে, ঝোপে ঝোপে। চাঁড়াগাছের তলায় কি ছায়াভরা কুঞ্জ-বিতান, পঞ্চাশ-ষাট বছরের মোটা চাঁড়াগাছ এখানে খুঁজলে ছু'চারটে মিলে যায়।

তিলু বললে—চল না, বনসিমতলার ঘাটে নাইতে যাই—

বিরাজ বললে—এই অবেলায় ?

—কদ্দূর আর ?

—যেতুম ভাই, কিন্তু শাশুড়ি বাড়ী নেই, দুটি ডাল ভেঙে উঠোনে রোদে দিয়ে গ্যাছেন, তুলে আসতে ভুলে গেলুম আসবার সময়। গোরু বাছুরে খেয়ে ফেললে আমাকে বুঝি আস্ত রাখবেন ভেবেচ ?

নিলু বললে—ও সব কিছু শুনচি নে। যেতেই হবে বনসিমতলার ঘাটে। চলো।

বিরাজ হেসে সুন্দর চোখ দুটি তেরচা করে কটাক্ষ হেনে বললে—কেন, কোনো নাগর সেখানে ওৎ পেতে আছে বুঝি ?

তিলু বললে—আমাদের বুড়োবয়সে আর নাগর কি থাকবে ভাই, ওসব তোদের কাঁচা বয়সের কাণ্ড। একটা ছেড়ে ঘাটে ঘাটে তোদের নাগর থাকতি পারে।

—ইস্! এখনো ওই বয়েসের রূপ দেখলে অনেক যুবোর মুণ্ডু ঘুরে যাবে একথা বলতে পারি দিদি। চলো, দেখি কোন্ ঘাটে নিয়ে যাবে। নাগরের চক্ষু ছানাবড়া করে দিয়ে আসি।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রায়পাড়ার ঘাটেই ওদের যেতে হোলো, পথে নামবার পরে অনেক ঝি-বৌ ওদের ধরে নিয়ে গেল। ঘাটে অনেক ঝি-বৌ.হাসির ঢেউ উঠচে,গরম দিনের শেষে ঠাণ্ডা নদীজলের আমেজ লেগেচে সকলের গায়ে, জলকেলি শেষ করে সুন্দরী বধূ কন্যার দল কেউ ডাঙায় উঠতে চায় না।

সীতানাথ রায়ের পুত্রবধূ হিমি ডেকে বললে—ও বড়দি, দেখি নি যে কদ্দিন ?

তিলু বললে—এ ঘাটে আর আসিনে—

—কেন ? কোন্ ঘাটে যান তবে ?

বিরাজ বললে—তোরা খবর দিস তোদের লুকোনো নাগরালির ? ও কেন বলবে ওর নিজের ? আমি তো বলতুম না।

হিমি বললে—বড় দিদির বয়েসটা আমার মার বয়সী। ওকথা আর ওঁকে বোলো না। তোমার মুখ সুন্দর, বয়েস কচি, ও সব তোমাদের কাজ। ওতে কি ?

—এতে ভাই খোল। গা-টায় ময়লা হয়েচে, ক্ষারখোল মাখবো বলে নিয়ে এলুম। মাখবি ?

—না। তুমি সুন্দরী, তুমি ওসব মাখো।

সবাই খিল খিল করে হেসে উঠলো। এতগুলি তরুণী হাসির লহরে, কথাবার্ত্তার ঝিল্লিকে স্নানের ঘাট মুখর হয়ে উঠেছে, আর কিছু পরে সপ্তমীর চাঁদ উঠবে ঘাটের ওপরকার শিরীষ আর পুরোঁ গাছের মাথায়। পটপটি গাছের ফুল ঝরে পড়চে জলের ওপর, বিরাজের মনে কেমন একটা অদ্ভুত আনন্দের ভাব এল, যেন এ সংসারে দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, তার রূপের প্রশংসা সব স্থানে শোনা যাবে, বড় পিঁড়িখানা এয়োস্ত্রী সমাজে তার জন্যেই পাতা থাকবে সর্ব্বত্র। ফেনি বাতাসার থালা তার দিকে এগিয়ে ধরবে সবাই চিরকাল, কোন কুয়াশা-ছাড়া পাখী-ডাকা ভোরে শাঁখ বাজিয়ে ডালা সাজিয়ে জল সইতে বেরুবে তার খোকার অন্নপ্রাশনে

কি-বিয়ে পৈতেতে, শান্তিপুরী শাড়ী পরে সে ফুলের সাজি আর তেলহলুদের কাঁসার বাটি নিয়ে ঝমর ঝমর মল বাজিয়ে, গুজরীপঞ্চম আর পৈঁছে পরে সেজে গুজে চলবে এয়োস্ত্রীদের আগে আগে···আরও কত কি, কত কি মনে আসে···মনের খুশিতে সে টুপ টুপ করে ডুব দেয়, একবার ডুব দিয়ে উঠে সে যেন সামনের চরের প্রান্তে উদার আকাশের কোণে দেখতে পেলে তার মায়ের হাসিমুখ, আর একবার দেখলে বিয়ের ফুলশয্যার রাতে ছোবা খেলা করতে করতে উনি আড় চোখে তার দিকে চেয়েছিলেন, সেই সলজ্জ, সসঙ্কোচ হাসি-মুখখানা।···

জীবনে শুধু সুখ! শুধু আনন্দ! শুধু খাওয়া-দাওয়া, জলকেলি, হাসিখুশি, কদম্বকেলি, তাস নিয়ে বিন্তি খেলার ধুম! হি হি হি—কি মজা!

—হ্যাঁরে, ওকি ও বিরাজদিদি, অবেলায় তুই জলে ডুব দিচ্ছিস্ কি মনে করে?

অবাক হয়ে হিমি বললে কথাটা।

নিলু বললে—তাই তো, ছাখ বড়দি, কাণ্ড। হ্যাঁরে চুল ভিজুলি যে, ওই চুলডার রাশ শুকুবে? কি আক্কেল তোর?

বিরাজের গ্রাহ্য নেই ওদের কথার দিকে। সে নিজের ভাবে নিজে বিভোর, বললে—এই। একটা গান গাইবো শুনবি?

মনের বাসনা তোরে সবিশেষ শোন রে বলি—

হিমি বললে—ওরে চুপ, কে যেন আসচে—ভারিক্কি দলের কেউ—

নিস্তারিণী গুল দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে ঘাটের ওপর এসে হাজির হোলো। সবাই এক সঙ্গে তাকে দেখলে তাকিয়ে, কিন্তু কেউ কথা বললে না। এ গাঁয়ের ঝি-বৌদের অনেকেই ওর সঙ্গে কথা বলে না, ওর সম্বন্ধে নানারকম কথা রটনা আছে পাড়ায় পাড়ায়। কেউ কিছু দেখে নি, বলতে পারে না, তবুও ওর পাড়ার রাস্তা দিয়ে একা একা বেরুনো, যার তার সঙ্গে (মেয়ে-মানুষদের মধ্যে) কথা বলা—এ সব নিয়ে ঘরে ঘরে কথা হয়েচে। এই সব জন্যেই কেউ ওর সঙ্গে হঠাৎ কথা বলতে চায় না সাহস করে, পাছে ওর সঙ্গে কথা কইলে কেউ খারাপ বলে।

তিলু ও নিলুর সাতখুন মাপ এ গাঁয়ে। তিলু কোনো কিছু মেনে চলার মত মেয়েও নয়, সবাই জানে। কিন্তু মজাও এই—তার বা তাদের ক' বোনের নামে কখনো এ গাঁয়ে কিছু রটে নি। কেন তার কারণ বলা শক্ত। তিলু মমতাভরা চোখের দৃষ্টি নিস্তারিণীর দিকে তুলে বললে—আয় ভাই আয়। এত অবেলা?

নিস্তারিণী ঘাটভরা বৌ-ঝিদের দিকে একবার তাচ্ছিল্য-ভরা চোখে চেয়ে দেখে নিয়ে অনেকটা যেন আপন মনে বললে, তেঁতুল কুটতে কুটতে বেলাডা টের পাইনি।

—ওমা, আমরাও আজ তেঁতুল কুটছিলাম রে। নিলু আর আমি। আমাদের ওপর রাগ হয়েচে নাকি?

—সেডা কি কথা? কেন?

—আমাদের বাড়ীতে যাস্নি ক'দিন।

—কখন যাই বলো ঠাকুরঝি। ক্ষার সেদ্ধ করলাম, ক্ষার কাচলাম। চিঁড়ে কোটা, ধান ভানা সবই তো একা হাতে করচি। শাশুড়ি আজকাল আর লগি ছান না বড় একটা—

নিস্তারিণী সুরূপা বৌ, যদিও তার বয়েস হয়েচে এদের অনেকের চেয়ে বেশি। তার হাত পা নেড়ে ঠোঁটের হাসি ঠোঁটে চেপে কথাটা বলবার ভঙ্গিতে হিমি আর বিরাজ এক সঙ্গে কৌতুকে হি হি করে হেসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে যেন কোথাকার একটা বাঁধ খুলে গেল, হাসির ঢেউয়ের রোল উঠলো চারিদিক থেকে।

হিমি বললে—নিস্তারদি কি হাসাতেই পারে! এসো না জলে নামো না নিস্তারদি।

বিরাজ বললে—সেই গানটা গান না দিদি। নিধুবাবুর—কি চমৎকার গাইতে পারেন ওটা! বিধুদিদি যেটা গাইতো।

সবাই জানে নিস্তারিণী সুস্বরে গান গায়। হাসি গানে গল্পে মজলিস জমাতে ওর জুড়ি বৌ নেই গাঁয়ে। সেই জন্যেই মুখ ফিরিয়ে অনেকে বলে—অতটা ভালো না মেয়েমানুষের। যা রয় সয় সেতাই না ভালো!

নিস্তারিণী হাত নেড়ে গান ধরলে—

ভালবাসা কি কথার কথা সই
মন যার মনে গাঁথা
শুকাইলে তরুবর বাঁচে কি জড়িত লতা—
প্রাণ যার প্রাণে গাঁথা—

সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল।—

কেমন হাতের ভঙ্গি, কেমন গলার সুর! কেমন চমৎকার দেখায় ওকে হাত নেড়ে নেড়ে গান গাইলে! একজন বললে—নীলবরণী গানটাও বড় ভালো গান আপনি।

নিস্তারিণীও খুশি হোলো। সে ভুলে গেল সাত বছর বয়েসে তার বাবা অনেক টাকা পণ পেয়ে শ্রোত্রিয় ঘরে মেয়েকে বিক্রি করেছিলেন—খুব বেশি টাকা, পঁচাত্তর টাকা। খোঁড়া স্বামীর সঙ্গে সে খাপ খাইয়ে চলতে পারে নি কোনোদিন, শাশুড়ির সঙ্গেও নয়। যদিও স্বামী তার ভালোই। শ্বশুর ভজগোবিন্দ বাঁড়ুয্যে আরো ভালো। কখনো ওর মতের বিরুদ্ধে যায় নি। ইদানিং গরীব হয়ে পড়েচে, খেতে পরতে দিতে পারে না, ছেলেমেয়েদের পেটপুরে ভাত জোটে না—তবুও নিস্তারিণী খুশি থাকে। সে জানে গ্রামে তাকে ভালো-চোখে অনেকেই দেখে না, না দেখলে—বয়েই গেল! কলা! যত সব কলাবতী বিদ্যেধরী সতী সাধ্বীর দল! মারো ঝাঁটা।

ও জলে নেমেচে। বিরাজ ওর সিক্ত সুঠাম দেহটা আদরে জড়িয়ে ধরে বললে—নিস্তার দিদি। সোনার দিদি!…কি সুন্দর গান, কি সুন্দর ভঙ্গি তোমার! আমি যদি পুরুষ হতুম, তবে তোর সঙ্গে দিদি পীরিতে পড়ে যেতুম—মাইরি বলচি কিন্তু—একদিন বনভোজন করবি চল্।

কেন হঠাৎ নিস্তারিণীর মনে অনেকদিন আগেকার ও ছবিটা ভেসে উঠলো? মনের

অদ্ভুত চরিত্র। কখন কি করে বসে সেটা কেউ বলতে পারে? সেই যে তার প্রণয়ীর সঙ্গে একদিন নদীর ধারে বসেছিল—সেই ছবিটা। আর একটা খুব সাহসের কাজ করে বসলো নিস্তারিণী। যা কখনো কেউ গাঁয়ে করে না, মেয়েমানুষ হয়ে। বললে—ঠাকুরজামাই ভালো আছেন, বড়দি?

পুরুষের কথা এভাবে জিগ্যেস করা বেনিয়ম। তবে নিস্তারিণীকে সবাই জানে। ওর কাছ থেকে অদ্ভুত কিছু আসাটা সকলের গা-সওয়া হয়ে গিয়েচে।

পুজো প্রায় এসে গেল। ফণি চক্কত্তির চণ্ডীমণ্ডপে বসে গ্রামস্থ সজ্জনগণের মজলিস চলচে। তামাকের ধোঁয়ায় অন্ধকার হবার উপক্রম হয়েচে চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়া। ব্রাহ্মণদের জন্যে একদিকে মাদুর পাতা, অন্য জাতির জন্যে অপর দিকে খেজুরের চ্যাটাই পাতা। মাঝখান দিয়ে যাবার রাস্তা।

নীলমণি সমাদ্দার বললেন—কালে কালে কি হোলো হে।

ফণি চক্কত্তি বললেন—ও সব হোলো হঠাৎ-বড়লোকের কাণ্ড। তুমি আমি করবোডা কি? তোমার ভালো না লাগে, সেখানে যাবা না। মিটে গেল।

শ্যামলাল মুখুয্যে বললেন—তুমি যাবা না, আবাইপুরের বামুনেরা আসবে এখন। তখন কোথায় থাকবে মানডা?

—কেন, কি রকম শুনলে?

—গাঁয়ের ব্রাহ্মণ সব নেমতন্ন করবে এবার ওর বাড়ী দুর্গোৎসবে।

—স্পদ্ধাডা বেড়ে গিয়েচে ব্যাটার। ব্যাটা হঠাৎ-বড়লোক কিনা!

লালমোহন পাল গ্রামের কোনো লোকের কোনো সমালোচনা না মেনে মহাধুমধামে দুর্গাপ্রতিমা তুললে। এবার অনেক দুর্গাপুজা এ গ্রামে ও পাশের সব গ্রামগুলিতে। প্রতি বছর যেমন হয়, গ্রামের গরীব দুঃখীরা পেট ভরে নারকোল নাড়ু, সরু ধানের চিঁড়ে ও মুড়কি খায়। নেমতন্ন ক' বাড়ীতে খাবে? সুক্তুনি, কচুরশাক, ডুমুরের ডালনা, সোনামুগের ডাল, মাছ ও মাংস, দই, রসকরা সব বাড়ীতেই। লালমোহন পালের নিমন্ত্রণ এ গাঁয়ের কোনো ব্রাহ্মণ নেন নি। এ পর্যন্ত নালু পাল ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে এসেচে পরের বাড়ীতে টাকা দিয়ে…কিন্তু তার নিজের বাড়ীতেই ব্রাহ্মণ ভোজন হবে, এতে সমাজপতিদের মত হোলো না। নালু পাল হাত জোড় করে বাড়ী বাড়ী দাঁড়ালো, ফণি চক্কত্তির চণ্ডীমণ্ডপে একদিন এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে ফুলবেঞ্চের বিচার চললো। শেষ পর্যন্ত ওর আপীল ডিস্‌মিস হয়ে গেল।

তুলসী এল ষষ্ঠীর দিন তিলু নিলুর কাছে। কস্তাপেড়ে শাড়ী পরনে, গলায় সোনার মুড়কি মাদুলি, হাতে যশম। গড় হয়ে তিলুর পায়ের কাছে প্রণাম করে বললে—হ্যাঁ দিদি, আমার ওপরে গাঁয়ের ঠাকুরদের এ কি অত্যাচার দেখুন!

—সে সব শুনলাম।

—ভাত কেউ খাবেন না। আমি গাওয়া ঘি আনিয়েচি, লুচি ভেজে খাওয়াবো। আপনি একটু জামাইঠাকুরকে বলুন দিদি। আপনাদের বাড়ীতি তো হয়ই, আমার নিজের বাড়ীতি পাতা পেড়ে বেরাহ্মণরা খাবেন, আপনাদের পায়ের ধুলো পড়ুক আমার বাড়ীতি, এ সাধ আমার হয় না? লুচি চিনির ফলারে অমত কেন করবেন ঠাকুরমশাইরা?

ভবানী বাঁড়ুয্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিলুর মুখে সব শুনে তিনি বললেন—আমার সাধ্য না। এ কুলীনের গাঁয়ে ও সব হবে না। তবে আংরালি গদাধরপুর আর নসরাপুরের ব্রাহ্মণদের অনেকে আসবে। সেখানে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বেশি। নালু পালকে তিনি সেইরকম পরামর্শ দিলেন।

নালু পাল হাত জোড় করে বললে—আপনি থাকবেন কি না আমায় বলুন জামাইঠাকুর।

—থাকবো।

—কথা দেচ্চেন?

—নইলে তোমার এখানে আসতাম?

—ব্যস। কোনো বেরাহ্মণ দেবতাকে আমার দরকার নেই, আপনি আর দিদিরা থাকলি ষোল কলা পুন্ন্য হোলো আমার।

—তা হয় না নালু। তুমি ওগাঁয়ের ব্রাহ্মণদের কাছে লোক পাঠাও নয়তো নিজে যাও। তাঁদের মত নাও।

আংরালি থেকে এলেন রামহরি চক্রবর্ত্তী বলে একজন ব্যক্তি আর নসরাপুর থেকে এলেন সাতকড়ি ঘোষাল। তাঁরা সমাজের দালাল। তাঁরা সন্ধির শর্ত্ত করতে এলেন নালু পালের সঙ্গে।

রামহরি চক্রবর্ত্তীর বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে, বেঁটে, কালো, একমুখ দাড়ি গোঁফ। মাথার টিকিতে একটি মাদুলি বাঁধা। বাহুতে রামকবচ। বিদ্যা ঐ গ্রামের সেকালের হরু গুরুমশায়ের পাঠশালার নামতার ডাক পর্য্যন্ত। তিনি ছিলেন ঘোষার সর্দ্দার। অর্থাৎ নামতা ঘোষবার বা চেঁচিয়ে ডাক পড়াবার তিনিই ছিলেন সর্দ্দার।

রামহরি সব শুনে বললেন—এই সাতকড়ি ভায়াও আছে। পালমশায়, আপনি ধনী লোক, আমরা সব জানি। কিন্তু আপনার বাড়ীতে পাতা পাড়িয়ে ব্রাহ্মণ খাওয়ানো, এ কখনো এ দেশে হয়নি। তবে তা আমরা দুজনে করিয়ে দেবো। কি বল হে সাতকড়ি?

সাতকড়ি ঘোষাল অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সের লোক, তবে বেশ ফর্সা আর একটু দীর্ঘাকৃতি। কৃশকায়ও বটে। মুখ দেখে মনে হয় নিরীহ, ভালো মানুষ, হয়তো কিছু অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, সাংসারিক দিক থেকে।

সাতকড়ি মাথা নেড়ে বললেন—কথাই তাই।

—তুমি কি বলচ?

—আপনি যা করেন দাদা।

—তা হোলে আমি বলে দিই?

—দিন।

নালু পালের দিকে ফিরে রামহরি ডানহাতের আঙুলগুলো সব ফাঁক করে তুলে দেখিয়ে বললেন—পাঁচ টাকা করে লাগবে আমাদের দুজনের।

—দেবো।

—ব্রাহ্মণদের ভোজন দক্ষিণে দিতি হবে এক টাকা।

—ওইটে কমিয়ে আট আনা করতি হবে।

—আর এক মালসা ছাঁদা দিতি হবে—লুচি, চিনি, নারকেলের নাড়ু। খাওয়ার আগে।

—তাও দেবো, কিন্তু দক্ষিণেটা আট আনা করুন।

—আমাদের পাঁচ টাকা করে দিতি হবে, খাওয়ার আগে কিন্তু। এর কম হবে না।

—তাই দেবো। তবে কম্‌সে কম একশো ব্রাহ্মণ এনে হাজির করতি হবে। তার কম হলি আপনাদের মান রাখতি পারবো না।

রামহরি চক্রবর্ত্তী মাথার মাদুলি সুদ্ধ টিকিটা দুলিয়ে বললে—আলবৎ এনে দেবো। আমার নিজের বাড়ীতিই তো ভাগ্নে, ভাগ্নীজামাই, তিন খুড়তুতো ভাই, আমার নিজের চার ছেলে, দুই ছোট মেয়ে। তারা সবাই আসবে। সাতকড়ি ভায়ারও শত্তুরের মুখি ছাই দিয়ে পাঁচটি। তারাও আসবে। একশোর অর্দ্ধেক তো এখেনেই হয়ে গেল। গেল কিনা?

ক্ষমতা আছে রামহরি চক্রবর্ত্তীর। ব্রাহ্মণভোজনের দিন দলে দলে ব্রাহ্মণ আসতে লাগলো। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের হাত ধরে। বড় উঠোনে সামিয়ানার তলায় সকলের জায়গা ধরলো না। "দীয়তাং ভুজ্যতাং" ব্যাপার চললো। গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি আর চিনি এক এক ব্রাহ্মণে যা টানলে! দেখবার মত হোলো দৃশ্যটা। কখনো এ অঞ্চলে এত বৃহৎ ও এত উচ্চশ্রেণীর ভোজ কেউ দেয় নি। যে যত পারে পেট ভরে গরম লুচি, মালপুয়া, চিনি ও নারকোলের রসকরা দেওয়া হোলো—তার সঙ্গে ছিল বৈকুণ্ঠপুরের সোনা গোয়ালিনীর উৎকৃষ্ট শুকো দই, এদেশের মধ্যে নামডাকী জিনিস। ব্রাহ্মণেরা ধন্য ধন্য করতে লাগলো খেতে খেতেই। কে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললে—বাবা নালু, পড়াহ ছিল কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকে—

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচ, দু'চারি আদার কুচি
কচুরি তাহাতে খান দুই—

খাইনি কখনো। কে খাওয়াচ্ছে এ গরীব অঞ্চলে? তা আজ বাবা তোমার বাড়ী এসে খেয়ে—

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো—যা বললেন, দাদামশাই। যা বললেন—

দক্ষিণা নিয়ে ও ছাঁদার মালসা নিয়ে ব্রাহ্মণের দল চলে গেলে দালাল রামহরি চক্রবর্ত্তী নালু পালের সামনে এসে বললেন—কেমন পালমশাই? কি বলেছিলাম আপনারে? ভাত ছড়ালি কাকের অভাব?

নালু পাল সঙ্কুচিত হয়ে হাতজোড় করে বললে—ছি ছি, ও কথা বলবেন না। ওতে আমার অপরাধ হয়। আমার কত বড় ভাগ্যি আজকে, যে আজ আমার বাড়ী আপনাদের পায়ের ধুলো পড়লো। আপনাদের দালালি নিয়ে যান। ক্ষ্যামতা আছে আপনাদের।

—কিছু ক্ষ্যামতা নেই। এ ক্ষ্যামতার কথা না পালমশাই। সত্যি কথা আর হক কথা ছাড়া রামহরি বলে না। তেমন বাপে জন্মো দেয় নি। লুচি চিনির ফলার এ অঞ্চলে ক'দিন ক'জনে খাইয়েচে শুনি? ঐ নাম শুনে সবাই ছুটে এসেচে। এ গাঁয়ের কেউ বুঝি আসে নি? তা আসবে না। এদের পায়া-ভারি অনেক কিনা!

—একজন এসেচেন, ভবানী বাঁড়ুয্যে মশায়।

রামহরি আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—কি রকম কথা! দেওয়ানজির জামাই?

—তিনিই।

—আমার সঙ্গে একবার আলাপ করে ছান না পালমশাই?

সব ব্রাহ্মণের খাওয়া চুকে যাওয়ার পরে ভবানী বাঁড়ুয্যে খোকাকে নিয়ে নিরিবিলি জায়গায় বসে আহার করছিলেন। খোকা জীবনে লুচি এই প্রথম খেলে। বলছিল—এরে লুচি বলে বাবা?

—খাও বাবা ভালো করে। আর নিবি?

বালক ঘাড় নেড়ে বললে—হুঁ।

ভবানীর ইঙ্গিতে তিলু খানকতক গরম লুচি খোকার পাতে দিয়ে গেল। ভবানীকে তিলু ও নিলুই খাবার পরিবেশন করছিল। এমন সময় নালু পাল সেখানে রামহরি চক্রবর্ত্তীকে নিয়ে ঢুকে ভোজনরত ভবানীর সামনে অথচ হাত-দশেক দূরে জোড়হাতে দাঁড়ালো।

—কি?

—ইনি এসেচেন আপনার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে।

রামহরি চক্রবর্ত্তী প্রণাম করে বললেন—দেখে বোঝলাম আজ কার মুখ দেখেই উঠিচি।

ভবানী হেসে বললেন—খুব খারাপ লোকের মুখ তো?

—অমন কথাই বলবেন না জামাইবাবু। আমি যদি আগে জানতাম আপনি আর আমার মা এখেনে এসে খাবেন, তবে পালমশায়কে বলতাম আর অন্ত কোনো বামুন এল না এল, আপনার বয়েই গেল। এমন নিধি পেয়ে আবার বামুন খাওয়ানোর জন্ত পয়সা খরচ? কই, মা কোথায়? ছেলে একবার না দেখে যাবে না যে, বার হও মা আমার সামনে।

তিলু আধঘোমটা দিয়ে এসে সামনে দাঁড়াতেই রামহরি হাত জোড় করে নমস্কার করে বললে—যেমন শিব, তেমনি শিবানী। দিনডা বড্ড ভালো গেল আজ পালমশাই। মা, ছেলেডারে মনে রেখো।

ভবানীকে তিলু ফিস্ ফিস্ করে বললে—পুন্নিমের দিন আমাদের বাড়ীতি দেবেন পায়ের ধুলো? খোকার জন্মদিনের পরবয় হবে। এসে খাবেন।

এই রকমই বিধি। পরপুরুষের সঙ্গে কথা কওয়ার নিয়ম নেই, এমন কি সামনেও কথা বলবার নিয়ম নেই। একজনকে মধ্যস্থ করে কথা বলা যায় কিন্তু সরাসরি নয়। ভবানী বুঝিয়ে বলবার আগেই রামহরি চক্রবর্ত্তী বললেন—আমি তাই করবো মা। পরবন্ন খেয়ে আসবো। এ আমার ভাগ্যি। এ ভাগ্যির কথা বাড়ী গিয়ে তোমার বৌমার কাছে গল্প করতি হবে।

—তাঁকেও আনবেন না?

—না মা, সে সেকেলে লোক। আপনাদের মত আজকালের উপযুক্ত নয়। সে পুরুষমানুষের সামনে বেরুবেই না। আমিই এসে আমার খোকন ভাইয়ের সঙ্গে পরবন্ন ভাগ করে খেয়ে যাবো। আর আপনাদের গুণ গেয়ে যাবো।

নীলমণি সমাদ্দারের স্ত্রী আন্নাকালী তাঁর পুত্রবধূ সুবাসীকে বললেন—হ্যাঁ বৌমা, কিছু শুনলে নাকি গাঁয়ে? ও দিকির কথা?

পুত্রবধূ জানে শাশুড়ি ঠাকরুণ বলচেন, বড়লোকের বাড়ীর দুর্গোৎসবে কাঁকালী নেমন্তন্নটা ফস্‌কে যাবে, না টিকে থাকবে! ওদের অবস্থা হীন বলে এবং কখনো কিছু খেতে পায় না বলে ক্রিয়াকর্ম্মের নিমন্ত্রণের আমন্ত্রণের দিকে ওদের নজরটা একটু প্রখর।

সুবাসী ভালোমানুষ বৌ। লাজুক আগে ছিল, এখন ক্রমাগত পরের বাড়ীতে ধার চাইতে গিয়ে গিয়ে লজ্জা হারিয়ে ফেলেচে। খবরাখবর সেও কিছু সংগ্রহ করেচে। যা শুনেচে, তাই বললে' গাঁয়ের ব্রাহ্মণেরা কেউ খাবে না নালু পালের বাড়ী।

আন্নাকালী বললে—যাও দিকি একবার স্বর্ণদের বাড়ী!

—তুমি যাবে মা?

—আমি ডাল বাটি। ডাল ক'টা ভিজতি দিয়েলাম, না বাটলি নষ্ট হয়ে যাবে, বচ্ছরের পোড়ানি তো উঠলোই না। শোন তোরে বলি বৌমা—

—কি মা?

আন্নাকালী এদিক ওদিক চেয়ে গলার সুর নিচু করে বললেন—স্বর্ণকে বলে আয় আর যদি কেউ না যায়, আমরা দু'ঘর লুকিয়ে যাবো একটু বেশী রাত্তির। তুই কি বলিস?

—ফণি জ্যাঠামশাই কি ওঁর বৌ দেখ'ত পেলি বাঁচবে?

—রাত হলি যাবো। কেডা টের পাচ্চে।

—এ গাঁয়ে গাছপালার কান আছে।

—তুই জেনে আয় তো!

সুবাসী গেল যতীনের বৌ স্বর্ণের কাছে। এরাও গাঁয়ের মধ্যে বড্ড গরীব। একরাশ থোড় কুটছে বসে বসে স্বর্ণ। পাশে দুটো ডেঙো ডাঁটার পাকা ঝাড়। সুবাসী বললে—কি রান্না করচো স্বর্ণদিদি?

—এসো সুবাসী। উনি বাড়ী নেই. তাই ভাবলাম মেয়েমানুষির রান্না আর কি করবো,

ডাঁটা শাকের চচ্চড়ি করি আর কলায়ের ডাল রাঁধি।

—সত্যি তো।

—বোস্ সুবাসী।

—বসবো না দিদি। শাশুড়ি বলে পাঠালে তোমরা কি তুলসীদিদিদের বাড়ী নেমন্তন্নে যাবা?

—ননদ তো বলছিল, যাবা নাকি বৌদিদি? আমি বললাম, গাঁয়ের কোনো বামুন যাবে না, সেখানে কি করে যাই বল। তোরা যাবি?

—তোমরা যদি যাও, তবে যাই।

—একবার নন্দরাণীকে ডেকে নিয়ে আয় দিকি।

যতীনের বোন নন্দরাণীকে ফেলে ওর স্বামী আজ অনেকদিন কোথায় চলে গিয়েচে। কষ্টে সৃষ্টে সংসার চলে। যতীনের বাবা ৺রূপলাল মুখুয্যে কুলীন পাত্রেই মেয়ে দিয়েছিলেন অনেক যোগাড়যন্ত্র করে। কিন্তু সে পাত্রটির আরো অনেক বিয়ে ছিল, একবার এসে কিছু প্রণামী আদায় করে শ্বশুরবাড়ী থেকে চলে যেতো। নন্দরাণীর ঘাড়ে দু'তিনটি কুলীন কন্যার বোঝা চাপিয়ে আজ বছর চার-পাঁচ একেবারে গা ঢাকা দিয়েচে। কুলীনের ঘরে এই রকমই নাকি হয়।

নন্দরাণী পিঁড়ি পেতে বসে রোদে চুল শুকুচ্ছিল। সুবাসীর ডাকে সে উঠে এল। তিনজনে মিলে পরামর্শ করতে বসলো।

নন্দরাণী বললে—বেশি রাতে গেলি কেডা ছাখচে?

স্বর্ণ বললে—তবে তাই চলো। তুলসীকে চটিয়ে লাভ নেই। আপদে বিপদে তুলসী বরং দেখে, আর কেডা দেখবে? একঘরে করার বেলা সবাই আছে।

অনেক রাত্রে ওরা লুকিয়ে গেল তুলসীদের বাড়ী। তুলসী যত্ন করে খাওয়ালে ওদের। সঙ্গে এক এক পুঁটুলি ছাঁদা বেঁধে দিলে। যতীন সে রাত্রেই বাড়ী এল। স্বর্ণ এসে দেখলে, স্বামী শেকল খুলে ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে বসে আছে। স্ত্রীকে দেখে বললে—কোথায় গিইছিলে? হাতে ও কি? গাইঘাটা থেকে দু'কাঠা সোনা মুগ চেয়ে আনলাম এক প্রজা-বাড়ী থেকে। ছেলেপিলে খাবে আনন্দ ক'রে। তোমার হাতে ও কি গা?

—সে খোঁজে দরকার নেই। খ'বে তো?

—খিদে পেয়েচে খুব। ভাত আছে?

—বোসো না। যা দিই খাও না।

স্বামীর পাতে অনেকদিন পরে সুখাদ্য পরিবেশন করে দিতে পেরে স্বর্ণ বড় খুশি হোলো। দরিদ্রের ঘরণী সে, শ্বশুর বেঁচে থাকতেও দেখেচে মোটা চালভাজা ছাড়া কোনো জলপান জুটতো না তাঁর। ইদানীং দাঁত ছিল না বলে স্বর্ণ শ্বশুরকে চালভাজা গুঁড়ো করে দিত।

যতীন বললে—বাঃ, এ সব পেলে কোথায়?

—কাউকে বোলো না। তুলসীদের বাড়ী। তুলসী নিজে এসে হাত জোড় করে

সেদিন নেমন্তন্ন করে গেল। বড্ড ভালো মেয়ে। ঠ্যাকার অংখার নেই এতটুকু।

—কে কে গিয়েছিলে?

—নন্দরাণী আর সুবাসী। ছেলেমেয়েরা। তুলসী দিদি কি খুশি! সামনে দাঁড়িয়ে খাওয়ালে। আসবার সময় জোর করে এক মালসা লুচি চিনি ছাঁদা দিলে।

—ভালো করেচ। খেতে পায় না কিছু, কেডা দিচ্চে ভালো খেতি একটু?

—যদি টের পায় গাঁয়ে?

—ফাঁসি দেবে না শূলে দেবে? বেশ করেচ। নেমন্তন্ন করেছিল, গিয়েচ। বিনি নেমন্তন্নে তো যাও নি।

—ঠাকুরজামাই ছিলেন। তিলুদিদি নিলুদিদি ছিল।

—ওদের কেউ কিছু বলতি সাহস করবে না। আমরা গরীব, আমাদের ওপর যত দোষ এসে পড়বে। তা হোক। পেট ভরে লুচি খেয়েচে? ছেলেমেয়েদের খাইয়েচ? ওদের জন্যে রেখে দ্যাও, সকালে উঠে খাবে এখন। কাউকে গল্প করে বেড়িও না যেখানে সেখানে। মিটে গেল। তুমি বেশ করে খেয়েচ কিনা বলো।

—না খেলি তুলসীদিদি শোনে? হাত-জোড় করে দাঁড়িয়ে। শুধু বলবে খ্যালেন না, পেট ভরলো না—

খোকার জন্মতিথিতে রামহরি চক্রবর্ত্তী এলেন ভবানীর বাড়ীতে। সঙ্গে তাঁর দুটি ছেলে। সঙ্গে নিয়ে এলেন খোকনের জন্যে স্ত্রীর প্রদত্ত সরু ধানের খই ও ক্ষীরের ছাঁচ। ভবানীর বাড়ীর পশ্চিম পোতার ঘরের দাওয়ায় মাদুর বিছানো রয়েচে অতিথিদের জন্যে। বেশি লোক নয়, রামকানাই কবিরাজ, ফণি চক্কত্তি, শ্যাম মুখুয্যে, নীলমণি সমাদ্দার আর যতীন। মেয়েদের মধ্যে নিস্তারিণী, যতীনের স্ত্রী স্বর্ণ আর নীলমণি সমাদ্দারের পুত্রবধূ সুবাসী।

ফণি চক্কত্তি বললেন—আরে রামহরি যে! ভালো আছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রণাম দাদা। আপনি কেমন?

—আর কেমন! এখন বয়েস হয়েচে, গেলেই গেলো। বুড়োদের মধ্যি আমি আর নীলমণি দাদা এখনো ভালোই আছি, এবং টিকে আছি। আর তো একে একে সব চলে গেল।

—দাদার বয়েস হোলো কত?

—এই উনসত্তর যাচ্চে।

—বলেন কি? দেখলি তো মনে হয় না। এখনো দাঁত পড়ে নি।

—এখনো আধসের চালির ভাত খাবো। আধ কাঠা চিঁড়ের ফলার খাবো। আধখানা পাকা কাঁটাল এক জায়গায় বসে খাবো। দু'বেলা আড়াইসের দুধ খাই এখনো, খেয়ে হজম করি।

—সেই খাওয়ার ভোগ আছে বলে এখনো এমনডা শরীল রয়েচে। নইলি—

—আচ্ছা, একটা কথা বলি রামহরি। সেদিন কি কাণ্ডটা করলে তোমরা! আঙরালি আর গদাধরপুরির বাঁওনদের কি একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই? নেমন্তন্ন করেচে বলেই পাতা পাড়তি হবে যেয়ে শূদ্দুর বাড়ী! ছিঃ ছিঃ, ব্রাহ্মণ তো? গলায় পৈতে রয়েচে তো? নাই বা হোলো কুলীন। কুলীন সকলে হয় না, কিন্তু মান অপমান জ্ঞান সবার থাকা দরকার।

কথাগুলোতে নীলমণি সমাদ্দার বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী ও পুত্রবধূও সেদিন যে বেশি রাত্রে লুকিয়ে ওদের বাড়ী গিয়ে ভোজ খেয়ে এসেছে একথা প্রকাশ না হয়ে পড়ে। পড়লেই বড় মুশকিল। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় ঠিক সেই সময় ভবানী বাঁড়ুয্যে এসে ওদের খাবার জন্যে আহ্বান করলেন। কথা চাপা পড়ে গেল।

শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ রামহরি চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে ফণি চক্কত্তি ও এঁরা খাবেন না। অন্য জায়গায় পিঁড়ি পেতে বসিয়ে খাওয়ান হোলো এবং শুধু তাই নয়, খোকাকে তার জন্মদিনের পায়েস খাওয়ানোর ভার পড়লো তাঁর ওপর। রামহরি চক্রবর্ত্তীর পাশেই খোকার পিঁড়ি পাতা। ঘোমটা দিয়ে তিলু ওদের দুজনকে বাতাস করতে লাগলো বসে।

রামহরি বললেন—তোমার নাম কি দাদু?

খোকা লাজুক সুরে বললে—শ্রীরাজ্যেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

—কি পড়?

এবার উৎসাহ পেয়ে খোকা বললে—হরু গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়ি। কলকাতায় থাকে শম্ভুদাদা, তার কাছে ইংরিজি পড়তি চেয়েচি, সে শেখাবে বলেচে।

—বাঃ বাঃ, এইটুকু ছেলে নাকি ইঙ্গিরি পড়বে! তবে তো তুমি দেশের হাকিম হবা। বেশ, দাদু বেশ। হাকিম হওয়ার মত চেহারাখানা বটে।

—মা বলচে, আপনি আর কিছু নেবেন না?

—না, না, যথেষ্ট হয়েচে। তিনবার পায়েস নিইচি, আবার কি? বেঁচে থাকো দাদু।

বামুন ভোজনের দালাল রামহরি চক্রবর্ত্তীকে এমন সম্মান কেউ দেয় নি কুলীন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে। বিদায় নিয়ে যাবার সময়ে রামহরি নিলুকে প্রণাম করে বললেন—চলি মা, চেরডা কাল মনে থাকবে, আজ যা করলে মা আমার। এ যত্ন কখনো ভোলবো না। আজ বোঝলাম আপনারা এ দিগরের রামা শামার মত লোক নন। দু'হাত দু'পা থাকলি মানুষ হয় না মা। গলায় পৈতে ঝোলালি কুলীন ব্রাহ্মণ হয় না—

কত কি পরিবর্ত্তন হয়ে গেল গ্রামে। রেল খুললো চাকদা থেকে চুয়াডাঙ্গা পর্য্যন্ত। একদিন তিলু ও নিলু স্বামীর সঙ্গে আড়ংঘাটায় ঠাকুর দেখতে গেল জ্যৈষ্ঠ মাসে। ওরা গরুর গাড়ী করে চাকদা পর্য্যন্ত এসে গঙ্গাস্নান করে সেখানে রেঁধেবেড়ে খেলো। সঙ্গে খোকা ছিল, তার খুব উৎসাহ রেলগাড়ী দেখবার। শেষকালে রেলগাড়ী এসে গেল। ওরা সবাই সেই পরমাশ্চর্য্য জিনিসটিতে চড়ে গেল আড়ংঘাটা। ফিরে এসে বছর খানেক ধরে তার গল্প

আর ফুরোয় না ওদের কারো মুখে।

খোকা এদিকে পাঠশালার পড়া শেষ করলে। ভবানী একদিন তিলুর সঙ্গে পরামর্শ করলেন ওকে ছাত্রবৃত্তি প'ড়িয়ে মোক্তারী পড়াবেন না টোলে সংস্কৃত পড়তে দেবেন। মোক্তারী পড়লে সতীশ মোক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

তিলু বললে—নিলুকে ডাকো।

নিলুর আর সে স্বভাব নেই। এখন সে পাকা গিন্নী। সংসারের সব কাজ নিখুঁতভাবে খুঁটিয়ে করতে ওর জুড়ি নেই। সে এসে বললে—টুলুকে জিজ্ঞেস করো না? আহা, কি সব বুদ্ধি।

টুলুর ভালো নাম রাজেশ্বর। সে গম্ভীর স্বভাবের ছেলে, চেহারা খুব সুন্দর, যেমন রূপ তেমনি বুদ্ধি। বাবাকে বড় ভালোবাসে। বিশেষ পিতৃভক্ত। সে এসে হেসে বললে—বাবা বলো না? আমি কি জানি? আর ছোট মা তো কিছু জানেই না। কলের গাড়ীতে উঠে সেদিন দেখলে না? পান সাজাতে বসলো। রানাঘাট থেকে কলের গাড়ী ছাড়লো আর টুক করে এলো আড়ংঘাটা। আর ছোট মার কি কষ্ট! বললে, দুটো পান সাজতি সাজতি গাড়ী এসে গেল তিনকোশ রাস্তা। হি-হি—

নিলু বললে—তা কি জানি বাবা, আমরা বুড়োসুড়ো মানুষ। চাকদাতে আগে আগে গঙ্গাস্নান করতি যাতাম পানের বাটা নিয়ে পান সাজতি সাজতি। অমন হাসতি হবে না তোমারে—

—আমি অন্যায় কি বল্লাম? তুমি কি জানো পড়াশুনোর? মা তবুও সংস্কৃত পড়েচে কিছু কিছু। তুমি একেবারে মুক্থু।

—তুই শেখাস আমায় খোকা।

—আমি শেখাবো? এই বয়সে উনি ক, খ, অ, আ—ভারি মজা।

—তোরে ছানার পায়েস খাওয়াবো ওবেলা।

—ঠিক?

—ঠিক।

—তাহলি তুমি খুব ভালো। মোটেই মুক্থু না।

ভবানী বললে—আঃ এই টুলু। ওসব এখন রাখো। আসল কথার জবাব দে।

—তুমি বলো বাবা।

—কি ইচ্ছে তোমার?

এই সময় নিলু আবার বললে—ওকে মোক্তারি-টোক্তারি করতি দেবেন না। ইংরিজি পড়ান ওকে। কলকেতায় পাঠাতি হবে। ওই শম্ভু ছাখো কেমন করেচে কলকেতায় চাকরী করে। তার চেয়ে কম বুদ্ধিমান কি টুলু?

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—কি বলো খোকা?

—ছোট মা ঠিক বলেচে। তাই হোক বাবা। মা কি বলো? ছোট মা ঠিক বলে নি?

নিলু অভিমানের সুরে বললে—কেন মুক্‌খু যে? আমি আবার কি জানি?

টুলু বললে—না ছোটমা। হাসি না। তোমার কথাডা আমার মনে লেগেচে। ইংরিজি পড়তি আমারও ইচ্ছে—তাই তুমি ঠিক করো বাবা! ইংরিজি শেখাবে কে?

নিলু বললে—তা আমি কি করে বলবো? সেডা তোমরা ঠিক কর।

তাই তো, কথাটা ঠিক বলেচে খোকা। ইংরিজি পড়বে কার কাছে খোকা। গ্রামে কেউ ইংরিজি জানে না, কেবল জানে ইংরিজি-নবীশ শম্ভু রায়। সে বহুকাল থেকে আমুটি কোম্পানীর হৌসে কাজ করে, সায়েব-সুবোদের সঙ্গে ইংরিজি বলে। গাঁয়ে এজন্যে তার খুব সম্মান—মাঝে মাঝে অকারণে গাঁয়ের লোকদের সামনে ইংরিজি বলে বাহাদুরি নেবার জন্যে।

তিলু হেসে বললে—এই খোকা, তোর শম্ভুদাদা কেমন ইংরিজি বলে রে?

—ইট্ সেইষ্ট মাট্ ফুট্—ইট সুনটু-ফুট-ফিট্—

ভবানী বললে—বা রে! কখন শিখলি এত?

টুলু বললে—শুনে শিখিচি। বলে তাই শুনি কিনা। যা বলে, সেরকম বলি।

ভবানী বললে—সত্যি, ঠিক ইংরিজি শিখেচে ছাখো। কেমন বলচে।

নিলু বললে—সত্যি, ঠিক বলচে তো!

তিনজনেই খুব খুশি হোলো খোকার বুদ্ধি দেখে। খোকা উৎসাহ পেয়ে বললে—আমি আরো জানি, বলবো বাবা? সিট্ এ হিপ্-সিট্-ফুট্-এপট্-আই-মাই—ও বাবা এ দুটো কথা খুব বলে আই আর মাই—সত্যি বলচি বাবা—

নিলু অবাক হয়ে ভাবলে—কি আশ্চর্য্য বুদ্ধিমান তাদের খোকা!

প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী নীলকুঠির চাকরী যাওয়ার পরে দু'বছর বড় কষ্ট পেয়েচে। আমীনের চাকরী জোটানো বড় কষ্ট। বসে বসে সংসার চলে কোথা থেকে। অনেক সন্ধানের পর বর্ত্তমান চাকরীটা জুটে গিয়েচে বটে কিন্তু নীলকুঠির মত অমন সুখ আর কোথায় পাওয়া যাবে চাকরীর? তেমন ঘরবাড়ী, তেমন পসার-প্রতিপত্তি দিশী জমিদারের কাছারীতে হবে না হতে পারে না। চার বছর ত কাটলো এদের এখানকার চাকরীতে। এটা পাল এষ্টেটের বাহাদুরপুরের কাছারী। সকালে নায়েব ঘনশ্যাম চাকলাদার পাল্‌কি করে বেরিয়ে গেলেন চিতলমারির খাসখামারের তদারক করতে। প্রসন্ন আমীন একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। এরা নতুন মনিব, অনেক বুঝে চলতে হয় এদের কাছে, আর সে রাজারাম দেওয়ানও নেই, সেই নরহরি পেস্কারও নেই, সে বড়সাহেবও নেই। নায়েবের চাকর রতিলাল নাপিত ঘরে ঢুকে বললে—ও আমীনবাবু, কি করচেন?

—এই বসে আছি। কেন?

—নায়েববাবুর হাঁসটা ইদিকি এয়েল? দেখেচেন?

—দেখিনি।

—তামাক খাবেন?

—সাজ্ দিকি এট্টু।

রতিলাল তামাক সেজে নিয়ে এল। সে নিজে নিয়ে না এলে নায়েবের চাকরকে হুকুম করার মত সাহস নেই প্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর।

রতিলাল বললে—আমীনবাবু, সকালে তো মাছ দিয়ে গেলো না গিরে জেলে?

—দেবার কথা ছিল? গিরে কাল বিকেলে হাটে মাছ বেচছিল দেখিচি। আড় মাছ।

—রোজ তো ছায়, আজ এল না কেন কি জানি? নায়েবমশায় মাছ না হলি ভাত খেতি পারেন না মোটে। দেখি আর খানিক। যদি না আনে, জেলেপাড়া পানে দৌড়ুতি হবে মাছের জন্যি।

রতিলালের ভ্যাজ ভ্যাজ ভালো লাগছিল না প্রসন্ন চক্কত্তির। তার মন ভালো না আজ, তাছাড়া নায়েবের চাকরের সঙ্গে বেশিক্ষণ গল্প করবার প্রবৃত্তি হয় না। আজই না হয় অবস্থার বৈগুণ্যে প্রসন্ন চক্কত্তি এখানে এসে পড়েচে বেঘোরে, কিন্তু কি সম্মানে ও রোবদাবে কাটিয়ে এসেচে এতকাল মোল্লাহাটির কুঠিতে, তা তো ভুলতে পারচে না সে।

আপদ বিদায় করার উদ্দেশ্যে প্রসন্ন আমীন তাড়াতাড়ি বললে—তা মাছ যদি নিতি হয়, এই বেলা যাও, বেশি বেলা হয়ে গেলি মাছ সব নিয়ে যাবে এখন সোনাখালি বাজারে।

—যাই, কি বলেন?

—এখুনি যাও। আর দ্রিং কোরো না।

রতিলাল চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল সে মাছের খাড়ুই হাতে বার হয়ে গেল কাছারীর হাতা থেকে। প্রসন্ন চক্কত্তির মন শান্ত হয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। রোদে বসে তেল মেখে এইবার নেয়ে নেওয়া যাক। কাঁটাল গাছতলায় রোদে পিঁড়ি পেতে সে রাঙা গামছা পরে তেল মাখতে বসলো। স্নান সেরে এসে রান্না করতে হবে।

কত বেগুন এ সময়ে দিয়ে যেতো প্রজারা। বেগুন, ঝিঙে, নতুন মুলো। শুধু তাকে নয়, সব আমলাই পেতো। নরহরি পেস্কার তাকে সব তার পাওনা জিনিস দিয়ে বলতো,—প্রসন্নদা, আপনি হোলেন ব্রাহ্মণ মানুষ। রান্নাডা আপনাদের বংশগত জিনিস। আমার দুটো ভাত আপনি রেঁধে রাখবেন দাদা।

সুবিধে ছিল। একটা লোকের জন্যে রাঁধতেও যা, দুজন লোকের রাঁধতেও প্রায় সেই খরচ, টাকা তিন-চার পড়তো দুজনের মাসিক খরচ। নরহরি চাল ডাল সবি যোগাতো। চমৎকার খাঁটি দুধটুকু পাওয়া যেতো, এ ও দিয়ে যেতো, পয়সা দিয়ে বড় একটা হয়নি জিনিস কিনতে। আহা, গয়ার কথা মনে পড়ে।

গয়া!...গয়ামেম!

না। তার কথা ভাবলেই কেন ওর মন ওরকম খারাপ হয়ে যায়? গয়ামেম ওর দিকে ভালো চোখে তাকিয়েছিল। দুঃখের তো পারাপার নেই জীবনে, ছেলেবেলা থেকেই দুঃখের পেছনে ধোঁয়া দিতে দিতে জীবনটা কেটে গেল। কেউ কখনো হেসে কথা বলে নি, মিষ্টি গলায় কেউ কখনো ডাকে নি। গয়া কেবল সেই সাধটা পূর্ণ করেছিল জীবনের।

অমন সুঠাম সুন্দরী, এক রাশ কালো চুল। বড়সাহেবের আদরিণী আয়া গয়ামেম তার মত লোকের দিকে যে কেন ভালো চোখে চাইবে—এর কোন হেতু খুঁজে মেলে? তবু সে চেয়েছিল।

কেমন মিষ্টি গলায় ডাকতো—খুড়োমশাই, অ খুড়োমশাই—

বয়েসে সে বুড়ো ওর তুলনায়। তবু তো গয়া তাচ্ছিল্য করে নি। কেন করে নি? কেন ছলছুতো খুঁজে তার সঙ্গে গয়া হাসি মস্করা করতো, কেন তাকে প্রশ্রয় দিত? কেন অমন ভাবে সুন্দর হাসি হাসতো তার দিকে চেয়ে? কেন তাকে নাচিয়ে ও অমন আনন্দ পেতো? আজকাল গয়া কেমন আছে? কতকাল দেখা হয়নি। বড় কষ্টে পড়েচে হয়তো, কে জানে? কত দিন রাত্রে মন কেমন করে ওর জন্যে। অনেক কাল দেখা হয় নি।

—ও আমীনমশাই, মাছ প্যালাম না—

রতিলালের মাছের খাড়ুই হাতে প্রবেশ। সর্ব্বশরীর জলে গেল প্রসন্ন চক্কত্তির। আ মোলো যা, আমি তোমার এয়ার, তোমার দরের লোক? ব্যাটা জলটানা বাসন-মাজা চাকর, সমানে সমানে আজ খোশগল্প করতে এয়েচে একগাল দাঁত বার করে তার সঙ্গে। চেনে না সে প্রসন্ন আমীনকে? দিন চলে গিয়েছে, আজ বিষহীন ঢোঁড়া সাপ প্রসন্ন চক্কত্তি এ কথার উত্তর কি করে দেবে? সে মোল্লাহাটির নীলকুঠি নেই, সে বড়সাহেব শিপ্‌টনও নেই, সে রাজারাম দেওয়ানও নেই।

নীলকুঠির আমলে শাসন বলে জিনিস ছিল, লোকে ভয়ে কাঁপতো লাল মুখ দেখলে, এসব দিশী জমিদারের কাছারীতে ভূতের কেত্তন। কেউ কাকে মানে? মারো ঝুলো ঝাঁট্টা।

বিরক্তি সহকারে আমীন রতিলালের কথার উত্তরে বললে—ও। নীরসকণ্ঠেই বলে।

রতিলাল বললে—তেল মাখচেন?

—হুঁ।

—নাইতি যাবেন?

—হুঁ।

—কি রান্না করবেন ভাবচেন?

—কি এমন আর? ডাল আর উচ্ছে চচ্চড়ি। ঘোল আছে।

—ঘোল না থাকে দেবানি। সনকা গোয়ালিনী আধ কলসী মাঠাওয়ালা ঘোল দিয়ে গিয়েচে। নেবেন?

—না, আমার আছে।

বলেই প্রসন্ন চক্কত্তি রতিলালকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি গামছা কাঁধে নিয়ে ইছামতীতে নাইতে চলে গেল। কি বিপদই হয়েছে। ওর সঙ্গে এখন বক্ বক্ করো বসে বসে। খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই। ব্যাটা বেয়াদবের নাজির কোথাকার।

রান্না করতে করতেও ভাবে, কতদিন ধরে সে আজ একা রান্না করচে। বিশ বছর? না তারও বেশি। স্ত্রী সরস্বতী সাধনোচিত ধামে গমন করেচেন বহুদিন। তারপর থেকেই হাঁড়িবেড়ি হাতে উঠেচে। আর নামলো কই? রান্না করলে যা রোজই রেঁধে থাকে প্রসন্ন, তার অতি প্রিয় খাদ্য। খুব বেশি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মাসকলাইয়ের ডাল, উচ্ছে ভাজা। ব্যস্! হয়ে গেল। কে বেশি ঝঞ্চাট করে। আর অবিশ্যি ঘোল আছে।

—ডাল রান্না করলেন নাকি?

জলের ঘটি উঁচু করে আলগোছে খেতে খেতে প্রায় বিষম খেতে হয়েছিল আর কি। কোথাকার ভূত এ ব্যাটা, দেখচিস একটা মানুষ তেতপ্পরে দুটো খেতে বসেচে। এক ঘটি জল খাচ্চে, ঠিক সেই সময় তোমার কথা না বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল, না তোমার বাপের জমিদারি লাটে উঠেছিল বদমাইশ পাজি? বিরক্তির সুরে জবাব দেয় প্রসন্ন চক্কত্তি—হুঁ। কেন?

—কিসের ডাল?

—মাসকলাইয়ের।

—আমারে একটু দেবেন? বাটি আনবো?

—নেই আর। এক কাঁসি রেঁধেছিলাম, খেয়ে ফেললাম।

—আমি যে ঘোল এনিচি অ পনার জন্যি—

—আমার ঘোল আছে। কিনিছিলাম।

—এ খুব ভালো ঘোল। সনকা গোয়ালিনীর নামডাকী ঘোল। বিষ্টু ঘোষের বিধবা দিদি? চেনেন? মাঠাওয়ালা ঘোল ও ছাড়া কেউ কত্তি জানেও না। খেয়ে ছাখেন।

নামটা বেশ। মরুক গে। ঘোল খারাপ করে নি। বেশ জিনিসটা। এ গাঁয়ে থাকে সনকা গোয়ালিনী? বয়েস কত?

এক কল্কে তামাক সেজে খেয়ে প্রসন্ন একটু শুয়ে নিলে ময়লা বিছানায়। সবে সে চোখ একটু বুজেচে, এমন সময় পাইক এসে ডাক দিলে—নায়েবমশাই ডাকচেন আপনারে—

ধড়মড় করে উঠে প্রসন্ন চক্কত্তি কাছারী ঘরে ঢুকলো। অনেক প্রজার ভিড় হয়েচে। আমীনের জরীপী চিঠার নকল নিতে এসেচে আট-দশটি লোক। নায়েব ঘনশ্যাম চাকলাদার রাশভারি লোক, পাকা গোঁপ, মুখ গম্ভীর, মোটা ধুতি পরনে, কোঁচার মুড়ো গায়ে দিয়ে ফরাসে বসেছিলেন আধ ময়লা একটা গির্দ্দে হেলান দিয়ে। রূপো বাঁধানো ফর্সিতে তামাক দিয়ে গেল রতিলাল নাপিত।

আমীনের দিকে চেয়ে বললেন—খাসমহলের চিঠা তৈরী করেচেন?

—প্রায় সব হয়েচে। সামান্য কিছু বাকি।

—ওদের দিতি পারবেন? যাও, তোমরা আমীনমশাইয়ের কাছে যাও। এদের একটু দেখে দেবেন তো চিঠাগুলো। দূর থেকে এসেচে সব, আজই চলে যাবে।

প্রসন্ন চক্কত্তি বহুকাল এই কাজ করে এসেচে, গুড়ের কলসীর কোন্ দিকে সার গুড়

থাকে আর কোন্ দিকে ঝোলাগুড় থাকে, তাকে সেটা দেখাতে হবে না। খাসমহলের চিঠা তৈরি থাকলেই কি আর সব গোলমাল মিটে যায়? সীমানা সরহদ্দ নিয়ে গোলমাল থাকে, অনেক কিছু গোলমাল থাকে, চিঠাতে নায়েবের সই করাতে হবে—অনেক কিছু হাঙ্গামা। এখন অবেলায় অত শত কাজ কি হয়ে উঠবে? বলা যায় না। চেষ্টা করে অবিশ্যি দেখা যাক।

নীলকুঠির দিনে এমন সব ব্যাপারে ছু' পয়সা আসতো। সে সব অনেক দিনের কথা হোলো। এখন যেন মনে হয় সব স্বপ্ন।

প্রজাদের তরফ থেকে একজন লোক এগিয়ে এসে বললে—করে ন্যান আমীনবাবু। আপনারে পান খেতি কিছু দেবো এখন—

—কিছু কত?

—এক আনা করে মাথা পিছু দেবো এখন।

প্রসন্ন চক্কত্তি হাতের খেরো বাঁধা দপ্তর নামিয়ে রেখে বললে—তাহলি এখন হবে না। তোমার নায়েব মশাইকে গিয়ে বলতি পারো। চিঠে তৈরি হয়েচে বটে, এখনো সাবেক রেকর্ডের সঙ্গে মেলানো হয় নি সই হয় নি। এখনো দশ পনেরো দিন কি মাস খানেক বিলম্ব। চিঠে তৈরি থাকলিই কাজ হতে হয় না। অনেক কাঠ খড় পোড়াতি হয়।

প্রজাদের মোড়ল বিনীতভাবে বললে—তা আপনি কত বলচো আমীনবাবু?

সেও অভিজ্ঞ লোক, আইন আদালত জমিদারির কাছারীর গতিক এবং নাড়ী বিলক্ষণ জানে। কেন আমীনবাবু বেঁকে দাঁড়িয়েচে তাকে বোঝাতে হবে না।

প্রসন্ন চক্কত্তি অপ্রসন্ন মুখে বললে—না না, সে হবে না। তোমরা নায়েবের কাছেই যাও—আমার কাজ এখনো মেটে নি। দেরি হবে দশ পনেরো দিন।

মোড়লমশাই হাতজোড় করে বললে—তা মোদের ওপর রাগ করবেন না আমীনমশাই। ছ' পয়সা করে মাথা-পিছু দেবানি—

—ছু' আনার এক কড়ি কম হলি পারবো না।

—গরীব মরে যাবে তাহলি—

—না। পারবো না।

বাধ্য হয়ে দশজন প্রজার পাঁচসিকে মোড়ল মশাইকে ভালো ছেলের মত সুড়সুড় করে এগিয়ে দিতে হোলো প্রসন্ন চক্কত্তির হাতে। পথে এসো বাপধন! চক্কত্তিকে আর কাজ শেখাতে হবে না ঘনশ্যাম চাকলাদারের। কি করে উপরি রোজগার করতে হয়, নীলকুঠির আমীনকে সে কৌশল শিখতে হবে পচা জমিদারি কাছারীর আমলার কাছে? শাসন করতে এসেচেন! দেখেচিস শিপ্‌টন্ সাহেবকে?

বেলা তিন প্রহর। ঘনশ্যাম চাকলাদার আবার ডেকে পাঠালেন প্রসন্ন চক্কত্তিকে। ঘনশ্যাম নায়েব অত্যন্ত কর্ম্মঠ, দুপুরে ঘুম অভ্যেস নেই, গির্দ্দে বালিশ বুকে দিয়ে জমার খাতা সই করচেন, পেস্কার কাছে দাঁড়িয়ে পাতা উল্টে দিচ্ছে। ফর্সিতে তামাক পুড়চে।

প্রসন্ন চক্কত্তির দিকে চেয়ে বললে—ওদের চিঠা দিয়ে দেলেন?

—আজ্ঞে হাঁ।

—ঘোড়া চড়্‌তি পারেন?

—আজ্ঞে।

—এখুনি একবার রাহাতুনপুর যেতি হচ্চে আপনাকে। বিলাতালি সর্দার আর ওসমান গনির মামলায় আপনি প্রধান সাক্ষী হবেন। সরেজমিন দেখে আসুন। সেখানে নকুড় কাপালী কাছারীর পক্ষে উপস্থিত আছে। সে আপনাকে সব বুঝিয়ে দেবে। ওসমান গনির ভিটের পেছনে যে শিমুল গাছটা আছে—সেটা কত চেন রাস্তা থেকে হবে মেপে আসবেন তো।

—চেন নিয়ে যাবো?

—নিয়ে যান। আমার কানকাটা ঘোড়াটা নিয়ে যান, ছাড় তোক দেবেন না, বাঁ পায়ে ঠোকা মারবেন পেটে। খুব দৌড়বে।

এখন অবেলায় আবার চল রাহাতুনপুর! সে কি এখানে! ফিরতে কত রাত হবে কে জানে। নকুড় কাপালী সেখানে সব শেখাবে প্রসন্ন চক্কত্তিকে! হাসিও পায়। সে কি জানে জরীপের কাজের? আমীনের পিছু পিছু খোঁটা নিয়ে দৌড়োয়, বড়সাহেব যাকে বলতো 'পিনম্যান', সেই নকুড় কাপালী জরীপের খুঁটিনাটি তত্ত্ব বুঝিয়ে দেবে তাকে, যে পঁচিশবছর এক কলমে কাজ চালিয়ে এল সায়েব-সুবোদের কড়া নজরে! শালুক চিনেচেন গোপাল ঠাকুর। নকুড় কাপালী!

ঘোড়া বেশ জোরেই চললো যশোর চুয়াডাঙ্গার পাকা সড়ক দিয়ে। আজকাল রেল লাইন হয়ে গিয়েচে এদিকে। ক্রোশ খানেক দূর দিয়ে রেল গাড়ী চলাচল করচে, ধোঁয়া ওড়ে, শব্দ হয়, বাঁশি বাজে। একদিন চড়তে হবে রেলের গাড়ীতে। ভয় করে। এই বুড়ো বয়েসে আবার একটা বিপদ বাধবে ও সব নতুন কাণ্ডকারখানার মধ্যে গিয়ে? মানিক মুখুয্যে মুহুরী সেদিন বলছিল, চলুন আমীনমশাই, একদিন কালীগঞ্জে গঙ্গাস্নান করে আসা যাক রেলগাড়ীতে চড়ে। ছ'আনা নাকি ভাড়া রাণাঘাট পর্য্যন্ত। সাহস হয় না।

বড় বড় শিউলি গাছের ছায়া পথের দু'ধারে। শ্যামলতা ফুলের সুগন্ধ যেন কোন বিস্মৃত অতীত দিনের কার চুলের গন্ধের মত মনে হয়। কিছুই আজ আর মনে নেই। বুড়ো হয়ে যাচ্চে সে। হাতও খালি। সামনে কতদিন বেঁচে থাকতে হবে, কি করে চলবে, অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে থাকলে—কে দেবে খেতে? কেউ নেই সংসারে। বুড়ো বয়েসে যদি চেন টেনে জমি মাপামাপির খাটাখাটুনি না করতে পারে মাঠে মাঠে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, তবে কে দু'মুঠো ভাত দেবে? কেউ নেই। সামনে অন্ধকার। যেমন অন্ধকার ওই বাঁশঝাড়ের তলায় তলায় জমে আসবে আর একটু পরে।

রাহাতুনপুর পৌঁছে গেল ঘোড়া তিন ঘণ্টার মধ্যে। প্রায় এগারো ক্রোশ পথ। এখানে সকলেই ওকে চেনে। নীলকুঠির আমলে কতবার এখানে সে আর কারকুন আসতো নীলের

দাগ মারতে। এখানে একবার দাঙ্গা হয় দেওয়ান রাজারাম রায়ের আমলে। খুব গোলমাল হয়, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এসেছিলেন প্রজাদের দরখাস্ত পেয়ে।

বড় মোড়ল আবদুল লতিফ মারা গিয়েচে, তার ছেলে সামসুল এসে প্রসন্ন চক্কত্তিকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল। বেলা এখনো দণ্ড দুই আছে। বড্ড রোদে ঘোড়া ছুটিয়ে আসা হয়েচে।

সামসুল বললে—সালাম, আমীনমশায়। আজকাল কনে আছেন?

—তোমাদের সব ভালো? আবদুল বুঝি মারা গিয়েচে? কদ্দিন? আহা, বড় ভালো লোক ছিল। আমি আছি বাহাদুরপুরি। বড্ড দূর পড়ে গিয়েচে কাজেই আর দেখাশুনো হবে কি করে বলো।

—তামাক খান। সাজি।

—নকুড় কাপালী কোথায় আছে জানো? তাকে পাই কোথায়?

—বাঁওড়ের ধারে যে খড়ের চালা আছে, জরীপির সময় আমীনদের বাসা হয়েল, সেখানে আছেন। ঠেকোয়।

প্রসন্ন চক্কত্তি অনেকক্ষণ থেকে কিন্তু একটা কথা ভাবচে। পুরনো কুঠিটা আবার দেখতে ইচ্ছে করে।

বেলা পড়ে এসেচে। সন্ধ্যার দেরি নেই। মোল্লাহাটির নীলকুঠি এখান থেকে তিন ক্রোশ পথ। ঘোড়া ছুটিয়ে গেলে একঘণ্টা। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাবে ঘোড়া। খানিক ভেবেচিন্তে ঘোড়ায় চড়ে সে রওনা হোলো মোল্লাহাটি। অনেকদিন সেখানে যায় নি। ধুঁধুঁল বনে হলদে ফুল ফুটেচে, জিউলি গাছের আটা ঝরচে কাঁচা কদমার শাকের মত। হু হু হাওয়া ফাঁকা মাঠের ওপার থেকে মড়িঘাটার বাঁওড়ের কুমুদফুলের গন্ধ বয়ে আনচে। শেঁয়াকুল কাঁটার ঝোপে বেঁজি খস খস করচে পথের ধারে।

জীবনটা ফাঁকা, একদম ফাঁকা। মড়িঘাটার এই বড় মাঠের মত। কিছু ভালো লাগে না। চাকরী করা চলচে, খাওয়া-দাওয়া চলচে, সব যেন কলের পুতুলের মত। ভালো লাগে না। করতে হয় তাই করা। কি যেন হয়ে গিয়েচে জীবনে।

সন্ধ্যা হোলো পথেই। পঞ্চমীর কাটা চাঁদ কুমড়োর ফালির মত উঠেচে পশ্চিমের দিকে। কি কড়া তামাক খায় ব্যাটারা। ওই আবার দেয় নাকি মানুষকে খেতে? কাসির ধাক্কা এখনো সামলানো যায় নি।

দিগন্তের মেখলা-রেখা বন-নীল দূরত্বে বিলীন। অনেকক্ষণ ঘোড়া চলেচে। ঘেমে গিয়েচে ঘোড়ার সর্ব্বাঙ্গ। এইবার প্রসন্ন চক্কত্তির চোখে পড়লো দূরে উঁচু সাদা নীলকুঠিটা দীর্ঘ দীর্ঘ ঝাউ গাছের ফাঁকে ফাঁকে। প্রসন্ন আমীনের মনটা ফুলে উঠলো। তার যৌবনের লীলাভূমি, তার কতদিনের আমোদ-প্রমোদ ও আড্ডার জায়গা, কত পয়সা হাত ফেরতা হয়েচে ওই জায়গায়। আজকাল নিশাচরের আড্ডা। লালমোহন পাল ব্যবসায়ী জমিদার, তার হাতে কুঠির মান থাকে?

প্রসন্ন চক্কত্তির হঠাৎ চমক ভাঙলো। সে রাস্তা ভুল করে এসে পড়েচে কুঠি থেকে কিছুদূরের গোরস্থানটার মধ্যে। দু'পাশে ঘন বন বাগান, বিলিতি কি সব বড় বড় গাছ রবসন্ সাহেবের আমলে এনে পোঁতা হয়েছিল, এখন ঘন অন্ধকার জমিয়ে এনেচে গোরস্থানে। ওইটে রবসন্ সাহেবের মেয়ের কবর। পাশে ওইটে ডানিয়েল সায়েবের। এ সব সায়েবকে প্রসন্ন চক্কত্তি দেখে নি। নীলকুঠির প্রথম আমলে রবসন্ সায়েব ঐ বড সাদা কুঠিটা তৈরি করেছিল গল্প শুনেচে সে।

কি বনজঙ্গল গজিয়েচে কবরখানার মধ্যে। নীলকুঠির জমজমাটের দিনে সাহেবদের হুকুমে এই কবরখানা থেকে সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া যেতো, আর আজকাল কেই বা দেখচে আর কেই বা যত্ন করচে এ জায়গার ?

ঘোড়াটা হঠাৎ যেন থমকে গেল। প্রসন্ন চক্কত্তি সামনের দিকে তাকালে, ওর সারা গা ডোল দিয়ে উঠলো। মনে ছিল না, এইখানেই আছে শিপ্‌টন্ সাহেবের কবরটা। কিন্তু কি ওটা নড়চে সাদা মতন ? বড়সায়েব শিপ্‌টনের কবরখানায় লম্বা লম্বা উলুখড়ের সাদা ফুলগুলোর আড়ালে ?

নির্জ্জন কুঠির পরিত্যক্ত কবরখানা, অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় ঢাকা। প্রেতযোনির ছবি স্বভাবতই মনে না এসে পারে না যতই সাহসী হোক আমীন প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী। সে ভীতিজড়িত আড়ষ্ট অস্বাভাবিক সুরে বললে—কে ওখানে ? কে ও ? কে গা ?

শিপ্‌টন্ সায়েবের সমাধির উলুখড়ের ফুলের ঢেউয়ের আড়াল থেকে একটি নারীমূর্ত্তি চকিত ও ত্রস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে রইল অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় পাথরের মূর্ত্তিরই মত।

—কে গা ? কে তুমি ?

—কে ? খুড়োমশাই ! ও খুড়োমশাই !

ওর কণ্ঠে অপরিসীম বিস্ময়ের সুর। আরও এগিয়ে এসে বললে—আমি গয়া।

প্রসন্নর মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ কোনো কথা বার হোলো না বিস্ময়ে। সে তাড়াতাড়ি রেকাবে পা দিয়ে নেমে পড়লো ঘোড়া থেকে, আহ্লাদের সুরে বললে—গয়া ! তুমি ! এখানে ? চলো চলো, বাইরে চলো, এ জঙ্গল থেকে—এখানে কোথায় এইছিলে ?

জ্যোৎস্নায় প্রসন্ন দেখলে গয়ার চোখের কোণে জলের রেখা। এর আগেই সে কাঁদছিল ওখানে বসে বসে এই রকম মনেহয়। কান্নার চিহ্ন ওর চোখেমুখে চিকচিকে জ্যোৎস্নায় সুস্পষ্ট।

প্রসন্ন চক্কত্তি বললে—চলো গয়া, ওই দিকে বার হয়ে চলো—এঃ, কি ভয়ানক জঙ্গল হয়ে গিয়েচে এদিকটা !

গয়ামেম ওর কথায় ভালো করে কর্ণপাত না করে বললে—আসুন খুড়োমশাই, বড়সাহেবের কবরটা দেখবেন না ? আসুন। আলেন যখন, দেখেই যান—

পরে সে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। শিপ্‌টনের সমাধির ওপর টাটকা সন্ধ্যা-মালতী আর কুঠির বাগানের গাছেরই বকফুল ছড়ানো। তা থেকে এক গোছা সন্ধ্যামালতী তুলে নিয়ে ওর হাতে দিয়ে বললে—দ্যান, ছড়িয়ে দ্যান। আজ মরবার তারিখ সাহেবের, মনে

আছে না? কত মুনড়া খেয়েচেন এক সময়। শ্যান, দুটো উলুখড়ের ফুলও শ্যান তুলে টাটকা। শ্যান ওই সঙ্গে—

প্রসন্ন চক্কত্তি দেখলে ওর দু'গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়েচে নতুন করে।

তারপরে দুজনে কবরখানার ঝোপজঙ্গল থেকে বার হয়ে একটা বিলিতি গাছের তলায় গিয়ে বসলো। খানিকক্ষণ কারো মুখে কথা নেই। দুজনেই দুজনকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখে বেজায় খুশি যে হয়েচে, সেটা ওদের মুখের ভাবে পরিস্ফুট। কত যুগ আগেবার পাষাণ-পুরীর ভিত্তির গাত্রে উৎকীর্ণ কোন্ অতীত সভ্যতার দুটি নায়ক নায়িকা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেচে আজ এই সন্ধ্যারাত্রে মোল্লাহাটির পোড়ো নীলকুঠিতে রবসন সাহেবের আনীত প্রাচীন জুনিপার গাছটার তলায়। গয়া রোগা হয়ে গিয়েচে, সে চেহারা নেই। সামনের দাঁত পড়ে গিয়েচে। বুড়ো হয়ে আসচে। দুঃখের দিনের ছাপ ওর মুখে, সারা অঙ্গে, চোখের চাউনিতে, মুখের ম্লান হাসিতে।

ওর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল গয়া।

—কেমন আছ গয়া?

—ভালো আছি। আপনি কনে থেকে? আজকাল আছেন কনে?

—আছি অনেক দূরে। বাহাদুরপুরি। কাছারীতে আমীনি করি। তুমি কেমন আছ তাই আগে কও শুনি। চেহারা এমন খারাপ হোলো কেন?

—আর চেহারার কথা বলবেন না। খেতি পেতাম না যদি সায়েব সেই জমির বিলি না করে দিত আর আপনি মেপে না দিতেন। যদ্দিন সময় ভালো ছেল, আমারে দিয়ে কাজ আদায় করে নেবে বুঝতো, তদ্দিন লোকে মানতো, আদর করতো। এখন আমারে পুঁছবে কেডা? উল্টে আরো হেনস্থা করে, এক-ঘরে করে রেখেচে পাড়ায়—সেবার তো আপনারে বলিচি।

—এখনো তাই চলচে?

—যদ্দিন বাঁচবো, এর সুরাগ হবে ভাবচেন খুড়োমশাই? আমার জাত গিয়েচে যে। একঘটি জল কেউ দেয় না অসুখে পড়ে থাকলি, কেউ উঁকি মেরে দেখে না। দুঃখির কথা কি বলবো। আমি একা মেয়েমানুষ, আমার জমির ধানডা লোকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যায় রাত্তির বেলা কেটে। কার সঙ্গে ঝগড়া করবো? সেদিন কি আমার আছে!

প্রসন্ন চক্কত্তি চুপ করে শুনছিল। ওর চোখে জল। চাঁদ দেখা যাচ্চে গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে। কি খারাপ দিনের মধ্যে দিয়ে জীবন তার কেটে যাচ্চে, তারও জীবনে ঠিক ওর মতনই দুদ্দিন নেমেচে।

গয়া ওর দিকে চেয়ে বললে—আপনার কথা বলুন। কদ্দিন দেখি নি আপনারে। আপনার ঘোড়া পালালো খুড়োমশাই বাঁধুন—

প্রসন্ন চক্কত্তি উঠে গিয়ে ঘোড়াটাকে ভালো করে বেঁধে এল বিলিতি গাছটার গায়ে। আবার এসে বসলো ওর পাশে। আজ যেন কত আনন্দ ওর মনে। কে শুনতে চায় দুঃখের কাহিনী? সব মানুষের কাছে কি বলা যায় সব কথা? এ যেন বড্ড আপন।

বলেও সুখ এর কাছে। এর কানে পৌঁছে দিয়ে সব ভার থেকে সে যেন মুক্ত হবে।

বললেও প্রসন্ন। হেসে খানিকটা চুপ করে থেকে বললে—বুড়ো হয়ে গিইচি গয়া। মাথার চুল পেকেচে। মনের মধ্যি সর্ব্বদা ভয় ভয় করে। উন্নতি করবার কত ইচ্ছে ছিল, এখন ভাবি বুড়ো বয়েসে পরের চাকরিডা খোয়ালি কে একমুঠো ভাত দেবে খেতি ? মনের বল হারিয়ে ফেলিচি। দেখচি যেমন চারিধারে, তোমার আমার রুক্ষু মাথায় একপলা তেল কেউ দেবে না, গয়া।

—কিছু ভাববেন না খুড়োমশাই। আমার কাছে থাকবেন আপনি। আপনার মেপে দেওয়া সেই ধানের জমি আছে, দুজনের চলে যাবে। আমারে আর লোকে এর চেয়ে কি বলবে ? ডুবিচি না ডুবতি আছি। মাথার ওপরে একজন আছেন, যিনি ফ্যালবেন না আপনারে আমারে। আমার বাবা বড্ড সন্ধানডা দিয়েচেন। আগে ভাবতাম কেউ নেই। চলুন আমার সঙ্গে খুড়োমশাই। যতদিন আমি আছি, এ গরীব মেয়েডার সেবাযত্ন পাবেন আপনি। যতই ছোট জাত হই।

এক অপূর্ব্ব অনুভূতিতে বৃদ্ধ প্রসন্ন চক্কত্তির মন ভরে উঠলো। তার বড় সুখের দিনেও সে কখনো এমন অনুভূতির মুখোমুখি হয় নি। সব হারিয়ে আজ যেন সে সব পেয়েচে এই জনশূন্য পোড়ো কবরখানায় বসে। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আচ্ছা, চললাম এখন গয়া।

গয়া অবাক হয়ে বললে—এত রাত্তিরি কোথায় যাবেন খুড়োমশাই ?

—পরের ঘোড়া এনিচি। রাত্তিরিই চলে যাবো কাছারিতি। পরের চাকরী করে যখন খাই, তখন তাদের কাজ আগে দেখতি হবে। না যদি আর দেখা হয় মনে রেখো বুড়োটারে। তুমিও চলে যাও, অন্ধকারে সাপ-খোপের ভয়।

আর মোটেই না দাঁড়িয়ে প্রসন্ন চক্কত্তি ঘোড়া খুলে নিয়ে রেকাবে পা দিয়ে লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠলো। ঘোড়ার মুখ ফেরাতে ফেরাতে অনেকটা যেন আপন মনেই বললে—মুখের কথাডা তো বললে গয়া, এই যথেষ্ট, এই বা কেডা বলে এ দুনিয়ায়, আপনজন ভিন্ন কেডা বলে ? বড্ড আপন বলে যে ভাবি তোমারে—

ষষ্ঠীর চাঁদ জুনিপার গাছের আড়াল থেকে হেলে পড়েচে মড়িঘাটার বাঁওড়ের দিকে। ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডাকচে পুরনো নীলকুঠির পুরনো বিস্মৃত সাহেব-সুবোদের ভগ্ন সমাধিক্ষেত্রের বনে জঙ্গলে ঝোপঝাড়ের অন্ধকারে।…

ইছামতীর বাঁকে বাঁকে বনে বনে নতুন কত লতাপাতার বংশ গজিয়ে উঠলো। বলরাম ভাঙনের ওপরকার সোঁদালি গাছের ছোট চারাগুলো দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যে ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়ে ওঠে, কত অনাবাদী পতিত মাঠে আগে গজালো ঘেঁটুবন, তারপর এল কাকজঙ্ঘা, কুঁচকাঁটা নাটা আর বনমরিচের জঙ্গল, ঝোপে-ঝোপে কত নতুন ফুল ফুটলো, যাযাবর বিহঙ্গ-কুলের কত কি কলকূজন। আমরা দেখেছি জলিধানের ক্ষেতের ওপরে মুক্তপক্ষ বলাকার সাবলীল গতি মেঘপদবীর ওপারে মৃণালসূত্র মুখে। আমরা দেখেছি বনসিমফুলের সুন্দর বেগুনী রং প্রতি বর্ষাশেষে নদীর ধারে ধারে।

ঐ বর্ষাশেষেই আবার কাশফুল উড়ে উড়ে জল-সরা কাদায় পড়ে বীজ পুঁতে পুঁতে কত কাশঝাড়ের সৃষ্টি করলো বছরে বছরে। কাশবন কালে সরে গিয়ে শেওড়াবন, সোঁদালি গাছ গজালো···তারপরে এল কত কুমুরে লতা, কাঁটাবাঁশ, বনচালতা। দুললো গুলঞ্চলতা, মটরফলের লতা, ছোট গোয়ালে বড় গোয়ালে। সুবাসভরা বসন্ত মূর্ত্তিমান হয়ে উঠলো কতবার ইছামতীর নির্জ্জন চরের ঘেঁটুফুলের দলে···সেই ফাল্গুন-চৈত্রে আবার কত মহাজনী নৌকা নোঙর করে বেঁধে গেল বনগাছের ছায়ায়, ওরা বড় গাঙ বেয়ে যাবে এই পথে সুন্দরবনে মোমমধু সংগ্রহ করতে, বেনেহার মধু, ফুলপাটির মধু, গেঁয়ো, গরান, সুঁদরি, কেওড়াগাছের প্রস্ফুটিত ফুলের মধু। জেলেরা সলা-জাল পাতে গলদা চিংড়ি আর ইটে মাছ ধরতে ···

পাঁচপোতার গ্রামের দু'দিকের ডাঙাতেই নীলচাষ উঠে যাওয়ার ফলে সঙ্গে সঙ্গে বন্যবুড়ো, পিটুলি, গামার, তিত্তিরাজ গাছের জঙ্গল ঘন হোলো, জেলেরা সেখানে আর ডিঙি বাঁধে না, অসংখ্য নিবিড় লতাপাতার জড়াজড়িতে আর সাঁইবাবলা, শেঁয়াকুল কাঁটাবনের উপদ্রবে ডাঙা দিয়ে এসে জলে নামবার পথ নেই, যবে স্বাতী আর উত্তর-ভাদ্রপদ নক্ষত্রের জল পড়ে ঝিনুকের গর্ভে মুক্তো জন্ম নেবে, তারই দুরাশায় গ্রামান্তরের মুক্তো-ডুবুরির দল জোংড়া আর ঝিনুক স্তূপাকার করে তুলে রাখে ওকড়াফলের বনের পাশে, যেখানে রাধালতার হলুদ রংয়ের ফুল টুপটাপ করে ঝরে ঝরে পড়ে ঝিনুক-রাশির ওপরে।

অথচ কত লোকের চিতার ছাই ইছামতীর জল ধুয়ে নিয়ে গেল সাগরের দিকে, জোয়ারে যায় আবার ভাঁটায় উজিয়ে আসে, এমনি বার বার করতে করতে মিশে গেল দূর সাগরের নীল জলের বুকে যে কত আশা করে কলাবাগান করেছিল উত্তর মাঠে, দোয়াড়ি পেতেছিল বাঁশের কঞ্চি চিরে বুনে ঘোলডুবরির বাঁকে, আজ হয়তো তার দেহের অস্থি রোদবৃষ্টিতে সাদা হয়ে পড়ে রইল ইছামতীর ডাঙায়। কত তরুণী সুন্দরী বধূর পায়ের চিহ্ন পড়ে নদীর দু'ধারে ঘাটের পথে, আবার কত প্রৌঢ়া বৃদ্ধার পায়ের দাগ মিলিয়ে যায়·· গ্রামে গ্রামে মঙ্গলশঙ্খের আনন্দধ্বনি বেজে ওঠে বিয়েতে, অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে, দুর্গাপুজোয়, লক্ষ্মীপুজোয়···সে সব বধূদের পায়ের আলতা ধুয়ে যায় কালে কালে, ধূপের ধোঁয়া ক্ষীণ হয়ে আসে মৃত্যুকে কে চিনতে পারে, গরীয়সী মৃত্যু-মাতাকে? পথপ্রদর্শক মায়ামৃগের মত জীবনের পথে পথে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে সে, অপূর্ব্ব রহস্য-ভরা তার অবগুণ্ঠন কখনো খোলে শিশুর কাছে, কখনো বৃদ্ধের কাছে···তেলাকুচো ফুলের দুলুনিতে অনন্তের সে সুর কানে আসে···কানে আসে

বনৌষধির কটুতিক্ত সুঘ্রাণে, প্রথম হেমন্তে বা শেষ শরতে। বর্ষার দিনে এই ইছামতীর কূলে কূলে ভরা ঢল-ঢল রূপে সেই অজানা মহাসমুদ্রের তীরহীন অসীমতার স্বপ্ন দেখতে পায় কেউ কেউ···কত যাওয়া-আসার অতীত ইতিহাস মাখানো ঐ সব মাঠ, ঐ সব নির্জ্জন ভিটের ঢিপি—কত লুপ্ত হয়ে যাওয়া মায়ের হাসি ওতে অদৃশ্য রেখায় আঁকা। আকাশের প্রথম তারাটি তার খবর রাখে হয়তো।···

ওদের সকলের সামনে দিয়ে ইছামতীর জলধারা চঞ্চলবেগে বয়ে চলেচে বড় লোনা গাঙের দিকে, সেখান থেকে মোহানা পেরিয়ে, রায়মঙ্গল পেরিয়ে, গঙ্গাসাগর পেরিয়ে মহাসমুদ্রের দিকে।···

ক্ষণভঙ্গুর

সিঁদুরচরণ

সিঁদুরচরণ আজ দশ-বারো বছর মালিপোতায় বাস করচে বটে কিন্তু ওর বাড়ী এখানে নয়। সেদিন রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে সিঁদুরচরণ কোথা থেকে এসেচে তা নিয়ে কথা হচ্ছিল। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মশায় তামাক টানতে টানতে বললেন—"কে, সিঁদুরচরণ? ওর বাড়ী ছিল কোথায় কেউ জানে না, তবে এখানে আসবার আগে ও খাবরাপোতায় প্রায় দশ বছর ছিল। তার আগে অন্য গাঁয়ে ছিল শুনিচি, গাঁয়ে গাঁয়ে বেড়িয়ে বেড়ানোই ওর পেশা।"

পেশা হয়তো হতে পারে, কারণ সিঁদুরচরণ গরীব লোক।

জীবনে সে ভালো জিনিসের মুখ দেখেনি কখনো। কেউ আপনার লোক ছিল না, সম্প্রতি মালিপোতাতে এসে বিয়ের চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীলকে কেউ মেয়ে দেবার আগ্রহ দেখায়নি। মালিপোতার এক বুনো মালী আজকাল ওর সঙ্গে একত্র স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করে। তার বয়স ওর চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। দেখতে মোটাসোটা, মিশকালো রং, মাথার চুলে এখনও পাক ধরেনি বটে তবে ধরবার বেশি দেরিও নেই। বুনো বলে এদেশে সেইসব কুলি-মজুরের বর্ত্তমান বংশধরদের, যারা একশো বছর আগে নীলকুঠির আমলে রাঁচি, হাজারিবাগ, গিরিডি, মধুপুর প্রভৃতি থেকে এসেছিল নীলকুঠির আমলে মজুরি করতে। এখন তারা বেমালুম বাঙালী হয়ে গিয়েচে—ভাষা, ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার সব রকমে। পূর্ব্বপুরুষের বোংগা পূজো ভুলে গিয়েচে কতকাল, এখন হরিসংকীর্ত্তন করে ঘরে ঘরে, মনসা-পূজো, ষষ্ঠী-পূজো করে, কালীতলায় মানত করে।

এখন যদি এদের জিজ্ঞেস করা যায়—তোরা কোন্ দেশ থেকে এসেছিলি রে? তোদের আপনজন কোথায় আছে?

ওরা বলবে—তা কি জানি বাবু।

—পশ্চিম থেকে এসেছিলি, না?

—শুনেচি বাপ-ঠাকুরদার কাছে। ওদিকের কোথা থেকে আমাদের পাঁচ-ছ' পুরুষের আগে এসে বাস করা হয়। সে সত্য যুগের কথা।

সিঁদুরচরণ এ-হেন বুনো মালীকে নিয়ে দিব্যি ঘর করতে থাকে। তার নাম কাতু—হয়তো 'কাত্যায়নী'র অপভ্রংশ হবে নামটা। কিন্তু ওর অপভ্রংশ নামটাই অন্নপ্রাশনের দিন থেকে পাওয়া—ভাল নাম তাকে কেউ দেয়নি।

সিঁদুরচরণ পরের গোরু চরিয়ে আর পরের লাঙল চষে জীবনের চল্লিশটি বছর কাটিয়ে দেওয়ার পরে বিঘে তিনেক জমি ওটবন্দি বন্দোবস্ত নিলে। তার জমিতে পরের বছর দশ মণ পাট হলো; সেবার বাইশ টাকা পাটের মণ। পাট বিক্রি করে সেবার এত পেলে সিঁদুরচরণ, অত টাকা একসঙ্গে তার তিন পুরুষে কখনো দেখেনি। দশ টাকার নোট বাইশখানা।

কাতু বললে—হ্যাঁ গো, দশ হাত ফুলন শাড়ীর দাম কত?

—কেন, নিবি ?

—দাও গিয়ে এবার। অনেকদিন যে ভাবচি। বড্ড শখ।

—এই বয়সে ফুলন শাড়ী পরলি লোকে ঠাট্টা করবে না ?

কথাটা কিঞ্চিৎ রূঢ় হয়ে পড়লো, মনে হলো সিঁদুরচরণের। অল্প বয়সে ওকে দেবার লোক কে ছিল ? আজ বেশি বয়সে সুবিধে যখন হলোই তখন অল্পবয়সের সাধটা পূর্ণ করতে দোষ কি ? তারপর ঘোষেদের দোকান থেকে একখানা ফুলন শাড়ী শুধু নয়—তার সঙ্গে এলো একখানা সবুজ রঙের গামছা।

কাতু খুশিতে আটখানা। বললে—শাড়ীখানা কি চমৎকার—না ?

—খুব ভালো। তোর পছন্দ হয়েচে ?

—তা পছন্দ হবে না ? যাকে বলে ফুলন শাড়ী।

—আর গামছাখানা কেমন ?

—অমন গামছাখানা কখনো দেখিইনি। ও কিন্তু মুই ব্যাভার করতি পারবো না প্রাণ ধোরে। তাহলি খারাপ হোয়ে যাবে।

—খারাপ হয় আবার কিনে দেবো। আমার হাতে এখন কম ট্যাকা না।

সেদিন কামার-দোকানে বসে তিনকড়ি বুনোর মুখে কালীগঞ্জে গঙ্গাস্নান করতে যাবার বৃত্তান্ত শুনলো সিঁদুরচরণ। বাড়ী এসে কাতুকে বললে—কাতু, তুই থাক্, আমি দুদিন দেশ বেড়িয়ে আসি—

—কোথায় যাবা ?

—একদিকে বেড়িয়ে আসি—

—আমারে নিয়ে যাবা না ?

—তুই যাস তো চল্—ভালোই তো—

দুজনে জিনিসপত্র একটা বোঁচকাতে বেঁধে তৈরী হলো। কিন্তু যাবার দিন কাতুর মত বদলে গেল হঠাৎ। সে বললে—তুমি যাও, আমি যাবো না। গোরুটার বাছুর হবে এই মাসের মধ্যে। যদি আসতে দেরি হয়, বাছুরটা বাঁচবে না।

—তুই যাবিনে ?

—আমার গেলি চলবে কেমন করে ? বাছুরটা মরে গেলি সারা বছরটা আর দুধ খেতি হবে না। তুমি যাও, আমি যাব না।

সুতরাং সিঁদুরচরণ একাই রওনা হলো বোঁচকা নিয়ে। রেলগাড়ীতে সামান্যই চড়েচে সে, একবার কেবল বেনাপোল গিয়েছিল গোরুর হাট দেখতে। সে জীবনে একবারমাত্র রেলগাড়ী চড়া। পরের চাকরি করতে সারা জীবন কেটেচে।

স্টেশনে গিয়ে রেলে চড়ে যেতে হবে। সিঁদুরচরণ কাপড়ের খুঁটে শক্ত করে গেরো বেঁধে দুখানা দশ টাকার নোট নিয়েচে। কেউটেপাড়ার কাছে পাঁচু বুনোর দো-চালা ঘর রাস্তার ধারে। ওকে দেখে পাঁচু জিজ্ঞেস করলে—ও সিঁদুরচরণ, কনে চলেচ এত সকালে ?

—একটু ইষ্টিশানে যাবা।

—কোথায় যাবা?

—বেড়াতি যাবা রাণাঘাটের দিকি।

—তামাক খাও বসে।

সিঁদুরচরণ তামাক খেতে বসলো। কাছেই একটা বাঁশনি বাঁশের ঝাড়—সিঁদুরচরণ সেদিকে চেয়ে ভাবলে—এই বাঁশনি বাঁশের ঝাড়টা এদেশে, আবার অন্য দেশেও গিয়ে কি এমনি দেখা যাবে? সে আবার না জানি কি রকম বাঁশনি বাঁশ। এই রকম বৈঁচো, এই রকম কচুর ফুল কি অন্য জায়গাতেও আছে? দেখতে হবে বেড়িয়ে। সত্যি, বড মজা দেশবিদেশে বেড়ানো।

সিঁদুরচরণ স্টেশনে পৌছবার কিছু পরে টিকিটের ঘণ্টা পড়লো ঢং ঢং করে। একজন ওকে বললে—যাও গিয়ে টিকিট করো। গাড়ী আসচে।

টিকিটের জানলায় গিয়ে ও বললে—ও বাবু, একখানা টিকিস্ ছান মোরে—

টিকিটবাবু বললে—কোথাকার টিকট?

—ছান বাবু, রাণাঘাটেরই ছান আপাতোক একখানা।

গাড়ীতে উঠে সিঁদুরচরণের ভীষণ আমোদ হলো। সে আমোদ রূপান্তরিত হলো বার বার ওর ধূমপান করবার ইচ্ছায়। ঘন ঘন বিড়ি খায়, এই ধরায়, এই খায়। কয়েকটি বিড়ি খেতে খেতেই রাণাঘাটে গাড়ী এসে পড়াতে ও আশ্চর্য্য হয়ে পড়লো। ষোল মাইল রাস্তা যে এত অল্প সময়ে এসে পড়বে, তা ও ভাবেই নি।

রাণাঘাটে নেমে এখন কোথায় যাওয়া যায়? এমন অনেক দূরে যেতে হবে, যেখানে কখনো সে যায়নি।

স্টেশনের এপারে একটা উঁচুমত রোয়াক বাঁধানো জায়গা খুব লম্বা। তার দুধারে রেল লাইন পাতা। সেই লম্বা রোয়াকের ওপর লম্বা একটা টিনের চালা। অত বড় টিনের চালার তলায় বা রোয়াকটার অন্যদিকে লোকে পান বিড়ি, চা, খাবার ইত্যাদি বিক্রি করচে—লোকজনে কিনচে। যেন একটা মেলা বসে গিয়েচে। মড়িঘাটায় গঙ্গাস্নানের যোগের সময় এ রকম মেলা সে দেখেচে।

একদল উত্তুরে লোক তার সঙ্গে একই ট্রেন থেকে নেমে বিড়ি টেনে আড্ডা জমিয়েচে টিনের চালার নীচে। ও সেখানে গিয়ে বললে—কনে যাবা?

তারা বললে—মুকসুদাবাদ, বেলডাঙা।

—সে কনে?

—উত্তুরে।

—কোথায় গিয়েলে?

—পাট কাচতে গেছলাম ওই কানসোনা, তালহাটি, মেহেরপুর।

মেহেরপুর গ্রাম সিঁদুরচরণের বাড়ীর কাছে। লোকগুলো সেখান থেকে আসছে শুনে

সিঁদুরচরণের মনে হলো এই দূর বিদেশ-বিভুঁয়ে এরাই তার পরম আত্মীয়। সে বললে—মেহেরপুরের নসিবদ্দি সেখয়ে চেন ?

—তেনার বাড়ীতেই তো ছিলাম আমরা। বছর বছর তেনার পাট কাচি। পত্তর দিয়ে আমাদের তিনি নিয়ে আসে।

—মুইও তারে খুব চিনি।

—আপনি কতদূর যাবা ?

—বেড়াতে বেরিইচি, যেতদূর যাওয়া যায় ততদূর যাবো।

ওদের মধ্যে একজন বললে—তবুও কতদূর যাওয়া হবে ? আমার সঙ্গে বাহাদুরপুর চলো। আমি সেখানে যাবো

—সে কনে ?

—কেষ্টনগর ছাড়িয়ে।

—তবে পয়সা নিয়ে মোর টিকিটখানা তোমার সঙ্গে করে নিয়ে এসো ভাই।

—ছাও ট্যাকা।

—কত নাগবে ?

—এগারো আনা।

আধঘণ্টা পরে লোকটা টিকিট কেটে এনে তার হাতে দিল। সিঁদুরচরণ পুঁটলির মধ্যে থেকে কাতুর দেওয়া ধুপি-পিঠে খেতে লাগলো এবং তার সঙ্গীকে দিলে। ধুপি-পিঠে আর কিছুই নয় শুধু চালের গুঁড়োর পিঠে, জলে সিদ্ধ। গুড় দিয়ে ভিন্ন সে কঠিন ইঁটের মত জিনিস গলা দিয়ে নামে না—'কন্তু গুড় সে সঙ্গে করে আনেনি কাপড়চোপড়ে লেগে যাবে বলে। ওর সঙ্গী বল্লে—একটু রসগোল্লার রস কিনে আনবো ? এ বড্ড শক্ত।

—হ্যাগা উত্তরের গাড়ী কখন আসবে ?

—এই এল। তামুক খেয়ে ন্যাও তাড়াতাড়ি।

একটু পরে আরাম করে বসে ওরা তামাক খেতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে উত্তরের অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের ট্রেন এসে হাজির। চা, পান, পাঁউরুটির ফিরিওয়ালাদের চীৎকারে প্ল্যাটফর্ম মুখরিত হয়ে উঠলো। যাত্রীরা ইতস্তত ছুটাছুটি করতে লাগলো গাড়ীতে ওঠবার চেষ্টায়। হতভম্ব ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সিঁদুরচরণের হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে তার নতুন সঙ্গী তাকে একটা কামরায় ওঠালে।

গাড়ী রাণাঘাট ছেড়ে দিলে। সিঁদুরচরণ এক কল্কে তামাক সেজে হাঁপ ছেড়ে বললে—বাবাঃ—এর নাম গাড়ী চড়া ? কি কাণ্ড।

সিঁদুরচরণের মনে হলো কাতুকে কতদূরে ফেলে সে অজানা বিদেশে বিভুঁইয়ের দিকে চলেচে ! না এলেই যেন ছিল ভালো। কে জানে বাড়ীর বার হলেই এসব হাঙ্গামা ঘটবে ? বিদেশের লোক কি রকম তারই বা ঠিক কি ? তার টাকা ক'টা কেড়ে নিতেও পারে।

তার সঙ্গী তাকে বলে বলে দিচ্চে—এই উলো, এই বাদকুল্লো, এই কেষ্টনগর।

—কেষ্টনগর ? কই দেখি দিকি ! নাম শোনা আছে বহুৎ দিন যে।

সিঁদুরচরণ বিশেষ কিছুই দেখতে পেলে না। গোটাকতক টিনের গুদোম, খানকতক ঘোড়ার গাড়ী, দু-চারটি কোঠাবাড়ী। তাই দেখেই সে মহা খুশি। মস্ত জায়গা কেষ্টনগর। দেশে ফিরে গল্প করার মত কিছু পাওয়া গেল বটে। কাতুকে নানা ছাঁদে গল্প শোনাতে হবে বাড়ী ফিরে।

আরও একটা স্টেশন গেল। পরের স্টেশনেই বোধ হয়—তার সঙ্গী বললে—নামো, নামো, বাহাদুরপুর।

সিঁদুরচরণ বোঁচকা নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লো। তখন সন্ধ্যা হয় হয় ; সে চেয়ে দেখে —ধূ ধূ মাঠের মধ্যে ছোট্ট স্টেশন—চারিধারে কূলকিনারা নেই এমন বড় মাঠ। দূরে দূরে দু-চারটে তালগাছ, বাঁশবন।

সিঁদুরচরণের বুকের মধ্যটা হু-হু করে উঠলো।

কোথায় কাতু, কোথায় তাদের মালিপোতা। সব ফেলে সে আজ এ কোথায় কতদূরে এসে পড়েচে !

মনে মনে বললে—এ্যান্‌বারা বিদেশেও মানুষ আসে ! ভগবান, এ তুমি কোথায় নিয়ে ফেললে মোরে !

ওর সঙ্গী বললে—চলো।

—ও বলে—কনে যাবো ?

—মোদের গাঁয়ে চলো। এখেন থেকে দু-কোশ পথ।

—সেখানে যাবো ?

—যাবা না তো এখানে থাকবা কোথায় ? খেতে-দেতে হবে তো ?

—কি নাম তোমাদের গাঁ ?

—গোয়ালবাথান। নাগরপাড়া।

অগত্যা সিঁদুরচরণ চললো নাগরপাড়া, তার নতুন সঙ্গীর বাড়ী। ক্রোশ দুই হাঁটবার পরে এক গাঁয়ে ঢুকবার মুখেই ছোট্ট চালাঘর। সেখানে গিয়ে তার বন্ধু বললে—এই মোদের বাড়ী ! ভাত-পানি খাও, হাত-মুখ ধোও।

সিঁদুরচরণ বললে—ভাত-পানি খাব কি, মুই কনে এসে পড়েচি তাই শুধু ভাবতি লেগেচি।

—কদ্দূর আসবা আবার !

—কোথায় ছেলাম আর কনে আলাম। উঃ ! এ পিরথিমির কি সীমেমুড়ো নেই ? হ্যাগা, আর কদ্দুর আছে হদিকি ?

—আরে তুমি কি পাগল নাকি ? কী বলে আর কী করে ! ন্যাও ভাত-পানি খাও।

ভাত খেয়ে সিঁদুরচরণ গ্রামের মাঠের দিকে বেড়াতে গেল।

বড় বড় মাঠ, দূরে তালগাছ। এতবড় মাঠ তাদের দেশে সে কখনো দেখেনি, আর

চারিদিকেই আকের খেত। উ-ই কি-একটা গ্রাম দেখা যায়! ওর পরও পিরথিম্ আছে ওদিকে? বাব্বাঃ!

একজন লোককে বললে—হ্যাঁগা, ইদিকে এত আকের চাষ কেন?

—কেন, বেলডাঙায় চিনির কল আছে। আক সেখানে মণ দরে বিক্রি হয় গো—

—সব আক?

—এ কী আক তুমি দেখচো, বেলডাঙার ওদিক ষাট সত্তর একশো বিঘের এক এক বন্দ, শুদ্দু—আক।

ওর বন্ধুর বাড়ীতে দিন দুই থাকার পরে আকের জমির মজুর দরকার হয়ে পড়লো। ওদের পরামর্শে সিঁদুরচরণও আকের ক্ষেতে আক কাটবার কাজে লেগে গেল। আট আনা রোজ। সিঁদুরচরণদের দেশে মজুরের রেট সওয়া পাঁচ আনা। সে দেখলে মজুরির রেট বেশ ভালোই। দুদিনে একটা টাকা রোজগার, হবেই বা না কেন, কোন্ দেশ থেকে কোন্ দেশে এসে পড়েচে—এখানে সবই সম্ভব।

নাগরপাড়ার ওপারে বোরগাছি, তার পাশে ধুবুলি। এই দুই গ্রাম থেকে অনেক মজুর আসতো আকের ক্ষেতে কাজ করতে। ওদের মধ্যে একজনের সঙ্গে সিঁদুরচরণের খুব ভাব হয়ে গেল। সে বললে—আমাদের গেরামে যাবা? সেখানে ঘোষ মশায়দের বাড়ীতে একজন কিষাণ দরকার। দশ টাকা মাইনে, খাওয়া-পরা।

সিঁদুরচরণের কাছে এ প্রস্তাব লোভনীয় বলে মনে হলো। তাদের দেশে কৃষাণদের মাইনে মাসে পাঁচ টাকার বেশি নয়, খাওয়া-পরার কথাই ওঠে না সেখানে। এবার পাটের দাম বেশি হওয়াতে কৃষাণদের রেট এক টাকা বেড়েচে মাসে—তাও কতদিন এ চড়া রেট টিকবে তার ঠিক নেই। হাতে কিছু টাকা করে নেওয়া যায় এদেশে থাকলে। কিন্তু এতদূর বিদেশে সে থাকবে কতদিন?

সে জবাব দিলে—না ভাই, আমার যাওয়া হবে না।

—চাকরি করবা না?

—মরতি যাবো কেন বিদেশে পড়ে? মোদের গাঁয়ে চাকরির অভাবডা কী?

খেয়ে দেয়ে হাতে দুপয়সা জমেছে যখন, তখন পরের চাকরি করতে যাবার দরকার নেই। রোজ রোজ মজুরি চলে। আজকাল একদিনও সে বসে থাকে না। ভালো একখানা রঙিন গামছা কিনে ফেললে তেরো পয়সা দিয়ে বাহাদুরপুরের হাটে একদিন।

রঙিন গামছাখানাই হলো কাল—এখানা কিনে পর্য্যন্ত তার কেবলই মনে হতে লাগলো কাতু যদি তাকে এ গামছা-কাঁধে না দেখলো তবে আর গামছা কেনার ফলটা কি? সবুজ গামছাখানা তো সেদিন কিনেছিল সে কাতুর জন্তে।

একদিন কাজকর্ম্ম সেরে বিকেলে সে মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়েচে। একটা বড় ঘোড়া-নিমগাছ ছায়া ফেলেচে অনেকখানি ফাঁকা মাঠে। সেখানে বসে চুপি চুপি কোমর থেকে

গেঁজে খুলে পয়সাকড়ি উপুড় করে সামনে ঢেলে গুনে দেখলে, উনিশ টাকা তেরো আনা জমেচে মজুরি করে।

সামনে একটা খালে তেরো-চোদ্দ বছরের সুন্দরী মেয়ে শামুকগুগলি তুলচে। ও বললে—কি তোলচো, ও খুকি ?

মেয়েটা বিস্ময়ের সুরে বললে—কি ?

—তোলচো কী ?

—গুগ্‌লি।

—কি হবে ?

মেয়েটি সলজ্জহাস্যে বললে—খাবো।

—কি জাত তোমরা ?

—বাউরি!

—বাড়ী কনে ?

মেয়েটি আবার ওর দিকে যেন খানিকটা আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে আছে—তারপর আঙুল দিয়ে দূরের দিকে দেখিয়ে বললে—নটবরপুর।

আর কোন কথা হয় না। মেয়েটা আপন মনে গুগলি তুলতে থাকে। সিঁদুরচরণ বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কাতুর কথা বড মনে হয়, আর থাকা যায় না। এ কোন্ মুল্লুক, কতদূর, বিদেশ বিভুঁই, সেখানে বাউরি বলে জাত বাস করে। কেউ বাপ-পিতেমোর জন্মে শুনেচে বাউরি বলে কোনো জাতের কথা, যারা খালে বিলে গুগলি তুলে খায় ?

ওর মনটা হু-হু করে ওঠে নতুন করে। বুকের মধ্যে কী যেন একটা মোচড় খায়। যদি এই বিদেশে মারা যায় ?

কাতুর সঙ্গে তাহলে দেখাই হবে না।

কাতু সজনে-তলায় গোরু বেঁধে বিচুলি কেটে দিচ্ছে, সন্ধের পিদিম ঘরে ঘরে সবে জ্বালা শুরু হয়েচে, এমন সময় রাস্তা কাঁপিয়ে রব উঠলো—বল হরি হরিবোল। ব্যাপারটা নতুন নয়—এই পথ দিয়েই দূর দেশের সমস্ত মড়া পোড়াতে নিয়ে যায় কালীগঞ্জের বা চাঁদুড়ের গঙ্গাতীরে।

কাতুদের পাড়ার কে একজন জিজ্ঞেস করলে—কনেকার মড়া ?

—সনেকপুর।

—কি জাত হ্যাগা ?

—সনেকপুরের বিপিন ঘোষের নাম শুনেচ ? তেনার ছেলে। কাতু বিপিন ঘোষের নাম শোনেনি, কিন্তু বড় কষ্ট হলো শুনে। কারো জোয়ান ছেলে মারা গেল—বাপ-মায়ের কী কষ্ট! এ লোক যে কোথায় গেল আজ মাসখানেকের ওপর হবে তা কেউ জানে না। খবর পত্তর কিছুই নেই। শিবির মা গাই দুইতে এসে দেখলে ও চালাঘরের ছেঁচতলায় বসে

কাঁদচে। শিবির মা অবাক হয়ে বললে—কানচিস কেন রে ?

—মনটা বড্ড কেমন করচে।

দূর! বাছুরটা ধর্। ইদিক আয় দিনি!

—একটা মড়া নিয়ে গেল দেখলি ? বিপিন ঘোষের ছেলে।

—নিয়ে গেল তা তোর কি ? মর্ মাগী! বাছুর ধর্। এখুনি পিইয়ে যাবে।

শিবির মা পাড়ায় গিয়ে রটিয়ে দিলে সিঁদুরচরণ কাতুকে ফেলে পালিয়েচে। আর আসবে না, এতদিনে বোঝা গেল। অনেকে সহানুভূতি দেখালে। কেউ কেউ বললে—বিয়ে করা সোয়ামী নয় তো। গিয়েচে তা কী হবে। গোরুটা রয়েচে, অমন ভাল বকনা বাছুরটা হয়েচে, ওরই রইল।

আরও দিন-পনেরো কাটলো··

কাতুর চোখের জল শুকোয় না। রোজ সন্ধ্যেবেলা মন হু-হু করে। এমন বকনা-বাছুর হলো গোরুটার, বার দোয়া শেষ হবে আজ সেই গোরু দেড় সের দুধ দিচ্চে দুবেলায়—ও এসে দেখুক নইলে ঘরে আগুন ধরিয়ে সে চলে যাবে একদিকে, যেদিকে দুচোখ যায়।

পাড়ার ছিচরণ সর্দার আজকাল ওর বাড়ী বড যাতায়াত শুরু করেচে। ঠিক যে সময়টিতে কেউ থাকে না, ভর সন্ধ্যেবেলাটি, বাঁশবনে রোদ মিলিয়ে গিয়েচে—ছিচরণ এসে বলবে—ও কাতু।

—কি ?

—ঘরে আছিস্ ?

—কেনে ?

—একটু তামুক খাওয়া।

—তামুক নেই গো।

—পান সাজ্ একটা।

—পান কনে পাবো ? মানুষ ঘরে না থাকলি ও-সব থাকে ? তুমি এখন যাও।

ছিচরণ সর্দার দমবার পাত্র নয়। তার স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে আজ দু'বছর। অবস্থা ভালো, এক আউড়ি ধান ঘরে তুলেচে গত ভাদ্র মাসে। একবার চড়া পাটের বাজারে ত্রিশ মণ পাট বিক্রি করেচে। লোকে খাতির করে চলে ওকে। শিবির মা রোজ গাই দুইতে এসে ছিচরণের ঐশ্বর্যোর ফিরিস্তি কাতুকে শুনিয়ে যায় অকারণে। ছিচরণ নিজে দু-একদিন অন্তর আসে; বসতে না বললেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গল্প জমাবার চেষ্টা করে। কাতুর ভালো লাগে না এ-সব। আর কিছুদিন সে দেখবে—তারপর গোরু বাছুর বিক্রি করে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়বে একদিকে।

সেদিন ছিচরণ আবার এসে হাজির। ডাক দিলে—ও কাতু।

—কি ?

—বাবাঃ, তা একটু ভালো করে কথা বললি কি তোর জাত যাবে?

—তুমি রোজ রোজ ভর্-সন্ধেবেলা এখানে আস কেন?

—তার দোষটা কি?

—না, তুমি এসো না। লোকে কি মনে করবে।

—একটা কথা বলি তোর কাছে। আমার সংসারডা তো গিয়েচে তুই জানিস। একা থাকতি বড্ড কষ্ট হয়।

—তা কি করবো আমি?

ছিচরণের আর বেশি কথা বলতে সাহস হলো না, আমতা আমতা করে বললে—না না—তাই বলচি।

কাতু বললে—এখন তুমি এসো গিয়ে।

ছিচরণ তবুও যায় না। বলে—ওরে দাঁড়া। যাবো, যাবো, থাকতি আসিনি। এই দু বিশ ধান কর্জ্জ দেলাম পাঁচরে। বলি হয়েচে দেড় পৌটী ধান, তা লোকের উপকারে লাগে তো লাগুক। ধান ঝেড়ে দিয়ে-থুয়ে এই আসচি। বড্ড কষ্ট হয়েচে আজ।

কাতু ঝাঁঝালো সুরে বললে—কষ্ট জুড়োবার আর কি জায়গা নেই গাঁয়ে?

—তোর সঙ্গে দুটো কথা বললি আমার মনডা জুড়োয় সত্যি বলচি কাতু। তোরে দেখে আসচি ছেলেবেলা থেকে। আমি যখন গোরু চরাই তখন তুই এতটুকু। তোর বয়েস আমার চেয়ে সাত আট বছরের কম

—বেশ, তা এখন যাও। বয়েসের হিসেব কসচি কে বলচে তোমারে?

—হাঁরে, সিঁদুরচরণ তোরে ফেলে এমনিই পালালো, না পয়সাকড়ি কিছু দিয়ে গিয়েচে? চলা-চলতির একটা ব্যবস্থা চাই তো?

—সেজন্যি তোমার দোরে গিয়ে কেঁদে পড়েলাম মুই, জিজ্ঞেস করি?

ছিচরণ বেগতিক দেখে আস্তে আস্তে চলে গেল। কাতু কাঁদতে বসলো। তার বয়েস হয়েচে একথা সত্যি, প্রায় পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি, কি তার চেয়েও বেশি। ঘরসংসার বলে জিনিসের মুখ এই ক'বছর দেখেচে, সিঁদুরচরণের কাছে থেকে। আবার কোথায় যাবে এই বয়সে? একটা পেট চলে যাবে, ভিক্ষে করা কেউ কেড়ে নেবে না। দুদিনের গেরস্থালি ভেঙে যদি যায়—আর কোথাও গেরস্থালি বাঁধবে না, সব ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়বে।

শিবির মা এসে দোরে দাঁড়ালো। কাতু জানে, ও কেন আসে। আসে একটা নিয়ে অবিশ্যি। বললে—একটু হলুদবাটা দেবা?

—নিয়ে যাও।

—দু'সের হলুদ এনেছিলাম ছিচরণ সর্দ্দারের বাড়ী থেকে। তা ফুরিয়ে গিয়েচে। ওর ঘরে কোনো জিনিসের অভাব নেই। হলুদ বলো, ঝাল বলো, পেঁজ বলো, সরষে বলো—সব মজুদ। গুড় আমাদের দেয় বছরে একখানা ক'রে। ওর ঘরে চার-পাঁচ মণ গুড় হয় ফি-বছর।

কাতু বললে—তা এখন হলুদ-বাটনা নেবা ?

শিবির মা বললে—হলুদ-বাটনা ছাও একটু। মাছ রাঁধবো।

—তবে নিয়ে যাও।

—তোমার শরিল খারাপ হলি দেখাশোনা করে কে তাই ভাবচি।

—সে ভাবনা তোমায় ভাবতি কেডা গলা ধরে সেধেচে শুনি ? গা-জ্বালা কথা শুনলি হয়ে আসে।

ঠিক সেই সময় উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কে ডাক দিলে—ও কাতু।

কাতু চমকে উঠেই পরক্ষণে দাওয়া থেকে ছুটে নেমে এসে বললে—তুমি। ওমা, আমি কনে যাবো!

শিবির মা অন্ত দিক দিয়ে পালানোর পথ খুঁজে পায় না শেষে।

এই হলো সিঁদুরচরণের বিখ্যাত ভ্রমণের ইতিহাস। এর পর থেকে মালিপোতা গ্রামের মধ্যে বিখ্যাত ভ্রমণকারী বলে সে গণ্য হয়ে রইল। দশবার ধরে এ গল্প করেও তার ভ্রমণ-কাহিনী আর ফুরোয় না। লোকে আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে বলে—ওই লোকটা বাহাদুর পুর গিয়েল। জোয়ান বয়েসে ও বড্ড বেড়িয়েচে দেশ-বিদেশে।

অবিশ্যি সিঁদুরচরণকে দেখতে নিতান্ত সাধারণ লোকের মতই। তার মধ্যে যে অত বড় গুণ লুকিয়ে আছে তা তাকে দেখে বোঝবার উপায় ছিল না। মানুষের কীর্ত্তিই মানুষকে অমর করে।

সিঁদুরচরণের খ্যাতি আমার কানেও গিয়েছিল। ঝুমবির বাগানের মধ্যে দিয়ে সিঁদুরচরণ হাট থেকে সেদিন ফিরচে, আমি বল্লাম—সিঁদুরচরণ নাকি বাহাদুরপুর গিয়েছিলে ?

সিঁদুরচরণ বিনম্র হাস্যের সঙ্গে বললে—তা গিয়েলাম বাবু। অনেকদিন আগে।

—বটে! আচ্ছা, সে কতদূর ?

—আপনি কেষ্টনগর চেন ?

—না চিনলেও নাম শোনা আছে ?

—কোন্ দিক জানো ?

—তা কি করে জানবো, আমি কি সেখানে গিয়েচি ?

বাহাদুরপুর কেষ্টনগরের দু'ইষ্টিশনের পরে।

কথা শেষ করেই সিঁদুরচরণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল বোধ হয় এই দেখবার জন্য যে, তার কথা শুনে আমার মুখের চেহারা কি রকম হয়।

একটি কোঠাবাড়ীর ইতিহাস

সন ১২৪০ সাল। সকাল বেলা। কাল দোলপূর্ণিমা।

কালীপদ চৌধুরী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। খই-দই খাইয়া তিনি এখনই রওনা হইবেন। অক্ষয় মিস্ত্রিকে ডাকিয়া আনিয়া কোঠাঘরের আনুমানিক ব্যয় ঠিক করিতে হইবে।

রামতারণ বাঁড়ুজ্যে কৃষ্ণনগর কোর্টের নকলনবিশ (গ্রামে অগাধ পয়সা প্রতিপত্তি। দু পয়সা করিয়াছেন, গোলাপালা, জমিজমা ও করিয়াছেন। ছুটিতে রামচরণ বাড়ী আসিয়াছেন, চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক টানিতেছেন সকালবেলা। কালীপদ চৌধুরীকে দেখিয়া কহিলেন—কোথায় চললে হে?

—আজ্ঞে কাকা, অক্ষয় মিস্ত্রীকে একবার ডাকতে যাচ্ছি।

—কেন হে? অক্ষয় মিস্ত্রীকে কি হবে তোমার?

কালীপদ আসিয়া বসিলেন চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায়। বলিলেন—বাঃ, এবার মিছরে গাছটাতে খুব বোল হয়েছে দেখছি!

বসন্তের সকাল। একটু একটু ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে, আম্রমুকুলের সুমিষ্ট সৌরভে ভরপুর।

রামতারণ বলিলেন—আর-বারও বোল হয়েছিল ভাল, কুয়াশাতে সব ঝাঁই পড়ে গেল। দেখ এ বছর কি হয়। বোল তো ভালই হয়, তবে টিকে থাকে না। বস বাবা।

এই সময় রামতারণের ভাইঝি একটা কাঁসার সাণ্ডরিতে চাল-ভাজা, নারকেল-কোরা ও খানিকটা গুড় লইয়া আসিয়া বলিল—জেঠামশায়, খাবার খান।

রামতারণ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—ও-শৈল, এই তোর কালীপদ-দাদা এসেছে। বাড়ী গিয়ে তোর জেঠাইমাকে বল গে—

কালীপদ বলিলেন—না না, কাকা। আমি এই মাত্তর খই-দই খেয়ে বেরিয়েছি। আমায় যেতে হবে সেই পুবপাড়া। অক্ষয় মিস্ত্রিকে বাড়ী পাওয়া দরকার। আমি উঠি।

—না না, বস, দুটি চালভাজা খেলে তোমাদের মতন ছেলে-ছোকরা মানুষের আর অক্ষিধে হবে না। যা শৈলি, নিয়ে আয় তো। ভাল হয়ে উঠে এসে বস না। তুমি আজকাল সেই জমিদারি সেরেস্তাতেই কাজ করছ তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

একটু পরে শৈলি আর এক বাটি চালভাজা ও গুড় লইয়া আসিয়া কালীপদর সামনে রাখিয়া চলিয়া গেল। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পল্লীগ্রামেও অবিবাহিত কিশোরী মেয়ে গ্রামের তরুণ যুবক প্রতিবেশীর সহিত গুরুজনের সম্মুখে কথাবার্তা বলিতে পারিত না।

শৈলি মেয়েটি বেশ স্বাস্থ্যবতী, দেখিতে শুনিতে ভাল। রংও ফর্সা। চাহিয়া দেখিবার ও দু-একটি কথা কহিবার ইচ্ছা থাকিলেও কালীপদ সামলাইয়া গেলেন।

রামতারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—তার পর, অক্ষয় মিস্ত্রির কাছে কী মনে করে?

—দুটো পাকা ঘর করব ভাবছি, কাকা।

রামতারণ একটু বিস্মিত না হইয়া পারিলেন না। সেদিনের ছেলে কালীপদ, ওর বাবা পয়সা রাখিয়া যায় নাই মৃত্যুকালে। একটি অবিবাহিতা ভগ্নী ও বিধবা মা লইয়া ওর সংসার। আজ আট-দশ বৎসর কি করিয়া চালাইতেছে, রামতারণ বাঁড়ুজ্যে তাহার খবর রাখা আবশ্যক মনে করেন নাই। কিন্তু সেই কালীপদ আজ তাহার পৈতৃক আমলের চৌচালা খড়ের ঘর ছাড়িয়া পাকা বাড়ীতে বাস করিবার স্পর্দ্ধা করিতেছে। এত পয়সা ছোঁড়ার হাতে আসিল কি-ভাবে?

রামতারণ বলিলেন—হুঁ।

—আচ্ছা কাকা, আপনি বলতে পারেন, দুখানা ঘর মাত্র, দরজা জানালা, সামনে একটু রোয়াক—এতে কত খরচ পড়তে পারে? তাই যাচ্ছিলাম অক্ষয় মিস্ত্রির কাছে। আপনার আঁচ পেলে আর অতদূরে যাই নে।

—হুঁ।

—তাহলে যদি বলেন—

—দাঁড়াও। কাগজ-কলম নিয়ে বসতে হচ্ছে। আনি।

কাগজ কলম আনিয়া হিসাবপত্র জুড়িয়া দেখা গেল আটশ টাকার কমে ও রকম একখানি ছোট বাড়ী তৈয়ারি হয় না। সব জিনিসের দাম বেশি। ইটের হাজার সাত টাকা। সাড়ে দশ আনা সিমেন্টের বস্তা। রাজমিস্ত্রির মজুরি দশ আনা, পেটেল মজুরের চার আনা হইতে স' পাঁচ আনা। রামতারণ ভাবিয়াছিলেন, খরচের হিসাব পাইলে ছোঁড়ার চুলবুলুনি ভাঙিয়া যাইবে, কিন্তু দেখা গেল, তাহা নয়, ছোঁড়া দমিল না। বরং বলিল—আট শ টাকা তো? না হয় শ'খানেক টাকা এদিক-ওদিক হতে পারে, কি বলেন? তাহলে পাঁজি দেখে একটা শুভদিন দেখে দিন, কাকা। সূত্র ফেলা যাক।

রামতারণ বলিলেন—তা একদিন দেখো এখন। কোঠা করছ—বড় আনন্দের কথা। তোমাদের উন্নতি দেখলে মনে বড়ই আনন্দ হয় বাবা। আহা, আজ যদি তোমার বাবা বেঁচে থাকতেন। তা সবই ভাগ্য।

কালীপদ রামতারণ বাঁড়ুজ্যের পদধূলি লইয়া বলিলেন—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন কাকা, যেন মাকে অন্তত কোঠাঘরে শোয়াতে পারি। আপনাদের আশীর্ব্বাদ—

—হবে, হবে বাবা, হবে বই কি। তবে হাজার টাকা ট্যাঁকে গুঁজে তার পর কাজে হাত দিও। দেখো, যেন অর্দ্ধেক হয়ে পড়ে না থাকে। বড় শক্ত কাজ। ছেলেমানুষ কিনা, তাই বলছি।

—আজ্ঞে, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে সব করব। আমার আর কে আছে আপনাদের পাঁচজন ছাড়া। কত কষ্টে মানুষ হয়েছি বাবা মারা যাওয়ার পরে, সবই তো জানেন। কোনদিন খাওয়া জুটেচে, কোনদিন জোটে নি। ছেঁড়া কাপড় তালি দিয়ে মায়ে পোয়ে পরেছি। দুধ-ঘি এর মুখ দেখি নি কোনদিন।

—হ্যাঁ হে, তোমার ভগ্নীটি তো প্রায় এগার বছরে পড়ল। আর তো ঘরে রাখা যায় না, এবার ওর একটা বিয়ের জোগাড় কর। পল্লীগ্রাম জায়গা, লোকে কি বলবে না বলবে। বাড়ী না হয় দু বছর পরে ক'রো—ভগ্নীর বিবাহটি আগে দাও।

—তাও ‧ দান দেখছি কাকা। ওবেলা এসে বলব এখন সব। আচ্ছা, উঠি তাহলে এখন।

কালীপদ চৌধুরী চলিয়া গেলেন রামতারণ বাঁড়ুজ্যের সকালটা মাটি হইয়া গেল। নাঃ, আজ আর কোন কাজ করা চলিবে না। কি কুক্ষণে তিনি চণ্ডীমণ্ডপে তামাক খাইতে বসিয়াছিলেন

রামতারণ বাঁড়ুজ্যে অন্যভাবেও দু-একবার বাধা দেবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, একবার মিস্ত্রিদের কাজ করা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর একবার অন্য কি একটা করিয়াছিলেন, কিন্তু কালীপদ চৌধুরীর কোঠাবাড়ী তাহাতে বন্ধ থাকে নাই। অবশেষে যেদিন সুন্দর দুইকুঠারি পাকা ঘর নির্ম্মাণ শেষ করিয়া কালীপ ‧ চৌধুরী গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে গ্রামের ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করিলেন, বাস্তুপূজা ও সত্যনারায়ণের সিন্নির আয়োজন করিলেন, রামতারণ সেদিন ‧ ‧ র কর্ম্মস্থল গোয়াড়িতে। বংশের প্রথম কোঠাবাড়ী। কালীপদ চৌধুরীর ম সেই র ত্রিতে এ ঘরে প্রথম শুইলেন। জ্যোৎস্না-রাত্রি। বর্ষাকাল। মনে পড়িল, এই বর্ষার দিনে খড়ের ঘরে জল পড়িত ‧টকা দিয়া, গরীব স্বামীর কথা ও সে দুঃখ ঘুচাইতে পারেন নাই। আজ উপযুক্ত ছেলে সে খড়ের চালার জায়গায় পাকা ঘর তুলিল। আজ যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন।

জগদম্বা দেবী সে রাত্রে আদৌ ঘুমাইতে পারিলেন না দোর-জানালায় নূতন রং মাখানো হইয়াছে—তাহার গন্ধটা বড় উৎকট। এক-একবার সে গন্ধটা মনে পরম আনন্দ বহন করিয়া আনে, চোখ বুঁজিয়া থাকিতে থাকিতে মাঝে মাঝে চোখ খুলিয়া ঘরের চারিধারে চাহিয়া দেখেন। না, পাকা ঘরই বটে। ওই তো কড়িকাঠ, ওই তো পাকা চুনকাম করা দেওয়াল—ওই সেই রঙের উৎকট গন্ধটা। স্বপ্ন নয়—সত্যই কোঠাঘরে শুইয়া আছেন বটে।

এই দিনটি হইতে কালীপদ চৌধুরী গ্রামের মধ্যে মাতব্বর হইয়া উঠিলেন। রামতারণের প্রতিদ্বন্দ্বী তিনি হইতে চাহেন না কিন্তু গ্রামের লোক সালিশ মীমাংসা ইত্যাদি কার্য্যে তাঁহার সাহায্য চাহিতে লাগিল, বারোয়ারির চাঁদা আদায়ের ভার তাঁহার উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে কালীপদ চৌধুরীর অবস্থা আরও ভাল হইয়া উঠিল, তিনি কাছারির নায়েবি পদে পাকাপোক্তভাবে বহাল হইয়া সুখ্যাতির সহিত উক্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন।

মাহিনা কুড়ি টাকা বটে, কিন্তু বে জগার ও রতেন বাদ সত্তর টাকা। যে সময় ন সিকা উৎকৃষ্ট বালাম চাউলের মণ, দশ আনা সের ঘৃতের সের, যোল সের খাঁটি দুগ্ধ টাকায়, একটা দু-তিন সের ওজনের রোহিত মৎস্যের দাম বড়জোর এক টাকা—সে সময়ে কালীপদ চৌধুরী গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন মাতব্বর গৃহস্থ বলিয়া গণ্য কেন না হইবেন।

বেলপুকুরের মহিমাচরণ গাঙ্গুলির কনিষ্ঠা কন্যা হৈমবতীর সঙ্গে কালীপদ চৌধুরীর

শুভবিবাহ নিষ্পন্ন হইল। লক্ষ্মী যখন আসেন, কোন দিক দিয়া আসেন বোঝা যায় না। এই বিবাহের পর হইতেই কালীপদ চৌধুরীর অবস্থা খুব ভাল হইতে লাগিল। রামতারণ বাঁড়ুজ্যে বৃদ্ধ হইয়া কার্য্যে অবসর গ্রহণ করিলেন; নকলনবিশের কাজে পেনশন নাই, তাঁহার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপ হইয়া পড়িল। তবে একেবারে গরীব হইয়া তিনি কোনদিনই পড়েন নাই, কারণ হুঁশিয়ার রামতারণ অনেক জায়গাজমি করিয়া লইয়াছিলেন। বছরের ধান গোলায় মজুত থাকিত।

কালীপদ চৌধুরীর একটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে। ছেলেটি গ্রাম্য পাঠশালায় পড়িবার পরে কিছুদিন বাড়ী বসিয়া জমিদারী সেরেস্তার কার্য্য শিখিতেছিল, কিন্তু এক বন্ধুর পরামর্শে তাহাকে দূরবর্ত্তী মহকুমার ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। ইংরেজি লেখাপড়ার চাল তখন গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে, দু-তিনটি ছেলে এণ্ট্রান্স পাশও করিয়াছেন, রামতারণ বাঁড়ুজ্যের বড় নাতি তাহাদের অন্যতম।

১২৮০ সাল।

কালীপদ চৌধুরীর ছেলে সুকুমার চৌধুরী দেশেই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি করিয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। কালীপদ চৌধুরীর বয়স চৌষট্টির কোঠায় ঠেকিয়াছে, রামতারণ বাঁড়ুজ্যে অতি বৃদ্ধ অবস্থায় এখনও বাঁচিয়া আছেন তবে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবার আর ক্ষমতা নাই। তাঁহার ছেলেরা চাকুরি করিতেছে।

আবার বাড়ী হইবে।

সুকুমারের সময় নাই, সে পসারওয়ালা ডাক্তার, বৃদ্ধ কালীপদ চৌধুরী ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন, কোথায় চুন, কোথায় সিমেণ্ট। দুটি বড় সেগুন গাছ কাটাইয়াছেন, সর্ব্ব পরামানিকের বাগানে। মুর্শিদাবাদ হইতে করাত টানিবার মিস্ত্রি ও ছুতার মিস্ত্রি আনাইয়া সেই বাগানেই কাঠচেরাই ও দরজাজানালা কড়িবরগা ইত্যাদি তৈরি হইতেছে। ছেলে বাড়ী দোতলা করিবে, পূজার দালান তৈরি করিবে, পুকুর কাটাইবে—বৃদ্ধের উৎসাহের সীমা নাই। অতিবৃদ্ধ রামতারণ (৮৯) বলিলেন—কে?

—এই কাকা, আমি কালীপদ।

—এস এস বাবা, কি মনে করে?

—শুনলাম আপনি নাকি কখানা পুরনো কড়ি বিক্রি করবেন?

—কার বাড়ী?

—আজ্ঞে বাড়ী না, কড়ি। ঘরের কড়ি। বিক্রি আছে শুনলাম আপনার এখানে?

—কেন?

—সুকুমার বাড়ীটা দোতালা করবে—আর বলছে পুজোর দালানটা করবে সঙ্গে সঙ্গে। মহামায়ার কৃপা সবই। যদি তাঁকে এবার আনা যায়। আর আমার তো এখন গেলেই হয়—আপনাদের কোলে-পিঠে মানুষ হলাম, আমরাই বুড়ো হয়ে গেলাম। এখন ওদের সব

—নাতি দুটো আছে, ধুলো গুঁড়ো বংশের। আশীর্ব্বাদ করুন যেন ওরা মানুষ হয়ে বংশের নাম রাখে।

—বস, বস বাবা। সুকুমার হীরের টুকরো ছেলে, তা বাড়ী করবে বই কি। দুপয়সা রোজগারও করছে। আর আমার ওই বাঁদরগুলো দেখ। মানুষ হল না। পুরনো কড়ি আছে, নিয়ে যেও। ও আমার সেই পৈতৃক আমলের বাড়ীর কড়ি। নিয়ে যেও, দর একটা যা হয় ঠিক করে দেব।

কালীপদ বিদায় লইলে রামতারণ বাঁড়ুজ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

খাইতে পাইত না ওই কালীপদ চৌধুরী, ওর মা লোকের বাড়ী রাঁধুনির কাজ করিয়া ছেলেকে মানুষ করিয়াছিল, তিনি তো সবই জানেন। আজ তাহার ছেলে দোতলা কোঠা তুলিতেছে! আবার পূজার দালান তুলিয়া দুর্গোৎসব করিবে বলিয়াও শাসাইয়া গেল। সবই অদৃষ্ট।

তিন মাসের মধ্যে সুকুমারদের দোতলা বাড়ী উঠিল বিস্তর ছুটাছুটির পরে। একখানা মনের মত বাড়ী তুলিতে সোজা হাঙ্গামা নয়, চুন সুরকি ইট কাঠ জোগাড় করিতে এই তিন মাস পিতাপুত্রের সময়ে স্নান হয় নাই, সময়ে আহার হয় নাই। খুব ধুমধামে গৃহপ্রবেশ হইল, রামতারণ বাঁড়ুজ্জে চিঁড়েদইএর ফলার করিয়া গেলেন। আবার সেই আশ্বিন মাসে সুকুমারদের বাড়ীর প্রথম দুর্গোৎসবে খিচুড়ি মাংস খাইলেন, কবির গান শুনিলেন।

পর পর এত আঘাত বোধ হয় অতিবৃদ্ধ রামতারণের সহ্য হইল না। সেই অগ্রহায়ণ শীতকালের প্রথমেই সামান্য দুদিনের জ্বরে তাঁহার দেহান্ত ঘটিল।

সুকুমার পৈতৃক ভিটাতেই দোতলা বাড়ী উঠাইয়াছিল। তাহার পিতা প্রথম যৌবনে সর্ব্বপ্রথম যে একতলা ক্ষুদ্র বাড়ীটা তোলেন ভিটাতে, যে বাড়ীটা এক সময় রামতারণ বাঁড়ুজ্যের মনে কত ঈর্ষার সঞ্চার করিয়াছিল, সে বাড়ীটার আদর কমিয়া গেল। দোতলা বাড়ীর পিছনে সেটা অনাদৃত অবস্থায় জিনিসপত্র রাখিবার ভাঁড়ার ঘর এবং দু-একজন আশ্রিতা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়াদের শয়নঘর হিসাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। হ্যাঁ, কেবল একটি কথা। বাড়ীতে সত্যনারায়ণ পূজা ও সিন্নি বিতরণ করা হইলে তাহা ওই পুরানো কোঠাবাড়ীতেই হইয়া থাকে।

সুকুমার ডাক্তার হিসাবে নাম করিল ভাল। অনেক দূর হইতে লোকে রোগী দেখাইতে আসে। যাহারা আসে, তাহারা একবার ডাক্তারবাবুর নতুন দোতলা বাড়ী দেখিয়া যায়। পূজার দালান তো গ্রামে মোটে ওই একটি। দুর্গোৎসবও ডাক্তারবাড়ী ছাড়া আর কোথাও হয় না।

সুকুমারের দুই সংসার। প্রথম পক্ষের কোন সন্তানাদি হয় নাই, দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর পর পর চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে হইল। লোকে যে অনেক সময় গল্প করে, নিঃসন্তানা প্রথমা স্ত্রী স্বামীর বংশ রক্ষার জন্য নিজেই স্বামীর বিবাহের ব্যবস্থা করে, সুকুমারের জীবনে তাহা বাস্তব সত্যে পরিণত হইয়াছে।

সুকুমারের প্রথমা স্ত্রী তরুবালা পরমা সুন্দরী। অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া কালীপদ চৌধুরী পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের পর দশ বৎসর কাটিয়া গেল। সন্তানসন্ততি বংশে একটিও আসিল না।

সুন্দরী তরুবালার রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে। খিড়কিতেই কালীপদ শখ করিয়া পুকুর কাটিয়া ঘাট বাঁধাইয়াছিলেন, পুকুরঘাটে যখন বড় বৌ নাহিতে নামে, ঘাট আলো করে রূপে।

সেদিন রাত্রে তরুবালা স্বামীকে ব'লল—একটা কথা রাখতে হবে।

—কি কথা?

—বল রাখবে?

—না শুনে কি করে বলি?

—তোমার আবার বিয়ে দেব।

—হ্যাঁ, একটা কথার মত কথা বটে! একটা কেন, দুটো দাও।

—ও চালাকি রাখ। মেয়ে দেখে রেখেছি। ছেলেপুলে না হলে বংশ থাকবে কি করে? পয়সাকড়ি রোজগার করছ কার জন্যে?

—কথাটা সত্যিই ভেবে দেখি নি। না, বিয়ে করা দরকার হয়ে পড়েছে দেখছি।

—তুমি যতই চালাকি কর, আমি কিন্তু জানি বাবার মন খুব খারাপ। বংশে বাতি দিতে কেউ না থাকলে তাঁর মন খারাপ হবারই কথা।

—এসব তোমার মনের কথা?

—নিশ্চয়ই। তুমি কি ভাব আমি ঠাট্টা করছি?

—সুকুমার সেবার কথাটা যতই ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিক, অবশেষে পুনর্ব্বার বিবাহ তাহাকে করিতেই হইল। দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম নীরজাসুন্দরী, দেখিতে নিতান্ত মন্দ নয়! বেশ স্বাস্থ্যবতী ও শান্তস্বভাব। বিবাহের তিন বৎসর পরে একটি কন্যা ও আরও দুই বৎসর পরে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ ক'রয়া ডাক্তারবাড়ী আলো করিল।

তরুবালা সর্ব্বদাই দোতলার ঘরে ছেলেটি লইয়া বসিয়া থাকে।

কেহ আসিলে গর্ব্বের সঙ্গে বলে—এই দেখ পিসি, আমার ছেলে

একবার একটি মন্থরা জুটিয়াছিল। সে বুড়ি পাশের বাড়ীর শ্যামাপদ বাঁড়ুজ্যের মা। বড়লোকের বৌ তরুবালার খোসামোদ করিয়া কখনও দুধ, কখনও পাটালি, কখনও একখানা নতুন কাপড়, কখনও বা এক কাঠা সোনামুগের ডাল হাতড়াইয়া যাইত। সেদিন তরুবালা অমন বলিতেই বুড়ি বলিল—আহা, বড় বৌমার যা কাণ্ড।

তরুবালা বলিল—কেন খুড়িমা?

—সতীন-পোর দেখা পেয়েছ, নিজের ছেলের সোয়াদ তো পেলে মা—আহা না। দুধের সোয়াদ কি ঘোলে মেটে?

—কেন?

—আহা মা, তোমার মুখের দিকে চাইলে কষ্ট হয়! কথায় বলে সতীন কাঁটা। তার

খোকা। তোমার তাতে কি? বড় হয়ে কি ও তোমায় ভাল চোখে দেখবে?

এইদিন হইতে তরুবালা তাহাকে এড়াইয়া চলিত।

ক্রমে নীরজাসুন্দরী আরও তিনটি পুত্রসন্তানের জননী হইল।

কনিষ্ঠ পুত্রটি লেখাপড়ায় ভাল হইয়া উঠিল, সব পরীক্ষায় বৃত্তি পায়, সব বিষয়ে সমান জানে শোনে। গ্রামের মধ্যে অমন ছেলে দেখা যায় নাই ইতিপূর্ব্বে বৃদ্ধ কালীপদ তো নাতিকে পলকে হারায় এমনি অবস্থা। নাতির কথা সকলকে গর্ব্ব করিয়া বলিয়া না বেড়াইলে তাঁর দিন কাটে না।

যে বৎসর ছেলেটি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তি পাইল, সুকুমারের প্রথমা পত্নী তরুবালা সেবার বৈশাখ মাসে স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া সৎছেলে-মেয়েগুলিকে কাঁদাইয়া অকালে স্বর্গারোহণ করিল।

তরুবালার মৃত্যুতে গ্রামের এমন লোক ছিল না যে চোখের জল ফেলে নাই। ১৩১০ সালের বৈশাখ মাস সেটা।

তার পর অনেক দিন কাটিয়া গেল। অনেক সুখদুঃখের ঝড় বহিয়া গেল সংসারের উপর দিয়া।

সুকুমারের ছেলে অনাথবন্ধু ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্টে ভাল চাকরি পাইয়া দিল্লী চলিয়া গেল। অন্য দুটি ছেলের মধ্যে একটি উকিল ও অন্যটি ডাক্তার হইয়া কলিকাতায় প্র্যাকটিস শুরু করিয়া দিল, কারণ দেশে নিজের বাবা পসারওয়ালা ডাক্তার, ডাক্তারি শিখিয়া ছেলে সেখানে বসিলে কোন লাভ নাই। সুকুমারও ভাবিল, অনেক দিন হইতেই কলিকাতায় ডাক্তারি প্র্যাকটিস করিবার যে শখটা ছিল, নিজের ছেলের মধ্য দিয়ে সেটা সার্থক করিয়া তোলা যাক।

কালীপদ চৌধুরী এখন অতি বৃদ্ধ। বিশেষ নড়িতে চড়িতে পারেন না। নাতবৌয়েরা সেবা করিলে খুব ভাল লাগিত বৃদ্ধের, কিন্তু একাল পড়িয়া গিয়াছে—নাতবৌয়েরা স্বামীদের সঙ্গে বাসায় বাসায় ঘোরে।

যদি কোন নাতবৌ কখনও আসে গ্রামের বাড়ীতে দু-এক সপ্তাহের জন্য, কালীপদ তাহাকে পাইয়া বসেন। যত গল্প তাহার সঙ্গে। সে বেচারীকে কাজ করিতে দিবেন না, তাহার নিজের ছেলেপুলেদের তদারক করিতে দিবেন না—কেবল বলিবেন, বস দিদি, বস। এই শোন, তোমার শ্বশুর যখন ছোট ছিল—

অর্থাৎ কেবল সুকুমারের গল্প।

বৃদ্ধ বলেন—বুঝলে দিদি, সুকুমার আমার বংশের চুড়ো—

তার পর বলেন, আগে এই ভিটাতে কি রকম খড়ের ঘর ছিল, তিনি হাতে সামান্য কিছু জমাইয়া পুরানো কোঠাঘরটি করেন। দুই কুঠুরি, ছোট্ট বারান্দা। সে কি আনন্দ উৎসাহের দিনই গিয়াছে। চিরদিনের খড়ের ঘর ঘুচাইয়া প্রথম পাকা বাড়ী করার আনন্দ।

গ্রামের লোকের চোখে প্রথম বড় হওয়া। অনেক লোকের প্রশংসা, অনেক লোকের ঈর্ষা অর্জন করা। জীবনে একটা কিছু করা হইল এই প্রথম। বংশের প্রথম কোঠাবাড়ী।

—তোমার দিদিশাশুড়ি, বুঝলে, আজ যদি বেঁচে থাকত—

নাতবৌ ঠাট্টা করিয়া বলে—কোন্ পক্ষের কথা বলছেন দাদু? আপনাদের সময়ে তো নাকি—

—ও সে আবার কি? ও হ্যাঁ, তা এক পক্ষই ছিল, এখন এই আর এক পক্ষ হয়েছে—এমন টুকটুকে—বলিয়া নাতবৌয়েব গাল টিপিয়া দেন।

নাতবৌ বলে—ও দাদু, এবার চলুন আপনাকে বাসায় নিয়ে যাব।

—না দিদি। সে বয়েস আর কি আছে? এখন গাড়ীতে উঠতে নামতে ভয় হয়।

তার পর অনেক বছর কাটিয়া গেল।

১৩৪০ সাল।

স্বর্গত কালীপদ চৌধুরীর পৌত্র অনাথবন্ধু এখন ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্টে বড চাকুরে। পেনসন লইবার সময় এখনও হয় নাই। তবে খুব বেশি দেরিও নাই। বড় ছেলেটি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, অন্য দুটি ছেলে এখনও ছাত্র। অনাথবন্ধুর পিতা সুকুমার এখন বৃদ্ধ। ছেলেরা এখন আর তাঁহাকে ডাক্তারি করিতে দেয় না।

লেক রোডের ধারে হাল-ফ্যাশানের তেতলা বাড়ী সম্প্রতি শেষ হইয়াছে। দুই ছেলের নামে পাশেই কয়েক কাঠা জমি আগেই অনাথবন্ধু কিনিয়া রাখিয়াছিলেন—আজ বছর দশেক আগে এক দালাল বন্ধুর সাহায্যে। গৃহপ্রবেশের দিন অনেক বড় বড় চাকুরে, এমন কি কয়েকজন সাহেবসুবো নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ভালই হইল।

অনাথবন্ধুর প্রতিজ্ঞা ছিল কলিকাতায় বাড়ী না করিয়া বড় ছেলের বিবাহ দিবেন না। নতুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ কত বড় বড ঘর হইতে আসিতেছিল। এইবার বাদুড়বাগানের বিখ্যাত গাঙ্গুলি পরিবারের মেয়ের সহিত শুভদিনে পুত্রের বিবাহ দিয়া অনাথবন্ধু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বৃদ্ধ সুকুমার ডাক্তার এই উপলক্ষে দেশের বাড়ী হইতে সেই যে কলিকাতার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, আর ফিরিয়া যান নাই। ছেলেরা যাইতে দেয় নাই।

নববিবাহিত পৌত্র অরুণ বলিল—কেমন বাড়ী হয়েছে দাদু?

বৃদ্ধ সুকুমার বলিলেন—বেশ হয়েছে, চমৎকার।

—আর তুমি কিন্তু দেশে ফিরো না, সেখানে মশা, ম্যালেরিয়া—

—তা বটে। তবে—

—তবেটা আবার কি শুনি দাদু? চল আমার সঙ্গে আমার সেখানে। শীতলক্ষ্যা নদীর ধারে চমৎকার কোয়ার্টারস্—

—বেশ বেশ। হ্যাঁ দাদু, হাকিমি করে এসে সন্ধেবেলা এতদিন কি করতিস? আজ না হয় নাতবৌ হল—

—কেন, পাশেই টেনিস কোর্ট। জেলখানার পাশেই। সরকারী ডাক্তার, খুরশেদ আলি সেকেণ্ড অফিসার, সার্কল অফিসার দত্ত, জুট অফিসার আবদুল সোভান—সবাই টেনিস খেলি। তোমার নাতবৌয়ের অভাব অনুভূত হয় নি একদিনও। চল দাদু আমার সঙ্গে—

—দাদু, গাঁ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। ওই গাঁয়ে বাবা যেদিন খড়ের বাড়ী ঘুচিয়ে প্রথম দুটি মাত্র পাকা কুঠুরি তুললেন, সেদিনের আনন্দ ওই ভিটের মাটির বুকে লেখা আছে। বংশের প্রথম কোঠাঘর! কত কষ্টের কত আনন্দের জিনিস। ওই ভিটেতে আমার প্রথমা স্ত্রী—তোমার বড় ঠাকুরমা—

এই সময়ে অরুণের ভাই তরুণ আসিয়া ডাকিল—দাদা,—ওপরে যাও—টেলিফোনে কে ডাকছে।

১৩৫০ সাল।

স্বর্গত সুকুমার চৌধুরীর গ্রামের ভিটা বনেজঙ্গলে ঢাকিয়া গিয়াছে। দোতলা কোঠার দেওয়ালে বড় বড় ডুমুর ও অশ্বত্থ বৃক্ষ। লোকে বলে ডাক্তারের ভিটায় দিনমানে বাঘ লুকাইয়া থাকিতে পারে। গত আট বৎসর এ ভিটায় পুত্র ও নাতিরা কেহই আসে নাই। জানালা-দরজার অনেকগুলি লোকে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

স্বর্গত কালীপদ চৌধুরীর তৈরি প্রথম আমলের সেই একতলা বাড়ীর ছাদ কয়েক বৎসর বর্ষার জল খাইয়া ধ্বসিয়া পড়িয়া গিয়াছে—জীর্ণ দেওয়াল দাঁড়াইয়া আছে মাত্র। সাপের ভয়ে আজকাল ডাক্তারের ভিটার ত্রিসীমানা কেহ মাড়ায় না।

বুধোর মায়ের মৃত্যু

বুধো মণ্ডলের মায়ের হাতে টাকা আছে সবাই বলে। বুধো মণ্ডলের অবস্থা ভাল, ধানের গোলা দু তিনটে। এত বড় যে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ গেল গত বছর, কত লোক না খেয়ে মারা গেল, বুধো মণ্ডলের গায়ে এতটুকু আঁচ লাগে নি। বরং ধানের গোলা থেকে অনেককে ধান কর্জ্জ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

সবাই বলে, বুধোর টাকা বা ধান সবই ওই মায়ের। বুধোর নিজের কিছুই নেই। বুড়ির দাপটে বুধো মণ্ডলকে চুপ করে থাকতে হয়, যদিও তার বয়েস হল এই সাতচল্লিশ। ওর মার বয়স বাহাত্তর ছাড়িয়ে গিয়েছে। আমি কিন্তু অত্যন্ত বাল্যকাল থেকে ওকে যেমন দেখে এসেছি, এখনও (অনেককাল পরে দেশে এসে আবার বাস করছি কিনা) ঠিক তেমনি আছে। তবে মাথার চুলগুলো যা পেকেছে।

অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ে। হরি রায়ের পাঠশালায় আমি তখন পড়ি। বিকেলবেলা, তেঁতুল গাছের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে হরি রায়ের ক্ষুদ্র চালাঘরের সামনেকার সারা উঠোন ছেয়ে ফেলেছে। ছুটি হয় হয়, নামতা পড়ানো শুরু হবে এখন। এমন সময় কালীপদ রায় আর চণ্ডীদাস মুখুজ্যে এসে হরি রায়ের সঙ্গে গল্প জুড়লেন। কালীপদ রায় গল্পের মধ্যে বুধোর মায়ের সম্বন্ধে এমন একটা উক্তি করে বসলেন যাতে আমি অবাক হয়ে প্রৌঢ় দাদুর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

চণ্ডী মুখুজ্যে মশায় জবাব দিলেন, আর বলো না ও মাগীর কথ', অনেক টাকা খুইয়েছি ও মাগীর পেছনে।—জবাবটা আজও বেশ মনে আছে।

একটু বেশি পাকা ছিলাম বয়েসের তুলনায়, সুতরাং স্ত্রীলোকের পেছনে টাকা খরচ করার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম। আর একটু বয়েস বাড়লে শুনেছিলাম, বুধোর মা গ্রামের অনেকেরই মাথা খারাপ করেছিল। বুধোর মা বালবিধবা, ওই ছেলেটিকে নিয়ে স্বামীর গোলার ধান দাদন দিয়ে কত কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করেছে—এই রকমই শুনতাম। আমি যখনকার কথা বলছি তখন বুধোর মায়ের বয়েস চল্লিশের কম নয়, কিন্তু তখনও তার বেশ চেহারা। আঁটসাট গড়ন, মাথায় একঢাল কালো চুল। আমার বাবার বয়সী গ্রামশুদ্ধ লোকের প্রণয়িনী।

তার পর বহুবার বুধোর মাকে দেখেছি অনেক বছর ধরে। সেই এক চেহারা। একটুকু টস্‌কায় নি কোনদিন।

দেশ ছেড়ে চলে গেলাম ম্যাট্রিক পাশ করে। পড়াশুনো শেষ করে বিদেশে চাকরি করে বোমার তাড়ায় সেবার আবার এসে গ্রামে ঘর-বাড়ী সারিয়ে বাস করতে শুরু করলাম।

কাকে জিজ্ঞেস করলাম—বলি, সেই বুধোর মা বেঁচে আছে?

—খুব। কাল ঘাটে দেখলে না?

—না।

—আজ দেখো এখন। তার মাথায় চুল পেকে গিয়েছে বলে চিনতে পার নি।

দু-একদিনের মধ্যে বুধোর মাকে দেখলাম। চেহারা ঠিক তেমনিই আছে, যেমন দেখেছিলাম বাল্যে। মুখশ্রী বিশেষ বদলায় নি। শুধু মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গিয়েছে মাত্র। অনেকে হয়তো ভাববেন, সত্তর-বাহাত্তর বছর বয়সে মুখের চেহারা বদলায় নি এ কখনও সম্ভব? তাঁরা বুধোর মাকে দেখেন নি। নিজের চোখে না দেখলে আমিও বিশ্বাস করতাম না। সেকালের বুধোর মার মাথায় যেন সাদা পরচুলো পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম দেখবার দিন আমার এমনি মনে হল।

পরে কিন্তু বুঝলাম তা নয়, ওর বয়েস হয়েছে। একদিন আমার বাড়ীতে বুড়ি লেবু দিতে এসেছিল। ওকে দেখে মনে হল, হায় রে কালীপদ দাদু, চণ্ডীদাস জেঠার দল! আজও তোমরা বেঁচে থাকলে তোমাদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে পারত বুধোর মা। কত পয়সাই এক সময়ে তোমরা খরচ করে গিয়েছ ওর পেছনে।

বললাম—এস বুধোর মা, কি মনে করে? অনেকদিন পরে দেখলাম।

—আর বাবা! গাঁয়ে ঘরে থাক না, তা কি করে দেখবা? বাত হয়েছে বাবা। এখন একটু সামলেছি। তাই উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছি।

হাতে কি?

—গোটাকতক কাগজি লেবু। বলি, দিয়ে আসি যাই। তুমি আর আমার পঞ্চা দুমাসের ছোটবড়। তুমি হলে ভাদ্র মাসে, পঞ্চা হয়েছে আষাঢ় মাসে। তা আমায় ফেলে চলে গেল।

—পঞ্চা মারা গিয়েছে?

—হ্যাঁ বাবা, অনেক দিন হয়েছে। বছর তিন চার হল।

গাঁয়ের যাকে জিজ্ঞেস করি, ওকে ভাল কেউ বলে না। একদিন ওদের বাড়ীর সামনের পথ দিয়ে যাচ্ছি, দেখি ওদের বাড়ীতে ঝগড়া ও কান্নাকাটির শব্দ।

দাসু কুমোর রাস্তার ধারেই পণ পোড়াচ্ছে।

বললাম- পণে আগুন দিলে কবে দাসু?

—প্রাতোপেন্নাম দা'ঠাকুর। পণ কাল ধরিয়েছি। জ্বলছে না ভাল। অনেক হাঁড়ি কাঁচা আসবে। কাঠের অমিল, দা'ঠাকুর।

—তোরা কি কাঠ দিয়ে পণ জ্বালাস, না পাতা দিয়ে?

—শুধু পাতা কি জ্বলে, দা'ঠাকুরের কথার যেমন ধারা!

—হ্যাঁরে, বুধোদের বাড়ীতে কান্নাকাটি কিসের রে?

—ওই বুধোর মা ছেলের বৌএর সঙ্গে ঝগড়া করছে।

—বুধোর বৌ বুঝি ঝগড়াটে?

—ওই বুড়ি আসল ঝগড়াটে। ওর দাপটে অত বড় বুড়ো ছেলের টুঁ শব্দ করবার জো নেই, তা ছেলের বৌএর। সব মুঠোর মধ্যে পুরে বসে আছে। টাকাকড়ি, ধানের গোলা সব ওর নামে। ছেলে কাজেই জুজু হয়ে থাকে। চিরকালের খারাপ মাগী, ওর স্বভাব চরিত্তির তো ভাল ছিল না কোনও কালে। ট্যাকা আসে কি অমনি দা'ঠাকুর?

—ওর বড় ছেলেটা বুঝি মারা গিয়েছে—সেই পঞ্চা?

—সে ওই মায়ের জ্বালায় বৌ নিয়ে এ গাঁ থেকে উঠে গিয়ে হিংনাড়্যায় বাস করে'ল। বড় বৌডার সঙ্গেও শুধু ঝগড়া আর ঝগড়া! বুধোর মার দাপটে এ পাড়া কাঁপে দা'ঠাকুর। আমাদের কিছু বলবার জো নেই। সবাই কিছু না কিছু ধারে ওর কাছে। ভয়ে কেউ কিছু বলতি পারে না।

কেন?

কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর করে সবাই। দরকারে অদরকারে ধানের জন্তি বুড়ির কাছে—

হাত পাততি হয়। পয়সার জন্যি হাত পাততি হয়। পাড়াশুদ্ধ সকলের মহাজন। কেডা কথা বলতি যাবে?

পৌষ মাসে আমার নতুন কেনা জমিতে সামান্য কিছু ধান হল। আমার ধান রাখবার জায়গা নেই। সকলে বললে, বুধোকে বলুন, ওর গোলায় জায়গা আছে। তবে ওর মা—

বুধোর মাকে গিয়ে বললাম সোজাসুজি—ওগো, আমাদের দুটো ধান রাখবে তোমার গোলায়?

—আমার গোলায় জায়গা কোথায় বাবাঠাকুর? কতডি ধান?

—বিশ চার পাঁচ। রেখে দিতেই হবে। নষ্ট হয়ে যাবে ধান তোমার গোলা থাকতে?

বুধোর মা হেসে বললে—তা রেখে দিয়ে যাও। তবে—চোর কি ইঁদুরে ধান নষ্ট করলি আমারে দায়িক হতি হবে না তো?

হায় কালীপদ দাদু, তুমি বেঁচে থাকলে হয়তো ওর হাসিটা এত বয়সেও মাঠে মারা যেত না। ভাল করে চেয়ে দেখে মনে হল এখনও ওকে বুড়ি বলা চলে না—অন্তত বুড়ি বলতে যা বোঝায় তা ও নয়। বেশ দোহারা চেহারা, লম্বা আঁটসাঁট গড়নের একটা আভাস আসে বটে, কিন্তু তা নয়, ঢিলেঢালা হয়ে গিয়েছে শরীর। তবে মুখের চেহারা এখনও আশ্চর্য রকমের ভাল—এত বয়সেও। গর্ব্ব ও তেজ ওর চালচলনে, চোখের দৃষ্টিতে, হাত পা নাড়ার ভঙ্গীতে।

খুব বড় জমিদারি থাকলে ও দাপটের ওপর জমিদারি চালাতে পারত রানী চৌধুরানীর মত। হয়তো ক্যাথেরিন দি গ্রেট কিংবা এলিজাবেথ হতে পারত রাজ্য-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হলে। লুক্রেজিয়া বর্জিয়ার মত নিষ্ঠুর আলো ওর চোখে এখনও খেলে—চোখ দেখে মনে হয়।

কিন্তু আমার ওপর ও কেন এত প্রসন্ন হয়ে উঠল কে জানে। আমার ধানগুলো গোলায় তোলবার সময় চমৎকার করে গোবর দিয়ে লেপাপোঁছা উঠোনে দু দশটা ধান যা ছড়িয়ে পড়েছিল, নিজের হাতে ঝাড়ন দিয়ে ঝাঁট দিয়ে, খুঁটে খুঁটে তুলতে লাগল। বললে—এ সব গোলায় তুলে রাখ বাবাঠাকুর, লক্ষ্মীর দানা নষ্ট করতি আছে! তুলে রাখ যত্ন করে। দাঁড়াও, আরো দুটো ইদিকে ছড়িয়ে আছে—পোড়ারমুখোগুলো কি করে যে ধান তোলে, সব ঠ্যালামারা কাজ। মন দিয়ে কি কেউ কাজ করে এ বাজারে!

অনেকদিন পরে আবার ওকে দেখে ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে। ভালই লাগে।

আমি বললাম—তীর্থধর্ম্ম করেছ?

বুড়ি জিভ কেটে বললে—সে ভাগ্যি কি আমার হবে বাবাঠাকুর?

—কেন, গেলেই হয়। পয়সাকড়ির যা হক অভাব তো নেই।

—কে বললে বাবাঠাকুর? পাড়ার মুখপোড়া মুখপুড়ীরা আমার নামে লাগায়। পয়সা কনে পাব?

—দেখ, সে তোমার ইচ্ছে। আচ্ছা, এ গাঁ ছেড়ে কখনও কোথাও গিয়েছ ?

—গঙ্গাস্নান করিতে গিয়ে'লাম কালীগঞ্জে।

—আড়ংঘাটার যুগলকিশোর দেখ নি ?

—না বাবা। একবার ও পাড়ার বিনু ঘোষের শাশুড়ি ঘোষপাড়ার সতীমায়ের দোলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, তা আমার পায়ে কোড়া হয়ে সেবার যাওয়া ঘটল না অদেষ্টে। অনেকদিনের কথা, তখন আমার পঞ্চা চার বছরের। ক বছর হল বাবা ?

—তা হয়েছে প্রায় চল্লিশ বছর।

—এবার কোথাও যাব ভাবছি বাবা। চিরজন্মো কেটে গেল এই বাঁশবাগানের ডোবা আর গাঙের ঘাটে, আর মুচিপাড়ার মাঠ আর গোয়াল গোবর নিয়ে। এইবার একটু দেশড়া বিদেশড়া স্থাপব।

এর পরের ইতিহাসটা আমার সংগ্রহ করা বুধো মণ্ডলের শালীর বড় ছেলে ও তার খুড়শাশুড়ির কাছ থেকে। আর ও পাড়ার খুড়িমার কাছ থেকে। আমি নিজে জ্যৈষ্ঠ মাসে পুরী থেকে এসেছি, চটক পাহাড়ের ওপাশের নির্জ্জন সমুদ্রবেলার ঝাউবনের সঙ্গীত ও উদয়গিরি খণ্ডগিরির শ্যামশোভা, প্রাচীন যুগের তপস্বীদের আশ্রমগুলির ছবি আমার মনে যে স্বপ্ন এঁকে দিয়েছে তখনও তাতে বিভোর হয়ে আছি, এমন সময় ও বাড়ীর খুড়িমা এসে বললেন—ওমা, পুরী থেকে চলে এলে তুমি, আমি যে যাচ্ছি রথ দেখতে !

—তা কি করে জানব খুড়িমা, চিঠি দিলেন না কেন পুরীর ঠিকানায় ?

—তখন কি ঠিক ছিল বাবা ? কাল বসে ঠিক করলাম। আমি যাব আর বোষ্টম-বৌ।

—আমার সঙ্গে যদি যেতেন। আপনারা কখনও পুরী যান নি, বিদেশেও বেরোন নি, একা যাওয়া এতদূর। বিপদে না পড়েন।

—তুমি বাবা তোমার জানাশুনো লোককে চিঠি লিখে দাও। পাণ্ডাদেরও চিঠি লেখ।

সব বন্দোবস্ত করে চিঠিপত্র দিয়ে গ্রামসম্পর্কের খুড়িমাকে পুরীতে রওনা করে দিলাম। দিন পনেরো কেটে গেল।

একদিন কুমোরপাড়ার পথ দিয়ে বিকেলে আসছি, হঠাৎ সামনে পড়ে গেল বুধো মণ্ডল। আমি বললাম—কি রে, তোর মা ভাল আছে ?

—প্রাতোপেন্নাম। আজ্ঞে বাবু, মা তো ছিক্ষেত্তর গিয়েছে।

—সে কি! তোর মা গিয়েছে ? কই জানি নে তো ? কার সঙ্গে ?

—আমার শালীর ছেলে আর এক খুড়শাশুড়ি গেল কিনা রথে, তাদেরই সঙ্গে।

—তা তো শুনি নি। ওপাড়ার খুড়িমা, মানে রামের মা, আর শশী বৈরাগীর স্ত্রী ওরা গেল সেদিন। ওরা একসঙ্গে—

—সে বাবু আমরা শুনি নি। তা হলে তো ভালই হত।

কিন্তু যোগাযোগ ঠিকই ঘটেছিল।

ভুবনেশ্বরের বিন্দু সরোবরের তীরে বাঁধাঘাটের সোপানে খুড়িমা সিক্ত বসনে কাপড়-ছাড়বার ব্যবস্থা করছেন, হঠাৎ অল্পদূরে কাকে দেখে তিনি অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলেন। পাশেই ছিল বোষ্টম-বৌ, তাকে বললেন—হ্যাগা বোষ্টম-বৌ, ও কে দেখ তো? আমাদের গাঁয়ের বুধোর মা না?

শশী বৈরাগীর বৌ চোখে কম দেখে। সে বললে—না মা ঠাকরুন, বুধোর মা এখানে কন থেকে আসবে? আপনি যেমন—!

—এগিয়ে দেখ না বৌ, আন্দাজে মারলে হয় না। ও ঠিক বুধোর মা। যাও গিয়ে দেখে এস।

বুধোর মা হঠাৎ সামনে স্বগ্রামের বোষ্টম-বৌকে দেখে হাঁ করে রইল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলে না।

বোষ্টম-বৌ এগিয়ে বললে—বলি দিদি নাকি? ওমা, আমার কি হবে! তাই বামুন-মা বললে—

বুধোর মায়ের আড়ষ্ট ভাব তখনও কাটে নি। বললে—কে?

—বামুন-মা আমাদের। রামবাবুর মা। ওই যে ভিজে কাপড় ছাড়ছেন ওখানে—

—তোরা কবে এলি? বামুন-দিদি কবে এলেন? ওমা, আমি কনে যাব। ই কি কাণ্ড!

—তাই তো!

—তোরা আসবি আমাকে তো বললি নে কিছু?

—তুমি এলে কাদের সঙ্গে? তা কি করে জানব যে তুমি আসবে।

খুড়িমা ইতিমধ্যে কাপড় ছেড়ে এগিয়ে এসেছেন। সুদূর বিদেশে নিজের গ্রামের লোকের সঙ্গে অপ্রাত্যাশিতভাবে পরস্পর দেখা হওয়া—এ যাদের ভাগ্যে না ঘটেছে তারা এর দুর্লভ আনন্দের এক কণাও উপলব্ধি করতে পারবে না।

বিশেষ করে এরা কখনও বিদেশে বেরোয় নি, এই সবে বিদেশে পা দিয়েই এ ধরনের ঘটনা।

খুড়িমা এক গাল হেসে বললেন—ওমা, আমি কোথায় যাব। তুমি কবে এলে গা?

বুধোর মা বললে—কি ভাগ্যি করে'লাম বামুন-দিদি। তিথিস্থানে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে কি আশ্চয্যি কাণ্ড। কবে এলেন বামুন-দিদি?

পরস্পর আলাপ আপ্যায়নের পর বিস্ময়ের প্রথম বেগ কেটে গেলে সবাই পরামর্শ করে ঠিক করলে, এখন থেকে ওরা একসঙ্গে থাকবে সবাই। সেদিন একই ধর্মশালায় সবাই গিয়ে উঠল, মন্দির দর্শন করলে, পরদিন সকালে একত্র গরুর গাড়ীতে খণ্ডগিরি উদয়গিরি যাত্রা করলে।

এর পরবর্তী ইতিহাস খুড়িমা বা তাদের অন্যান্য সঙ্গীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা।

খুব সকালে রওনা হয়ে ওরা বেলা সাতটার সময় খণ্ডগিরি উদয়গিরির পাদদেশে বন-নিকুঞ্জে পৌঁছে গেল। খুড়িমা লেখাপড়া জানতেন, দু-একখানা মাসিক পত্রিকায় খণ্ডগিরির বিবরণও পড়েছিলেন। তিনি সঙ্গিনীদের সব বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। বুধোর মা কখনও পাহাড় দেখে নি জীবনে, এবার পুরী আসবার পথে বালেশ্বর ছাড়িয়ে পাহাড় প্রথম দেখে অবাক হয়ে যায়। উদয়গিরি-আরোহণ ওর জীবনে এই প্রথম পাহাড়ে ওঠা।

খুড়িমার মুখে এ গল্প শুনতে শুনতে আমি চোখ বুজে অনুভব করবার চেষ্টা করছিলুম—মাত্র একদিন আগে যে উদয়গিরির উপরকার নির্জ্জন বনভূমিতে আমি আমার এক সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে অমনি এক সুন্দর মেঘমেদুর প্রভাতে বসে বসে বনবিহঙ্গ-কাকলীর মধ্যে বহুশতাব্দী-পারের সঙ্গীত শুনেছিলুম—সেখানে গিয়ে বুধোর মায়ের মনের সে ভার্জিন আনন্দ।

সমতল পাষাণচত্বরের মত শৈলশিখর, যেন প্রকৃতির তৈরি পাষাণবেদী। কত বন্য লতাপাতা, কুচিলা গাছের জঙ্গল, কত গুহা, কত কারুকার্য্য, কত যক্ষ-যক্ষিনী, কত নাগ-নাগিনী, পাষাণে পাষাণে মৌন অতীতের কত মুখরতা।

বুধোর মা বলে উঠল—কি চমৎকার পাথরে বাঁধানো ঠাঁই বামুন-দিদি! আমাদের গাঁয়ে শুধু কাদা আর ধুলো! কত ভাগ্যি করলি তবে এসব জায়গায় আসা যায়। আচ্ছা, ওসব ঘরের মত তৈরি করেছে কারা পাহাড়ের গায়ে?

—মুনি-ঋষিদের গুহা।

—মুনি-ঋষিদের কী বললে বামুন-দিদি?

—গুহা। মানে, থাকবার কোকর।

—কে করেছে এসব? গবরমেণ্টো?

—সেকালে রাজরাজড়ারা তৈরি করেছেন।

—এসব দেখলি চোখ জুড়োয় বামুন-দিদি। কখনও দেখি নি এসব। পিরথিমে যে এমন-সব জিনিস আছে তা কখনও জানতাম না। জানবই বা কি করে, চেরকাল বাঁশবন ডোবা আর গরুর গোয়াল এই নিয়ে আছি।

নামবার পথে একটি ফর্সা স্ত্রীলোককে একটি ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওরা সেখানে গেল। খুড়িমা বললেন—আপনার এখানে ঘর?

স্ত্রীলোকটি উড়িয়া ভাষায় বললে—হ্যাঁ। নিজের ঘর। তোমরা কোথায় যাবে?

—রথ দেখতে এসেছি বাংলা দেশ থেকে। এখানে খাবার কিছু পাওয়া যায়?

—আমি মুড়ি বিক্রি করি। আর আচার আছে—লঙ্কার, আমের, কুলের।

—কি রকম আচার দেখি?

স্ত্রীলোকটি ঘরের ভিতর থেকে যা হাতে করে এনে দেখালে, সে কতকগুলো নুন-মাখানো আমের টুকরো এবং কুল। খুড়িমা বা তাঁর সঙ্গিনীরা সেসব পছন্দ করলে না। পথে আসবার সময় খুড়িমা বললেন—ওমা, ওর নাম নাকি আচার। আম্‌সি আর শুকনো কুল. ওর নাম নাকি আচার! এখানে আচার তৈরি করতে জানে না বাপু।

বুধোর মা তো আচার দেখে তখন হেসেই খুন হয়েছিল। বললে—না একটু তেল, না একটু গুড়, না ছুটো মেথি কি কালজিরে। আচার বুঝি অমনি হয়? আপনারা যেমন খান, আমাদের তো তা কিছুই হয় না, তাও ওদের চেয়ে ভাল হয়।

ভুবনেশ্বর স্টেশনে বিকেলে ওরা এল পুরী প্যাসেঞ্জারের জন্তে।

ট্রেনের তখনও দেরি। দক্ষিণ দিক থেকে সমুদ্রের অবাধ হাওয়া বইছে প্ল্যাটফর্মে। শেষরাত্রে উঠে ভুবনেশ্বর যেতে হয়েছিল, বুধোর মা ঘুমিয়ে পড়ল সেখানে কাঁথা পেতে। ছ ঘণ্টা পরে ওদের প্রথম সমুদ্র-দর্শন হল পুরীতে। আষাঢ় মাসের দিন, তখনও সন্ধ্যা হয় নি।

পাণ্ডা বললে—দেখুন মা—

বুধোর মা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সমুদ্রের ধারে। নীল সমুদ্র ধু ধু করছে যতদূর চোখ যায়! ফেনার ফুল মাথায় বড় বড় ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে বালুবেলায়। দক্ষিণে বামে সামনে অকূল জলরাশি। খুড়িমা, বোষ্টম-বৌ, বুধোর মা সকলেই নির্ব্বাক নিস্পন্দ। খুড়িমার যেন কান্না আসছে। কতক্ষণ পরে ওদের চমক ভাঙল। বুধোর মা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ই কি কাণ্ড বামুন-দিদি! এমন কখনও ঠাওর করি নি গাঁয়ে থাকতি।

খুড়িমা বললেন—তাই বটে।

বুধোর মা বললে—উঃ রে জল।

খুড়িমা বললেন—তাই।

কেউই চোখ ফেরাতে পারছিল না সমুদ্রের দিক থেকে। ভেবে ভেবে বললে বুধোর মা—আচ্ছা বামুন-দিদি, ওপারে কী গাঁ?

খুড়িমা বললেন—ওপারে? ওপারে-এ-এ লঙ্কাদ্বীপ।

—রাম-রাবণের সেই লঙ্কা, বামুন-দিদি?

—হ্যাঁ।

—কি কাণ্ড! অ্যাদ্দিন মরছিলাম ডোবায় আর বাঁশবনে পচে, কত কি ত্থাখলাম!

—চল সব, এখুনি গিয়ে মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করে আসি।

জগন্নাথ বিগ্রহ ও বিরাট মন্দির দেখে সবাই অত্যন্ত খুশী। রাত সাড়ে নটার পরে জগন্নাথ বিগ্রহের সিঙার-বেশ হবে শুনে ওরা সকলে মন্দিরের অন্ত অনেক মেয়েদের সঙ্গে বসে রইল। একটি বৃদ্ধার সঙ্গে খুড়িমার খুব আলাপ হয়ে গেল। তাঁর বাড়ী হুগলী জেলার সিঙ্গুরের কাছে কামদেবপুর। বাড়ীতে তাঁর ছুই ছেলে চাষবাস দেখে, তাদের ছেলেপুলে অনেকগুলি, মস্ত সংসার। বৃদ্ধার ভাল লাগে না সংসারের গোলমাল, বছরের মধ্যে চার পাঁচ মাস পুরীতে প্রতিবৎসর কাটিয়ে যান। ভগবানের কথা, গীতার কথা ইত্যাদি বলতে ও শুনতে খুব ভালবাসেন। মন্দিরে কোন্ এক সাধু এসেছেন, রোজ সন্ধ্যায় গীতার ব্যাখ্যা

করেন, সে সব শুনলে মানুষের মন আর ছোট জিনিস নিয়ে মত্ত থাকতে পারে না। কাল খুড়িমার সময় হবে কি ? তাহলে সিংদরজার কাছে তিনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, নিয়ে যাবেন সেই সাধুর কাছে ওঁকে বা ওঁর সঙ্গিনীদের।

পাণ্ডা ওদের বাসায় নিয়ে এল। দোতলা ঘরের একটা কুঠুরিতে ওদের থাকবার জায়গা। ছোট জানালা দিয়ে সমুদ্রের হাওয়া আসছে। দেওয়ালের গায়ে বাঁশের আড়ায় অনেকগুলো বেতের পেটরা তোলা। পাণ্ডাগিন্নি বললে—ওগুলোতে ওদের কাপড়চোপড় থাকে। পাণ্ডার বাড়ীতে শালগ্রাম শিলার নিত্য পূজা হয়। বাড়ীর মেয়েরা যেমন সুন্দরী, তেমনই ভক্তিমতী। দোতলার ছোট্ট ঠাকুরঘরে অনেক পুরনো আমলের কাঁথা পাতা, কড়ি-ঝিনুকের দোলায় গৃহদেবতা বসানো, দেওয়ালে পদ্ম আঁকা, সর্ব্বদা ধুপ ধুনোর গন্ধ সে ঘরে। মেয়েরা স্নান করে ঠাকুরের স্তব পাঠ করে, ধপ ধপ করে ওদের গায়ের রং মাথায় একঢাল করে কালো চুল।

বড় মেয়েটির নাম রুক্মিণী, সে বলে—মোর বাবা ভিতরছ পাণ্ডা।

খুড়িমা বলেন—সে কি ?

রুক্মিণীর মা বুঝিয়ে বলে—পাণ্ডাদের মধ্যে বড়। সিঙার-বেশ করবার একমাত্র অধিকার ওদের। সেইজন্যে উপাধি সিঙারী—বৃন্দাবন সিঙারীর পুত্র গোবিন্দ সিঙারী। অনেক বেশি মান ওদের। দুজন গোমস্তা, তিন চার জন ছড়িদার মাইনে করা, কটক থেকে পর্য্যন্ত যাত্রী বাগিয়ে আনে।

রাত্রে ওদের জন্যে মন্দির থেকে এল ঘিয়েভাজা মালপোয়া, ভুরভুর করছে গব্যঘৃতের সুগন্ধ তাতে, আরও দু-তিন রকম মিষ্টি। পাণ্ডাগৃহিণী বললেন—কাল কণিকা-প্রসাদ আনিয়ে দেব শ্রীমন্দির-থেকে। মধ্যাহ্নধূপ সরে গেলেই লোক পাঠাব।

সকালে উঠে ছড়িদার ওদের নিয়ে সমুদ্রস্নান করাতে গিয়ে একজন নুলিয়ার জিম্মা করে দিলে।

বুধোর মা বলে উঠল—ও-বামুন-দিদি, ই কি কাণ্ড! এ যে আমারে নিয়ে নাচতি লাগল ঢেউয়ে।

বোষ্টম-বৌকে উত্তাল এক ঢেউয়ে তুলে নিয়ে সপাটে এক আছাড় মারলে বালির চড়ায়।

স্নানান্তে মন্দিরে গিয়ে সবাই ঠাকুরদর্শন করলে। কাল রাত্রের সেই বৃদ্ধটির সঙ্গে বিমলাদেবীর মন্দিরে দেখা। তিনি নিজে নিয়ে গেলেন ওদের নৃসিংহদেবের মন্দিরে প্রাঙ্গণ পার হয়ে। সেদিন মধ্যাহ্নধূপ সরতে একটু দেরি হয়ে গেল, কণিকা-প্রসাদ নিয়ে পৌঁছুল বাসায় বেলা চারটের সময়। খুড়িমার একটু কষ্ট হল ; অন্যান্য সঙ্গিনীদের খাওয়া অভ্যেস বেলা তিনটের সময়, তারা বিশেষ অসুবিধে অনুভব করলে না।

সন্ধ্যাবেলায় বিমলাদেবীর মন্দিরের চাতালে সেই সাধুটির গীতা-ব্যাখ্যা হচ্ছে।

ওরা সবাই গিয়ে বসল সেখানে হাত জোড় করে। আরও অনেক বৃদ্ধা সেখানেই উপস্থিত, প্রায় সকলের হাতেই জপের মালা। সকলে একমনে গীতার ব্যাখ্যা শুনছে।

বুধোর মা কিছুই বুঝলে না। দু-চারবার বোঝবার চেষ্টা যে না করলে এমন নয়, কিন্তু কি যে বলছেন উনি, যদি একটা কথার অর্থ সে বুঝে থাকে! তবুও তার চোখ দিয়ে জল এল—কোনও কারণে নয়, এমনিই। কেমন সুন্দর কথা বলছেন উনি, মুনি-ঋষিদের মত চেহারা। কতবড় উঁচু মন্দির, বাবাঃ! উই কেমন একটা লাল শাড়ি পরা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা, কত টাকা খরচ হয়েছে না-জানি এই মন্দির তৈরি করতে। পাশের একজন বৃদ্ধাকে সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে—মন্দিরডা কারা তৈরি করে'ল মা?

বৃদ্ধা একমনে শুনছিলেন—বিরক্ত হয়ে বললেন—আঃ, একমনে শোন না বাপু—

বুধোর মা অপ্রতিভ হয়ে বললে—না, তাই শুধোচ্ছিলাম।

ওদিক থেকে কে ধমকে উঠল—আঃ!

আর একজন কে টিপ্পনী কাটলে—শুনতে আসে না তো, কেবল গল্প করতে আসে।

বুধোর মার বড় রাগ হয়ে গেল। একটু কথা বলবার জো নেই, বাব্বাঃ! মাগীদের যদি একবার পেতাম আমাদের গাঁয়ে, তবে দেখিয়ে দেতাম—। পরক্ষণেই সে রাগ সামলে গেল। না না, সে মহাপাপী, জগন্নাথ প্রভু দয়া করে তাকে এনেছেন এখানে। নইলে তার কি সাধ্যি সে এখানে আসে। মন্দিরে এসে রাগ করতে নেই। কেমন সুন্দর জায়গা, কত সব ভাল লোক, কেমন ভাল কথা। এসব কথা কেউ তাদের গাঁয়ে বলে? ও-রকম বুড়ো তো কতই আছে—ন'লে জেলের বাবা কেদার, কাক-তাড়ানে পাঁচু, শ্যামা যুগী, বেহারী কুমোর—আরও দু'একটা নাম মনে আসতে সে তাড়াতাড়ি চেপে গেল। ও-সব কিছু নয়। মুখে মার ঝাঁটা মুখপোড়াদের!

এতকাল সে কোথায় কোন্ গর্ত্তে পড়ে ছিল? কি চমৎকার জায়গা, কি পুণ্যির জায়গাতে জগন্নাথ দয়া করে তাকে এনে ফেলেছেন। গীতার ব্যাখ্যা শেষ হয়ে গেলে সবাই যখন চলে আসছিল, তখন সে আবার কাকে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, এ মন্দিরডা কে তৈরি করে'ল মা-ঠাকরোন?

—বিশ্বকর্ম্মা।

—বটে!

বুধোর মা আবার অবাক হয়ে কতক্ষণ মন্দিরের দিকে চেয়ে রইল।

খুড়িমা পিছন থেকে বললেন—ও বুধোর মা, অমন কথা-বলতে আছে শাস্ত্রপাঠের সময়? ছিঃ, আর অমন করো না।

রাত্রে বাসায় এসে বুধোর মায়ের উৎসাহ কি! বললে—ও বামুনদিদি, বড্ড ভাল লাগছে আমার। যে-কডা টাকা হাতে আছে, তীথিধম্মেই খরচা করব। কি ভাগ্যি ছেল আমার যে এখানে এনেছেন জগন্নাথ!

রুক্মিণীর মা ওদের কাছে বসে বসে জগন্নাথদেবের অনেক মহিমাকীর্ত্তন করলেন। কলিকালের জাগ্রত দেবতা জগন্নাথ। যে যা কামনা করে, তাই তিনি পূর্ণ করেন। কলিকালে অন্ন ব্রহ্ম, অন্নদান মহাসেবা' তাই তিনি শুধু অন্ন বিতরণ করছেন দু হাতে।

যে যেখানে ক্ষুধার্ত্ত আছে, সকলকে শুধু পেট ভরে খাওয়াচ্ছেন তিনি। ধ্যান-ধারণা তপস্যা এসব শিকেয় তুলে রাখ। অন্ন বিলোও, শুধু অন্ন বিলোও। অন্নদান মহাযজ্ঞ।

বুধোর মা এ-কথাটা কিছু কিছু বুঝতে পারে। গত বছর বর্ষাকালে, যখন লোকে না খেয়ে মরছে তাদের গাঁয়ের আশপাশে, তখন নিজের গোলা থেকে সে মুচিপাড়ার সতের জন লোককে বিনা বাড়িতে ন বিশ ধান কর্জ্জ দিয়েছিল। কেউ কেউ বলেছিল—মুচিদের ধান কর্জ্জ দিলে বুধোর মা, ওদের লাঙল নেই, জমি নেই, কর্জ্জ শোধ দেবে কি করে? বাড়ি দেওয়া তো চুলোয় যাক গে।

বুধোর মা গ্রাহ্য করে নি সেসব কথা।

আজ সিঙারীগিন্নির মুখে জগন্নাথের অন্নদান-মাহাত্ম্য শুনে ওর বুকখানা দশ হাত হল। ভগবান তাকে ঠিক পথেই চালিয়ে নিয়ে গিয়েছেন তাহলে। সবাই তাকে মন্দ বলে তাদের গাঁয়ে, তারা এসে দেখুক এখানে।

সন্ধ্যাবেলা মন্দিরে ঠাকুরদর্শন করতে গিয়ে বিগ্রহের দিকে চেয়ে ও আজ ভাল করে দেবতাকে যেন বুঝতে পারলে। সে যা বোঝে। অন্নদান মহাপুণ্য। সে নিজের গোলার ধান আকালের সময় বার করে মুচিদের দিতে যায় নি? গন্‌শা মুচির ভাইবৌ ছোট্ট খোকাটার হাত ধরে এসে ওকে আর বছর শ্রাবণ মাসে বললে—ও দিদিমা, কাল থেকে মোর খোকার পেটে দুটো দানাও যায় নি। একটা উপায় যদি না করেন, সবসুদ্ধ না খেয়ে মরতি হবে। ধামা বেঁধে তোমার নাতি আজ দুদিন আগে আট আনা রোজগার করে এনে'ল। তাতে কদিন খাওয়া হবে বল। দু টাকা করে চালির কাঠা। একটা হিল্লে করতে হবে দিদিমা।

ও বললে—ধামা নিয়ে আসিস এখন মানকের বৌ, ধান দেব। একজন যদি নিয়ে গেল, অমনি দশজন এসে পড়ল। মুচপাড়ার সব ভেঙে পড়ল ধামা-কাঠা হাতে। সবাই কান্নাকাটি করতে লাগল। খেতে পাচ্ছি নে দিদিম, ধান দেও। কাউকে সে শুধু-হাতে ফিরিয়ে দেয় নি। এতদূর থেকেও জগন্নাথদেব তা জানেন। তাই কি এতদূর থেকে তাকে ডেকে এনেছেন? সেদিন কিসের সেই সব হিজিবিজি কথা বলছিল দাড়িওলা সন্নিসিঠাকুর। সে কিছুই বুঝছিল না। আজ জগন্নাথের কথা সে ঠিক বুঝতে পেরেছে।

অন্নহীন যে, তাকে খাওয়াও, মাখাও। গোলার ধান কর্জ্জ দাও, ওদের বিনা বাড়ীতেই কর্জ্জ দাও।

খুড়িমাকে সে ফেরবার পথে সব বললে।

জ্যোৎস্নারাত্রে সমুদ্রের ধারে ওরা সবাই গেল, বুধোর মা-ও গেল। কূলকিনারা নেই জলের, আর কি চমৎকার জ্যোৎস্না। কাল যে বৃদ্ধাটির সঙ্গে মন্দিরে দেখা, তিনিও ছিলেন। কে একজন বড় সন্নিসি, নাম শ্রীচৈতন্ত, এমন জ্যোৎস্নারাত্রে নাকি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন, উনি বলছিলেন সে গল্প। না, সে নিজে কখনও ওঁদের নামও শোনে নি।

অজ পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, কে ওঁদের নাম শোনাচ্ছে? সে জানে পায়রাগাছির ফকিরের নাম। পায়রাগাছির ফকিরও মস্ত সাধু। সেবার তার একটা গাইগরু কি খেয়ে হঠাৎ মরে যায় আর কি, সবাই বললে পায়রাগাছির ফকিরের খুব ক্ষমতা। বুধোকে সেখানে পাঠানো হল। ফকির সাহেবের সামান্য কি ওষুধে গরু একেবারে চাঙ্গা হয়ে উঠল।

ওঁরা সবাই ভাল, সবাই বড়। সে-ই কেবল পাপী।

বুধোর মা-ও দুহাত জুড়ে পায়রাগাছির ফকির সাহেবের উদ্দেশে প্রণাম করে।

খুড়িমা বললেন—চল বুধোর মা, বাসায় ফিরি। ভাল লাগছে?

—পাপমুখে কি করে আর বলি বামুনদিদি। ইচ্ছে হচ্ছে জগন্নাথের পায়ে চেরজন্ম পড়ে থাকি। শুধু ওই ছোট নাতনিটার মায়া। আমার হাতে না হলি দুষ্টু মেয়ে খাবে না। এখন বসে বসে তার কথাডাই বড্ড মনে হচ্ছিল। আহা, কদ্দিন মুখটা দেখিনি।

বুধোর মা আঁচলে চোখ মুছলে।

সে-রাত্রে শুয়ে বুধোর মা ছটফট করছে, অনেক রাত্রেও কাতরাচ্ছে দেখে খুড়িমা ও বোষ্টম-বৌ ওকে ডাক দিলেন। দেখা গেল, ওর বড্ড জ্বর হয়েছে। জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে গেল বুধোর মা। সেদিন ভুবনেশ্বর ইষ্টিশনের প্ল্যাটফর্মে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে হাঁটুর খানিকটা কেটে যায়। সেই কটা জায়গাটা বিষিয়ে উঠেছে, পরদিন দেখা গেল। জ্বর কমে না দেখে ডাক্তার ডেকে দেখানো হল। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের পরামর্শে রোগীকে হাসপাতালে দেওয়া হল।

তিন দিন পরে—রথের আগের দিন।

বুধোর মার অবস্থা খুব খারাপ। খুড়িমা, বোষ্টম-বৌ, গ্রামের সবাই ঘিরে বসে, এমন কি সেই বৃদ্ধা পর্য্যন্ত! কখনও কখনও জ্ঞান হয়, কখনও আবার অজ্ঞান হয়ে যায়। ডাক্তার বলছে, অবস্থা ভাল নয়।

খুড়িমা বললেন—ও বুধোর মা, কেমন আছ?

—ভাল না, বামুনদিদি।

—বাড়ী যাবে?

—শরীরডা সেরে উঠলি চলুন যাই বামুনদিদি। ছোট নাতনিটার জন্যি মনডা কেমন করছে।

ভক্তিমতী বৃদ্ধাটি বললেন—ভগবানের নাম কর দিদি। বল—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—ওসব চিন্তা ছেড়ে দাও।

রাত বারটার সময় আর একবার জ্ঞান হল ওর। জ্ঞান হলেই বলে উঠল—ও মুখুজ্যে ঠাকুর, আমার সেই সাত গণ্ডা ট্যাকা—

খুড়িমা মুখের ওপর ঝুঁকে বললেন—কি বলছ, ও বুধোর মা?

—আমার সেই সাত গণ্ডা ট্যাকা আর শাড়ি দেবা না?

—হরিনাম কর। হরি হরি বল। বল, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে!

—আমবাগানের তলায় মুখুজ্যে ঠাকুরের সঙ্গে সিঁদুরকৌটো গাছটার কাছে দেখা। ঘাটের পথ। লোকজনের যাতায়াত বড্ড। এখান থেকে সরে চল ওদিকি, ও মুখুজ্যেঠাকুর!

আমি খবরটা জানতাম না।

রথের দিন-পাঁচ-ছয় পরে বুধোর সঙ্গে হঠাৎ পথে দেখা। ওর গলায় কাছা দেখে একটু অবাক হয়ে বললাম—কি রে! গলায় কাছা কেন?

বুধো বললে—মা নেই। চিঠি এসেছে কাল। রথের দিন মারা গিয়েছে।

পরে একটু থেকে বললে—তিনি ভালই গিয়েছে। বয়েস তো কম হয় নি। কিন্তু এতগুলো ট্যাকা দাদাঠাকুর, কোথায় যে রেখে গেল, সন্ধান দিয়ে গেল না। কাউকে তো বলত না ট্যাকার কথা।

গ্রামে সবাই বললে—রথের দিন তিথিস্থানে মিত্যু, কি জানি কি রকম হল! অমন স্বভাব-চরিত্তির, চিরকালের খারাপ মেয়েমানুষ। জগন্নাথের নিতান্ত কিরপা না হলে কি এমন হয়! মাগীর অদেষ্ট ছেল ভাল।

ছেলে-ধরা

সবাই মিলে বাসায় ফিরে এলাম।

এসেই দেখি ঝুমরির মা বাংলোর বারান্দাতে বসে। তার সঙ্গে নাহানপুর গ্রামের কয়েকটি লোক। নাহানপুর শোন নদের ধারে একটা গ্রাম—বেশির ভাগ গোয়ালার বাস এ গ্রামে। শোনের চরে গরু মহিষ চরিয়ে দুধ ঘি উৎপাদন করে। ডিহিরি থেকে ঘি চালান যায়। এই নাহানপুর গ্রাম থেকেই তিনটি ছেলে হারিয়েছে গত পনেরো দিনের মধ্যে। ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি যে হয়েছে এই বন্য গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে, সেটাকে নিতান্ত অকারণ বলি কি করে।

একটা লোক এগিয়ে এসে বললে—কি হল বাবু?

আমরা বললাম—কিছু না, তোমরাও তো খুঁজছিলে।

—হাঁ বাবুজি। আমাদেরও কিছু না।

—তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?

—বহুৎ দূর, বন-জঙ্গলের দিকে। সে সব দিকে তোমরা যেতে পারবে না। তোমরা চেন না সেদিক।—পরে ওরা পরামর্শ করতে বসল। আমরা বাঙালী বাবু, লেখাপড়া-জানা, আমরা কি দিই পরামর্শ ওদের? পনেরো দিনের মধ্যে তিনটি ছেলে উধাও। এখানে বাস করা দায় হয়ে উঠল। ডিহিরি শহর এখান থেকে অনেক দূর। প্রায় ন মাইল রাস্তা।

সেখানে গিয়ে পুলিশের সাহায্য চাওয়া কি উচিত নয়?

আগের লোকটার নাম মন্নু আহীর। মন্নু বললে ওই অঞ্চলের হিন্দিতে—বাবু, জঙ্গল-পাহাড় অঞ্চলের গাঁ। বেশি লোক থাকে না এক গাঁয়ে। দূরে দূরে গাঁ। এখানে এই রকম বিপদ হলে আমরা কি করে বাঁচি? আপনারা এসেছেন বেড়াতে, মজুমদার সাহেবের কুঠিতে আছেন, তবু কত ভরসা আমাদের। মজুমদার সাহেব বড়লোক, আসেন না আজকাল আর। আগে আগে যখন নতুন কুঠি বানালেন, তখন কত আসতেন।

ওরা সেদিন চলে গেল যখন, তখন রাত দশটা। বেশ দল বেঁধে মশাল জেলে চলে গেল।

সতীশ গিরির দলপতিত্বে পরদিন হৈ হৈ করে হারানো ছেলে খুঁজতে বেরনো গেল। রোটাস গড়ে ওঠাই হত এবং ঠিক ছিল। কিন্তু একজন মহিষ-চরানো বৃদ্ধ রাখাল আমাদের বারণ করলে। ওখানে কি করতে যাবে বাবুজী, রোটাস গড়ে লোক থাকে না। চৌকিদার একজন আছে, সে সব সময় ওপরে থাকে না, নিচে নেমে আসে। ওখানে যাওয়া মিথ্যে।

বনের মধ্যে একস্থানে আমরা সেদিন বাঘের থাবার দাগ পেলাম। মহুয়া গাছের তলায় দিব্যি বড় বাঘের পায়ের থাবার দাগ। আমাদের মধ্যে একজন বললে—ওদের বাঘে নিচ্ছে না তো? যে বাঘের ভয় এদেশে—

হীরু বললে—তাই বা কি করে সম্ভব? বাঘ গাঁয়ের মধ্যে ঢুকলে সেখানে তো পায়ের দাগ থাকত।

দুপুরে আমরা খেতে এলাম বাসায়। শোনের চরে বালুহাঁস শিকার করেছিল ধীরেন আজ সকালে, আমাদের বেরোবার আগে। দশ মিনিটের মধ্যে তিনটি। খুব মজা করে হাঁসের মাংস খাওয়া যাবে সবাই মিলে।

সতীশ গিরি খাওয়ার সময়ে বললে—শিকার করা বর্ব্বরের কাজ তা জান?

আমরা সবাই চুপ।

হীরু বললে—বাজার থেকে মাংস কিনে খাও নি কখনও?

সতীশ গিরি বললে—আমি দেখে-শুনে তো সে জন্তুকে মারি নি। আমি না কিনলেও অপরে কিনত।

খাওয়া-দাওয়ার পরে হঠাৎ বাইরে একটা গোলমাল উঠল। জন-কয়েক লোক এসে হাজির হল বাংলোর কম্পাউণ্ডে ব্যস্তসমস্ত ভাবে। সতীশ গিরি এগিয়ে গিয়ে বললে—কি হয়েছে? কি, কি?

ওরা বললে—আবার ছেলে চুরি গিয়েছে আজ।

আমরা সবাই অবাক। সতীশ বললে—আজ? কোন্ গাঁ থেকে?

—নাহানপুর থেকে দু মাইল ওদিকে। উনাও বলে একটা গাঁ। একটা ছোট ছেলে নিয়ে মা ফিরছিল গাঁয়ের বাইরের মাঠ থেকে, ছোট ছেলেটাকে এক জায়গায় ওর মা

রাস্তার পাশে রেখে শালপাতা ভাঙতে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে ছেলে নেই।

—বাঘের পায়ের দাগ?

—না বাবু।

—মানুষের?

—অত ভাল করে মেয়েমানুষ কি দেখেছে?

আমরা বাংলো থেকে সন্ধ্যের আগেই বেরিয়েছি। কত জায়গায় খুঁজলাম কিন্তু কোন পাত্তা পাওয়া গেল না খোকার। সেই বনবেষ্টিত পাহাড়-অঞ্চলে সন্ধ্যার পর বেরনো কত বিপজ্জনক আমরা জানি, কিন্তু তবু ছেলেটিকে খুঁজে এনে মায়ের কোলে দেওয়ার আনন্দ যে কত বড়! যদি পারা যায়, যদি খোকার মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে পারি!

কিন্তু এদিকে রাত হয়ে আসছে। সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে হীরু। বিদেশ বিভুঁই জায়গা, জঙ্গলাবৃত পাহাড় চারিধারে। বাঘের ভয়ও আছে। বৈশাখ মাসের চড়া রোদে পাহাড় তেতে এমন আগুন হয়ে আছে। যে একপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয় না। তাও সত্যিকারের ঠাণ্ডা হয় না। বিদেশে বেড়াতে এসে কি শেষে বাঘের পেটে যাব?

কথাটা ঠিক।

সতীশ মহারাজের কি! তার বাপ নেই, মা নেই। মরে গেলে কাঁদবে না কেউ। আমাদের তা নয়, আমাদের সবাই বেঁচে।

হীরু বললে—আজ কদিন হল আমরা এসেছি এখানে?

আমি বলি হিসেব করে—আজ তেরো দিন।

—আর কতদিন থাকা হবে?

—আর চার পাঁচ দিন।

—কিন্তু এই হাঙ্গামাটা না চুকলে তো—

—সে তো বটেই।

হীরু বললে—ঘরের পয়সা খরচ করে বেড়াতে এসে কি ফ্যাসাদ!

ধীরেন একটু বিরক্তির সঙ্গে বললে—কে জানত এমনতর হবে। তাহলে কি—

সতীশ আমাদের মধ্যে সাধু-প্রকৃতির লোক। অনেস্ট, সত্যবাদী, পরোপকারী—ওকে আমরা এইজন্যে সতীশ গিরি, কখনও সতীশ মহারাজ বলে ডাকতাম, অবিশ্যি ব্যঙ্গচ্ছলে।

সতীশ মহারাজ বললে—ওর মায়ের কান্না শোনবার পরেও একথা তোমরা বলতে পারলে?

ও মাঝে মাঝে আমাদের বিবেক জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা পায় এই ভাবে। সেদিন এক বুড়ি টোমাটো নিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাকে ডেকে বললাম—এদ টোমাটো কিনব। বুড়ি বাজার-দর জানে না বোধ হয়। সে বললে—বাজারে তোমরা কত করে কেন বাবুজি?

আমরা জানি ছ পয়সা বাজার-দর একসের টোমাটোর। হীরু বললে—চার পয়সা দর বাজারে, দিবি?

বুড়ি দিয়ে গেল।

কিন্তু সতীশ গিরির তিরস্কারে সে টোমাটো আমাদের মুখে ওঠে নি সেদিন।

হীরুর নির্ব্বুদ্ধিতা, সে গেল বাহাদুরি করতে তা নিয়ে খাবার সময়।

আমরা সবাই খেতে বসেছি। সতীশ মহারাজ গম্ভীরভাবে হেঁকে বললে—'টোমাটোর অম্বল আমার পাতে দিও না।' সবাই অপ্রস্তুত। যে রকম সুরে সে হেঁকে বললে, তার পর সেদিন আর উক্ত তরকারী কারও পাতে পড়তে পারল না। অসম্ভব। যাক গে, আজ কিন্তু সতীশ মহারাজের কথার প্রতিবাদ করলে ধীরেন। বললে—ঝুমরির মা দোর খুলে শুয়েছিল কেন রাত্তিরে?

সতীশ বললে—তাই কি?

—তা না হলে তো ছেলে হারাত না।

—সে নির্ব্বোধ মেয়েমানুষ।

—তাহলে তার এমন হওয়াই উচিত। যখন সবাই জানে একথা যে, গাঁ থেকে বা এ অঞ্চল থেকে ছেলে চুরি যাচ্ছে প্রায়ই—

হীরু বললে—এইবার নিয়ে চারটি ছেলে এভাবে গেল।

ধীরেন বললে—হ্যাঁ, যখন তা সবাই জানে, তখন কি ওর উচিত হয়েছে রাতে দোর খুলে শোওয়া?

সতীশ বললে—এ গরমে করেই বা কি?

—তখন তার যাওয়াই উচিত। আমাদের দোষে তো যায় নি?

আমি ওদের থামিয়ে বলি—শোন, বাজে বকে লাভ নেই। ছেলে চুরি বা হারানো এ অঞ্চলে আমরা এসে পর্য্যন্ত শুনছি একথা ঠিক। তবু এসব দেশের গ্রাম্য লোকে অত সতর্ক হতে শেখে নি। পরের ছেলে হারিয়েছে—খোঁজবার চেষ্টা করা যাক, বিশেষ করে ওর মা আমাদেরই ঝি। যে কদিন আমাদের ছুটি বাকি আছে, খোঁজ, না পাই কলকাতায় যাবার সময় মনে অন্তত আমাদের ক্ষোভ থাকবে না। এ অজানা বন-জঙ্গলের দেশে আমরা এর বেশি আর কি—

—আমাকে সবাই সমর্থন করলে।

সতীশ বললে—কাল চল রোটাস ফোর্টে উঠে দেখা যাক।

ধীরেন বললে—বড্ড সোজা কথা বললে। রোটাস ফোর্টে ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়। এ গরমে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। ওপরে জল নেই। বাঘ সেদিনও বেরিয়েছিল জঙ্গলে। ফেরবার পথে সন্ধ্যে হয়ে গেলে ঐ বন ভেঙে নিচে নামতে পারব? আমাদের ঘরে বাপ-মা আছে সতীশদা!

আমি বললাম—তা ছাড়া রোটাস ফোর্টে পাহাড়ের ওপর ছেলে নিয়ে গিয়ে তুলবে কে? আমার মনে তো হয় না।

সতীশ বললে—দেখতে দোষ কি?

—তুমি বল যদি, আমি তোমার সঙ্গে যাব, সতীশ। তুমি ভাবতে পার এরা কষ্টের ভয়ে হয়তো যেতে চাইবে না। চল কাল সকালে।

হীরু ও ধীরেন নিজেদের ছোট করতে চায় না। তারা মুখে বললে, আমরাও যাব—কিন্তু মনে মনে বোধ হয় বিরক্তি হল আমার ও সতীশ মহারাজের ওপর।

গ্রামের লোকজন ডাকিয়ে আমরা তাদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে দিয়ে এক এক দিকে পাঠালাম। আমরা নিজেরাও বেরিয়ে পড়লাম। নাহানপুরের পথে, ডিহিরি যাবার পথে, শোন নদের ধারে। সব দিকে আমরা বলে দিয়েছি কোনও রকম সন্ধান পেলে যেন বাংলোতে এসে খবর দেওয়া হয়। সেখানে সতীশ মহারাজ স্বয়ং বসে। তাকে কোথাও যেতে দিই নি আমরা। কারও মুখে কোন রকম সন্ধান পেলে যেন বাংলোয় খবর দেওয়া হয়।

সারাদিন কেটে গেল। কেউ কোন খবর নিয়ে এল না। কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না হারানো ছেলের। সন্ধ্যার অনেক পরে আমরা পরিশ্রান্ত দেহে বাংলোর বারান্দায় পা দিতে না দিতে সতীশ গিরির দুর্ব্বার জেরা।···কাজে ফাঁকি আমরা দিয়েছি কিনা দেখে নেবে সতীশ। আমরা কি ওখানে গিয়েছিলাম? সেখানে গিয়েছিলাম? অমুক জঙ্গলের পথ কি দেখেছি? একটু চা খাব সারাদিন পরিশ্রমের পরে, তা কৈফিয়ৎ দিতে দিতেই প্রাণান্ত হবার উপক্রম হল।

খেয়ে-দেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়া গেল। কাল সকালেই আবার নাকি বেরুতে হবে। ধীরেন বললে—চল, পরশু আমরা এখান থেকে খসে পড়ি। আর এ ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে না।

আরও দুদিন কেটে গেল। কোনও ছেলেরই পাত্তা পাওয়া গেল না। ঝুমরির মা কেঁদে কেঁদে বেড়ায়, গ্রামের লোকজন এসে ফিরে যায়। আমরা কদিন খোঁজাখুঁজির পর ক্রমে আলগা দিলাম। ক্রমে আরও দিন কেটে গেল।

সেদিন আমরা জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা করে রওনা হয়ে পড়লাম। সিমেণ্ট পাহাড়ের গা কেটে পাথর নিয়ে যাচ্ছে ডিহিরিতে, সেই লরিতে আমরা চলেছি। জিনিসপত্র সমেত আমাদের ডিহিরি স্টেশনে পৌঁছে দেওয়ার ভাড়া সাত টাকা ধার্য্য হয়েছে।

লরি ছাড়ল রাত আটটার সময়। পাথর বোঝাই করতে দেরি হয়ে গেল। পাহাড়-জঙ্গলের পথে বোঝাই লরি বেশি জোরে যেতে পারছে না, আমরা দিন কুড়ি পরে কলকাতায় ফিরছি, মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে চলেছি।

ডিমৃহা ও বোচাহির পাহাড়ের কাছাকাছি পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র নদী পার হতে পাথর-বোঝাই লরির খানিকটা সময় লাগল। হাঁটুখানেক জল নদীতে ঘন জঙ্গল দুধারে—হরীতকী, মহুয়া ও শাল। কি একটা পাখী কুস্বরে ডাকছে ডিমৃহা পাহাড়ের ওপরকার বনে। লরি হু হু চলেছে।

এমন সময় লরিওয়ালা বলে উঠল—ও ক্যা বাবুজী? আমরা লরিড্রাইভারের পাশেই বসে। তখন দশটা, কোনদিকে লোকালয় নেই সেখানটাতে। চেয়ে দেখি, পথ থেকে

রশি-তুই দূরে জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় আগুন জলছে। যেন কেউ আগুন পোয়াচ্ছে কি ভাত রেঁধে খাচ্ছে। আমরাও চেয়ে দেখলাম। ···কে ওখানে?

কৌতূহল হল দেখবার জন্যে। লরি থামিয়ে রাস্তার একপাশে রাখা হল। আমি ও সতীশ গিরি এগিয়ে গেলাম। আমাদের পেছনে পেছনে ধীরেন, হীরু ও লরি-ড্রাইভার। যখন আধ রশি মাত্র দূরে আছে আগুন তখন আমরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম হঠাৎ।

অন্ধকার রাত। শোন নদের ধারের কাশচর দূর থেকে সাদা কাপড় পরা প্রেতের মত দেখাচ্ছে। ধীরেন বললে—শোনের ধারে যাস নে ভাই, ওদিকেই কাশবনে বাঘ থাকে। চল্ সিমেণ্টের পাহাড়ের ওপর। সতীশ মহারাজ গম্ভীরভাবে বললে—ওটা সিমেণ্টের পাহাড় নয়। সিমেণ্ট জিনিসটা বালির সঙ্গে আরও জিনিস মিশিয়ে তৈরি করতে হয়। ওটা বেলে পাথরের পাহাড়। যাকে বলে স্যাণ্ডস্টোন।···আমাদের মনের অবস্থা এখন সতীশ গিরির ভূতত্ত্ব-বক্তৃতা শোনবার অনুকূল নয়। আমরা আজ আর খুঁজতে রাজী নই। আর খুঁজবই বা কোথায়?

বড় সিমেণ্টের পাহাড়ের তলায় শালচারা আর কি কি গাছের বনজঙ্গল। সেদিন সন্ধ্যায় এখানে হায়েনার হাসি শোনা গিয়েছিল। সে হাসি গভীর রাত্রে শুনলে প্রেতের অট্টহাসির মত শোনায়; শহুরে ছেলে আমরা, আমাদের গায়ে কাঁটা দেয়। পাহাড়ের ওপর কলকাতার কোন্ ভদ্রলোকের এক বাংলো আছে। কিন্তু তিনি কোনদিন আসেন না। তাঁর বাড়ীর দরজা-জানলায় উই ধরেছে, কাঠের ফটকটা ভেঙে ঝুলছে কব্জার গায়ে। ভূতের বাড়ী বলে মনে হয় প্রথমটা। লোকে বলে ভূতও নাকি আছে। মহুয়া ফুলের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, বড় বড় মহুয়া গাছগুলোর তলায় পাতা পুড়িয়ে দিয়েছিল গত চৈত্র মাসে মহুয়া ফুল সংগ্রহ করবার জন্যে। পাতা-পোড়া ছাইয়ের গন্ধ বাতাসে। ছাইয়ের ওপর আবার পড়েছে শুকনো পাতার রাশ। খস খস করে কি একটা জন্তু পালিয়ে গেল তার ওপর দিয়ে।

ধীরেন চমকে উঠে বললে—ও কি রে?

আমি বললাম—কিছু না! শেয়াল হবে।

আমাদের চোখে যা পড়ল তা এই—

একটা বড় অগ্নিকুণ্ডের সামনে একজন লোক বসে কি করছে। দূর থেকেই মনে হল লোকটা দীর্ঘাকার—একটু অসম্ভব ধরনের দীর্ঘাকার। কি একটা নাড়ছে-চাড়ছে আগুনের সামনে বসে যেন।

সতীশ গিরি বললে—সন্নিসি।

আমাদের মনে হল লোকটা নিশ্চয়ই সন্নিসি-টন্নিসি হবে। কিন্তু এই জঙ্গলের মধ্যে এই গভীর রাত্রে—আচ্ছা সন্নিসি তো! বাঘের ভয়ে দিনমানে এখানে মানুষ আসতে ভয় পায় যে।

আমরা এগিয়ে গেলাম আরও। লোকটাও বেজায় লম্বা—অগ্নিকুণ্ডের ধারে উবু হয়ে

বসে লোকটা কি একটা আগুনের ওপর ধরে নাড়ছে-চাড়ছে। বেশ বড় ও কালো মত একটা কি। কি ওটা? আলো-আঁধারে সে জিনিসটা দেখাচ্ছে যেন একটা কালো কাপড়ের বাণ্ডিলের মত। আমাদের সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে। কি জিনিস ওটা?

হঠাৎ আমি চমকে উঠলাম। সেই কালো বাণ্ডিলের মত জিনিসটা থেকে যেন একটা ছোট হাত ঝুলে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সতীশ মহারাজ ও ধীরেন একসঙ্গে বলে উঠল—হ্যাঁরে, ও তো একটা ছোট ছেলে।

আমরা তখন ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম। অদূরে সেই অতি দীর্ঘাকার বিকটদর্শন লোকটাকে রাক্ষসের মত দেখাচ্ছে। সন্ন্যাসীর সাজ বটে। দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্রক ওর কপালে, দীর্ঘ জটাজূট, এতখানি লম্বা দাড়ি পড়েছে বুকের ওপর।

লোকটা সামনের অগ্নিকুণ্ডের ওপর একটা ছোট ছেলেকে দুহাতে ধরে ঝলসাপোড়া করছে। বাতাসে মড়াপোড়ার বিকট দুর্গন্ধ।

আমরা কেউ এগোতে সাহস করলাম না। কারও মুখে কথাটি নেই। এই গভীর রাত্রি, নির্জ্জন পাহাড়-জঙ্গল, কোথাও লোকালয় নেই কাছে। সম্মুখে এই নর-রাক্ষস। কেমন একপ্রকার আতঙ্কে আমরা সবাই মোহগ্রস্ত হয়ে চুপ করে আছি, এক পাও কেউ এগোয় না।

লোকটা আমাদের দেখলে কট্‌মট্‌ চোখে। তার পর যেন বিরক্তমুখে সেই আধ-ঝলসানো ছেলেটাকে কাঁধে ফেলে নিলে আমাদের চোখের সামনে, ঠিক যেমন লোকে গামছা কাঁধে ফেলে সেই ভঙ্গিতে। তারপর ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপে অন্ধকারে বনের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সতীশ গিরির মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে গেল একটা কথা—ছেলে ধরা।

রামতারণ চাটুজ্যে, অথর

পনেরো-ষোল বছর আগেকার কথা। পটলডাঙা স্ট্রীটে এক বেঞ্চিপাতা চায়ের দোকানে রামতারণবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ শুরু হয়। এক পয়সা দামের এক পেয়ালা চা; গোলদিঘি বেড়িয়ে এসে সস্তায় চা-পান সারতে দোকানটাতে ঢুকলাম। আমার দলের আরও পাঁচ-ছটি খরিদ্দার অত সকালেও সেখানে জমায়েত হত এক পয়সার এক পেয়ালা চা খেতে। এই দলের মধ্যে অনেকেই ১৫।২নং মেস-বাড়ীর অধিবাসী; একমাত্র রামতারণবাবুই ছিলেন গৃহস্থ লোক, যিনি ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করেন, মেসে নয়। সেইজন্যেই তাঁর সঙ্গে আলাপের প্রবৃত্তিটা আমার হয়তো অত বেশি ছিল। তখন থাকি মেসে, গৃহস্থবাড়ীর মধ্যে একটা নতুন জগৎ দেখতাম।

রামতারণবাবুর সঙ্গে এই ধরনের দেখাশুনো প্রায় তিন চার মাস ধরে হল। অবিশ্যি চায়ের দোকানে যেমন আলাপ হওয়া সম্ভব, তেমনি।—নমস্কার, এই যে, কেমন আছেন? হেঁ হেঁ। আমার ওই এক রকম কেটে যাচ্ছে, আপনি? হেঁ হেঁ, ওই এক রকম।

একদিন রামতারণবাবু বললেন—কোন্ দিকে যাবেন? চলুন গোলদীঘিতে।

দুজনে একখানা বেঞ্চির ওপর এসে বসি। রামতারণবাবু একটা বিড়ি ধরালেন। তার পর বললেন—একটা কথা আজ শুনলাম, শুনে বড় খুশী হলাম, তাই আজ আপনাকে একটু আলাদা করে এখানে আনা। আপনি নাকি লেখক? শুনলাম নাকি একখানা বই লিখেছেন, অনেকে ভাল বলছে।

আমার সসঙ্কোচ বিনয়কে তিনি হাত-নাড়া দিয়ে হটিয়ে বললেন—বাঃ, এতে আর অত ইয়ের কারণ কি। ভালই তো। বেশ বেশ, বড সন্তুষ্ট হওয়া গেল। সুরেন কাল আমায় বিকেলে বলছিল কিনা।

আমি চুপ করেই রইলাম। রামতারণবাবুর বয়স আমার চেয়ে অনেক বেশি, মাথার চুল একটিও কাঁচা নেই, তাঁকে একটু সমীহ করেই চলতাম, বিড়ি সিগারেট চায়ের দোকানেও কখনও তাঁর সামনে খাই নি। রামতারণবাবু গম্ভীরভাবে বললেন—বড আনন্দ হল আপনার পরিচয় জেনে। শুনলাম নাকি আপনার বই বেশ বিক্রি-সিক্রি হয়?

—ওই এক রকম। হয় মন্দ নয়।

—বটে!

রামতারণবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন—তবুও কি-রকম বিক্রি হয়? একটা এডিশন ফুরিয়েছে?

—আজ্ঞে এই সেকেণ্ড এডিশন চলছে।

—কত দিনে হল?

—ধরুন, তা প্রায় দেড় বছর।

—বটে?

রামতারণবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করলেন। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না আমার বইয়ের সেকেণ্ড এডিশন হওয়া এমন কি একটা সামাজিক দুর্ঘটনা।

আবার তিনি বললেন—আজকাল হয়েছে যত সব বাজে বইয়ের আদর—লোকের রুচিও গিয়েছে নেমে।

আমি মনে মনে ভীষণ রেগে গেলাম। আমি নতুন লিখতে আরম্ভ করি নি। পাঁচ সাত বছরের মধ্যে দুটো উপন্যাস ও অনেকগুলো ছোট গল্প লিখেছি। লোকে সেগুলো মন্দ বলে নি, উনি প্রবীণ ব্যক্তি, কোথায় আমায় উৎসাহ দেবেন, তা নয়, আমার বইকে বাজে বইয়ের পর্য্যায়ে ফেলে দিলেন এক নিশ্বাসে। কি করে জানলেন উনি? পড়েছেন আমার বই? লেখকের অভিমান একটু বেশি। আমি বেঞ্চি থেকে উঠে বললাম—আচ্ছা, চলি। কাজ আছে।

—না না, বসুন। এই দেখুন, রেগে গেলেন। এই আপনাদের মত ইয়ং লেখকদের বড্ড একটা ইয়ে। শুনুন, আমি বলছি কি, আপনি বোধ হয় জানেন না—আমিও একজন অথর।

'অথর' কথাটা বেশ গালভরা করে সময় নিয়ে টেনে টেনে উচ্চারণ করলেন। 'অ—অ—থ—র'।

আমার বিরক্তি কেটে গেল এক মুহূর্ত্তে। বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করি—ও! আপনার কি কি বই—উপন্যাস না ধর্ম্মগ্রন্থ?

একটা সন্দেহ জেগেছিল মনে, বোধ হয় ধর্ম্মগ্রন্থই হবে। কিন্তু আমায় আরও বিস্মিত করে দিয়ে উনি বললেন—উপন্যাস।

আমি বললাম—আপনার নাম তো রামতারণ—রামতারণ—

—চাটুজ্জে। নাম শোনা আছে? আমার বইএর নাম রঙের গোলাম, পরশমণি, সোনার বাংলা—

—ও!

কোথাও নাম শুনেছি বলে মনে করতে পারলাম না। তবুও আপ্যায়ন ও হৃদ্যতার সুরে বললাম—বেশ বেশ। বড় খুশী হলাম। এতদিন ধরে চা'এর দোকানে মেলামেশা কই একথা তো এতদিন শুনি নি—আজই প্রথম—

রামতারণবাবু বললেন—আরে আমিও তো আজ প্রথম—

সেই থেকে ওঁর সঙ্গে আলাপ ঘনিষ্ঠ হয়ে জমল। রোজ চায়ের দোকানে দেখা, প্রায়ই গোলদীঘির বেঞ্চিতে দুজনে নিভৃতালাপ। একদিন রামতারণবাবু বললেন—চলুন আমার বাড়ী একদিন। কবে যাবেন বলুন।

এর দু-তিন দিন আগে থেকে রামতারণবাবু আমায় ধরেছেন, তাঁর একখানা বই আছে, বছর কয়েক আগে লিখেছেন, সেখানার জন্যে প্রকাশক জোগাড় করে দিতে হবে। বুঝলাম যে, বইখানা আমায় দেখাবার উদ্দেশ্যেই উনি বাড়ীতে নিয়ে যেতে চান আমাকে। সেজন্যেই যেতে নারাজ ছিলাম, কি জানি কি রকম বই প্রকাশক জোগাড় করে দিতে পারব কিনা, বাড়ী গিয়ে মাখামাখি করলে একটা চক্ষুলজ্জার মধ্যে পড়তে হবে। সুতরাং আমি কাজের অজুহাত দেখিয়ে কেবলই দিন পিছিয়ে দিই।

মাস দুই এভাবে কেটে গেল।

একদিন সকালে মেসে বসে আছি, রামতারণবাবু এসে হাজির। কখনও আসেন নি, একটু খাতির করা গেল ভাল ভাবেই। প্রবীণ সাহিত্যিক তো বটেই একজন।

আমায় বললেন—একটা বিশেষ কাজে এলাম ভায়া।

—বলুন।

—আপনাকে বলতে কোনও আপত্তি নেই। আমার একখানা বইয়ের সেকেণ্ড এডিশন

হবে, ফার্স্ট এডিশনের বই একখানাও আর বাজারে নেই, খবর পেয়েছি। একটা প্রকাশক জোগাড় করে দিন। কিছু টাকার বড় দরকার হয়েছে।

—বইখানা কি ?

—রঙের গোলাম। আমার বইয়ের মধ্যে সব চেয়ে ভাল বই। বেশ নাম আছে বইখানার। বাজারে যাচাই করে দেখলেই বুঝতে পারবেন।

—ও।

—দিতেই হবে ভায়া। একটু টানাটানি পড়েছে টাকাকড়ির। কিছু আসা দরকার, যেখান থেকেই হক। বুঝলেন ?

রামতারণবাবুর বাড়ী একদিন যেতেই হল। একতলা দু-তিনটি ঘর। বাইরের ঘর নেই, তার বদলে ঢোকবার পথের অতি সংকীর্ণ স্থানটুকুতে একখানি বেঞ্চি পাতা। তাতেই বসলাম। রামতারণ একটা বাটিতে চিঁড়েভাজা নিয়ে এলেন, একটি ছোট ছেলে চা দিয়ে গেল। আতিথেয়তার কোন ত্রুটি হল না।

অত্যন্ত অনুরোধে পড়ে এসেছি। রামতারণবাবুর কোন উপকার করতে পারব কি ? যদি পারি তো খুব আনন্দিত হব। সুতরাং কথাটা পেড়ে বললাম—তাহলে এবার—

—হ্যাঁ, এবার নিয়ে আসি।

একটু পরে খান-দুই মোটা পুরনো বাঁধানো খাতা এবং এক বোঝা কাগজ নিয়ে রামতারণবাবু আবার এসে বসলেন আমার কাছে। একখানা খাতা খুলে আমায় দেখাতে লাগলেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রিকায় তাঁর বই সম্বন্ধে যে সব সমালোচনা বার হয়েছিল, সেগুলোর কাটিং আঠা দিয়ে মারা। কাটিংগুলো হলদে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। বহুকাল আগের জিনিস, সে সব সাময়িক পত্রিকার মধ্যে একখানারও নাম আমি শুনি নি, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তাদের অস্তিত্ব ছিল, বহুকাল তারা মরে ভূত হয়ে গিয়েছে। তারা সকলে বলছে, রামতারণবাবু 'রংয়ের গোলাম' লিখে বঙ্কিমের খ্যাতির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন, এমন ভাব ও ভাষা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ—এই ধরনের সব কথা। রামতারণবাবু সলজ্জ বিনয়ের সঙ্গে লাইনগুলো আমায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগলেন। একখানা পত্রিকাতে লিখছে, "রামতারণ চট্টোপাধ্যায় বর্ত্তমানে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক (তখন 'কথাশিল্পী' শব্দটির সৃষ্টি হয় নি)। বাঙালী সমাজের নিখুঁত ছবি তাঁহার নিপুণ লেখনীর সাহায্যে এই উপন্যাসখানিতে ('রঙের গোলাম') ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।"—এই ধরনের আরও অনেক কিছু। সকলের অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, হংকং থেকে মুদ্রিত এক ইংরিজি খৃষ্টানী কাগজে তাঁর বইখানার নাম প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমি সত্যি অবাক হয়ে গেলাম। রামতারণবাবু নিতান্ত যা-তা লোক নন দেখছি। আমি নিজে লিখি বটে—কিন্তু কই, স্বদেশ ছাড়া বিদেশের কোনও কাগজে আজও পর্য্যন্ত আমার সম্বন্ধে একটা লাইনও বেরোয় নি। যত বড় তারা বলেছে রামতারণবাবুকে, অত বড়ও আমাকে আজও কেউ বলে নি।

কিন্তু এসব অতীত যুগের কাহিনী। আমি তখন নিতান্ত বালক, যখন রামতারণবাবু বঙ্কিমের কলম কেড়ে নিই-নিই করছিলেন ; যদিও উক্ত ব্যক্তি সে দুর্ঘটনা ঘটার পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। কত যত্নে রামতারণবাবু খাতাখানা রেখে দিয়েছেন আজও। কত কাল আগের সে সব কাগজ, যাদের নামও আজকাল কেউ জানে না। বিবর্ণ হলদে হয়ে গিয়েছে কাটিংগুলো। কত যত্নে কাটিংগুলোর ওপরে নিজের হাতে তারিখ লিখেছিলেন সেখানে, ১৯শে জানুয়ারি ১৯০২, ২রা মে ১৯০৫, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯০৪—। ১৯৩৪ সালে বসে সেসব তারিখকে যেন বহু যুগ পূর্ব্বের কথা বলে মনে হচ্ছিল আমার। আমি তখন ছেলেমানুষ, হয়তো তুঁততলার রাখাল মাস্টারের পাঠশালায় পড়ি। কতকাল কেটে গিয়েছে তার পর, কত ঘটনা ঘটে গেল আমার জীবনে, তবে এসেছে ১৯৩৪ সাল আজ। আর উনি সেই সব দিনের নামজাদা লেখক।

তবে এমন হল কেন ?

এত যিনি নামজাদা লেখক এক সময়ের—আজ তিনি একখানা বই প্রকাশ করবার জন্যে আমার মত লোকের শরণাপন্ন হয়েছেন কেন ? ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এমন গুরুতর পরিবর্ত্তন কি ভাবে সম্ভব হল কি জানি।

রামতারণবাবু হাসিমুখে বললেন—দেখলেন সব ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হংকং টাইমস্‌টার কাটিং দেখলেন ?

—আজ্ঞে দেখলাম। আপনার দেখছি আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি ছিল এক সময়ে।

—হেঁ—হেঁ—তা—তা—

রামতারণবাবু সলজ্জ হাস্যে চুপ করলেন। আমি বললাম—কতদিন আপনি লেখেন নি ?

—লিখব না কেন, লিখি। তবে মধ্যে দিনকতক বন্ধ করেছিলাম।

—কেন ?

—ইংরেজি কাগজের মোহে পড়েছিলাম।

—সে কি রকম ?

—একটা আমেরিকান পেপারে ভারতবর্ষের কথা লিখতাম। তারা বেশ টাকা দিত।

—তাতেই বাংলা লেখা ছাড়লেন ?

—পয়সা পাচ্ছি ভাল, আর বাংলা লিখে কি হবে, এই ভাবলাম।

—তার পর ?

—তার পর দেখলাম বাংলা না লিখলে মনের খুঁতখুঁতুনি যাচ্ছে না। কতকগুলো উপন্যাসের প্লটও মনে এল। আবার তখন বাংলা লিখতে হাত দিলাম। কিন্তু কি জানি কি হয়ে গিয়েছিল—ইতিমধ্যে। আর প্রকাশক পাচ্ছি নে মোটে। এদিকে সে আমেরিকান কাগজের সঙ্গেও আজকাল আর সম্পর্ক নেই। তারা হাত গুটিয়েছে, আগে বেশ টাকা দিত। কাগজ বোধ হয় তাদের উঠেই গিয়েছে। চিঠিও লেখে না আর।

—তাই তো।

রামতারণবাবু একটা বাণ্ডিল খুলে কতকগুলো পুরনো বই আমার সামনে ধরে বললেন—এই দেখুন আমার সব বই।

অনেক দিনের ছাপা, অনেকদিন আগের কাগজ। সেকালের ধরনের চটকদার বাঁধাই। সোনার জলে রুপোর জলে নাম লেখা। বইগুলোর বাঁধাই শুধু শক্ত কাগজের বোর্ডের। কি রকম ঘোরানো গড়নের অক্ষর। গ্রন্থকারের নামের পূর্ব্বে লেখা আছে—অমুক অমুক বইয়ের লেখক শ্রীরামতারণ চট্টোপাধ্যায়।

একখানা বই হাতে দিয়ে রামতারণবাবু সগর্ব্বে বললেন—এই আমার 'রঙের গেলাম'।

আগ্রহের সঙ্গে বইখানা হাতে নিলাম। বইখানার প্রথমদিকে এক সুদীর্ঘ ভূমিকা। 'শ্রীভুবনমোহন শর্ম্মণঃ' নাম লেখা আছে ভূমিকার শেষে। আর ভূমিকায় লেখা আছে, 'আমি এই পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি, আমার সব ভাল লাগিয়াছে; আমার মনে হয়, আমি নিঃসঙ্কোচে লিখিতেছি, হিন্দুর পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আদর যতদিন থাকিবে ততদিন সাধারণেঃ এই পুস্তকখানির আদর—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু এতবার যিনি 'আমি' লেখেছেন ভূমিকায়, যাঁকে এত অনুরোধ করে ভূমিকা লেখানো হয়েছিল একদিন, আজ ত্রিশ বৎসর পরে তাঁকেও লোকে বেমালুম ভুলে গিয়েছে, আমার তো মনে হল না এ নাম কখনও শুনেছি।

রামতারণবাবু বললেন—ভূমিকাটা দেখেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ভুবন বাঁড়ুজ্যের লেখা।

কথাটা বলেই রামতারণবাবু আমার মুখের দিকে চাইলেন, বোধ হয় লক্ষ্য করবার জন্যে এ নাম শুনে আমার মুখের ভাব কেমনতর হয়। কিন্তু আমার মুখের ভাবের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন হয় নি বলেই আমার ধারণা, তবুও গলায় যতদূর সম্ভব সম্ভ্রমের সুর এনে বললাম—তাই দেখছি।

রামতারণবাবু বললেন—আবও আছে বইয়ের পেছনে। উল্টে দেখুন। অনেক লোকের মতামত ছাপানো আছে।

আমি উল্টে দেখি, সত্যি অনেকে ভাল বলেছে বইখানাকে। ওদের মতামত ছেপে দেওয়া আছে বটে, কিন্তু যে সব লোকের মতামত ছাপানো হয়েছে তখনকার দিনে তাদের ব্যক্তিত্ব হয়তো যথেষ্টই ছিল, তাদের মতামতের মূল্যও ছিল সেই অনুপাতে, আজকাল তাদের কেউ চেনে না, তাদের মতামতের মূল্য কানাকড়িও না। যুগ-পরিবর্ত্তন হয়েছে: সেদিনের বাণী যারা শুনিয়েছিল, আমড়া গাছের পাকা পাতার মত তাদের দিন ঝরে গিয়েছে। তাদের আজ কেউ চেনে না।

তত্ত্বটা কি অদ্ভুতভাবেই উপলব্ধি করলাম সেদিন সেখানে বসে। আমার সামনে নোনা-ধরা পুরনো দেওয়াল, চুন-বালি খসে অনেকখানি করে ইট বেরিয়ে পড়েছে। একগাদা

পুরনো বাঁধানো খাতা—জীর্ণ হলদে বিবর্ণ খবরের কাগজের কাটিংএ ছাপানো জীর্ণ হলদে বিবর্ণ প্রশংসা—যাদের মতামত, তারা ইহলোকের হিসেব চুকিয়ে ফেলেছে বহুকাল···পুরনো কাগজ-পত্রের ভ্যাপসা গন্ধ। প্রবীণ পককেশ গ্রন্থকার রামতারণ চাটুজ্যে সামনে বসে শিরাবহুল হাতে পুরনো বই-খাতার পাতা ওল্টাচ্ছেন···

মন খারাপ না হয়ে পারে না। আমিও লেখক। আমার চেয়ে অনেক বড় দরের লেখক ছিলেন ইনি একদিন। দিন চলে যায়, থাকে না। এ যুগের বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের বইয়ের জীর্ণ পাতা ও যুগে লাইব্রেরির আলমারির পেছনে তেলাপোকায় কাটে। ওজন-দরে বিক্রি হয়।

রামতারণবাবু বললেন—দেখেছেন? এই দেখুন রায়বাহাদুরের মত—

—কোন্ রায়বাহাদুর?

—রায়বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ মুন্সী—কত বড় ইয়ে—কলকাতায় হেন সভা ছিল না যেখানে রায়বাহাদুর সভাপতিত্ব না করতেন—

—ও।

চিনলাম না। যেমন চিনি নি বইয়ের ভূমিকা-লেখক ভুবনমোহন বাঁড়ুজ্যেকে।

রামতারণবাবু এইবারে 'রঙের গোলাম' সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করলেন। কে পড়ে কবে কি বলেছিল। কোন্ সভায় তাঁর সম্বন্ধে কি কি বলা হয়। 'রঙের গোলাম' সম্পূর্ণ নতুন ধরনের জিনিস বাংলা সাহিত্যে। ও ধরনের প্লট নিয়ে কেউ কখনও লেখে নি। আমাকে বললেন—নিশ্চয় আপনি পড়েছেন? পড়েন নি?

পড়ি নি একথা বলতে কষ্ট হল ওঁর সাগ্রহ প্রশ্নভরা দৃষ্টির সামনে। বললাম—নিশ্চয়ই।

এর পরেই তিনি তাঁর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি দেখালেন। অনেক দিনের পাণ্ডুলিপি বলেই মনে হল। আমায় বললেন—শোনাব?

একটু একটু করে পড়েন তিনি, আর আমি বসে বসে শুনি আর ঘাড় নাড়ি। মাঝে মাঝে বলেন, আপনার কেমন লাগছে? বলি, ভালই লাগছে। ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। ত্রিশ বছর আগের বাংলায় লেখা মামুলি প্লট বলে মনে হবারই কথা আমার কাছে। ওসব খোঁচ, ওসব কৌশল অনেক পেছনে ফেলে এসেছি আমরা। "পাঠক! এই যুবক ও যুবতীকে কি চিনিতে পারিলেন? ইহারাই আমাদের নবকুমার ও ইন্দুমতী।"

বেলা যায় যায়। এতক্ষণে আমাদের আড্ডা বসেছে 'ইন্দিও-ভানু' আপিসে—বন্ধুবান্ধব এসে গিয়েছে, চা চলছে। আমি উসখুস করি আর ঘন ঘন বাইরের দিকে উঁকি মারি। রামতারণবাবুর সেদিকে দৃষ্টি নেই, তিনি তন্ময় হয়ে দরদের সুরে পড়ে চলেছেন 'ইন্দুমতী'র পাণ্ডুলিপি। ইন্দুমতী কি একটা ফ্যাসাদে পড়েছে, ভাল করে বোধ হয় জায়গাটা শুনি নি, এখন তার করুণ স্বগতোক্তি খুব দরদ দিয়ে উনি পড়ছেন। কি মুশকিলেই পড়া গেল, আজকের আড্ডা ফসকাল দেখছি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলব—"আচ্ছা থাক, আমার কাজ আছে আজ—"?

না, রামতারণবাবু কি মনে করবেন। তার চেয়ে শুনি বসে বসে। আর কখনও আসব না। সন্ধ্যা হয়ে এল ক্রমে। আর পড়া চলে না। রামতারণবাবু হেঁকে যেন কাকে বললেন, ওরে আলো একটা দিয়ে যা!

আমি এই সুযোগে বলি—তাহলে আজ—

—যাবেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। একটু দরকার আছে।

—কাল আসবেন কোন্ সময় বলুন। সবটা শুনতে হবে তো। নইলে প্রকাশকদের কাছে বলবেন কি? কেমন লাগছে?

—বাঃ চমৎকার।

—তাহলে কাল—ধরুন এই তিনটে—এখানে এসে চা খাবেন?

—ইয়ে—কাল? কাল আবার ভবানীপুরে একটু কাজ ছিল—

—না না, তা হবে না! একটা বই আরম্ভ করে মাঝে ফাঁক দিলে ইমপ্রেশন কেটে যায় —একটানা না শুনলে। আসুন কাল। সময় খুব কম হাতে।

অগত্যা রাজী হতে হল। পরদিনও গেলাম। সেদিন খাতা শেষ হয়ে গেল—আমার সৌভাগ্য বলেই সেটা ধরতে পারতাম যদি না রামতারণবাবু পড়ার শেষে খাতাখানা আমার ঘাড়ে চাপাতেন প্রকাশক খুঁজে দেওয়ার জন্যে।

বললেন—তাহলে এইবার একটু ভাল করে চেষ্টা করুন। শুনলেন তো সবটা? এ ধরনের বই আজকাল কেউ লিখতে পারবে না মশাই—নিজের মুখেই বলছি, তা আপনি যা-ই ভাবুন। অথর হলেই হল না।

আমার ভাবনা অবশ্য একটু ভিন্ন পথে গেল। এ যুগে চেষ্টা করলেও অমন বই লেখা যায় না ঠিকই। যুগের হাওয়া বদলেছে, রামতারণবাবুর যুগ পঁয়ত্রিশ বৎসর পিছিয়ে পড়ে গিয়েছে।

চেষ্টা করি নি তা নয়। সত্যিই চেষ্টা করেছিলাম। প্রকাশকেরা হেসেই কথাটা উড়িয়ে দেয়। সোজা কথা শুনিয়ে দেয় অনেকে, কেন আমি বৃথা চেষ্টা করছি, ও বই চলবে না। লেখকের নাম নেই বাজারে।

বললাম—কেন থাকবে না? এক সময় তাঁর বইয়ের যথেষ্ট আদর ছিল।

—যখন ছিল তখন ছিল। এখন ও অচল।

রামতারণবাবুর সঙ্গে দেখা করতে সঙ্কোচ হয়। অন্য চায়ের দোকানে চা খাই, গোল-দীঘির ত্রিসীমানা মড়াই না। কিন্তু একদিন তিনি আমার মেসে এসে হাজির। আমি ওঁকে দেখে একটু থতমত খেয়ে গেলাম।

উনি বললেন—কি ব্যাপার? দেখি নে যে?

—আসুন। শরীর খারাপ। বেরই নি।

—বইখানার কতদূর কি হল বলুন তো। আমার ছোট নাতনীর অসুখ, কিছু টাকা বড়

দরকার। কে কি বললে তাই বলুন।

বড় বিপদে পড়ি। কেউ কিছুই বলে নি যে, একথা তাঁকে শোনাতে আমার বড়ই বাধে। প্রবীণ লেখকের মনে সে রূঢ় আঘাত কেমন করে দিই? অবশেষে বললাম—একজনদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হচ্ছে।

—খাতা তারা নিয়ে নিয়েছে নাকি?

—না—ইয়ে—খাতা আমার কাছেই—

রামতারণবাবু যেন দুর্ভাবনার দায় এড়িয়ে হাঁপ ছাড়লেন। প্রকাশকদের বিশ্বাস নেই, তারা অনেক সময় ভাল বই পেলে মেরে দেয়, আমি যেন খুব সাবধানে কাজ করি। অনেক সদুপদেশ দিলেন। আমি বেশ মন দিয়ে চেষ্টা করছি তো?

দু তিন জায়গায় ঘুরলাম আরও। রীতিমত অনুনয়-বিনয় করলাম দু-এক জায়গায়।

তারা হেসে বলে—আপনি অমন করছেন কেন ওঁর জন্যে বলুন তো? ওঁর বই চলবে না। আপনার নিজের বই আছে? থাকে নিয়ে আসুন। কালই প্রেসে দিচ্ছি।

একজন অনভিজ্ঞ লোক বই ছাপবার ব্যবসা করতে এল মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে। আমার কাছে দিন কতক ঘোরাঘুরি করলে। পয়সা বেশি নেই, কম টাকায় কাজ হাসিল করতে চায়। তাকে পাঠিয়ে দিলাম রামতারণবাবুর কাছে। সে চেনে না বিশেষ কোন গ্রন্থকারকে। আমার মুখে শুনলে রামতারণবাবুর খ্যাতির কথা। ওঁর বাসার ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম ওঁর কাছে। সন্ধ্যার পরে লোকটা এল আমার বাসায়! খুব খুশী। মস্ত বড় 'অথার' ধরিয়ে দিয়েছি তাকে। আমার কাছে সে কৃতজ্ঞ থাকবে চিরকাল নাকি। অতবড় একজন লোক। বঙ্কিমচন্দ্রের মত খ্যাতি ছিল এক কালে! ইংরেজি কাগজে পর্য্যন্ত নাম বেরিয়েছে, তাও এখানকার কাগজে নয়, চীন দেশের।

বুঝলাম রামতারণবাবু তাঁর পুরনো খাতাপত্র সব বের করেছিলেন এর সামনে।

দিন পাঁচ-ছয় কেটে গেল। দুজনের কারও সঙ্গে দেখা হয় না। মনে মনে আশা হল, রামতারণবাবুর নৌকা ডাঙায় ভিড়েছে এতদিনে।

পরদিন আমি রামতারণবাবুর বাড়ী গেলাম। রামতারণবাবু স্নান করে উঠেছেন সবে, ভিজে গামছা পরেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, হাতে এক ড্যালা বড় কাপড়-কাচা সাবান। বললেন—কে? ও, আপনি? আমি বলি বুঝি সেই ভদ্রলোক—

—কে?

—ঐ যাঁকে আপনি পাঠিয়েছিলেন। বেশ লোক।

—কি ঠিক হল?

—বসুন। আমি কাপড় ছেড়ে এসে সব বলছি। চা দিতে বলি?

—না, এতবেলায়—আসুন আপনি।

রামতারণবাবুর মনে খুব স্ফূর্ত্তি। ফিরে এসে আমার কাছে বসলেন।

আমি বললাম—কি ব্যাপার বলুন।

—এখনই আসবেন উনি। আজ টাকা দেবার কথা।

—কথা পাকাপাকি হয়ে গেল? কত টাকায় মিটল?

—দেড়-শ টাকা।

দুজনেই বসে রইলাম অনেকক্ষণ। কেউ এল না। আমি উঠে বাড়ী চলে এলাম।

সেই প্রকাশকটি আমার কাছে দুপুরের পরেই এসে হাজির। বললাম—আপনি গেলেন না ওখানে? কতক্ষণ বসে ছিলাম আমরা।

—না মশাই। ওঁর বই নেব না।

—কেন?

—চলবে না, সবাই বারণ করছে। উনি সেকেলে লেখক—ওঁর বই একালে বিক্রি হবে না।

তবুও আমি অনেক বোঝালাম। ফল বিশেষ কিছু হল না। সেই যে চলে গেল, আর আমি তাকে কোনদিন দেখি নি।

এই ঘটনার পরে দু তিন মাস কেটে গেল। রামতারণবাবুর আর কোন খবর পাই নি। সে চায়ের দোকানেও তিনি আর আসেন না।

তিন মাস পরে একদিন তাঁর বাড়ী গেলাম। ওঁর নাতি আমায় বললে—আসুন, দাদুর বড় অসুখ উনি আপনার কথা প্রায়ই বলেন। চলুন ও ঘরে।

সে ঘরে গিয়ে দেখি, রামতারণবাবু মলিন শয্যায় শুয়ে চোখ বুজে রয়েছেন। রোগীর মত মত চেহারা নয় কিন্তু—বেশ সৌম্য মূর্ত্তি, পাশে একখানা খবরের কাগজ—বোধ হয় কিছু আগে পড়ছিলেন। বিছনার পাশে একখানা বেঞ্চিতে ময়লা কাপড়ের ঘেরাটোপে পুরনো কয়েকটি বাক্স-তোরঙ্গ। দেওয়ালে ক্যালেণ্ডার থেকে কাটা ছবি টাঙানো। কাঠের বাঁধাই সেকেলে আয়না একখানা।

বিছানার পাশে একটা টুলে রামতারণবাবু আমায় বসবার নির্দ্দেশ করলেন।

বললাম— কেমন আছেন এখন?

ঐ অমনি। বুড়ো বয়সের জর। শরীরটা দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে।

দেখে সত্যিই কষ্ট হল। দারিদ্র্যের কালিমাখা হাতের ছাপ ঘরের আসবাবপত্রে মলিন বিছানায়, ছারপোকার ছোপ ধরা-তক্তপোশে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের একজন নামকরা লেখকের এই পরিণতি দেখে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব পুলকিত হয়ে উঠলুম না, বলাই বাহুল্য।

একথা-ওকথার পর রামতারণবাবু বললেন—আচ্ছা এক জুয়াচোরকে পাঠিয়েছিলেন মশাই। এই বলে গেল টাকা নিয়ে আসছি, তার পর আর এলই না। ও আমাকে ভেবেছে কি? আমার এখানে সেন লাইব্রেরীর গোলগোবিন্দ সেন একদিন তিন শ টাকা নিয়ে খোশামোদ করেছে একখানা ছোট উপন্যাসের জন্য—এই সাত-আট ফর্মা। ওর ভাগ্য ভাল

যে দেড়-শ টাকায় ওকে বই দিতে রাজী হয়েছিলাম—তা বুঝল না ও—

রামতারণবাবুর ব্যথা কোথায় জানতে দেরি হয় না। আমি কোন কথা না বলে চুপ করে রইলাম।

উনি বললেন—আপনার সঙ্গেও দেখা করে নি ?

অম্লান বদনে বললাম—কই, না।

—হামবাগ কোথাকার! ওর কোনও পুরুষে প্রকাশক নয়। মুড়িমিছরির যে একদর করে সে আবার প্রকাশক! অনেক পাবলিশার দেখেছি আমি, বুঝলেন? আমার এখানে ধন্না দিয়েছে। বুঝলেন?

—নিশ্চয়ই। তা হবে না! কত বড় নাম আপনার!

রামতারণবাবু আত্মপ্রসাদের প্রসন্ন হাসি হাসলেন। বললেন—সে আপনারা বুঝবেন মশাই, কারণ আপনারা লেখেন নিজেরা। ভাল হক মন্দ হক, লেখেন তো? আমার 'রঙের গোলাম' বইখানা পড়েছেন, দেখেছেন তো? ওর নাম চিরকাল থেকে যাবে—কি বলেন আপনি?

—তা আর বলতে! সেদিন এক বড়লোকের বাড়ী গিয়েছি—সেখানে আপনার 'রঙের গোলাম'এর কথা উঠল—

রামতারণবাবু আগ্রহের মাথায় বিছানা ছেড়ে সোজা হয়ে বসে বললেন ব্যগ্রভাবে—কোথায়? কোথায়?

—ওই—ইয়ে, বালিগঞ্জে।

—তার পর? তার পর?

—তার পর ওরা বললে, বইয়ের মত বই একখানা। খুব ভাল বলছিল সবাই।

—বলতেই হবে যে—মশাই, বলতেই হবে। এমন কৌশল করে রেখেছি ওর মধ্যে যে, সব ব্যাটাকে ভাল বলতে হবে। কেঁদে ভাসিয়ে দিতে হবে শেষের দিকে—কেমন, না?

—উঃ সে আর—

ভগবান যেন আমায় ক্ষমা করেন। রামতারণবাবুকে দেখে মনে হচ্ছিল তাঁর রোগ অর্দ্ধেক সেরে গিয়েছে। নিজের বইয়ের প্রশংসা শোনা অনেকদিন বোধ হয় তাঁর ভাগ্যে ঘটে নি।

সেদিন একটু পরেই চলে এলাম।

এইদিনটি থেকে কি জানি কি হল, যখনই রামতারণবাবুর কাছে গিয়েছি, তখনই মাঝে মাঝে তিনি জানতে চাইতেন, তাঁর 'রঙের গোলাম' সম্বন্ধে আর কোথাও কিছু শুনলাম কি না। কি আগ্রহেই জিজ্ঞেস করতেন কথাটা!

আমায় সংবাদ দিতেই হত। কখনও তাঁর বইয়ের প্রশংসা শুনে এলাম বালিগঞ্জের কোনও ক্লাবে, কোনদিন ট্রেনে, কোনদিন তরুণ সাহিত্যিকদের আড্ডায়, কোনদিন বা আমার কোন বান্ধবীর মুখে।

এর পরেই তাঁর সানুনয় অনুরোধ শুনতে হত প্রায় প্রত্যেকবার—দেখুন না মশাই, বইখানার সেকেণ্ড এডিশন যদি কেউ নেয়! একবার উঠে পড়ে লাগতে হয় এবার। আপনি তো পড়েছেন, আপনি বলবেন তাদের বুঝিয়ে—কি বলেন?

ভগবান জানেন, 'রঙের গোলাম' নামধেয় কোন উপন্যাস আমি চক্ষে দেখি নি।

হয়তো রামতারণবাবুর বাসাতে যাতায়াত করা উচিত ছিল না অত, কিন্তু না গিয়ে আমি পারতাম না। কেমন একটা টান অনুভব করতাম। প্রবীণ লেখক অসহায় ভাবে রোগ-শয্যায় পড়ে আছেন! কখনও দু-পাঁচটা কমলা লেবু, কখনও একটু মিছরি হাতে নিয়ে যেতাম—কিন্তু রামতারণবাবু সব চেয়ে খুশী হতেন ভাল গুড়ুক তামাক নিয়ে গেলে। বৈঠকখানা বাজারের সাধনের দোকানের তামাক বড় পছন্দ করতেন।

এর পরে ধীরে ধীরে রামতারণবাবুর কাছে যাওয়া আমার কমে গেল।

এমনিই হয়ে থাকে জীবনে। কিছু সময় ধরে এক এক লোকের রাজত্বকাল চলে, সে সময় পার হয়ে গেলে সারা জীবনেও আর হয়তো সে লোকের দেখা মেলে না। দেখা মিললেও প্রথম আলাপের দিনের উৎসাহ খুঁজে পাওয়া যায় না। রামতারণবাবুকে সে চায়ের দোকানের আর অনেকদিন দেখি নি।

দশ এগার বছর কেটে গেল এর মধ্যে।

আমার নিজের জীবনেও কত পরিবর্ত্তন ঘটে গেল। কলকাতার অধিবাসী এখন আর আমি নই। গ্রামদেশে বাড়ী করেছি, মাঝে মাঝে আসি যাই, এই পর্য্যন্ত।

একদিন হেদোর ধারের বেঞ্চিতে বসে একটু জিরোচ্ছি, পাশেই একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি বসে ছিলেন আমার আগে থেকেই। দু-একবার চেয়ে দেখে লোকটিকে চিনতে পেরে আমি একেবারে বেঞ্চি ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। বললাম—রামতারণবাবু যে! চিনতে পারেন?

রামতারণবাবু খুব বুড়ো হয়ে গিয়েছেন—চেহারাও গিয়েছে অনেক বদলে। আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন—ও! আপনি?

আবার ওঁর পাশে বসে পড়ি। এত দিনের অদেখা। অনেক কথাবার্ত্তা হয়।

উঠবার সময় বললেন—চলুন না আমার বাসায়। সেই ভীম ঘোষের লেনেই আছে বাসা। ওখানেই বহু কাল কাটল। এখন আর কোথায় বা যাব? আপনি তো ভুলেই গিয়েছেন একেবারে।

গেলাম সেই পুরনো বাড়ীতে। সেই পুরনো দিনের আসবাবপত্র ঠিকই আছে, মায় ঢুকবার দরজার সামনে সেই বেঞ্চিখানা পর্য্যন্ত। পরিবর্ত্তনের মধ্যে রামতারণবাবু একটু স্থবির হয়ে পড়েছেন, নিজেও তুললেন সে কথা।

—আর তেমন হাঁটাহাঁটি করতে পারি নে। হেদোটাতে গিয়ে বসি বিকালটাতে। যাবই বা কোথায়, গেলে পয়সা খরচ। যা টানাটানির সংসার—

—আপনার বড় ছেলে কোথায় কাজ করছে ?

—সে তো নেই। আজ এই আট বছর। ওই ছোট ছেলেটা কি একটা চাকরি করে, রেশন পায়, তাতেই কোন রকমে—

—কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। কি কথা বলি ?

রামতারণবাবুই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে উঠলেন—ভাল কথা—

আমি ওঁর মুখের দিকে চাইলাম।

—আমার 'রঙের গোলাম'-এর কথা আজকাল কেমন শোনেন-টোনেন ? লোকে বলছে কি ? আধুনিক জেনারেশনের মত কি ? ওরা ওটা বুঝতে পারবে ? ওদের জন্যেই ওটা লেখা। আমরা হচ্ছি অ-ব-থর, বইয়ের কথা লোকে কি বলে না বলে—সে তো আর আপনাকে বোঝাতে হবে না—আপনিও তো একজন—

শীর্ণকায় অতিবৃদ্ধ ঔপন্যাসিক আমার সামনে , মিথ্যা গল্প ফাঁদি, বলি—হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল, সেদিন ট্রামে দেখি আপনার বই নিয়ে দুই ভদ্রলোকের মধ্যে বেধেছে ঘোর তর্ক—কলেজের ছেলে বলেই মনে হল, দুজনেই ভক্ত আপনার লেখার—তার পর—

উনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—হতেই হবে যে—ওর মধ্যেই এমন কৌশল করা আছে, কেঁদে ভাসিয়ে দিতে হবে শেষের দিকে যে! তা—ভাল কথা, ওর সেকেণ্ড এডিশনটার জন্যে একটু খাটতে হচ্ছে আপনাকে, বুঝলেন ? আপনাকে বলব না তো কাকে বলব বলুন—অথরস্য অথরো গতি—নাম করা বই বাজারের! তাহলে একটু দয়া করে—

শীর্ণ হাত দুখানা দিয়ে রামতারণবাবু সাগ্রহে আমার ডান হাত চেপে ধরলেন।

নুটি মন্তর

হাবু—নাপিতের ছেলে, সুতরাং রীতিমত তার বুদ্ধি।

পায়রাগাছির গুণীন্ রোজা এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ, সে নাকি মন্ত্রবলে সাপ হতে পারে, বাঘ হতে পারে, কী না হতে পারে! লোহার সিন্দুকে কিংবা বাড়ীতে বড় বড় হব্‌সের চব্‌সের কুলুপ লাগানো আছে—পায়রাগাছির রোজা (ওঝা) এসে কি একটা মন্তর বিড়বিড় করে বলে দু বার তালা ঝম্‌ঝম্ করে নাড়লে, আর তালা সব গেল বেমালুম খুলে। এ কত লোকের স্বচক্ষে দেখা। রায়েদের কলম আমবাগানে বিকেল বেলা কেউ কেউ নাকি দেখেছে রোজা কলমের আম পাড়ছে—হয়তো লোকে ধরতে গিয়ে দেখলে একটা খরগোস লাফাতে লাফাতে বাগানের উত্তরদিকের বেড়া ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল।

পায়রাগাছির রোজা! মস্ত বড় নাম।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—এত বড় নাম-করা রোজা যে, তাকে কেউ কখনও দেখে নি। কোথায় যে কখন কি ভাবে থাকে, তা কেউ বলতে পারে না।

হাবুর বড্ড ইচ্ছে সে কিছু মন্তর-তন্তর শেখে। এ তার অনেক দিনের ইচ্ছে। এখন তার বয়স আঠার-উনিশ। যখন তার বয়স চোদ্দ-পনের তখন থেকে সে যেখানেই শুনেছে রোজা গুণীন্ এসেছে অমনি তার পিছু পিছু ছুটে গিয়েছে। একবার তাদের পাশের গ্রামের হাইস্কুলে একজন বড় জাদুকর এসে নানারকম তাসের খেলা, টাকার খেলা দেখালে। একটা তাস বেমালুম গোলাপ ফুল হয়ে গেল, এর মুঠোবাঁধা হাতের টাকা ওর হাতে গেল, এক গ্লাস জল হয়ে গেল মিষ্টি শরবত।

তাদের গাঁয়ের দু-চারজন লোকের সঙ্গে হাবুও গিয়েছিল খেলা দেখতে। একখানা তাসকে তার চোখের সামনে গোলাপ ফুল হতে দেখে সত্যি সে কি আশ্চর্য্যই না হয়ে গিয়েছিল!

ফেরবার পথে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ওর কি রকম গা ছম ছম করতে লাগল।

কালী স্যাকরা দলের মধ্যে প্রবীণ। হাবু বললে—আচ্ছা কালী জেঠা, ওসব কি করে করলে?

কালী স্যাকরা একটা তাচ্ছিল্যসূচক ভঙ্গি করে বললে—আহা, ওসব তো সোজা!

—সোজা, কালী জেঠা?

—খু-উব সোজা।

—কি রকম সোজা?

—ওসব মন্তর-তন্তরের কাণ্ড। আমিও ইচ্ছে করলে পারি।

—তুমিও পার?

—কেন পারব না।

—একদিন করে দেখাবে জেঠা?

—হু হুঁ, যা। সময় হলে দেখাব। ও কিছুই নয়।

কালী স্যাকরার কথায় কিন্তু হাবুর বিস্ময়বোধ দূর হল না। সে গিয়ে জাদুকরকে পরদিন সকালে পাকড়ালে। সোজাসুজি তাঁকে জানালে সে ঐসব খেলা শিখতে চায়। শাগরেদ হতে সে রাজী আছে। জাদুকর কলকাতার লোক, মাথায় নরম বুরুশ দিয়ে চুল আঁচড়ে থাকেন, হাতে ঘড়ি পরেন, চোখে থাকে চশমা। তিনি নাক উঁচু করে বললেন—ওসব হয় না হে ছোকরা, হয় না। অনেক টাকার খেলা, অনেক টাকা প্রিমিয়াম দিলে তবে শাগরেদ করি।

হাবু বললে—প্রিমিয়াম কি?

—প্রিমিয়াম টাকা হে, টাকা পারবে আমায় দিতে?

মরীয়া হয়ে হাবু বললে—আজ্ঞে কত টাকা?

—এক শ'।—পারবে দিতে?

—আজ্ঞে না। অত টাকা কখনও একসঙ্গে দেখি নি।

—তবে ফিরে যাও। এসব অমনি হয় না।

—কিছু কম করে নিন—

—দু শ' করে প্রিমিয়াম নিই, তোমার এক শ' বলেছি!

হাবু সেখান থেকে সরে পড়ল। অত টাকার সিকিও দেবার ক্ষমতা নেই তার। জাদুবিদ্যা শেখবার সৌভাগ্য কি সকলের ঘটে!

কেটে গেল বছর তিনেক। এই তিন বছরে তার জীবনে নতুন কিছু ঘটল না। এ অজ-পাড়াগাঁয়ে জীবন এক-রঙা ছবির মত একঘেয়ে।

ঠিক এই সময়ে একদিন হাবু দুপুরে মাছ ধরতে গেছে নদীতে, এমন সময়ে দেখলে একটা লোক আমবাগানের ছায়ায় বসে আপন মনে কতকগুলো ঢিল নিয়ে খেলছে। হাবু একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলে লোকটা একটা ঢিল হাতে নিয়ে ছুঁড়ে দিতেই সেটা মস্ত বড় একটা কোলা ব্যাং হয়ে গেল, লাফিয়ে লাফিয়ে পালাল। আর একটা ঢিল ছুঁড়তেই সেটা হয়ে গেল একটা ছেলেদের দু চাকার খেলনাগাড়ী, কিন্তু সে গাড়ী গড়গড় করে গড়িয়ে চোখের বাইরে অদৃশ্য হল, আর একটা ঢিল হিল হিল করতে করতে একটা সাপ হয়ে চলে গেল, একটা ঢিল একমুঠো আবীর হয়ে ছত্রাকারে ছড়িয়ে মাটি রাঙিয়ে দিলে। হাবু সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা ওর মুখের দিকে চেয়ে ফিক্ করে হেসে বললে—কি?

স্তম্ভিত ও ভীত হাবু কোন কথা না বলে একেবারে লোকটার পা জড়িয়ে ধরতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল।

গাছতলায় লোকটা নেই।

হাবু বিভ্রান্ত চোখে চারিদিকে চেয়ে দেখলে। অত বড় আমবাগানের কোথাও সে নেই! দু মিনিট হাবু দাঁড়িয়ে রইল আড়ষ্ট হয়ে। হঠাৎ সে দেখলে হাত দশেক দূরে সেই ব্যক্তি দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

হাবু কাতর কণ্ঠে বললে—আমাকে দয়া করুন।

—কি দয়া?

—পায়ে ঠেলবেন না এমন করে। আমাকে আপনার চাকর করে রেখে দিন। আমি অনেক ভাগ্যে আপনার দেখা পেয়েছি।

—আমি গরিব লোক, চাকরে আমার কি দরকার। তাছাড়া আমার হাতে অনেক চাকর। এই দেখ—বলেই লোকটা একটা ঢিল গাছের ওপরের ডালের দিকে অবহেলার সঙ্গে ছুঁড়ে মারতেই ঝর ঝর করে একরাশ আম পড়ল। হাবু একেবারে স্তম্ভিত। আম আসে কোথা থেকে এই কার্তিক মাসে? পাড়াগাঁয়ে কোন গাছেই এ সময়ে আম তো দূরের কথা, আমের বউলও নেই। পাকা আম ঝুড়িখানেক তার সামনে।

লোকটা বললে—খাবার জল? এই—

যেমন একটা ঢিল ছোঁড়া, আমনি গাছের গুঁড়ির এক জায়গা একেবারে ফুটো হয়ে কলের মুখে যেমন জল পড়ে, তেমনি জল পড়তে লাগল। লোকটা হাত নেড়ে ইঙ্গিত করে

বললে—খাও—ভাল জল।

হাবু কাতর সুরে বললে—আমায় শাগরেদ করে রাখুন।

—কি সর্ব্বনাশ! শাগরেদ? আমি ওস্তাদ নই।

—আমায় দয়া করুন।

লোকটা হি হি করে হেসে উঠল। ওকি! মুখের ফাঁক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লাল নীল বেগুনি রঙের ডানাওয়ালা প্রজাপতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।…লোকটা কে?

এর উত্তর লোকটা দিলে। বললে—পায়রাগাছি জান? উত্তর দিকে। আমার সঙ্গে সেখানে দেখা ক'রো।

হাবু হাঁ করে রইল। ইনি তবে পায়রাগাছির সেই গুণীন্! সবাই বলে, উনি 'ছুটি মন্তর' জানেন, অর্থাৎ মন্ত্রবলে অদৃশ্য হতে পারেন। আজ সে নিজে তার প্রমাণ পেয়েছে। হাবু হাত জোড় করে বললে—আমায় দয়া করুন।

পায়রাগাছির রোজা এবার নরম সুরে বললে—শেখাতে পারি ছুটি মন্তর, কিন্তু ছোকরা, তুমি এ পথে কেন? এ পথে কেবল তারাই আসতে পারে যাদের বাসনা কামনা ক্ষয় হয়ে গেছে। কত লোভের পথ খুলে যাবে—দেখ। আচ্ছা রোসো, দি'চ্ছি তোমায় মন্তরটা শিখিয়ে।…

কিছুদিন কেটে গেল।

হাবু এখন ছুটি মন্তর শিখে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হতে শিখেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবিষ্কার করলে সে একজন ভীষণ চোর। যে ঘরে যায়, ভাল ভাল জিনিস সব চুরি করতে ইচ্ছে হয়। খাবারের দোকানে গেলে ইচ্ছে হয় খাবারের হাঁড়ি ফাঁক করে। সে যে চোর, তা সে কখনও জানত না। একদিন এক বন্ধুর বাড়ী গিয়ে দেখলে, মস্ত বড় একটা ইলিশ মাছ এনেছে বন্ধুর বাবা। রোয়াকে সেটা পড়ে আছে, বন্ধুর মা ঘরে ঢুকেছেন বঁটি আনতে। ওর লোভ হল মাছটাকে নিয়ে দৌড় দেয়!

হাবু ভয়ে তখনই দৃশ্যমান হয়ে গেল!

বন্ধুর মা ওকে দেখে বললেন—ওমা, হাবু কোথা দিয়ে এলি? তোকে তো দেখলাম না দরজা দিয়ে আসতে? এই মাত্তর তো ঘরে বঁটি আনতে গিয়ে'ছি।

হাবু হেসে চুপ করে রইল।

একদিন আরও গুরুতর ব্যাপার ঘটল। পাড়ার গাঙ্গুলিরা বড়লোক, তাদের বাড়ীর ওপরের তালায় খাটে একছড়া দামী সোনার হার কে ফেলে রেখেছে। হাবু কৌতূহলবশত গাঙ্গুলিদের তেতলায় অদৃশ্য অবস্থায় বেড়াতে গিয়ে লোভ সামলাতে না পেরে সেই হার হাতে নেমে এল। সেও অদৃশ্য, তার কাছে যে জিনিস থাকবে তাও অদৃশ্য।

কেউ কিছু টের পেলে না।

তার পর যখন জানা গেল হার চুরি গিয়েছে, তখন গাঙ্গুলিদের বাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে গেল।

গাঙ্গুলিদের বড় মেয়ের হার সেটা, তার সে কি কান্না? সবাই মিলে তাকে অপমান উৎপীড়ন করতে লাগল, সে কেন এত অসাবধান, কেন সে হার খাটের ওপর ফেলে রেখেছিল। অবশেষে সন্দেহ গিয়ে পড়ল এক বৃদ্ধা দাসীর ওপর। তার ওপর শুরু হল নির্য্যাতন। পুলিশে খবর দিয়ে তাকে ধরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও হতে লাগল।

কিন্তু হাবুর সবচেয়ে অসহ্য হল গাঙ্গুলিদের মেয়ের সেই হাপুস নয়নে কান্না। মেয়েটির সঙ্গে তার স্বামীর বনিবনাও নেই। বাপের বাড়ী পড়ে থাকে। এমন মেয়ের কোন মান থাকে না বাপের বাড়ী। বৌদিদিরা একেই তো তাকে দাঁতে পেষেন, তার ওপর সে বাপের দেওয়া হারছড়া খুইয়ে ঘোর অপরাধে অপরাধিনী।

হাবু অদৃশ্য হয়ে সব দেখছিল, হারও তার পকেটেই ছিল। আর সহ্য করতে না পেরে হারছড়াটা সে বালিশের তলায় রেখে দিলে। সেখান থেকে সেই মেয়েই প্রথম হার আবিষ্কার করলে। তখন কি হাসি তার মুখে!

তা তো হল, কিন্তু হাবু পড়ে গেল মহা বিপদে।

সে চোর হয়ে গেল শেষ পর্য্যন্ত? এ কি ভয়ানক প্রলোভনে সে পড়েছে! পদে পদে প্রলোভন, পদে পদে সচ্চরিত্রতার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে তাকে। মনের বল ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। লোভ সামলাতে সামলাতে গলদঘর্ম্ম। অদৃশ্য না হয়েও থাকা যায় না, অদৃশ্য হলেও বিপদ। এ কি সর্ব্বনাশা মন্ত্র!

মাসের পর মাস কাটে, এই ঘোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে।

হাবু ইতিমধ্যে এক বিয়েবাড়ীর ভাঁড়ারে ঢুকে সের খানেক সন্দেশ মেরে দিল। পরক্ষণেই জাগল অনুতাপ—তীব্র অনুতাপ। সে কোথায় নেমে চলেছে দিন দিন! পায়রাগাছির রোজা এ কি সর্ব্বনাশ তার করে গেল! কিছুতেই অদৃশ্য হবার প্রলোভন সামলানো যায় না। কিছুতেই ভোলা যায় না দুটি মন্তর। দুটি মন্তর তার জীবনের অভিশাপ।

বছরখানেক এভাবে কেটে গেল। কত খুঁজলে পায়রাগাছির রোজাকে—কেউ সন্ধান দিতে পারলে না।

একদিন হাবু সেই আমবাগান দিয়ে যেতে যেতে সেই একই গাছের তলায় দেখলে পায়রাগাছির রোজা সেই রকম ঢিল নিয়ে ছুঁড়ে খেলা করছে। ওর দেহে বিদ্যুতের স্রোত বয়ে গেল। সন্ধান মিলেছে এতদিন পরে। ও ছুটে এগিয়ে কাছে গেল। ঢিল একটা ব্যাঙ হয়ে লাফাতে লাফাতে পালাল। একটা ঢিল সদ্য-কাটা ধাড়ি ছাগলের মুণ্ড হয়ে গড়াগড়ি খেতে খেতে চলে গেল। এক ঝাঁক ছাতারে পাখী রোজার মুখের মধ্যে থেকে বের হয়ে উড়ে গেল।

হাবু ছুটতে ছুটতে (পাছে রোজা অদৃশ্য হয়ে যায়) গিয়ে ওর পায়ের ওপর পড়ল।

রোজা প্রশান্ত হাসির সঙ্গে বললে—কি হয়েছে?

—আমায় বাঁচান।

—কি ব্যাপার ?

—আপনি সব জানেন। আপনি অন্তর্য্যামী। ওস্তাদজি, ছুটি মন্তরের কবল থেকে আমার উদ্ধার করুন। আমার চরিত্র গেল, মনের শান্তি গেল,—সব গেল। এ আপনি ফিরিয়ে নিন।

রোজা মৃদু মৃদু হেসে বললে—একবার মন্তর দিলে আর ফেরত হয় ?—হয় না।

হাবু ভয়ে শিউরে উঠল। তবে কি জীবন-ভোর এই সর্ব্বনেশে মন্তরের ভার বইতে হবে তাকে ? এই অশান্তি,—পদে পদে এই পরীক্ষা সারাজীবন চলবে ?

হাবু পা আঁকড়ে ধরে বললে—বাঁচান আমায়। আমি মরে যাব।

—তবে চাও না ছুটি মন্তর ?

—আজ্ঞে না।

রোজা হেসে বললে—তবে যাও, দিলাম না। মোটেই তোমাকে মন্তর দিই নি। পরীক্ষা করছিলাম।

হাবু অবাক। সে কি কথা। এক বছর ধরে তবে সে কিসের ভারবোঝা বয়ে মরল ?

সে কি বলতে যাচ্ছিল। রোজা হেসে বললে—মোটে সাত মিনিট কেটেছে। এই প্রথম দেখা তোমার সঙ্গে আমবাগানে। ছুটি মন্তর তোমাকে দেওয়া যায় কিনা পরীক্ষা করছিলাম। আমি আজ বিশ বছর এই মন্তরের ভার বয়ে আসছি, আর তুমি এর দায়িত্ব সাত মিনিটও নিতে পারলে না ?

হাবু বললে—তবে আমি গাঙ্গুলিদের বাড়ী হার চুরি করি নি ? ময়রাদোকানে খাবার খাই নি চুরি করে ? তবে আমি—

—না। মোটে সাত মিনিট কেটেছে। আমার সামনে ছাড়া তুমি কোথাও যাও নি। এই তো প্রথম তোমার সঙ্গে আমবাগানে ··

বলে কি! হাবু আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পায়রাগাছির গুণীন্ হা হা করে হেসে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক চামচিকে তার হাঁ-করা মুখের মধ্যে থেকে পটপট শব্দে বের হয়ে ইতস্তত উড়ে গেল।

ফড় খেলা

চড়কডাঙা ক্ষুদ্র গ্রাম। পৌষ-সংক্রান্তি উপলক্ষে বড মেলা হয়।

অনাদিবাবু সেকালের বনেদী জমিদার, কাম্পনহাটির বিখ্যাত জমিদারবংশের ছেলে। বর্ত্তমানে অবিশ্যি সে প্রাচীন গৌরবের কিছুই অবশিষ্ট নেই। বহু শরিকে জমিদারি ভাগ হয়ে গিয়েচে, কোন রকমে ঠাট বজায় রেখে সংসার চলে।

অনাদিবাবু প্রথম যৌবনে ফুর্তি করতে গিয়ে অন্তত হাজার পঁচিশ টাকা উড়িয়ে দিয়েছেন, বর্ত্তমানেও একটি রক্ষিতার পেছনে এই দুরবস্থার মধ্যেও মাসে ত্রিশটি টাকা দিতে হয়। লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানেন না, বডলোকের ছেলে, ফুর্তিটাই চিরকার বুঝে এসেছেন। আজকাল অর্থের অভাবে অন্য সব ছেড়ে দিয়ে আফিং ধরতে বাধ্য হয়েছেন।

অনাদিবাবু সম্প্রতি চড়কডাঙার মুখুজ্যেবাড়ী এসেছেন বেড়াতে। হরিচরণ মুখুজ্যের তিনি হলেন দূর সম্পর্কে ভগ্নীপতি। পৌষ--সংক্রান্তির মেলা তখন বসেছে। একদিন অনাদিবাবু মেলায় বেড়াতে গেলেন বিকেলে। একটি অশ্বত্থতলায় অনেক লোক ভিড করেছে দেখে ডিঙি মেরে উঁকি দিয়ে দেখলেন, ভিড়ের কেন্দ্রস্থলে ফড-গুটির জুয়াখেলা চলছে। একটা বাটিতে হাড়ের ছোট্ট-গুটি (তার গায়ে এক ফোঁটা থেকে ছ ফোঁটা পর্য্যন্ত খোদাই করা) ঘুরিয়ে দেওয়া হয়—আর সমনের একটা কাপড়েও ঐ রকম ফোঁটা থেকে ছ ফোঁটার ঘর আঁকা আছে; টাকা-পয়সা যে ঘরে ইচ্ছে রাখ, গুটি ঘুরিয়ে জুয়োর মালিক একটি বাটি চাপা দেবে, তার পর গুটি আপনা-আপনি থেমে যখন পড়ে যাবে তখন ঢাকা খুলে যদি দেখা যায়, যে চিহ্নটি পড়েছে সেই দাগে অমুক অমুকের টাকা আছে—তখন তাদের টাকার চারগুণ ফেরৎ দেওয়া হবে। এই হল মোটামুটি খেলার ব্যাপারটা। পাশার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

অনাদিবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখলেন খেলাটা।

অনেক নিরীহ চাষা, গ্রাম্য লোক, এমন কি বালকেরা পর্য্যন্ত পেলে পকেটে বা ট্যাঁকে যা কিছু এসেছে সব খুইয়ে চলে যাচ্ছে। জিততে বড় একটা কাউকে দেখলেন না। একবার যদি বা যেতে তবে পরের ক-বার উপরি উপরি হারে। সিকি, দুয়ানি, পয়সা ও টাকা জুয়াড়ির সমনে ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠছে! অনাদিবাবু দাঁড়িয়ে দেখে দেখে বললেন—হ্যাঁহে বাপু, আমি খেলতে পারি?

জুয়াড়ি অনাদিবাবুর বেশভূষা দেখে মোটা শিকার ঠাউয়ে সসম্ভ্রমে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, অনায়াসে। খেলুন না বাবু, খেলুন।

অনাদিবাবু পকেট থেকে একটা টাকা বের করে দুই-ফোঁটা আঁকা ঘরে ফেলে দেন। লোকটা বলে—বাবু, কোন্ ঘরে?

—দুরি।

—তিরি?

—বলছি দুরি, তুমি বলছ তিরি! থাক্‌ ওখানে।

ঢাকনি তুলে দেখা গেল—দুরির দান। ফড়-গুটির গায়ের দুই-ফোঁটা আঁকা অংশটা ওপরেই।

জুয়াড়ির মুখ আর ততটা উজ্জ্বল রইল না। চারটি টাকা অনাদিবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে কাষ্ঠহাসি হেসে বললে—হেঁ হেঁ, বাবু জিতলেন—

—হ্যাঁ তো, তা জিতলাম।

আর কিছুক্ষণ কেটে গেল। অনাদিবাবু আর খেলছেন না দেখে জুয়াড়ি বললে—খেলুন বাবু—

অর্থাৎ চারটি টাকা জিতে পালিয়ে না যান। আবার খেললেই ও-কটি টাকা জিতে তো নেবেই, বরং আরও—

—খেলুন বাবু!

অনাদিবাবু মৃদু হেসে বললেন, না বাপু, আর খেলছি নে। তোমরা খেল।

—না খেলুন, খেলুন।

—বেশ, খেলি তবে। এই চার টাকা ঐ পঞ্জুরিতে ফেল—

দান পড়ল পঞ্জুরিতেই। ষোল টাকা আর ঐ চার টাকা, কুড়ি টাকা জিতলেন অনাদিবাবু। জুয়াড়ির কাষ্ঠহাসি কাষ্ঠতর হয়ে উঠেছে। সে টাকা কটা এগিয়ে দিয়ে বললে—নিন বাবু, হেঁ হেঁ—জিতলেন এবারও।

দু-তিন দান কেটে গেল। খেলছেন না আর অনাদিবাবু।

জুয়াড়ি বললে—বাবু খেলবেন না? খেলুন।

অনাদিবাবু বললেন—একটা সিগারেট ধরিয়ে—আবার খেলব?

—খেলবেন না কেন। খেলুন—

—আচ্ছা এই পঞ্চাশ টাকা ঐ ছক্কার ঘরে রাখ।

দান পড়ার শব্দ হল বাটির ঢাকনির মধ্যে। ঢাকনি ওঠানো হল, ছক্কার ঘরের দান।··· আড়াই শ টাকার নোট গুনে গুনে জুয়াড়ি দেয় অনাদিবাবুর হাতে। হাসি?···না। তার মুখে হাসি আর নেই। যারা খেলছিল, পাড়াগাঁয়ের চাষা-ভূষো গেঁয়ো লোক, এত টাকা একসঙ্গে বাজি ফেলা বা জেতা তারা দেখে নি। একটা লোক যে এ রকম জিততে পারে তাও তাদের কোন ধারণা নেই। ওরা বিস্ময়ে হাঁ করে চেয়ে রইল অনাদিবাবুর দিকে।

জুয়াড়ি বললে—বাবু, খেলুন।

—আবার খেলব?

—হ্যাঁ, খেলুন না!

অনাদিবাবু কিছুক্ষণ পরে আড়াই শ টাকার নোটের বাণ্ডিলটা পুনরায় ছক্কার ঘরে রেখে দিলেন। তখন অন্য সব লোকের সিকি দুয়ানির খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সবাই হাঁ করে চেয়ে আছে অনাদিবাবুর দিকে।

জুয়াড়ি বললে—আড়াই শ'ই খেলবেন বাবু?

—হ্যাঁ।

জুয়াড়ি একটু অস্বস্তি বোধ করলে। একটু পরে যখন দান পড়ল, তখন তার চোখ ঘোলাটে হয়ে গেল, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ছক্কার দান পড়েছে, ওর ধাক্কায় হাজার বার শ টাকা জিতে গেলেন অনাদিবাবু। সকলের চোখ বড় হয়ে উঠেছে বিস্ময়ে।

তখনই আবার খেললেন অনাদিবাবু—বার শ টাকাই পোয়ার ঘরে অর্থাৎ এক ফোঁটা আঁকা ঘরে রাখলেন, জুয়াড়ির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পোয়ার দান সাধারণত পড়ে না। এইবার ভগবান মুখ তুলে বোধ হয় চাইলেন। নয়তো জুয়াড়ি সর্ব্বস্বান্ত। বাবু এইবার ভুল করে বসেছেন বোধ হয়। এই ভুলেই চাল মাৎ হবে নিশ্চয়!

দুরু দুরু বক্ষে জুয়াড়ি ঢাকনি তুলল—তুলেই তার চক্ষু স্থির। একচক্ষু দৈত্যের মত গুটির সঙ্গে একটি মাত্র ফোঁটা ওর দিকে চেয়ে আছে। ওর গা ঝিম্ ঝিম্ করে মাথা ঘুরে উঠল। গা বমি বমি করল। চোখে কিছু দেখতে পেলে না কিছুক্ষণ।

আটচল্লিশ শ টাকা জিতেছেন অনাদিবাবু; আর এই বার শ, মোট কত বল হিসেব করে দেখ। সমবেত লোকজন হর্ষকোলাহল করে উঠল।

অনাদিবাবু হাত বাড়িয়ে বললেন—দাও।

জুয়াড়ি পাংশুমুখে বললে—বাবু, আর আমার কাছে কিছু নেই, হুজুর! এই দেখুন গেঁজে। গোটাকতক খুচরো টাকা সিকি দুয়ানি পড়ে আছে।

সকলে রাগে চীৎকার করে উঠল—তা হবে না, বাবুর টাকা ফেলে কথা কও।

ওদের দু-দশ আনা জিতে নিয়েছে জুয়াড়ি—আজ দু দিন অনেক পয়সা জিতেছে ও। সকলেরই রাগ আছে ওর ওপর।

—টাকা ফেল; সোজা কথা। বাবুর টাকা মিটিয়ে দাও। শালা, আজ তোমার একদিন কি আমাদের একদিন—

জুয়াড়ি অনাদিবাবুর পা ধরে বললে—গরিব, মরে যাব বাবু—মাপ করে দেন। বিশ-ত্রিশ টাকার রেজগি পড়ে আছে। মরে যাব বাবু।

হাজারী ট্যারা দু দিনে দেড় টাকা হেরে গিয়েছিল। সে সকলের আগে চীৎকার করে বলে উঠল—ওসব হবে না বলে দিচ্ছি। টাকা ফেলে তবে কথা কইবে। আমাদের সর্ব্বস্বান্ত করে নিয়েছ না তুমি? তোমায় অল্পে ছাড়ব ভেবেছ? টাকা না দিলে তোমার হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায়—

খুব যখন একটা হৈচৈ শুরু হয়েছে তখন সবাই মিলে জুয়াড়িকে ধরে বসল—চল বাবুর কাছে। তোমার চালাকি বের করে দিই একেবারে।

গ্রামের জমিদার হরিচরণ মথুজ্যের কাছে ওকে ধরে নিয়ে গেল উন্মত্ত জনতা। অনাদি বাবুর ভগ্নীপতি তিনি, আগেই বলা হয়েছে। তিনিও লোকটি যথেষ্ট প্রজাপীড়ক ও স্বার্থপর।

মদে তিনিও অনেক টাকা উড়িয়েছেন। লেখাপড়া সামান্যই জানেন, তবে কথায় কথায় ইংরেজির বুকনি দেন।

হরিচরণ বললেন—ব্রাদার, এ আবার কি কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছ?—কি রে, ব্যাপার কি?

· জুয়াড়ি কিছু উত্তর দেবার আগে ট্যারা হাজারী এগিয়ে গিয়ে হাত জোড় করে সব বুঝিয়ে দিলে।

—পাঁচটি হাজার টাকা বাবু ও এখন দেবে, তবে ওকে ছাড়ুন। আমরা যদি হারতাম তবে ও কি চাড়ত? বাবু জিতেছেন, বলিহারি খেলা বটে বাবুর! আমরা তাজ্জব একেবারে। যা ফেলেন, তাতেই দান পড়ে! আমাদের মুখে তো রা নেই একেবারে। এখন টাকার বাণ্ডিল জিতেছেন; ও ব্যাটা এখন হাতে পায়ে পড়ছে—বলি বার শ' টাকা যদি ও জিতত, তবে নিত না? যদি বলি—

হরিচরণবাবু ট্যারা হাজারীকে ধমক দিয়ে থামিয়ে অনাদিবাবুকে বললেন—কি বল ভাই? তোমার যা ইচ্ছে। তুমি কর যা হয়।

অনাদিবাবু জুয়াড়িকে ডাকলেন। সে বেজায় ভয় খেয়ে গিয়েছে উন্মত্ত জনতার গতিক দেখে। বেচারী নবমীর পাঁঠার মত কাঁপছে। সে হাত জোড় করে এগিয়ে গেল।

অনাদিবাবু বললেন—নাম কি?

—আজ্ঞে, গঙ্গাধর নস্কর।

—বাড়ী?

—আজ্ঞে বাবু, হুগলী ঘুঁটেবাজারে আমার···

—ফড-গুটি খেলা শিখেছ কার কাছে?

—আজ্ঞে করিম বস্‌কো সর্দ্দার ছেল বড্ড ভারী জুয়াড়ি গেঁড়োর। তিনি আমার গুরু। আমি সাত বছর তাঁর শাগরেদি করি।

—গুরুমারা বিদ্যে হয়েছে?

—আজ্ঞে যা বলেন—

গঙ্গাধর নস্কর চুপ করে রইল। এখন কোন রকমে সে পরিত্রাণ পেলে বাঁচে। কথা আর সে কি কইবে? অনাদিবাবু বললেন—চাষাভুষোর সর্ব্বনাশ করে বেড়াও। এ খেলার অন্ধিসন্ধি তুমি কিছুই জান না।

—আজ্ঞে—আজ্ঞে—

—না, শোন, তুমি কিছু জান না এ খেলার। কখনও এ খেলা খেলো না। —দেখবে? এই দেখ, ফড়-গুটি নিয়ে এস—

ট্যারা হাজারীর দল ও ফড়-গুটি খেলার বাটি, ফড়, মায় এক দুই আঁকা তেরপলের চটখানা পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে এসেছিল। ওরা বললে—এই যে বাবু।

অনাদিবাবু বললেন—গুটি ঘোরাও, ঘুরিয়ে ঢাকনি চাপা দাও।

গঙ্গাধর নস্কর তাই করলে। একটু ঘুরে গুটি পড়ার শব্দ হল ঢাকনির মধ্যেই। অনাদিবাবু বললেন···তুমি তো মস্ত ওস্তাদের শাগরেদ—শব্দ শুনে বুঝতে পারলে কি দান পড়েছে?

—আজ্ঞে না, আমি শুনি নি তেমন ভাল করে।

—আমি বলছি, তিরির দান প'ড়েছে, তুলে দেখ।

গঙ্গাধর ঢাকনি তুলে ফেললে। সমবেত জনতা সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলে ঠিক তিন ফোঁটার দান পড়েছে বটে!

অনাদিবাবু বললেন—শব্দ শুনে তুমি কই বল এবার? ঘোরাও—চাপা দাও—

গুটি পড়ার শব্দ হল। গঙ্গাধর কান পেতে শুনলে।

—বল, কত দান পড়েছে?

—আজ্ঞে, ছক্কা।

—না চৌকো। তোল ঢাকনি।

গঙ্গাধর ঢাকনি তুললে সমবেত জনতা হুমড়ি খেয়ে পড়ল দেখতে। চৌকোর দানই বটে! অনাদিবাবু মৃদু মৃদু হেসে বললেন—দেখলে? আচ্ছা, আবার বল। ঘোরাও গুটি। চাপা দাও।

মন্ত্রমুগ্ধবৎ সবাই চুপ করে আছে। গুটি পড়া তো দূরের কথা, সূচ পড়লেও তার শব্দ শোনা যায়। অনাদিবাবু বললেন—কত দান পড়ল?

গঙ্গাধর বললে—আজ্ঞে বাবু, শব্দ শুনে আমি বলতে পারব না। আমার ওস্তাদও বলতে পারতেন না। কখনও শুনিও নি, শব্দ শুনে কি দান পড়েছে তা বোঝা যায়।

—যায় না? তবে আমি বলছি কি করে?—তিরির দান পড়েছে। ঢাকনি তোল।

ঢাকনি তোলা হল। গলা লম্বা করে সবাই চেয়ে দেখলে, তিরির দানই প'ড়েছে বটে! আশ্চর্য্য! গঙ্গাধর নস্কর হাত বাড়িয়ে অনাদিবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—আপনি বাবু বড় ওস্তাদ! মাপ করুন আপনার সঙ্গে খেলার জন্যে। আপনার পায়ের ধুলোর যুগ্যি নই। আপনি ওস্তাদ, আমি শাগরেদ। চরণে রাখুন বাবু!

অনাদিবাবু মৃদু হেসে পকেট থেকে আগের জেতা সেই বার শ টাকা বের করে দিয়ে বললেন—এই নাও, নিয়ে যাও তোমার টাকা।

সে কি! পাঁচ হাজার টাকা গেল। আবার সাবেক বার শ' টাকাও ফেরত কি রকম? ট্যারা হাজারী সকলের আগে বলে উঠল—বাবু, অমন করে ওকে 'নাই' দিলে আমরা যাব কোথায়? ও বেটা এ ক'দিন অনেকের সর্ব্বোস্বান্ত করেছে—

গঙ্গাধর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—আরে সব্বস্বান্ত করবে কি করে? খেলেন তো সব এক পয়সা দু পয়সা, বড়জোর দু আনা চার আনা—

ট্যারা হাজারী বললে—তা যাই খেলুক। তুমি সব ফতুর করেও নাও নি?

হরিচরণবাবু ধমক দিয়ে বললেন—চুপ।

অনাদিবাবু বললেন—যাও, আজই ফড়-গুটি তুলে এখান থেকে চলে যাও। চাষা ঠকিয়ে

আর তোমাকে এখানে আর করতে দেব না।

হরিচরণবাবু তামাক টানতে টানতে বললেন—বেশ, চলে যাও ক্ষতি নেই, কিন্তু আমাদের যাত্রার জন্তে দু শ' টাকা চাঁদা দিয়ে যাও। আরও দু রাত যাত্রা হবে এখানে।

ট্যারা হাজারী বলে উঠল—বহুৎ আচ্ছা, বাঃ!

হরিচরণবাবু ধমক দিয়ে বললেন—চুপ।…পরে গঙ্গাধরের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—দাও, দু শ' টাকা।

গঙ্গাধর টাকা গুনে দিয়ে বাবুদের পায়ের ধুলো নিয়ে ফড়-গুটি বগলে করে প্রস্থান করল।

হাট

গাঙের ধারে পটলের ক্ষেত।

বুড়ো কুড়োন মণ্ডল সবুজ উলুখড়ের বেড়াঘেরা ক্ষেতটিতে বসে পটল তুলে বাজরা বোঝাই করছিল। ক্ষেতের নিচেই হারান মাঝি দোয়াড়ি পাতছে গাঙের জলে। আজ বড় মেঘলা দিন, বৃষ্টি হবে না হবে না করে এমন বৃষ্টি নেমেছে যে, দু'দিনের মধ্যে থামল না। হারান বললে—ও কুড়োন, একটু তামাক খাওয়াবা?

—নাম ওখান থেকে। ইদিকি এস।

একটা বাবলা গাছের তলায় দুজনে তামাক খায় বসে। দুজনেই জলে ভিজছে, কিন্তু কেউ ওটা গ্রাহ্য করছে না। ভদ্দরলোক নয় যে ঘরের মধ্যে বসে থাকবে। জলে না ভিজলে ক্ষেতখামারের কাজ বা মাছধরার কাজ হবে কোথা থেকে। আর এতে ওদের শরীরও খারাপ হবে না ওরা জানে। রোদে জলে শরীর পেকে গিয়েছে। ভদ্দরলোক হলে এমনধারা ভিজলে নিউমোনিয়া হত হয়তো।

হারান বললে—হাটে যাবা?

—যাই। দু-বাজরা মাল কাটাতি হবে তো।

—কোন্ হাটে যাবা? নতুন হাটে?

—তাই যাব। পুরনো হাটে কেউ বড় একটা আসছে না। মাল কাটে না।

—পটলের মণ?

—তা কি করে বলব। খদ্দেরে যা দেয়।—মাছ?

—ন'সিকি।

দুজনে খুব খুশী। এবার চড়া পটল আর চড়া মাছের দাম গিয়েছে দু-তিন মাস।

হাতে কিছু জমেছে দুজনেরই। অনিশ্চি কুড়োন মণ্ডলের অবস্থা হারান মাঝির চেয়ে সচ্ছল। চরের সাত বিঘে পটল বাদে প্রায় দশ বিঘে কলাবাগান আছে ওর। একখানা

ডিঙি বেয়ে হারান মাঝি আর ক'মণ মাছ ধরবে মাসে।

কুড়োন বাড়ী ফিরে খেয়ে নিলে, তার পর পটলের বাজরা মাথায় হাটের দিকে রওনা হল। এ হাটটা নতুন হয়েছে আজ মাস পাঁচ-ছয়। রসুলপুরের আবদুল খালেক মিঞা জমিদার গত পৌষ মাস থেকে এ হাট বসিয়েছেন। ঝিটকিপোতার পুরনো হাটে আজকাল লোক হয় না। নতুন হাটে খাজনা নেই, তোলা নেই, ভিখিরির উৎপাত নেই। কলকাতার পাইকিরী খদ্দের এখানে আসে বেশি, দামও দেয় বেশি।

হাটে গিয়ে কুড়োন বসে তার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে। পটল প্রথম ছিল দু আনা সের, কলকাতাওয়ালাঘাটের পাইকিরীখদ্দের যেমন আসতে শুরু করল,অমনি দাম চড়ল দশ পয়সা।

কুড়োন হাতের দাঁড়িপাল্লা নামিয়ে একবার তামাক সেজে কল্কেটা হাওয়ায় রেখে দিলে টিকে ধরাবার জন্যে। একটা খদ্দের এসে বললে—পটল কত?

কুড়োন গম্ভীর ও নিস্পৃহ সুরে বললে, বারো পয়সা।

—বারো পয়সা কি রকম! সব জায়গায় দশ পয়সা আর তোমার বারো পয়সা?

--তবে সেই সব জায়গায় নেও গে যাও।

—ভাল পটল?

—হাত দিয়ে দেখ আসল বোশেখী লতার পটল! তুলে দেখ না একটা? এর দাম বারো পয়সা।—কুড়োন মণ্ডল ঘুঘু ব্যবসাদার। খদ্দের কিসে ভোলে, কোন ধাপ্পায় তাকে কাবু করা যায়, এসব তার গত ছত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত জিনিস। নিজের জিনিসের দাম নিজেই চড়িয়ে দিতে হবে এবং জোর গলায় নিজের জিনিসের তারিফ করতে হবে—খদ্দের ভিজবেই, ভিজতে বাধ্য। খদ্দের তখন বারো পয়সার পটলকে কল্পনা-নয়নে অনেক উঁচু বলে ভাবতে শুরু করবে? ব্যবসার এ অতি গুহ্যতত্ত্ব, কুড়োন মণ্ডল সারাজীবন ধরে সাধনা করে এ তত্ত্বে সিদ্ধিলাভ করেছে। দেখতে দেখতে খদ্দেরের ভিড় লেগে গেল তার সামনে। দশ পয়সা সেরের পটল কেউ কেনে না। কুড়োন মণ্ডল মনে মনে হেসে চড়া গলায় বলতে লাগল—এই চলে এস খদ্দের, বারো পয়সা, সরাটির চড়ার সেরা পটল, বারো পয়সা—চলে এস—

কুড়ি মিনিটের মধ্যে আধমণ পটল উঠে গেল ঐ দরে। সিকি ও আনি প্রচুর জমল বগলিতে। কুড়োন আবদুল শোভান ফকিরের কাছ থেকে এক ছড়া পাকা মর্ত্তমান কলা কিনে নিজের বাজরায় রেখে বললে—ক'টা পয়সা দেব, ও ফকির?

—দ্যাও যা দেবা। তিন আনা দ্যাও।

—বারোটা কলার দাম তিন আনা! এক একটা কলা এক একটা পয়সা?

আবদুল ফকিরও ঘুণ ব্যবসাদার। নিজের বাড়ীর উঠোনে সব রকম তরিতরকারি উৎপন্ন করে এবং তাই হাটে বেচে দু-পয়সা রোজগার করে।

ওর সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে এ অঞ্চলে। কে একজন দুটি পাতিলেবু চাইতে গিয়েছিল আবদুল শোভানের বাড়ী।

—ও ফকির, লেবু আছে তোমার বাড়ী ?

পাছে বিনি পয়সায় দিতে হয়, তখনই ওর মুখ বন্ধ করবার জন্যে আবদুল ফকির বললে—পয়সা দিলিই পাওয়া যায়।...সে-ই আবদুল ফকির। সে অমায়িকভাবে হেসে বললে—যুদ্ধের বাজারে কোন্ জিনিসটা সস্তা ছাখছো, ও কুড়োন ? তুমি পটল বেচলে কি দর ?

না, ফকিরের সঙ্গে পারা গেল না। অবশেষে দশটা পয়সা দাম দিতেই হল।

বেলা পাঁচটার মধ্যে পটলের বাজার কাবার। বিক্রিও বটে। কুড়োন তাদের গাঁয়ের হরিপদ মাইতিকে ডেকে বললে—কখানা বাজরা বেচলে ?

—দু খানা।

—বেশ বিক্রি, কি বল ভাইপো ?

—যুদ্ধের সময় লোকের হাতে পয়সা কত আজকাল।

—তা সত্যি।

—এমন কখনও দেখেছিলে খুড়ো ? তোমার বয়েস তো চার কুড়ির কাছে ঠেকল। তুমি যখন হাট করতে আরম্ভ করেছ তখন আমরা জন্মাই নি।

—তা সত্যি।

হরিপদ মিথ্যে বলে নি। কুড়োন ভেবে দেখে সত্যিই হরিপদ যখন জন্মায় নি, তখন থেকে সে হাটে পটল বেচে। কিন্তু সে এ-হাটে নয়, ঝিটকিপোতার পুরনো হাটে। এ হাট তো মোটে গত পৌষ মাস থেকে হয়েছে।

কুড়োন আজ চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর ধরে ঝিটকিপোতার হাট করছে। কতদিনের কত স্মৃতি ঝিটকিপোতার হাটের সঙ্গে জড়ানো। এ নতুন হাটে এসে কোন আনন্দ হয় না। এখানে এসে পয়সা হয় বটে, কিন্তু সব ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। মন খুশী হয়ে ওঠে না। মনের যোগাযোগ কিছু নেই এ হাটের সঙ্গে।

কথাটা তার রোজই মনে হয়।

ঝিটকিপোতার হাট তার কত কালের পরিচিত। এখানে বসে সে এতক্ষণ ভাবছিল ঝিটকিপোতার হাটের সেই অশ্বথ গাছের তলা, যেখানটিতে বিয়াল্লিশ বছর ধরে ফি হাটে বসে সে পটল বিক্রি করে এসেছে। কত পুরনো লোক ছিল, তাদের কথা মনে পড়ে। তার আগে ঐখানটিতে বসত লক্ষ্মণ সর্দার, ভীম সর্দারের বাপ। লক্ষ্মণ সর্দার বেগুন বিক্রি করত, তার বাপের বয়সী বুড়ো, তাকে হাতে ধরে বেচা-কেনা শিখিয়েছিল—রোজ নিজের গাড়িতে চড়িয়ে ওকে নিয়ে আসত হাটে। লক্ষ্মণ সর্দার মরবার পরে তার ছেলে ভীম ওকে বললে—বাবার জায়গাটিতে তুমি বসে বেচা-কেনা কর দাদা। আমি হাট করা ছেড়ে দিলাম। বেগুন পটল বিক্রি আমার পোষাবে না, আমি পাটের ব্যবসাতে নামব ভাবছি।

দু বছর পরে পাটের ব্যবসাতে ফেল মেরে ভীম সর্দার আবার যখন হাটে ফিরে এল বেগুন-পটল বেচতে, তখন অশ্বত্থতলার কুড়োনের আসন পাকা হয়ে গিয়েছে।

সে সব আজ কত বছরের কথা!

নতুন হাটে বসে পুরনো হাটের সেই অশ্বত্থতলার কোণটি বড় মনে পড়ে। ওই জায়গাটি ছিল ওর লক্ষ্মী, ওখানেই বেচাকেনার কাজে হাতেখড়ি; জীবনের উন্নতির সূচনা। আজ যুদ্ধের বাজারে পটলের দাম বড় চড়া। এত চড়া দামে কখনও পটল বিক্রি হয় নি তার জীবনে, এত পয়সাও কোনদিন হাতে আসে নি। তবুও ভাল লাগে না। পয়সাতেই কি জীবনের সুখ হয় শুধু? আজ কোথায় গেল সেই ভূষণদা, কোথায় গেল কেষ্ট ময়রার বাবা হরি ময়রা, কোথায় গেল হাটের সাবেক ইজারাদার পাঁচু নিকিরি।

পাঁচকড়ি নিকিরি কখনও হাটের খাজনা আদায় করে নি ওর কাছে। বলত, তোমার কাছে চার পয়সা খাজনা নিয়ে কি করব কুড়োন, একসের করে পটল দিও তার বদলে, আর দুটো বেগুনের চারা। এবার বর্ষায় আধবিঘেটাক বেগুন লাগাব ভাবছি। মুক্তকেশী বেগুন আছে?

—আছে। বীজ দেব এখন। নি-কাঁটা বেগুন। এক একটাতে এক এক সের।

—বল কি!

—হয় না হয় চোক্ষি দেখো। নিজের চোকি দেখলি তো অবিশ্বাস যাবা না?

বেলা গেল। ওদের গাঁয়ের লোকেরা গাড়ী করে বেগুন পটল এনেছিল, খালি গাড়ীতে ওরা সবাই একসঙ্গে বসে বাড়ী ফেরে।

হাঁটতে হয় না এতটা রাস্তা। ওকে ডাকতে এল হরিপদ মাইতি। বললে—খুড়ো, বাড়ী যাবা না? চল, গাড়ী যাচ্ছে। কই দ্যাও তোমার বাজরা তুলে দিই গাড়ীতি।

—যাব। তুমি বাজরা তুলে দ্যাও, আমি মেছোহাটা পানে যাই।

—কনে যাবা? আজ মাছ কিনতি পারবা না। আড়াই টাকা কাটা পোনা।

—ও, আর আমাদের পটলের বেলা বুঝি সবাই সস্তা খোঁজে? আসছে হাটে চার আনার কমে কেউ বেচতি পারবা না, সবাইকে বলে দিচ্ছি।

গরুর গাড়ীতে ওদের গ্রামের আটজন উঠল। গল্প করতে করতে যাচ্ছে সবাই। পান-বিড়ি এ ওকে দিচ্ছে। কুড়োন মণ্ডলের সমবয়সী কেউ নেই গাড়ীতে, তবে নিতাই ঘোষ আছে; সে যদিও তার দশ বছরের ছোট—বর্ত্তমানে দুজনেই সমান বৃদ্ধ। কুড়োন নিতাইকে বললে—কিন্তু যতই বল, ঝিটকিপোতার হাটে গিয়ে যে মজা ছিল, এখানে তা নেই।

নিতাই বললে—যা বললে দাদা! সেখানে অন্তত ত্রিশ বছর হাট করিছি।

—তুমি ত্রিশ বছর আর আমি চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর সেখানে হাট করিছি—সেখানে মন বড্ড টানে।

—মনে পড়ে সেবার বন্যের সময় ভূষণ-দার দোকানে চড়ুই-ভাতি করেলাম?

—ওঃ সে সব কি আজকের কথা! ভূষণ-দা মারা গিয়েছে আজ অন্তত দশ বছর। সে অন্তত বিশ বছর আগের কথা।

—কি দিয়ে খেয়েছিলে বল তো? আমার আজও মনে আছে—খিচুড়ি, কুমড়ো ভাজা, পটল ভাজা। পোস্ত দিয়ে বড়া ভাজা—

—আমারও মনে আছে। আর হয়েছিল বেগুনের টক।

গাড়ীর অন্ত সবাই ছোকরা বয়সের। দুই বুড়োর কথাবার্তা শুনে হেসেই তারা অস্থির। ওদের মধ্যে একটি হাস্যরত ছোকরাকে ধমক দিয়ে কুড়োন বললে—ওরে থাম ছোঁড়া—হেসে যে মলি! তোরা তখন কোথায়? তোরা কি জানবি?

ছোকরা জিজ্ঞেস করলে—তখন পটলের দর কি ছিল দাদু?

—পয়সা পয়সা সের, কখনও বা পয়সার দু সের।

—দুয়ো—এমন পয়সার জুত ছিল না তখন বল?

—ওরে বাপু, হাসিস নে, হাসিস নে। তখন একখানা বাজরা পটল বেচে এক টাকা পাঁচ সিকে হত—আর এখন হয় ষোল টাকা সতের টাকা। কিন্তু তখনই সুখ ছিল। এখন এক বাজরা পটল বেচে একখানা কাপড় হয় না।

—ওগো, মেঘ করে আসছে। শীগগির হাঁকিয়ে চল—পদ্মবিলের ওপারে দেখ-না মেঘ!

একজন বললে—বুঝলে দাদু, সেবার এই পদ্মবিলের ধারে জ্যাছনা রাতে আমার জেঠা বড় মাছ পেয়েছিল ডাঙায়।

সকলে বললে—দূর!

বৃদ্ধ নিতাই বললে—দূর না, অমন হয়। আমি একবার এত বড় সরম পুঁটি পেয়েছিলাম গাঙের ধারের শর-ঝোপে। জল থেকে লাফিয়ে উঠে শরের ঝোপে আটকি ছটফট করছিল। খপ করে গিয়ে ধরেলাম অমনি। এক সের পাঁচ পোয়া ওজন ছিল।

পুকুরে ডোবায় ব্যাঙ ডাকছে শুনে দু-একজন বললে—আজ রাত্তিরি ভয়া হবে—ওই শোন ব্যাঙের ডাক!

হরিপদ মাইতি বললে—চোক দিও না, চোক দিও না। আমন ধান হবে না জল না হলি। জল হক, জল হক। ধানের জাওলা খড় হয়ে গেল বৃষ্টি আবানে। এ দুদিনে যা বৃষ্টি হচ্ছে, এ তো শুকনো মাটি টেনে নেবে। বড় ভয়া হওয়ার দরকার। টিপ টিপ বৃষ্টির কাজ নয়।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। বেশ অন্ধকার। বর্ষা-সন্ধ্যায় ঝোপ-ঝাড়ে জোনাক জলছে, ঘেঁটকোল ফুলের কটুগন্ধ সজল বাতাসে।

ওরা গ্রামে পৌছে যে যার বাড়ী চলে গেল।

অরণ্যকাব্য

আমরা মাঠাবুরু বাংলোতে কয়েকদিন হল গিয়েছি। বাংলোর পেছনে দু শ' হাতের মধ্যে দীর্ঘ মাঠাবুরু শৈলমালা। মনে আচ্ছন্ন উপত্যকার সমতলে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে বনবিভাগের বাংলো। সেই ফাঁকা জায়গাটাতে বনবিভাগের লোকদের যত্নে কুলু-আপেল, নাশপাতি, বোম্বাই আম, কাশ্মীর পেয়ারা প্রভৃতির গাছ লাগানো হয়েছে—এখন চারাগাছ, চেরা শালকাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা, অদূরবর্ত্তী মাঠা গ্রামের গরু ছাগল প্রভৃতির উপদ্রব থেকে রক্ষা করবার জন্যে। গ্রামের লোকসংখ্যা পঞ্চাশ-ষাট ঘরের বেশি নয়, সবাই দরিদ্র, সবারই রাঙা মাটির দেওয়াল দেওয়া খোলার ঘর, কেবল একঘর গৃহস্থের বাড়ী পাথরের দেওয়াল। তারাই নাকি গ্রামের জমিদার, 'বাবু' খেতাব ধারী। বাড়ীর ছেলেদের উপাধি 'বাবু। ওদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, তার নাম দর্পনারায়ণ বাবু, সে বনবিভাগের আরদালি, কুড়ি টাকা মাসিক বেতন। গবর্ণমেণ্টের দেওয়া কুড়ুল ঘাড়ে দর্পনারায়ণ বাবু বনবিভাগের রেন্‌জারের পেছনে পেছনে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। গ্রামের লোকের উপজীবিকা বনজঙ্গল থেকে কাঠ চুরি করে বাঘমুণ্ডির হাটে বিক্রি করা; পাহাড়ের ওপর থেকে বেল, কেঁদ, পিয়াল, বুনো আলু, মিষ্টি ডুমুর, করঞ্জা প্রভৃতি বন্যফল সংগ্রহ করে আনা এবং বন্য জন্তু শিকার। আগে এ কাজে কোনও বাধা ছিল না, এখন বনবিভাগের কর্ম্মচারীদের কড়াকড়িতে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

আমরা বাংলোর সামনের মাঠে বেতের বড় বড় ঈজি-চেয়ারে শুয়ে গল্পগুজব করছিলাম। মিঃ মিশ্র ফরেস্ট অফিসার টুরে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে এসেছেন বাবু রতনলাল খাস্তগীর, পি. ডবলিউ. ডি-র ইনজিনিয়ার, বিলেতফেরত ও কেতাদুরস্ত লোক। আর আছেন বাঘমুণ্ডি সার্কেলের ভারপ্রাপ্ত ইনজিনিয়ার মিঃ সরকার, ইনি নতুন চাকরি পেয়ে কাজে যোগ দিতে যাচ্ছেন ন মাইল দূরবর্ত্তী বাঘমুণ্ডি নামক বনবেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামে; কয়েক মাস হল বর্ম্মা থেকে অতিকষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন, জাপ-অভিযানের তোড়ের মুখে।

মিঃ সরকার চা খেতে খেতে বলছিলেন তাঁর বর্ম্মা থেকে প্রত্যাগমনের রোমাঞ্চকর কাহিনী। পাঁচ টাকা সের চাল কিনে সঙ্গের নটি প্রাণী কোন রকমে প্রাণ ধারণ করে এসেছিলেন এক এক থাবা ভাত খেয়ে। রাত্রে বন্য অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব তাঁবুতে। পথে কলেরায় একটি দুটি করে ছটি কাবার নটির মধ্যে।

ফাল্গুনের শেষ। বাংলোর পেছনে মাঠাবুরু পাহাড়ে করঞ্জা ফুল ফুটেছে—তার সুগন্ধ ঠিক জুঁই ফুলের মত তীব্র। বাতাস মাতিয়েছে করঞ্জা ফুলের ঘন বাসে। রহস্যময় পর্ব্বতারণ্যে বন্যকুক্কুটের ডাক এই খানিক আগেও শোনা যাচ্ছিল। আবার গভীর রাত্রে সেদিন শুনেছি অদ্ভুত কি এক জন্তুর আওয়াজ—কেউ বললে বাঘ, কেউ বললে সম্বর হরিণ।

মিঃ সরকার বললেন—এ জায়গাটা বড় চমৎকার, সত্যি—বেশ অদ্ভুত ধরনের সিনারি।

আমি বললাম—স্বপ্নলোকে বাস করছি ক'দিন। আবার কলকাতা গিয়ে আপিস করতে হবে—সেই ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি।

মিঃ মিশ্র বললেন—কাল আপনাকে মাঠাবুরু পাহাড়ের ওপরকার বনে নিয়ে যাব। কত রকম ফুল ফুটেছে দেখবেন এই সময়।

মিঃ সরকার বললেন—আমিও যাব।

আমি বললাম—আপনি কাল কাজে জয়েন করবেন না?

—না। আমার জিনিসপত্তর এখনও বলরামপুর থেকে আসে নি।

—কিন্তু এর পরে আপনি বাঘমুণ্ডি যাওয়ার মোটর পাবেন না। মিঃ মিশ্র তো কাল চলেছেন।

মিঃ মিশ্র বললেন—হাঁা, কথাটা খানিকটা ঠিক। তবে আমি কাল কখন যাব বলতে পারি নে। ছাট ডিপেণ্ডস্—পুরুলিয়া থেকে যদি তার আসে তবে।

—নয়তো?

—নয়তো পরশু সকাল।

হঠাৎ মিঃ সরকার উৎকর্ণ হয়ে বললেন—ও কি ডাকছে বনে? ভীষণ আওয়াজ।

—আমি হেসে বললাম—তাই তো। কি বলুন তো?

—আমি কিছুই বুঝছি না। কি ওটা?

—মিঃ মিশ্র বললেন—প্রাগৈতিহাসিক ব্রণ্টোসরাস নয়—নথিং মোর ছান এ বার্কিং ডিয়ার।

মিঃ সরকার বিস্মিত হয়ে বললেন—বার্কিং ডিয়ার! অমন শব্দ! ও যে পাহাড় বন ফাটিয়ে দিচ্ছে আওয়াজে।

আমি হেসে বললাম—ও আপদ ওই রকম করে।

মিঃ মিশ্র চাকরকে ডেকে আরও কয়েক পেয়ালা গরম চা আনতে বললেন। বেশ লাগছিল এই চমৎকার রাত্রিটি, যদিও দিনে বেশ গরম, শুকনো শালপাতার গন্ধ মেশানো ও করঞ্জা পুষ্পের সুবাসে ভরা নৈশ বাতাস বাংলা দেশের অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রির মত ঠাণ্ডা। আমরা কেউ কম্বল, কেউ আলোয়ান গায়ে দিয়ে বসেছিলাম।

আমি বললাম—বর্মা থেকে ফেরবার পথে পাহাড়-জঙ্গলের দৃশ্য কেমন দেখলেন মিঃ সরকার?

—ওঃ, ছিন্দউইন নদী পার হয়ে মণিপুরের পথে যে অপূর্ব্ব পাহাড়বনের দৃশ্য, তেমন দৃশ্য হঠাৎ চোখে পড়ে না। অনেক বড় বড় সাহেবের মুখেও আমি একথা শুনেছি। যারা অনেক বেড়িয়েছে, অনেক জায়গায় গিয়েছে, তারাও বলেছে। ভগবানের তৈরি দুনিয়ার একটা ভাল জিনিস যদি কেউ দেখতে চায়, তবে যে ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক, যার বুকে সাহস ও উৎসাহ আছে, সে যেন মণিপুর বর্মা রোড ধরে ছিন্দউইন নদী পর্য্যন্ত যায়। চোখ সার্থক হবে। যদি পয়সা খরচ করে, পয়সাও সার্থক হবে।

ভৃত্য সবাইকে গরম চায়ের পেয়ালা দিয়ে গেল। আমাদের পরামর্শ হচ্ছিল আগামী কাল যদি পুরুলিয়া থেকে মিঃ মিশ্রের তার না আসে তবে বিকেলে মিঃ সরকারকে নিয়ে নাকটিটাঁড়ের ফরেস্টে সবাই মিলে টি-পিকনিকে যাওয়া যাবে।

মিঃ মিশ্র বললেন—বাঘমুণ্ডিতে বড্ড কষ্ট হবে আপনার মিঃ সরকার। ছোট্ট গ্রাম, একটি বাঙালী নেই। থাকবার ঘর পাবেন না। ডাকবাংলা আছে বটে কিন্তু তাতে কদিন থাকবেন ? রান্না করবে কে, নানা অসুবিধে। সভ্যতার মুখ দেখতে পাবেন না। পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে বাস।

মিঃ খাস্তগীর বললেন—থাকবার যতদিন ঘর জোগাড় না হয়, ততদিন উনি ডাক-বাংলাতেই থাকবেন। সে ঠিক করে রেখেছি। ভদ্রলোকের ছেলে, যাবেন কোথায়। গাছতলায় তো উঠতে পারেন না।

মিঃ খাস্তগীর মিঃ সরকারের ওপরওয়ালা অফিসার। মিঃ সরকার কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে ওঁর দিকে চেয়ে বললেন—সে আপনার দয়া। যাতে ফ্যামিলি আনতে পারি, এ ব্যবস্থাটা করে দেবেন। নয়তো বড় কষ্ট হবে।

মিঃ মিশ্র বিস্ময়ের সুরে বললেন—ফ্যামিলি ? না মশায়, আমি আপনাকে সে পরামর্শ দিই নে।

—কেন ?

—না। এ সব বে-খাপ্পা জায়গায় কেউ ফ্যামিলি আনে।

—আনছি আর কি সাধে। নিতান্ত পেটের দায়ে।

—যাই হক। আমার পরামর্শ অন্য রকম।

—এই, কৌন্ হ্যায় ?

দেখা গেল একটা বাইরের লোক রাস্তার ওপর থেকে চলে এসে বাংলার হাতায় ঢুকল। মিঃ মিশ্রের প্রশ্নের উত্তরে সে আরও কাছে এসে এক লম্বা সেলাম দিলে সবাইকে। তার পর এগিয়ে এসে মিঃ মিশ্রের হাতে একখানা চিঠি দিলে। মিঃ মিশ্র চিঠিখানা দেখে বললেন—এ তো বাংলা চিঠি দেখছি। আমি তো পড়তে পারব না—এই নিন পড়ুন—কে লিখল চিঠি—আমার হাতেই চিঠিখানা দিলেন। আমি খুলে দেখলাম বাঁকা মেয়েলি হাতে লেখা কটি মাত্র ছত্রে লেখা চিঠি। তাতে লেখা আছে—"আমার স্বামী উপানন্দ মণ্ডল মৃত্যুশয্যায়। কয়দিন হইতে জ্বর আর ছাড়িল না। জ্ঞান নাই, একা আমি যে কি করিব, বুঝিতে পারি না। আমার হাতে টাকা পয়সা নাই। একজন লোক নাই যে আমার কথা বুঝিতে পারে। এই চিঠি দিলাম, বাঙালী বাবু হইলে চিঠি পাইয়া দয়া করিয়া আসিয়া আমার স্বামীকে বাঁচান। ইতি দুঃখিনী—উপানন্দ মণ্ডলের স্ত্রী।

আমি উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই।

মিঃ খাস্তগীর বললেন—কি হল ? কোথাকার চিঠি। ব্যাপার কি ?

আমি চিঠি পড়ে সকলকে শোনালাম। মিঃ মিশ্র জিজ্ঞেস করলেন—কোথাকার চিঠি ?

কোন্ জায়গা থেকে আসছে ?

বাকি সকলেই হতবুদ্ধি।

হঠাৎ মনে পড়ল পত্রবাহক তো এখানে সশরীরে উপস্থিত। তাকে জিজ্ঞেস করা গেল কথাটা। সে বললে—বাঘমুণ্ডিসে।

আমি বললাম—এ বাবু কে ?

—কনট্রাকৃটরকা কিরানী।

—কোন্ কনট্রাকটার ?

—ফরেস্ট ইজারদার। উ কনট্রাকৃটর হুঁয়াপর নেহি রহতা হ্যায়। কিরানী বাবু উনকো কাম দেখতা থা। আজ সাত রোজসে বাবু বিমার পড়া—আউর—

মিঃ মিশ্র বললেন—বুঝতে পেরেছি, লোচনলাল কনট্রাকৃটারের বুঝনদার। সবাই ঘাসের আঁটি ওজন করে, প্রেসে আঁটি বাঁধায়। সামান্য বিশ-ত্রিশ টাকা মাইনে পায়। ওখানে বাঙালী তো আর কেউ নেই।

মিঃ খাস্তগীর বলে উঠলেন—চলুন সবাই। একটি বাঙালী পরিবার বিপন্ন। এই বিদেশে বিভুঁই এ। লেট আস—। মিনিট কুড়ির মধ্যে সকলে তৈরি হয়ে মিঃ মিশ্রের মোটরে এসে উঠলাম, সঙ্গে সেই পত্রবাহক। রাস্তার মাঝে মাঝে বনজঙ্গল বেশ ঘন স্থানে স্থানে—ডানদিকে দীর্ঘ মাঠাবুরু শৈলমালা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। বনে বনে করঞ্জা ফুলের সুবাস। উঁচুনীচু পথে শোভা নদী (কি চমৎকার নামটি) পার হয়ে (এখন জল নেই) রাত সাড়ে আটটার মধ্যে বাঘমুণ্ডি পৌছে গেলাম। পত্রবাহক নিয়ে গিয়ে তুলল এক খোলার বাড়ীতে। বাড়ীর সামনে একটা খুব বড় কুসুম গাছ। বাড়ীর মধ্যে থেকে কান্নার শব্দ শুনে আমরা মোটর থেকে না পারি নামতে, না পারি হাত-পা কোলে করে বসে থাকতে। মিঃ মিশ্র হাঁক দিয়ে বললেন—কে আছেন বাড়ীতে ? মোটরের হর্ন-ও বাজানো হল।

দু-তিনটে ওদেশী লোক কোথা থেকে জুটল এসে মোটরের কাছে।

মিঃ মিশ্র তাদের বললেন—এখানে এক বাঙালী বাবুর অসুখ ?

ওরা সাহেবী পোশাক পরা সব লোক দেখে থতমত খেয়ে গিয়েছিল। সেলাম দিয়ে সংক্ষেপে বললে—ও বাবু মর্ গিয়া।

আমরা সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম—সে কি ! কখন ?

—বেলা তিন বাজে।

—সৎকার হয়েছে ?

—নেহি বাবু।

—লাশ কোথায় ?

—বাড়ীমে আভিতক্ হ্যায়। ক্যা করে বাবুজি, হাম লোক তো মুসলমীন হ্যায়, বাঙালী হিন্দুকে লাশ কৌন্ লে যায়গা—

পত্রবাহকটির কথা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। সে বাড়ীর ভেতর থেকে এসে আমাদের বললে—মাঈজী ডাকছেন আপনীদের।

বাড়ীর মধ্যে গিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তা বড়ই করুণ। খোলার ছোট বাড়ীর মধ্যে দু-তিনখানা আলোকবিহীন ঘর। একটা ঘরের দাওয়ার দু-তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বসে কাঁদছে। ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে প্রথমটা ভাল দেখতে পাওয়া গেল না। তার পর দেখি দড়ির খাটিয়ায় কে যেন শুয়ে আছে, তার পাশে মেজের ওপর বসে একটি মেয়ে কাঁদছে। বিহারের পল্লীগ্রামের ঘর, ভাল আলো বাতাস আসবার ব্যবস্থা নেই এ সব ঘরগুলোতে। খোলার দোতলা করবে, অথচ উপযুক্ত পরিমাণে জানলা থাকবে না।

আমাদের দেখে মেয়েটি আরও চীৎকার করে কেঁদে উঠল।

ওই অসহায় সদ্যোবিধবার কান্না যেন আর্ত্তনাদের মত শোনাল। তার মধ্যে স্বামীর জন্যে শোক কতকটা নিশ্চয়ই আছে, তার চেয়েও বেশি আছে নিজের কি উপায় হবে তার জন্যে আতঙ্কবোধ। আমরা যে ক'জন উপস্থিত আছি, সেটা খুব ভাল করেই বুঝলাম. বাঙালী বিহারী সবাই।

মিঃ খাস্তগীর বললেন সান্ত্বনার সুরে—কাঁদবেন না মা। আমরা যখন এসেছি, তখন সব ব্যবস্থা হচ্ছে।

মিঃ মিশ্র ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে বললেন—ও, সো ভেরি স্যাড।

আমাদের আসতে দেখে দু-পাঁচটি লোক বাড়ীর মধ্যে ঢুকল। এতক্ষণ কেউ ছিল না। মিঃ মিশ্র তাদের ধমক দিয়ে বললেন—বাঘমুণ্ডি গ্রামে কি এমন একজন মেয়েমানুষ নেই যে এই বিপদের সময় এখানে এসে দাঁড়িয়ে একটু সান্ত্বনা দেয়? শুধু পয়সা করতেই এসেছে সব এখানে? মনুষ্যত্ব শেখে নি?

এখানে বেশির ভাগ লোক মুসলমান, আরা জেলা প্রভৃতি জায়গা থেকে এসেছে বস্তাপালা কেনাবেচা করবার জন্যে। ছোট্ট গ্রাম, তবে বস্তাপালার মস্ত বড় হাট বসে এখানে ফি সোমবারে। এ ব্যবসা উপলক্ষে অনেকগুলি বিদেশী লোক এখানে এসে বাস করছে, অনেকেই খোলার ঘরদোরও বানিয়েছে। নিজেরা থাকে, আবার ভাড়াও দেয়। হিন্দুও এদের মধ্যে আনেক।

সত্যই রাগ হয় বটে। এ লোকগুলো কি রে বাবা! কেউ নেই ওর আত্মীয়স্বজন এখানে, সাদ্যোবিধবা একটি মেয়ে স্বামীর মৃতদেহ আঁকড়ে পড়ে আছে বিদেশ বিভুঁইএ, এ অবস্থায় তাকে সান্ত্বনা দিতেও তো দু-চারটি স্থানীয় মেয়েছেলের আসা উচিত ছিল।

শুনলাম নাকি এসেছিল। একেবারে যে আসে নি তা নয়। কিন্তু এই ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়েছে বেলা তিনটের সময়, আর এখন রাত নটা। ছ ঘণ্টা ধরে কে বসে থাকবে এখানে, বাড়ীঘরের কাজকর্ম সকলেরই আছে না কি?

এ যুক্তি অকাট্য। কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। যদি দোষ দিতে হয় তবে মেয়েটির অদৃষ্টকে।

আমি বললাম—মা, কান্নাকাটি করে আর কি করবেন, যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন সৎকার করবার ব্যবস্থা করতে হবে সকলের আগে। একটু বাইরে আসুন। আমরা জিজ্ঞেস করি—

মেয়েটি বাইরে এসে দাঁড়াল। কপাল কুটেছে, ঢিবি হয়ে ফুলে আছে কপালটা। বয়স তেইশ-চব্বিশ কি বড়জোর পঁচিশের মধ্যে। আধময়লা শাড়ি পরনে, রাত্রিজাগরণে এবং দুশ্চিন্তায় মুখ শীর্ণ, তবুও কেমন মনে হয় মেয়েটি এক সময়ে নিতান্ত খারাপ ছিল না দেখতে; রং ময়লা নয়, বরং ফর্সাই। হাতে দুগাছা সরু রুলি, গাছকতক কাঁচের চুড়ি।

ওর চোখে-মুখে গভীর নিরাশা আঁকা রয়েছে। অবলম্বনহীন নিঃসম্বল জীবনের আতঙ্ক ওর মুখের প্রতি রেখায়।

মিঃ খাস্তগীর ও আমার প্রশ্নের উত্তরে ওদের ঘটনা যা জানা যায় তা এই যে, ওর স্বামী উপানন্দ মণ্ডল এখানে ফরেস্ট কনট্রাক্টারের কেরানী। লোচনলাল কনট্রাক্টার বড়লোক, তার বহু জায়গায় ও-রকম কত লোক মাইনে-করা আছে। সে নিজে থাকে ধানবাদে, এখান থেকে বহুদূর। তাও এক জায়গায় থাকে না। আজ আছে কলকাতায় কাল গেল খড়গপুর।

উপানন্দ মণ্ডলের বাড়ী পুরুলিয়ার কাছে কি গ্রামে—কিন্তু মেয়েটির বাপের বাড়ী নদীয়া জেলায়। আজ দশ বছর বিয়ে হয়েছিল—ওই তিনটি সন্তান তার ফল। বাপের বাড়ীর অবস্থা খারাপ। শ্বশুরবাড়ীতেও এক বৃদ্ধ জেঠশ্বশুর ছাড়া আর কেউ নেই। চাকরি না করলে যদি সংসার চলবেই তবে এতদূরে পাণ্ডববর্জ্জিত স্থানে পাহাড়জঙ্গলের দেশে কেউ আসে চাকরি করতে!

বললাম—বাপের বাড়ীতে কে আছে?

—সৎমা ও দুটি বৈমাত্র ভাই।

—বাবা বেঁচে?

—তাহলে কি আজ—বলেই মেয়েটি ডুকরে কেঁদে উঠল।

ওর এই কান্নার মধ্যে একটা অসহায় সুর ফুটে উঠল বেশি করে—সেটা ততটা আধ্যাত্মিক নয়, যতটা আধিভৌতিক। সংক্ষেপে সব বোঝা গেল। হাতে এমন পয়সা যার নেই যে কাল কি খাবে, তার আধ্যাত্মিক ক্রন্দনের সময় এটা নয়—তা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যত গভীর দাম্পত্য প্রেম থাকুক না কেন।

মিঃ খাস্তগীর আমাদের ইংরেজিতে বললেন—শেষকালে মৃতদেহ কি আমাদেরই বইতে হবে নাকি?

বললাম—গতিক দেখে তাই মনে হচ্ছে।

—এখন—এত রাত্রে?

—সকাল তিনটে থেকে সারা রাত্ত মড়া পড়ে থাকবে বাড়ীতে? সে হয় না।

আমাদের মোটর আসতে দেখে এবার অনেক লোক জড়ো হয়েছে বাড়ীর উঠোনে ও বাড়ীর সামনে।

তাদের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল পথে শোভা নদী পার হয়ে এসেছি ওরই ধারে শ্মশান। তবে বর্ণহিন্দু বলতে যা বোঝায় তা বাঘমুণ্ডি গ্রামে নেই—সুতরাং বর্ণহিন্দুর সৎকারপ্রথা এখানে যথাযথ ভাবে পালন করা হয় না, যেখানে যার খুশি সৎকার করে। এত রাত্রে সেই শোভা নদীর ধারে যেতে হবে! সে এখান থেকে তিন মাইলের কম নয়।

মিঃ মিশ্র বললেন—লাশ আমার মোটরে তুলুন। আমার আপত্তি নেই। চলুন নদীর ধারে। এ প্রস্তাবে আমার আপত্তি জানালাম। ওঁর আপত্তি না থাকতে পারে, কিন্তু হয়তো ওঁর স্ত্রীর আপত্তি থাকতে পারত। ওঁর এ উদারতার সুযোগ নেওয়া উচিত হবে না। ঝোঁকের মাথায় অনেকে অনেক কিছু বলে বইকি।

সে রাত্রে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে উঠত না কিন্তু ভুবনেশ্বর বাঁড়ুজ্যে বলে একটি মানভূমবাসী লোককে পাওয়া গেল হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে। তাকে স্থানীয় বন্য লোকের ভিড় থেকে চিনে নেওয়া অসম্ভব হত, যদি না ওদের মধ্যে কেউ বলে উঠত ওর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে—এ বেরাহ্মণ আছে—

—কে ব্রাহ্মণ আছে? কই?

একজন কালো ভূতের মত লোক সলজ্জভাবে ভিড়ের মধ্যে থেকে বার হয়ে এসে এক পাশে দাঁড়াল। অতি ময়লা আটহাতি মোটা কাপড, ধুলোমাটি লেগে রাঙা হয়ে গিয়েছে কাপড়খানা। রাস্তার কুলির কাজ করে কিনা কি জানি। অতি গরিব ব্যক্তি।

তাকে জিজ্ঞেস করা হল সৎকার কোথায় হয়। সে বললে, সেই নদীটার ধারে বালিএ—

অর্থাৎ শোভা নদীর ধারে বালির ওপর।

সে যেতে রাজী আছে। বিস্মিত হলাম যে সে কোন পয়সার দাবি করলে না। সৎকারান্তে পরদিন তাকে কিছু বকশিশ দিতে গেলেও সে প্রথমটা নিতে চায় নি। এটাও বুঝেছিলাম তার এই প্রত্যাখ্যান মৌখিক নয়, আন্তরিক। শোভা নদীর ধারে সে-ই চিতা সাজিয়েছিল, ঘন ঘন কাঠ জুগিয়েছিল—অবিশ্যি আমরা মৃতদেহ নিজেরা বহন করলেও কাঠ মোটরে নিয়ে গিয়েছিলাম। তবে বড্ড বকে, এই মাত্র ওর দোষ। কিন্তু অক্লান্তকর্মী, কাজে ফাঁকি দিতে জানে না, সারা রাত শোভা নদীর তীরবর্তী বনভূমি থেকে শুকনো শালের ডালাপালাও তাকে সেই রাত্রে সংগ্রহ করে আনতে হয়েছিল। কৃষ্ণা দ্বাদশীর ক্ষীণ চাঁদ যতটুকু ম্লান জ্যোৎস্না দান করলে শোভা নদীর বালির চরে, তাতেই শেষ রাত্রে আমরা আমাদের কাজ সমাধা করে ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোটরে উঠে আবার বাঘমুণ্ডি ফিরে এলাম।

মেয়েটির ঘরদোর ওরই মধ্যে বেশ সাজানো।

বিদেশে গেরস্তালি পাতিয়েছিল বেশ একটু সাজিয়েই। মেয়েটির হাতের কারিকুরি—নিজের হাতে বোনা উলের কুকুর, 'পতি পরম গুরু'-ইত্যাদি দেওয়ালে টাঙানো আছে কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো অবস্থায়। সরস্বতী, মা কালীর ছবি। একখানা ক্যালেণ্ডার, খানকতক

টাঙানো ধুতি একটা আলনায়। দুটো টিনের তোরঙ্গ একটা কাঠের বেঞ্চিতে বসানো ঘরের একদিকে। অ্যালুমিনিয়মের ছোট ডেকচি একটা। সাজা পানের ডিবে ঝকমক করছে। কষ্ট হল ভেবে এ গৃহস্থালি ভেঙে যাবে আজই। যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিল এ দুদিনের বাসা, তা আজ টলেছে। কত গৃহস্থালির এই একই দুঃখময় ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছি।

মেয়েটির নাম কি জানি নে। 'পতি পরম গুরু' বোনা ছবির তলায় লেখা আছে শৈলবালা দেবী, বোধ হয় ঐ নামই হবে ওর। শৈলবালা খুব কাঁদলে আমরা ফিরে এলে, এইবার আমাদের বকুনির ফলে জন-দুই স্ত্রীলোক দেখলাম ওর কাছে রাত্রে ছিল।

আমাদের পরামর্শ-সভা বসল। মিঃ মিত্র বললেন—এখন কি করা হবে বলুন।

আমি গিয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম—হাতে কি আছে আপনার?

জানা গেল গোটা দুই টাকা ছাড়া কিছু নেই। অসুখের জন্যে সব খরচ হয়ে গিয়েছে। তার ওপর স্থানীয় মুদীর দোকানে আঠার উনিশ টাকা দেনা। দু মাসের বাড়ীভাড়া বাকি, বাড়ীওয়ালা হরদম তাগাদা দিচ্ছে।

আমি বললাম—আপনার বাপের বাড়ীতে খবর দেব? এখন কান্নার সময় না, ভেবে বলুন।

—সেখানে কোথায় যাব। সৎমা ও দুই বৈমাত্র ভাই, তারা আমাকে স্থান দেবে না।

—শ্বশুরবাড়ীতে খবর দিন তবে।

—এক বুড়ো জেঠশ্বশুর আছেন, তিনি একা থাকেন। রান্নাবান্না করেন, খান।

—কৃপণ?

—তা নয়। গরিব। দুই ছেলে ও দুই নাতি মারা গিয়েছে। কেউ নেই।

—চলে কিসে?

—কোন রকমে চলে। সামান্য দুটো ধান হয় জমিতে। লোকের চিঠিপত্র আর দলিল লিখে কিছু পা'ন, সেও আজকাল আর চোখে দেখেন না। তিনি কি জায়গা দেবেন? তিনি তো আমার শ্বশুরের সঙ্গে এক সংসারে ছিলেন না। তিনি পৃথক হয়েছিলেন অনেকদিন আগে, আমার বিয়েরও আগে।

—আপনার স্বামীর বাড়ীঘর নিশ্চয়ই আছে?

—খোলার বাড়ী ছিল, মাটির দেয়াল। এতদিন আমরা বিদেশে, বাড়ীঘরের অবস্থা কি রকম আছে কি জানি।

সব তথ্য সংগ্রহ করে এসে আবার পরামর্শ করতে বসি আমরা। এখানে রাখলে দেখাশুনো করবে কে? তা ছাড়া, জায়গা ভাল না। হাটবাজার করে এনে দেবে, এমন লোক নেই। উঁকি মেরে কেউ দেখবে না। অনেক ভেবে জেঠশ্বশুরকেই টেলিগ্রাম করা গেল।

আমি বললাম—তাতে ফল কি হবে? তাঁর কি মাথাব্যথা পড়েছে, তিনি ছুটে আসবেন কোন্ দুঃখে?

মিঃ খাস্তগীর বললেন—তবে কি সৎমাকে খবর দেবেন?

—তাঁর দায় পড়েছে উত্তর দিতে।

—আপনি কি বলেন?

—আমার মাথায় কিছু আসছে না।

—চলুন, এখান থেকে মেয়েটিকে আমরা ডাক-বাংলায় নিয়ে যাই। এখানে একদিনও রাখা চলবে না। জায়গা খারাপ।

বাড়ীওয়ালাকে ডেকে জানা গেল কুড়ি টাকা বাড়ীভাড়া বাকি, মুদীর দোকানেও টাকা কুড়ি—এই গেল চল্লিশ টাকা নগদ। তার পরে শ্বশুরবাড়ী পাঠানোর খরচ টাকা পনেরো—হাতে কিছু দেওয়া দরকার শ্রাদ্ধের খরচের জন্যে। এক শ টাকা।

মোটরে করে বিকেলে মেয়েটিকে ডাকবাংলাতে আনা গেল। জিনিসপত্র সামান্যই ছিল—গরুর গাড়ীতে ডাকবাংলায় পৌঁছবার ব্যবস্থা করে দেওয়া গেল। ওদিকের ঘরটি ওদের জন্যে ঠিক করে ওদের হবিষ্যের ব্যবস্থার জন্যে লোক পাঠানো গেল ভোজুডির বাজারে। গ্রাম থেকে একটি স্ত্রীলোক ঠিক করা গেল শৈলবালার কাছে দিনরাত থাকবে।

দুদিন, তিনদিন কেঁটে গেল। কা কস্য পরিবেদনা! না বাপের বাড়ী, না শ্বশুরবাড়ী—টেলিগ্রামের জবাব এল না কোথা থেকেও।

মিঃ খাস্তগীর বললেন—পুরুলিয়ার হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারি ললিতবাবুকে একবার খবর দেওয়া যাবে? এ যে বিষম দায়ে পড়া গেল।

মিঃ মিশ্র বললেন—আমাদের ডাকবাংলায় থাকবার মেয়াদও ফুরিয়ে এসেছে তো। আমরাই বা ওঁকে নিয়ে এখন কি করি?

আমি বললাম—অনাথ-আশ্রম আছে না একটা ওখানে? বা এই রকম কিছু?

মিঃ খাস্তগীর বললেন—খ্রীষ্টান মিশনারীদের। সে কথা বাদ দিন একেবারেই।

মহা ভাবনায় পড়া গেল। কারও মাথায় আসছে না কিছু। পরের মেয়ে নিয়ে এসে যে বিষম বিপদ দেখছি। শৈলবালা বেশ সেবাপরায়ণা, আমাদের জন্যে চা করে পাঠিয়ে দেয়, খাবার করে। ডাকবাংলার রান্নাঘরে গিয়ে নিজে রান্নার তদারক করে। আর সব সময়ে যেন কাঁদে। ওর ওপর নিষ্ঠুর হওয়া যায় না, একটা কিছু উপায় করতে হবে ওর। অথচ কি ভাবে, কেউ বুঝতে পারছি না।

আরও তিনদিন কেটে গেল। বিদেশে আমরা এমন কিছু বেশি টাকা নিয়ে বেরুই নি, এখন শৈলবালার কি করা যায়? আমরা ডাকবাংলা থেকে চলে গেলে ওর উপায় কি হবে, কোথায় রেখে যাব ওকে, দিই বা কোথায় পাঠিয়ে? এখানে বেশিদিন রাখাও যায় না, কে কি বলবে।

মাঝগ্রামের এক বৃদ্ধ বৈষ্ণবের পরামর্শে আমরা তার সঙ্গে শৈলবালাকে তার জেঠশ্বশুরের কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

হাতে সামান্ত কিছু টাকাও দিয়ে দিলাম ওর স্বামীর শ্রাদ্ধশান্তির জন্মে। এই ছ সাত দিন ও ডাকবাংলার ঘরটাতে একটা ছোটখাটো সংসার পেতে বসেছিল—যাবার সময় বড় কান্নাকাটি করতে লাগল।

তার যেন যাবার ইচ্ছে নেই।

সে কি সত্যিই ভেবেছিল চিরকালের আশ্রয় হবে ওর এই ডাকবাংলায়—পথিপার্শ্বের ডাকবাংলায়? যে আশ্রয় ওর স্বামীর ঘরে পেলে না?

শৈলবালা ওর পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে মোটরে উঠছে। মোটরে ওকে বলরামপুর পাঠানো হবে, সেখান থেকে ট্রেনে উঠবে।

সন্ধ্যাবেলা, পঞ্চমীর জ্যোৎস্না পড়েছে মাঠাবুরু শৈলশ্রেণীর শালবনে, করঞ্জাফুলের তেমনি মিষ্ট সুবাস বাতাসে—সেদিন নাকটিটাঁড়ের বনে, শোভা নদীর তীরের বন-ভূমিতে যেমন পেয়েছিলাম। মাদল বাজছে মাঝগ্রামের মহুয়া মদের ভাঁটিতে। কেমন জীবনের মধ্যে ও যাচ্ছে, কে ওকে আশ্রয় দেবে—এ সব কথা মনে না উঠে পারল না। চলে গেল ওদের মোটর।

পরদিন সকালে মিঃ সরকার এসে হাজির।

আমরা বললাম—কি মনে করে? হঠাৎ যে?

—না ওখানে আসব না। উপানন্দ মণ্ডলের ব্যাপারে বুঝলাম যে এখানে চাকরি পোষাবে না। ফ্যামিলি না নিয়ে থাকলে আমার চলবে না। আর আনলে তো অমন বিপদ সবারই হতে পারে। আজই রিজাইন দিয়ে দেব অমন জায়গার চাকরিতে।

মিঃ সরকার সেই দিনই পুরুলিয়ায় চলে গেলেন, তাঁকে বলে বুঝিয়ে কিছুতে রাখা গেল না।

প্রবন্ধাবলী

রবীন্দ্রনাথ

বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক লর্ড এ্যাক্টন একবার বলেছিলেন যে উনবিংশ শতাব্দীর মানুষের পক্ষে নবম বা দশম শতাব্দীর মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝা বড়ই কঠিন, কারণ রাষ্ট্রে, সমাজে, কার্য্যে, চিন্তায় ও ধর্ম্মে তারা ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মানুষ—বর্ত্তমান যুগের মানুষের সঙ্গে তাদের কোথাও কোনো মিল নেই। এই মূলসূত্রটি মনে রাখলে ইতিহাসের যে সকল অবিচার, নৃশংসতা ও অকারণ রক্তলোভের কাহিনী আজকাল আমাদের দুর্ব্বোধ্য বলে মনে হয়, তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে মনে হবে, কারণ সে যুগের মনোবৃত্তির সঙ্গে এদের কার্য্যকারণ-সম্পর্কটুকু আমরা আবিষ্কার করে ফেলবো।

লর্ড এ্যাক্টনের উক্তিটি ব্যাপকভাবে যদি গ্রহণ করি এবং এর অন্তর্নিহিত তত্ত্বটুকু বুঝতে চেষ্টা করি, তাহ'লে এই দাঁড়ায় যে শতাব্দীর পর শতাব্দী যতই পার হয়ে যাচ্ছে, মানুষ ততই দ্রুত এগিয়ে চলেচে—একযুগের গোঁড়ামী, ধর্ম্মান্ধতা, কুসংস্কার অন্যযুগের মানুষের পক্ষে পরম বিস্ময়ের বস্তু, এ যুগের মির‍্যাকল পরবর্ত্তী যুগের সুপরিচিত দৈনিক ঘটনা—সহস্র শতাব্দীর পারের কোন্ সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশে তার যাত্রা, এখন সে গৌরবময় বিবর্ত্তনের কাহিনী আমাদের কল্পনারও অতীত।

বিশ্বমানবের এই অগ্রগতির সাহায্যের জন্য মাঝে মাঝে এক একজন লোক আসেন, যাঁরা একাধারে মানুষের সকল দিকে সকল পরিণতির আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে সেই রকম একটি মানুষ। যে অসীমতার তৃষ্ণা মানুষের এই অগ্রগমনের সাথী ও পথ প্রদর্শক রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে দিয়ে তা আমাদের সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম একটি মৌলিক রূপ ধরে দেখা দিয়েচে। এমন এক সময় ছিল যখন আমাদের দেশের লেখকের উৎকর্ষতার পরিচয় দিতে হ'লে প্রতীচীর সেই শ্রেণীর লেখককে মাপকাঠি রূপে ব্যবহার করা হোত—এইটাই ছিল সাহিত্যে তাঁদের স্থাননির্ণয়ের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। তাই দেশবাসীরা বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলার সার ওয়াল্টার স্কট্, মধুসূদনকে বাংলার মিল্টন, কালীপ্রসন্ন ঘোষকে বাংলার এমার্সন নামে অভিহিত করে সাহিত্যে তাঁদের স্থান সুনিপুণভাবে নির্দ্দিষ্ট করা হয়ে গিয়েচে ভেবে পরম আনন্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন। আমাদের সাহিত্যের এই পরমুখাপেক্ষী দাসমনোবৃত্তি দূর করলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার অমিত তেজে—তাঁর স্থান এ ধরনে নির্দ্দেশ করতে কেউ সাহস করলে না—মানুষ সেখানে দিশাহারা হয়ে পড়ল, গতযুগের মাপকাঠির উপর আস্থা হারাল, তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল. তারা নিশ্চিন্ত মুরুব্বিয়ানার সুরে তাঁকে বংলার শেলী কি বাংলার মেটারলিঙ্ক্ বলতে পারলে না, রবীন্দ্রনাথ রয়ে গেলেন একটি unclassified phenomenon—অমুক শেল্‌ফের অমুক নম্বরের অমুক তাকে রবীন্দ্রনাথের স্থান নির্দ্দিষ্ট করা চলল না সহজে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন নানাভাবে। একটা কথাই এখানে বলি। আমার হাতের কাছে একখানা বাংলা উপন্যাস রয়েচে, নাম 'বিজয় বল্লভ',

১৮৮০ সালে সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। লেখক ভূমিকায় বলেচেন, "ইংলণ্ডীয় ভাষায় নবেল নামে মনোহর প্রসিদ্ধ উপাখ্যান গ্রন্থসকল যে প্রণালীতে সঙ্কলিত হইয়া থাকে, সেই সেই প্রণালী অনুসারে এই পুস্তকখানি রচিত, হইয়াছে" ইত্যাদি। উপাখ্যানভাগ অবশ্য কাদম্বরীর অনুকরণে রচিত, প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে পাই Decadent যুগের সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণে আড়ষ্ট ও মামুলী ধরনের বাঁধিগৎ। পূর্ণিমা থেকে কোকিলের কুহু পর্য্যন্ত তাতে সবই আছে, নেই কেবল প্রাণ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতি-বর্ণনাও সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবমুক্ত নয়, কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথেরই মধ্যে পাই প্রকৃতির বিপুলতা ও রহস্যকে। অনাড়ম্বর বাহুল্যবর্জ্জিত বলেই তা প্রাণবন্ত, অসাধারণ চাক্ষুষ্মান প্রতিভা সেখানে কেতাবী বর্ণনাপদ্ধতির মোহপাশ কাটিয়ে দিয়ে নিজের চোখ ও মনকে বড় বলে মেনেচে; সে দর্শনও যেমন নিখুঁত, তেমনি convincing—পদ্মাচরের বিপুল প্রসারের সঙ্গে, পুষ্পিত কাশবনের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মন সেখানে একদিকে যেমন এক হয়ে মিশে যায়, অন্যদিকে তেমনি নতুন শক্তির উৎসমুখের সন্ধান পেয়ে নতুন পথে দিগ্বিজয়ে বার হবার অদম্য স্ফূর্ত্তিকে লাভ করে।

জীবনের ও জগতের ব্যাপারে এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পাই সর্ব্বপ্রথম। আমাদের সাহিত্যের যে আদর্শ ছিল অত্যন্ত খর্ব্ব, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গত পঞ্চাশ বৎসরের সাধনায় তার স্ট্যাণ্ডার্ড এত উঁচু করে দিয়েছেন—সাধারণ গতিতে চলতে চলতে হয়তো দেড়শো বছরেও তা ঘট্‌ত কিনা সন্দেহ। তাঁর নব দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যেক জিনিসটি নতুন করে দেখেচে, বিশ্বমানবের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যোগসূত্রকে আবিষ্কার করেচে—দৃষ্টির সঙ্গেই নবসৃষ্টির সূচনা হয়েচে। এমন একটি জীবন্ত, সদাজাগ্রত মনের পরিচয় আমরা পাই, পদ্মাবুকের বজ্‌রার কামরায় যা নিদ্রিত হয়ে পড়ে নি—নির্জ্জন রাত্রে রহস্যময়ী প্রকৃতি কখন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন, কখন তাঁর সঙ্গে চোখোচোখি দেখা হবে—তারই আশায় বিনিদ্র রজনী যাপন করেচে।

রবীন্দ্রনাথের দানের তুলনা নেই, জীবনের এমন কোনো দিকও নেই, যেদিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েনি, যার সম্বন্ধে তিনি কিছু না-কিছু নতুন কথা না শুনিয়েছেন, তা শরৎকালীন দুপুর সম্বন্ধেই হোক, বা নাম উচ্চারণ করার পদ্ধতি নিয়েই হোক। এ যুগের বাংলার কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রবন্ধলেখক—তাঁর কাছে সবারই ঋণের বোঝা বিপুল, বর্ত্তমান চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেচেন তিনি, রূপ দিয়েচেন তিনি—বিশ্লেষণ করে দেখলে সকলেরই চিন্তার উপর রবীন্দ্রনাথের এই প্রভাব ধরা পড়বেই।

একটা ক্ষুদ্র প্রাদেশিক সাহিত্য থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যকে আজ বিশ্বের দরবারে সকলের আসনে বসিয়েচেন, এই বিপুল দানের, মানব প্রতিভার এই অনন্যসাধারণ বিকাশের তুলনা নেই বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে।

তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে আছে যে প্রগাঢ় অনুভূতি, তা সাধারণ মনের ব্যাপার নয়, চেতনা ও অনুভূতির সে স্তর সাধারণের দুরধিগম্য—তাই তাঁর কাছে আমরা যে লোকের

সন্ধান পাই, আমাদের দৈনন্দিন তুচ্ছ অনুভূতি পরম্পরার বহু উর্দ্ধে সে এক অপরূপ আনন্দলোক—তাঁকে পথপ্রদর্শক না পেলে সেটা আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাতই রয়ে যেতো চিরদিন। জাতীয় চেতনার এই অগ্রগতি রবীন্দ্র-সাহিত্যের নিকট অপরিসীম ঋণে ঋণী—গত শতাব্দীর অলঙ্কার ও অনুপ্রাস-বহুল বাংলা কাব্যের কথা বাদ দিলেও রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পূর্ব্বের কাব্যের সহিত তাঁর যে তফাত, তা বল্মীকস্তূপ ও হিমালয়ের তফাত। অনুভূতির এই অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যের কথা ভেবে শুধুই এই কথা মনে হয়—এক জীবনে এত বিপুল রসাস্বাদ কি করে সম্ভব হোল, তখুনি আবার তাঁরই কথায় তাঁকে বলতে ইচ্ছা করে—

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় এস
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো ধরায় এস।

রবি-প্রশস্তি

বাংলা সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত সাধনায় এ সাহিত্য যে নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, বিশ্বসাহিত্যে তাহার স্থান অতি উচ্চে। এ কথা আজ আমরা সগর্ব্বে ঘোষণা করিয়া ধন্য হইতেছি। সীমাসংখ্যাহীন অবদান পরম্পরায় রবীন্দ্রসাহিত্য মহনীয়। জগতের কোন একটি বিশেষ লেখক সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এমনি বহুমুখী যে অল্প পরিসরের মধ্যে সে বিরাট সাহিত্য প্রতিভার সম্যক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। কাব্যে সঙ্গীতে, নাটকে, উপন্যাসে, ছোটগল্পে, সমালোচনায়, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নিবন্ধে, পরিভাষা সঙ্কলনে—সাহিত্যের এমন কোন ক্ষেত্র নাই যাহা তাঁহার দানে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই। বাংলা সাহিত্যের বিরাট মানদণ্ড স্বরূপ যে রবীন্দ্র-সাহিত্য আজ আমাদের মুগ্ধ চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশমান, নগাধিরাজ হিমালয়ের মত তাহার উত্তুঙ্গ শিখরদেশ সাধারণ দৃষ্টির নাগালের বাহিরের জিনিস।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার মূল প্রেরণা সৌন্দর্য্য ও অনুভূতি। তাহার বাহ্য অলঙ্কার প্রকাশ হইয়াছে অপূর্ব্ব শব্দ-চয়ন, ছন্দধ্বনি ও অলঙ্কার প্রকাশের কৌশলের দ্বারা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকার্য্যগুলির মূল ভিত্তি হইতেছে সৌন্দর্য্যানুভূতি। Leonardo-র Gioconda অথবা বেঠোফোনের পরিকল্পিত Symphony-র যে-সৌন্দর্য্য, ইহাদের প্রথমটির মূলে আছে রেখা ও বর্ণের অপূর্ব্ব সমাবেশ ও দ্বিতীয়টির মূলে সুকৌশল ধ্বনি-সমন্বয়। তথাপি একথাও অনস্বীকার্য্য যে এই দুইটি শিল্প-কার্য্য আমাদের চিত্তে যে কল্পলোক রচনা করে তাহা নিশ্চয়ই কেবলমাত্র দৃশ্যমান বর্ণ-সমষ্টি বা শ্রুতধ্বনি সমষ্টি উদ্ভূত হইতে পারে না। বস্তুতঃ এই আনন্দলোক সৃষ্টির মূলে আছে, এই ধ্বনি ও বর্ণনাতীত কোন অদৃশ্য প্রভাব এবং একটি

ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি। আবার, যদিও এই বর্ণ ও ধ্বনির মাধ্যমেই সেই অতীন্দ্রিয় আত্মিক অনুভূতির বিকাশ সম্ভব হয়, ইহাও নিশ্চিত যে এই অনুভূতি বর্ণ ও ধ্বনির বহু উর্দ্ধে স্থাপিত এক মহত্তর সত্য। কবি রসবন্ধ বাক্য পাঠ করিয়া বা রচনা করিয়া যে আনন্দানুভূতির সন্ধান পান একজন খৃস্ট, বুদ্ধ অথবা চৈতন্য সদৃশ ব্যক্তি বিশুদ্ধ আত্মিক উপলব্ধির পথেই সে আনন্দের সন্ধান পাইতে পারেন। কিন্তু এ ক্ষমতা নিম্নতর কোন মানুষের আয়ত্ত হইবার কথা নয়। কাব্য-সাহিত্যের এই মূল সূত্রটি দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলে আমরা দেখিতে পাইব রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভগীরথের ন্যায় নবতীর্থ-জল আনিয়াছেন তাঁহার প্রতিভার গভীর শঙ্খধ্বনির সহযোগে। এই জাতির মর্ম্মস্থল তাঁহার চিন্তার আলোক-পাতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় প্রতিভার চারণ তিনি। দেশে যে-প্রতিভার সৃষ্টি আদর লাভ করিয়াছে, যে-ভারতীয় প্রতিভার সৃষ্টি উপনিষদ্ পাঠ করিয়া দার্শনিক সপেনহর বলিয়াছিলেন—উপনিষদ্ তাঁহার জীবনে সান্ত্বনার কারণ হইয়াছে, মৃত্যুতেও তাহাই হইবে, যে-ভারতীয় প্রতিভার সৃষ্টি শকুন্তলা পাঠ করিয়া কবিবর গ্যেটে বলিয়াছেন—যদি কেহ এক স্থানে শরতের বসন্তের সম্পদ—স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের মিলন প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে শকুন্তলা পাঠ করিলে তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ হইবে। রবীন্দ্রনাথ সেই ভারতীয় প্রতিভার মূর্ত্ত প্রতীক; নানা ভাবে নানারূপে ভারতীয় অনুভূতি ও ভাবরাশিকে তিনি প্রতীচ্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভার আলোকরশ্মি-সম্পাতে সাহিত্যের যে-শাখায় তিনি হাত দিয়াছেন, তাহাই সোনা হইয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ তাঁহার ছোট ছোট গল্পগুলির কথা বলিব। ছোট গল্প বলিয়া কোন জিনিস রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যে ছিল না। যাহা ছিল, তাঁহা ছোট গল্প নহে, কাহিনী। অথবা অসার্থক উপন্যাসের কয়েকটি অধ্যায়। কাহিনী এবং ছোট গল্পে প্রভেদ বিস্তর। ছোট গল্প একটি বিশেষ প্রকাশ ভঙ্গি "কথা"-র। আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে "কথা" ছিল। যেমন, কথাসরিৎ সাগর ও পঞ্চতন্ত্র। দণ্ডীর দশকুমার চরিত। গোঢ়লকৃত উদয়-সুন্দরী কথা ইত্যাদি। ছোট গল্প এই শ্রেণীর "কথা" নয়। ইহাতে একটি বিশেষ ধরনের আর্ট প্রকাশিত। অথবা যে কথা এইরূপ মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে তাহাই ছোট গল্প। যে কথায় এই মাধ্যম ব্যবহৃত হয় নাই তাহা ছোট গল্প নহে। কাহিনী মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী সাহিত্যে conte বলিয়া এক শ্রেণীর 'কথা' বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, মোপাসাঁ, ব্যালজাক, আলফাঁস দোদে প্রভৃতি ক্ষমতাশালী কথা লেখকের হাতে conte অপূর্ব্ব সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে এই conte ক্রমে ফরাসী দেশ হইতে ইউরোপের সর্ব্বস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এদিকে পতিত হইতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন উনবিংশ শতাব্দীর ইহা একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। ফরাসী conte বিভিন্ন দেশে গিয়া তাহার রূপ বদলাইয়া ফেলিল; বিভিন্ন লেখকের হাতে একটু আধটু অদল বদল হইতে লাগিল। তথাপি এই মাধ্যমের মূল কৌশলটি সকলেই যথাযথ ভাবে অভ্যাস করিলেন। এই মূল-কৌশলটি হইল ছোট গল্পের 'মুহূর্ত্ত' বা moment। এই মুহূর্ত্ত সৃষ্টিই

ছোট গল্পের আর্টের প্রাণ-বস্তু। যিনি ইহা যত যথাযথরূপে ও যত সুষ্ঠুভাবে খাটাইতে পারেন, ছোট গল্প লেখক হিসাবে তিনি তত সক্ষম, একথা অনস্বীকার্য্য।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যে conte আমদানি করিলেন, যাহার ফলস্বরূপ আমরা পাইলাম গল্প-গুচ্ছের অপূর্ব্ব গল্পগুলি। ১২৮৪ সালে ভারতী পত্রিকায় তাঁহার প্রথম ছোট গল্প 'ভিখারিণী' বাহির হয়। পরে পরে তাঁহার ছোট গল্পগুলি বাহির হইতে লাগিল। তখন বাঙালী পাঠকের মনে সেগুলি একটি নূতন রাগিনীর মত ধ্বনিলোক সৃজন করিয়া চলিল।

ফরাসী সাহিত্যের গল্পের নিয়মগুলি এত স্থিতিশীল ও সুনির্দ্দিষ্ট যে তাহার সহিত ইউরোপীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন ক্রমগুলির তুলনা করা চলে। প্রথম অংশটি 'ভূমিকা' দ্বিতীয় অংশ 'সম্প্রসারণ', তৃতীয় অংশ 'পুনরাবৃত্তি, চতুর্থ অংশ 'বিরতি' ও সর্ব্বশেষ অংশ koda বা 'ক্লাইম্যাক্স'। ছোট গল্পের বিভিন্ন অংশেও এইরূপ ক্রম বজায় রাখিতেই হইত; এবং এই স্বর্ণ-নিগড়ের মধ্যে বন্দিনী কথা-সরস্বতী শিল্পীর সাধনা ও উপাসনায় পরিতুষ্টা হইয়া যে অমর বর দান করিতেন শিল্পীকে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা পাই জুল ক্লারেৎ, ফ্রাঁমোয়া কোপ্প, মোপাসাঁ, ব্যালজাক, আনাতোল ফ্রাঁসের অনবদ্য ছোট গল্পগুলি। আনাতোল ফ্রাঁসের 'জুডিয়ার শাসনকর্ত্তা' নামক অপূর্ব্ব গল্পটিকে প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচকরা ছোটগল্প-শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইহাতে ছোট গল্পের ক্রমগুলিকে গোঁড়া শিল্পীর মত মানিয়া লইয়াও শেষ অনুচ্ছেদে লেখক একটি অদ্ভুত ও আশ্চর্য্যজনক মুহূর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া ছোট গল্প শিল্পের প্রকৃত রূপটিকে সর্ব্বসমক্ষে প্রকটিত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছোট গল্প এ বিষয়ে একেবারে নিখুঁত ফরাসী আর্ট। যেমন অপূর্ব্ব তাহার পরিবেশ, তেমনি অপূর্ব্বতর তাহার মুহূর্ত্ত সৃষ্টি। মুহূর্ত্ত সৃষ্টির সাহায্যেই ছোট গল্প অমর হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ এইরূপ অমর মুহূর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার 'পোস্ট মাস্টার', 'কাবুলি-ওয়ালা', 'দৃষ্টিদান', 'ব্যবধান', প্রভৃতি বিখ্যাত গল্পগুলিতে। এই মুহূর্ত্তগুলি এতই সুস্পষ্ট ও যথাযথ, যে কখনও ছোটগল্প পড়ে নাই বা ছোটগল্পের আর্ট যেজানে না—সেও এগুলির মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিবে। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি অনুভূতিপ্রধান, সে যুগে বড় বড় শিল্পীদের গল্প ছিল এ ধরনের সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিবেশনের মাধ্যম, এ যুগে প্রতীচ্য শিল্পীদের মধ্যে ক্যাথারিন ম্যান্‌সফিল্ডের গল্পগুলি এ দিক দিয়া অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

বলা বাহুল্য অনুভূতি প্রধান না হইয়া ঘটনাপ্রধান হইয়াও ছোট গল্প সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে এবং ভালো ভাবেই পারে—তাহার প্রমাণ আধুনিক যুগের অধিকাংশ লেখকের গল্প। রবীন্দ্রনাথের ঘটনা প্রধান গল্পের মধ্যে 'গুপ্তধন'-এর কথা হঠাৎ মনে পড়িল। এই গল্পটাকে আধুনিক কালের ঘটনা প্রধান যে কোনো ছোট গল্পের মধ্যে সাদরে ও সসম্মানে চালানো যায়। পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের মধ্যে ফরাসী conte আর ধ্বনিত হয় নাই, যেমন বৈষ্ণবী প্রভৃতি গল্প। ফরাসী শিল্পের মায়াশৃঙ্খল সবলে ছিন্ন করিয়া তাহার শক্তিশালী মন তখন গল্প লিখিবার নিজস্ব একটি অপূর্ব্ব ধারা আবিষ্কার করিয়াছে যাহার চরম পরিণতি

আমরা দেখিতে পাই 'চতুরঙ্গ' এবং 'দামিনী' শ্রীবিলাস', 'জ্যাঠামশাই' প্রভৃতির মধ্যে। ইহারা পৃথক পৃথক গল্প নয়। একই সূত্রে গ্রথিত কয়েকটি অমূল্য মণির নিপুণ হার—শুধু বঙ্গ সাহিত্যে নয়, বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে 'চতুরঙ্গ'-এর জুড়ি মেলা ভার। 'চতুরঙ্গ'-এর গভীর অন্তর্দৃষ্টি সাধারণ শ্রেণীর আয়ত্তের বাহিরে।

রবীন্দ্র প্রতিভার বহুমুখী দিকের একটি মাত্র সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। সমস্ত দিকের সম্বন্ধে বলিবার অধিকার আমার নাই। তাঁহার সম্বন্ধে আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাই যে তাঁহার বাল্য ও কৈশোর কালেও তাঁহার প্রতিভার দীপ্তি সে-যুগের মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নাই, এই অদ্ভুত বালক ও কিশোর সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মার্চের সাধারণী হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশই বিশিষ্ট প্রমাণ।

"আমরা নিরাশ মনে নবগোপালবাবুকে অভিসম্পাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি এমন সময়ে দেবেন্দ্রবাবুর পুত্র জ্যোতিরিন্দ্র ও রবীন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রবাবু দিল্লীর দরবার সম্পর্কে একটি কবিতা ও একটি গল্প রচনা করিয়াছিলেন। আমরা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষচ্ছায়ে দূর্ব্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কবিতা ও গল্পটি শ্রবণ করি। রবীন্দ্রনাথ তখনো বালক, তাহার বয়স ষোল কি সতেরো বৎসরের অধিক হয় নাই। তথাপি তাহার কবিত্বে আমরা বিস্মিত ও আদ্রিত হইয়াছিলাম। তাঁহার সুকুমার কণ্ঠের আবৃত্তির মাধুর্য্যে আমরা বিমোহিত হইয়াছিলাম। একজন সুপরিচিত কবি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দ্রবিত হৃদয়ে বলিলেন, যখন এই কবি প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিণত হইবেন, তখন দুঃখিনী বঙ্গের একটি অমূল্য রত্নলাভ হইবে।"

এই কবি নবীনচন্দ্র সেন। নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' গ্রন্থের চতুর্থভাগে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন।

"স্মরণ হয় ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে [বস্তুত ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দ] আমি কলিকাতায় ছুটিতে থাকিবার সময়ে কলিকাতার উপনগরস্থ কোনও উদ্যানে "নেশনাল মেলা" দেখিতে গিয়াছিলাম।... একজন সম্ভপরিচিত বন্ধু মেলার ভিড়ে আমাকে 'পাকড়াও' করিয়া বলিলেন যে একটি লোক আমার সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া উদ্যানের এক কোণার এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলায় লইয়া গেলেন। দেখিলাম সেখানে সাদা ঢিলা ইজার চাপকান পরিহিত একটি সুন্দর নবযুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ১৮।১৯, শান্ত স্থির। বৃক্ষতলায় যেন একটি স্বর্ণমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধু বলিলেন—'ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। দেখিলাম সেই রূপ, সেই পোশাক। হাসিমুখে করমর্দ্দন কার্য্যটি শেষ হইলে তিনি পকেট হইতে একটি 'নোটবুক' বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন, ও কয়েকটি কবিতা গীতকণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর কামিনীলাঞ্ছনকণ্ঠে, এবং কবিতার মাধুর্য্যে ও স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম।"

যে রবীন্দ্রনাথের যশঃগৌরব উত্তরকালে সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইবে—সেই রবীন্দ্রনাথ

কিশোর বয়সে খ্যাতিলোলুপ অকুণ্ঠ মনের সমস্ত উৎসাহ ঢালিয়া তৎকালীন প্রসিদ্ধ কবিদের নিজে যাচিয়া যাচিয়া কবিতা শোনাইতেছেন ও গান গাহিতেছেন—এ ছবিটি আমাদের বড় মুগ্ধ করে। কল্পনানেত্রে আমরা দেখিতে পাই হিন্দুমেলার লোকের ভিড়ের আড়ালে একটি নিভৃত বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান যশঃলোলুপ সলজ্জকণ্ঠ কিশোর রবীন্দ্রনাথকে। নবীনচন্দ্র সেনের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের কথা শেষ হইবার নয়, সে চেষ্টা করিব না। তবে একটি কথা না বলিলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না—সেটি হইতেছে রবীন্দ্রনাথের উপর বিশ্ব-প্রকৃতির অদ্ভুত প্রভাব। তাঁহার সারা কাব্যের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই দুইটি উৎসুক নেত্রের পিপাসু দৃষ্টির পরিচয় ও তাহাদের রস দর্শন করিবার লোকোত্তর ক্ষমতা। উপনিষদের ঋষিরা ভারতের কোন্ সুপ্রাচীন বনাস্তস্থলীতে বসিয়া নিভৃত ধ্যানে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, জগতের সত্যমূর্ত্তি 'রসো বৈ সঃ।' কিংবা 'আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি সর্ব্বানি ভূতানি জায়ন্তে।'

আজ এই ব্ল্যাকমার্কেটের দিনে, পরস্পর পদগৌরবলোলুপতার হানাহানির দিনে, স্বার্থান্বেষী ভক্তদিগের মিথ্যাবাদিতার দিনে, কে বুঝিবে উদাসীনতার এই সেই অমর বাণী। প্রাচীন ঋষিদিগের মধ্যে যাঁহারা গন্ধমধুর অন্ধকারের পথে দাঁড়াইয়া বন, আকাশ, নক্ষত্র ও নদীতটকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—'পশ্য দেবস্য কাব্যং ন মমার ন জীর্য্যতি অহো', বিশ্বদেবতার এই অমরকাব্য প্রত্যক্ষ কর, যা কখনো জীর্ণ হয় না, কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। চিরানন্দলোক হইতে আমাদের চির নির্ব্বাসন মানব প্রকৃতির মিলন তীর্থ নাই। আজিকার দিনে রবীন্দ্র সাহিত্যের এই একটি অতি বিরাট দিককে আমরা চিনিতে পারিব কজন? যাহাদের পেটে অন্ন নাই, দৈনন্দিন অন্ন-সংস্থানের জন্য যাঁহাদের ছুটাছুটি করিতে হয় দু-বেলা, তাঁহাদের বনান্ত শীর্ষে বসন্তের শিহরণ দেখিবার অবকাশ নাই। যাঁহাদের আছে, তাঁহারা সহস্র হইতে লক্ষ, লক্ষ হইতে কোটীপতি হইবার স্বপ্ন দেখিতেছেন—তাঁহাদেরই বা রবীন্দ্রকাব্যের এই অমৃতলোকে বিচরণ করিবার সময় কোথায়?

কবিগুরুকে আজ আমাদের অভিনন্দন জানাই। তিনি প্রকৃতির সহিত শিশুমনের সংযোগ সাধন করিবার জন্য শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় গড়িয়াছিলেন। মুক্ত বাতাসে ছায়াঘন আম্রকুঞ্জে যাহাতে শিশুরা বসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে, শৈশবের মাহেন্দ্রক্ষণে যাহাতে শিশু দুইচোখ মেলিয়া সুন্দর বিশ্বের দিকে চাহিতে শিখে, ইহাই ছিল তাঁর এই ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা শান্তিনিকেতন অমর হোক ও সেই সঙ্গে আমাদের বস্তুবাদী জীবন যাত্রার পথ কিছু ঘুরিয়া যাক। আমরা যেন রবীন্দ্র উৎসবকে প্রাণশূন্য হুজুকে পরিণত না করি, যেন তাঁহার কাব্য আমাদের অন্তরে দৃষ্টিদান এবং সে দৃষ্টির সাহায্যে বিশ্ব-দেবতার অমর কাব্য যাহার ক্ষয় নাই ও যাহা জীর্ণ হয় না—তাহা পাঠ করিবার ক্ষমতা লাভ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের নামে একটি রাজপথ বা একটি উদ্যান অথবা একটি নগরী করিয়া তাঁহার জন্মদিনে অবকাশ ঘোষণা করিয়া আমরা তাঁহাকে কতটুকু সম্মান দেখাইতে পারিব? তাঁহার অমর কীর্ত্তি তাঁহার রচনাবলী বহু যুগ যুগান্তর লোকে তাঁহার বাণী পৌছাইয়া দিতে পারিবে।

আমাদের ইঁট কাঠ পাথরের স্মৃতি-স্তম্ভ অতদূর যাইতে পারিবে বলিয়া ভরসা হয় না।

হে অমর কবি, স্বাধীন ভারতের মৃত্তিকায় দাঁড়াইয়া আমরা শুভ ২৫শে বৈশাখে তোমার কথাটি স্মরণ করি। তুমি দেশের মুক্তি সাধনার অন্যতম অগ্রদূত, কিন্তু স্বাধীন দেশকে তুমি দেখিয়া যাও নাই। আজ তুমি আমাদের আশীর্ব্বাদ কর যেন বিশ্বের মাঝে সগৌরবে দাঁড়াইবার শক্তি আমরা লাভ করি। দেশের গৌরবময় ঐতিহ্য যেন আমাদের আচরণে লজ্জিত হইয়া না পড়ে। আমরা তোমাকে অন্তরের সাদর অভিনন্দন জানাই।

প্রথম দর্শন

আজ প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ বছর আগের কথা।

কলকাতায় সবে এসেছি কলেজে পড়তে। রাস্তাঘাট তখনও ভাল চিনি না, একদিন দুপুরবেলা কলেজে কে বললে, আজ সেণ্ট পল্‌স কলেজ হোস্টেলে রবিবাবু আসবেন—দেখতে যাবে?

রবি ঠাকুর! ইন্দ্রজাল ছিল ও নামে মাখানো আমার বাল্যকাল থেকে। কারণ বলছি। আমার বয়েস যখন আট কিংবা নয়, পাঠশালায় পড়ি আপার প্রাইমারি—তখন আমাদের হেড-মাস্টার গগনচন্দ্র পাল একদিন একখানা শিশুপাঠ্য বই থেকে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। কবিতাটির ধ্বনি ও ছন্দ কানে যেতেই মন্ত্রমুগ্ধের মত গগনচন্দ্র পালের মুখের দিকে চেয়ে থেকে শেষ পর্য্যন্ত শুনলাম। দাশু রায়ের পাঁচালি শুনেছি, কবি-জারি-গান শুনেছি, কাশীরাম দাসের মহাভারত নিজেও পড়েছি, গুরুজনদের মুখেও শুনেছি, কিন্তু এমন সুললিত কবিতা কখনও শুনি নি। যেন একটি অপূর্ব্ব সঙ্গীত—অশ্রুতপূর্ব্ব বাণী। হেড-মাস্টারের মুখে শুনলাম কবিতার নাম 'বঙ্গে শরৎ'—লেখকের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের নাম সেই প্রথম শুনলাম জীবনে। এবং এই নামটির সঙ্গে বাল্যকালে শ্রুত সেই কবিতাটির অপরিচিত সৌন্দর্য্য মিশে গিয়ে ওই নামটির চারিপাশে একটি মায়ালোক গড়ে উঠল আমার মনে সেই দিন থেকেই। কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই মায়ালোকের মানুষ। যখন আমি হাই-স্কুলের ছাত্র, তখন তিনি নোবেল-প্রাইজ পান, তাঁর কবি খ্যাতির কথা তখন যথেষ্ট শুনলেও, তাঁর রচনার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ঘটে নি তখনও, কারণ যে সময়ের কথা বলছি, মফঃস্বলের একটি ক্ষুদ্র শহরে রবীন্দ্রনাথের রচনা তত প্রসার লাভ করে নি সে সময়ে। মনে আছে, সে সময়ে গর্ব্ব অনুভব করেছিলুম এই ভেবে যে, আমাদেরই একজন আজ বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উচ্চ সম্মান লাভ করেছেন, সাহেবেরা দেখুন আমরা ছোট নই। রবীন্দ্রনাথের সম্মান সারা বাংলা দেশের তথা সারা ভারতবর্ষের সম্মান—আমাদের সম্মান।

সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এলেন সেণ্ট পল্‌স কলেজের হোস্টেলের সামনের মাঠে—ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, বেলা বিশেষ পড়ে নি—তিনটে হবে। মাঠে তাঁর জন্যে চেয়ার টেবিল পড়েছে।

আমরা সেই টেবিলের দুই পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় রবীন্দ্রনাথ ঢুকলেন পেছনে ছাত্রদের ভিড়ের মধ্যেকার সরু পথ দিয়ে। দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘ শ্মশ্রু, সৌম্য সুন্দর মূর্ত্তি। তার আগে ছবিতে তাঁর চেহারা দেখেছি অনেকবার, কিন্তু তঁকে দেখে মনে হল কোন ফোটোই তাঁর প্রতি সুবিচার করে নি। কি একটি অনন্যসাধারণ দীপ্ত দৃষ্টি চোখে, চিবুকের নিচে শ্মশ্রুরাজির বাঁকা ভার। একেবারে তাঁর কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছি, তাঁর অতটা নিকট সান্নিধ্য-লাভের আনন্দে তখন আমি আত্মহারা। দেশে গিয়ে গল্প করবার মত একটা ঘটনা বটে আজ। সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ছেলেবেলায় তাঁর কবিতা গগন পালের মুখে প্রথম শুনে মুগ্ধ হই।

বেশ মনে আছে, হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কেনেডি সাহেব রবীন্দ্রনাথের সামনের টেবিলে বড় একটা কাঁচের জগ ভর্ত্তি করে জল ও একটা গ্লাস রাখলেন। দেখে সকৌতুকে ভাবলাম, দেখ কেনেডি সাহেবের কাণ্ড! অতটা জল কি খাওয়ার দরকার হবে ওঁর?

রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিতে উঠলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর কানে যেতে যেন চমকে উঠলাম, তারপর যতই শুনি, মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। এমন কণ্ঠস্বর আর কখনও শুনি নি, মনে হল এ কণ্ঠস্বর অসাধারণ, জীবনে এই এমন কণ্ঠস্বর কানে গেল, যা হাজার লোকের মধ্যেও পৃথক করে চিনে নেওয়া চলবে।

তাঁর বক্তৃতার আর কোন কথা আমার মনে নেই, বহুদিনের কথা—কেবল মনে আছে, তিনি বক্তৃতার মধ্যে একটা কথা অনবদ্য ভঙ্গিতে ডান হাত নেড়ে চাঁপার কলির মত অঙ্গুলির সাহায্যে (যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন, সবাই জানেন তাঁর আঙুল দেখলে চাঁপা কলির কথা মনে হত) একটি সুশ্রী মুদ্রা রচনা করে বললেন, "কল্পলোক···কল্পলোক"—কয়েকবার তিনি কথাটি ব্যবহার করলেন বক্তৃতার মধ্যে, আরও অনেক কিছু বলেছিলেন মনে নেই।

একটা কথা মনে আছে। সে দিন সেণ্ট পল্‌স হোস্টেলের মাঠে কিন্তু তেমন ভিড় হয় নি, অন্তত যেমন ভিড় দেখেছিলুম ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে তাঁর বক্তৃতার সময়, ইউরোপ থেকে তাঁর প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরেই কৌতূহলী জনতার চাপে ইনস্টিটিউটের দরজা ও রেলিং সেদিন ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। হোস্টেলের মাঠে ক্রমে ছায়া পড়ে এল। বক্তৃতা শেষ হয়ে গেল। আমরা সবাই ঠেলাঠেলি করে তাঁর পায়ের ধুলা নিলাম, পায়ে তাঁর চকচকে বাদামী চামড়ার জুতা ছিল—সে কথা আজও ভুলি নি।

পরবর্ত্তী কালে যখন তাঁর কাছে বসে কথাও বলেছি, তখনও তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কখনই মনে করতে পারি নি, ইনিই আমাদের পাঁচ জনের মত মানুষ। আমার বাল্যমনের রঙে রাঙানো কল্পলোকের দেবতা হয়ে তিনি চিরদিন রইলেন আমার কাছে—তিনি সাধারণ লোক নন, তিনি অতি-মানব, তিনি রবি ঠাকুর।

সাহিত্যে বাস্তবতা

সাহিত্যে দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা একটি বড় জিনিস। একই ঘটনা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে বা পাঠকের মনে বিভিন্ন প্রকার রসের সৃষ্টি করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতার নিমিত্ত যে জিনিসটির বেশী প্রয়োজনীয় সেটি হচ্ছে ভূয়োদর্শন। জীবনের নানা বিচিত্র দিকের সঙ্গে পরিচয় যত নিবিড় হয়ে উঠবে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি তত স্বচ্ছ হবে। তারুণ্যের স্পর্দ্ধায় একদিন যে বিশেষ মতবাদকে নিন্দা করে এসেছি, প্রৌঢ় মনের অভিজ্ঞতাব আলোকে সে মতবাদকে শ্রদ্ধা করতে শিখবো। সাধারণ বুদ্ধির পিছনে বুদ্ধির অতীত আর একটি চৈতন্য বিদ্যমান। সাধকের সপ্তম-ভূমির মত এই চৈতন্যও দুষ্প্রাপ্য ও দুরধিগম্য। তপস্যা দ্বারা একে লাভ করতে হয়। তেমনি একে বুঝতে হলেও তপস্যার প্রয়োজন। মহা-প্রতিভাশালী বহু লেখকের অনেক রচনা সেজন্যে সাধারণে বুঝতে পারেন না। কেমন করে পারবেন? তিনি যে-লেখকের সংবাদ কথায় বা চিত্রে বা সুরে আমাদের কাছে পরিবেশন করতে চাইবেন, সে-লোক হয়ত তাঁর কাছেও সদ্য পরিচয়ের রহস্য কুহেলিকায় তখনও আবৃত। সে গভীর লোকের খবর ভাষার বন্ধনে বন্দী করে প্রচলিত উপমা-সাহায্যে প্রকাশ করা তাঁর কাছেও তখন একটি কঠিন সমস্যা। হঠাৎ বন্ধনের মধ্যে ধরা দিতে চায় না সে অনুভূতি। অনেক অনুভূতি আবার এত অল্পক্ষণ স্থায়ী যে, তার স্থায়িত্বকালে তাকে প্রকাশ করবার সময় হয় না। স্মৃতির সাহায্যে হারানোর মুহূর্ত্তটির আনন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হয়ত তার অখণ্ডতা বজায় থাকে না। হয়ত সেই হারিয়ে ফেলার দরুণ কিছু ভুলচুকও হয়। তবুও প্রতিভাশালী লেখকেরাই তা প্রকাশ করতে সমর্থ তাঁদের প্রকাশ-নিপুণতা দ্বারা, তাঁদের ভাষার ঐশ্বর্য্য দ্বারা, তাঁদের সহজাত স্থাপন-ক্ষমতা দ্বারা। অক্ষম লেখকের লেখনী সে জিনিসের নাগাল পায় না। ক্ষমতাবান লেখককেও অবুঝের গালাগাল সহ্য করতে হয়। বহু প্রতিভাশালী লেখকের ভাগ্যেই এ ঘটনা ঘটচে। যাঁরাই আজ সাহিত্যজগতের খবর রাখচেন, তাঁরা এটি জানেন।

আজ রবীন্দ্রনাথের কথা তাই বিশেষ মনে পড়ে।

বাংলার রবীন্দ্রনাথ, বাঙালীর রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় সম্পদ ছিলেন, বাঙালী আমরা এখনো তাঁকে বুঝতে পারি নি। তাঁর যে বিরাট আদর্শ আমাদের সামনে হিমালয়ের সমান উঁচু হয়ে অবস্থান করচে তার পাশে মেকী সাহিত্যের ও ধার করা বিদেশী আদর্শের কল্পনাকে বসাতে আমরা যেন লজ্জা বোধ করি; পারিপার্শ্বিককে অগ্রাহ্য করে, আমাদের বাস্তব সমস্যাকে উপেক্ষা করে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে সাহিত্যের আদর্শ আমদানী করতে যেন ইতস্ততঃ করি। উৎকেন্দ্রিক বস্তুনিষ্ঠাই যে সাহিত্যের একমাত্র উপাদান নয়, রবীন্দ্রনাথের পরেও কি বাঙালীকে তা মনে করিয়ে দিতে হবে? রবীন্দ্রনাথকে আমরা আমাদের স্বভাব-সুলভ হুজুক-প্রিয়তার কেন্দ্র না করে তুলে প্রকৃতপক্ষে যে সংস্কৃতির ও যে উদার মন্ত্রের তিনি ঋষি ছিলেন—কি আর্টে, কি জীবনে, কি ধর্ম্মে—আমরা যেন সেই মন্ত্রের সাধনা শুরু করি।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর জাতির নব মেরুদণ্ডের স্বষ্টিকর্তা; আমরা হুজুক করে বেড়াই বটে, সেই মেরুদণ্ডের সন্ধান এখনও পেয়েছি কি?

সাহিত্য সমাজের মাপকাঠি। সমাজের বাস্তবপটভূমিতে যে রসশিল্প রচিত হয়, শিল্পী-মানসের প্রকাশ-ভূমি যাহা, তাহাই সাহিত্য। রাজনীতি আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্র সব চেয়ে বড় স্থান অধিকার করে রয়েচে। সমাজের বেশীর ভাগ লোক সকালে উঠে পড়েন দৈনিক খবরের কাগজ। তাতে যে আস্বাদ পান, সাহিত্যের মধ্যেও কি তাকেই খুঁজতে হবে? আধুনিক দিনের সমস্যা নিয়ে সাহিত্য রচিত হতে পারে এবং হচ্চেও। 'রেইন-বো'র মত বড় উপন্যাসও তৈরী হয়েচে যুদ্ধের আবহাওয়ায়। প্যারিসে জার্ম্মান অধিকারের দুঃস্বপ্ন লুই ব্রমফিল্ডকে প্রলুব্ধ করেচে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসখানি লিখতে।

কিন্তু পশ্চাত্যজাতির সমস্যা অন্যরূপ। তারা যত ভীষণ দুঃখ অনাচার সহ্য করেচে বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে, আমরা ততটা দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করি নি। আগষ্ট আন্দোলনের ব্যাপক সত্তা ছিল না। যে দুটি জিনিস খুব বেশী দোলা দিয়েচে আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনকে—ব্ল্যাকমার্কেট ও মন্বন্তর—সে দুটি বহু লেখকের উপজীব্য স্বরূপে একই করুণ রাগিণীর একঘেয়ে আলাপের মত বিস্বাদ হয়ে পড়েচে ক্রমশঃ। তবু স্বীকার করতে হবে তারাশঙ্করের মন্বন্তর', প্রবোধ সান্যালের 'অঙ্গার', মনোজ বসুর 'দ্বীপের মানুষ' প্রভৃতি এ সময়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। শাশ্বত সাহিত্যের পথে এ রচনাগুলি পা বাড়িয়ে রয়েচে।

এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে লেখা আসে কবি-মানসের অন্তর্নিহিত তাগিদ থেকে। কবি-মানসের বিভিন্নমুখী গতি থেকে বিভিন্ন ধরনের লেখার স্বষ্টি। যেদিন বাংলার লেখকেরা দেশের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন, সেদিন সেই প্রসারিত চেতনা তাঁদের বাধ্য করবে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সমস্যা ও সমাজ সমস্যাকে আশ্রয় করে গল্প ও উপন্যাস লিখতে। এই ব্যাপক চেতনার লক্ষণ বহু লেখকের সাম্প্রতিক রচনায় সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেচে। একটি জীবন্ত সাহিত্য বিভিন্ন আঙ্গিক এ মাধ্যমে দেশের সমস্যাগুলিকে ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় করে রেখে দিচ্ছে। বহু লেখার আবশ্যক কি? একখানি সার্থক রচনায় এক এক যুগকে অমর করে রাখে। যেমন সোভিয়েট রাশিয়ায় দুঃখদুর্দ্দশার চিত্র ফুটে উঠেচে ওয়েলেস্কির বিখ্যাত উপন্যাসখানিতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে ভারতব্যাপী বিরাট রাষ্ট্র-আন্দোলনের চিত্রকে অমর করে রেখে গেলেন। এঁদের প্রতিভা এ সব রচনাকে অপূর্ব্ব আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে যুগ প্রয়োজনের উর্দ্ধে উন্নীত করে দিয়েচে। চেতনা যে কি ভাবে অমর সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে, তার খোঁজ নিতে গেলে ওগুলির সঙ্গে সম্যক পরিচয় হওয়া প্রয়োজন।

একটা যুগ চলে যাচ্চে, ভেঙ্গে যাচ্চে—এ খুব সত্যি কথা। এযুগে স্বভাবতই কবি বা শিল্পী-মানস কিছু অব্যবস্থিত। নতুন সময়ের আভাসে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেচে, এমন মন এখন হয়ত বিরল। হয়ত অত্যন্ত নিকট থেকে দেখচি বলে অনেক নতুন রচনাকে, অনেক দুঃসাহসিক এক্সপেরিমেণ্টকে আমরা বাজে আধুনিকতা বলে ভুল করচি। রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী' সংবাদ যখন রচিত হয়েছিল, তখন সেকালের অনেক বিজ্ঞ সমালোচক বলেছিলেন,

"মহাভারতের কথা নিয়ে এ আবার কি রকম কাব্যি ?" আমরা আবার যেন প্রশ্নকর্ত্তাদের দলে না পড়ি। কবি-মানস কোন দিন হুজুকের বশীভূত হবেন না। দু'দিনের হাততালিকে অবজ্ঞা করলেও তাঁর চলবে। অনর্থক কালাপাহাড়ী যেখানে সেখানে তাঁর সত্য শুভ্র ও কল্যাণদৃষ্টি কখনো সায় দেবে না। শিল্পীর সকল রচনার মধ্যে থাকবে একটি চারিত্র। রচনার ওপর এই চারিত্রের দৃঢ় ছাপই পাঠকের মনে এনে দেবে নিঃসংশয় নির্ভরশীলতা।

এ আমরা যেন আদৌ ভুলিনে যে কোন রচনায় আধুনিক যুগের সমস্যা আছে কিনা, রাজনীতির ক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টি স্বচ্ছ না ঘোলাটে, দুর্ভিক্ষের কথা ঠিক করে বলা হল কিনা —এ সব দেখে সাহিত্য বিচার হয় না। আজকাল নানা কারণে আমাদের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেচে, মন হয়ে এসেচে নিস্তেজ। সমালোচনার আদর্শ অন্য রকম হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জীবনের শাশ্বত ধ্রুব সত্যকে আমরা এখন অস্বীকার করে চলেচি। যে দেশে গীতার মত সাহিত্য রচিত হয়েছিল, যা আজ দেড় হাজার বৎসর ধরে স্বকীয় আলোয় উদ্ভাসিত, কতশত মনীষীর ভাষ্য-টীকা-টিপ্পনীর অর্ঘ্যপুষ্পে যা এই দীর্ঘ দিন ধরে সজ্জিত হয়ে এসেচে—আজ আমাদের দুর্ভাগ্য সেই দেশের সাহিত্যের আদর্শ আমাদের আমদানি করতে হয় সমুদ্রপারের দেশ থেকে। সাংবাদিকতা ও সাহিত্য যে এক জিনিস নয় এ কথা আমরা ভুলতে বসেচি। সেদিনও আমাদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যে শুদ্ধ নির্ম্মল পরিবেশ ও উদার শুভবুদ্ধি শিল্পী-মানসের একমাত্র একান্ত প্রয়োজনীয়, তিনি তার আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার মধ্য দিয়ে, তাঁর তপস্যা'স্তব্ধ, মৌনমুখর মুহূর্তগুলির মধ্য দিয়ে দিনশেষের কল্যাণ-রাগিণী কেমন নানাভাবে অরূপের ও রূপের ঐশ্বর্য্য বিস্তার করেচে তাঁর লেখনীর লীলা বিলাসের ছন্দে, আমরা সাহিত্যকে পলিটিকসের দিন-মজুরীতে নিয়োগ করার পূর্ব্বে একথা যেন একবার ভেবে দেখি।

এত কথা বলবার কারণ যে সম্পূর্ণ রূপে ঘটেচে এমন উক্তি আমি করচি না। বাংলা সাহিত্য আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েচে, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য-রসিকগণ বাংলা সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠেচেন এবং মূল বা অনুবাদের সাহায্যে তাঁরা রবীন্দ্র পরবর্ত্তী বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নিজেদের পরিচয় স্থাপন করতে ব্যগ্র এ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য। সেজন্যেই আমাদের অবহিত হতে হবে যেন আমরা সাময়িক উত্তেজনার মোহে পথভ্রান্ত হয়ে না পড়ি। ভারতীয় আদর্শ অম্লান রাখবার দায়িত্ব আমাদেরই হাতে—এ কথা আমরা যেন না ভুলি। নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে যেন পথ দেখে নিয়ে চলি সত্য ও সুন্দরের পেছনে, সাময়িক হুজুক থেকে নিজেদের যেন যথাসম্ভব দূরে রেখে চলি। দেশপ্রেমের এ আর এক দিকের বিকাশ, স্পষ্ট কণ্ঠে এ কথা প্রচার করতে যেন লজ্জিত না হই।

আবার রবীন্দ্রনাথের কথা তুলতে হয়। সাহিত্যে কতবড় আদর্শ তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরে রেখে গেলেন। আজ আমরা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষা করচি ঘরে ঘরে, কিন্তু রসক্ষেত্রে বা শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর পূজা ওভাবে হবে না। হবে যখন আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের

আলোক-বর্ত্তিকা হস্তে শ্রেয়ের পথে দৃঢ়পদে অগ্রসর হব। সে যে কতবড় সম্পদ, সে যে কতবড় আদর্শ তার সম্যক মাপকাঠি এখনো আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি। তাকেও অনেকটা আমরা অনেকটা হুজুকের পর্য্যায়ে এনে ফেলেছি।

গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের গর্ব্ব করবার জিনিস রয়েচে। নবতর বাহিনীর অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলি দিকচক্রবালে দেখা দিয়েচে। সেই আশার বাণীটি উচ্চারণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেচি বঙ্গবাণীর বেদীমূলে কয়েকজন শক্তিধর নবীন লেখকের আবির্ভাব। এতে এই প্রমাণ হল যে বাংলার প্রাণশক্তির উৎস আজও তেমনি সজীব, যেমন ছিল মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের যুগে, যেমন ছিল ভারত-চন্দ্রের যুগে, যেমন ছিল 'নব বাবু বিলাসের' ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগে, যেমন সেদিনও দেখেছি বঙ্কিম-শরৎ রবীন্দ্রনাথের যুগে। এঁরা নব্য-বাংলার প্রাণস্পন্দন শুনতে পেয়েচেন। সে সুর বেজে উঠেচে এঁদের লেখায়। যে মাটিতে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন সে মাটি অজর অমর। ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাব্যতাকে তা নিজের মধ্যে বহন করচে।

আর একটি কথা সকলের শেষে বলি।

সাহিত্য আমাদের মনকে অমৃতরস দ্বারা বলবান করচে। তা যে কোন আঙ্গিকের মধ্য দিয়েই হোক না কেন। নিগূঢ় বিশ্ব-রহস্যের অন্তরতম বস্তুটির সন্ধানে যে আনন্দ, যে আনন্দ তার আবিষ্কারে—উপনিষদের ঋষির স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের মন্ত্রে তার রূপ আমরা দেখেছি। সুতরাং এও সাহিত্যের যে একটা বড় দিক তা আমাদের মনে রাখা উচিত। সাহিত্য আমাদের পরিচিত করচে জীবনের চরমতম প্রশ্নগুলির সঙ্গে দেবে আমাদের উদার, মৃত্যুঞ্জয় দৃষ্টি;—সকল সুখ-দুঃখের ঊর্দ্ধে যে অসীম অবকাশ ও তৃপ্তি আমাদের পরিচিত করবে সেই অবকাশ ও তৃপ্তির সঙ্গে।

"তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।"

যে জ্যোতির মধ্যে বিশ্বদেবের কল্যাণতমমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত, আমরা যেন দেবতার সেই জ্যোতিকে—দৈনন্দিন জীবনোত্তীর্ণ বৃহত্তর অনুভূতি ও ভাবকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দর্শন করি। সাহিত্য শুধু রসবিলাস নয়। জীবনের দুঃখ, পরাজয় ও ব্যর্থতার দিনে যে সাহিত্য-রসিক পাঠক অচঞ্চল থাকেন, দারিদ্র্যের মধ্যেও যিনি নিজেকে হেয় জ্ঞান না করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস রাখেন, সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া তাঁর সার্থক। জীবন সমস্যাগুলির সমাধানের গূঢ় প্রেরণা যে সাহিত্যে তার মধ্যে আমরা পাব কলালক্ষ্মীর কল্যাণতম মূর্ত্তিটির সন্ধান।

আর্টের পুরানো রস-চক্রে যদি আমরা এখনও ঘুরপাক খেয়ে মরি, তবে রবীন্দ্রনাথের মত বড় আদর্শের উপযুক্ত মূল্য আমরা দিতে পারবো না। বস্তুনিষ্ঠার নামে বা ছদ্মবেশে যাঁরা সাহিত্যের আদর্শকে ইদানীং বিভ্রান্ত করে তুলেচেন, আমাদের দেশের সত্যিকার সমস্যাকে ও পারিপার্শ্বিকতাকে উপেক্ষা করে যাঁরা সোভিয়েট রাশিয়া নিয়ে মত্ত হয়ে আছেন তাঁরা যেন এসব কথা একবার ভেবে দেখেন। যে সহিত্যের শিকড় এ দেশের মাটি থেকে

রস সঞ্চয় করচে না, সমাজের বা দেশের মনে সে ধরনের সাহিত্যের কোন ফলপ্রসূ আবেদন থাকতে পারে না। এরূপ উৎকেন্দ্রিক বস্তুনিষ্ঠার স্বৈরাচার থেকে বঙ্গভারতীকে তাঁরা যেন মুক্তি দেন, এই আমার একান্ত কামনা।

সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প

মানব-জীবনের দৈনন্দিন অতি-পরিচিত ও বৈচিত্র্যময় পরিবেশের যে অংশকে অবলম্বন করে সাহিত্য বড় হবার চেষ্টা করেচে সে অংশটা তাকে বিশেষভাবে পুষ্ট করে তুলেচে উপন্যাস ও গল্পের দিক থেকে। তাই সাহিত্যে জীবনের প্রতিফলন সত্যিকারের ঘটেচে উপন্যাস ও গল্পের সাহায্যে। গল্পের কাজটা আবার একটু বেশী কৃতিত্বের। এই হিসেবে যে গল্প সে রকম পরিবেশকে সাহিত্যের কাছে পৌঁছে দিয়েচে খুব সহজে ও ছোট করে। সাহিত্যে গল্পের মান সে জন্যে খুবই উঁচুতে। সাহিত্য যেদিন থেকে জন্ম নিয়েচে সেদিন থেকেই প্রায় ছোট গল্প আত্মপ্রকাশ করেচে তাকে উন্নত করে রাখতে নিজের দিক থেকে। কিন্তু তার পরিচয় আমাদের কাছে খুব বেশি দিনের নয়। ছোট গল্পকে আমরা চিনেচি বিশেষ করে মোঁপাসার দৌলতে, তাও সেটা বিদেশী সাহিত্য। তাঁরই কাছ থেকে পাওয়া দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা দেখতে শিখেচি বিদেশী সাহিত্যে গল্পের মান মর্য্যাদা যার অনুকরণে আবার বাংলা সাহিত্যে গল্পের স্থান দিতে শিখেচি যথেষ্ট খাতিরের।

বাংলা সাহিত্যে গল্পের যে ধারা এখন পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে মৌলিকত্ব পাওয়া যায় না বিশেষ। সবই যেন কতকগুলো শেখান বুলি আওড়ান, বেশী রকম বিদেশী ঘেঁষা, আর যেন কোন 'ইজমে'র চাপে পড়া। যা হোক, নরনারীর প্রেমের কাহিনী নিয়ে যে একটানা একটা একঘেয়েমি পেয়ে বসেছিল গত শতাব্দীর বাংলা গল্পে সেটার থেকে মুক্তি দিতে যে সংস্কার-সাধনের চেষ্টা হতে চলেচে আজকের গল্পে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু এই সংস্কারসাধনের ব্যাপারটা এতই দ্রুত ও সামঞ্জস্যবিহীন ভাবে হয়ে চলেচে যে মৌলিকতা বলে জিনিসটা নষ্ট হতে চলেচে, যে মৌলিকতার গৌরবে বাংলা সাহিত্য এতদিন শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষ অধিকার করে ছিল। মোহিতলাল প্রমুখ বিশিষ্ট সমালোচকরা বলেন, আজ সেই মৌলিকতার অভাবেই বাংলা সাহিত্যে গঠনমূলক বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। সংস্কারের ছদ্মবেশে সমালোচনাই স্থান নিচ্ছে বেশী করে। সংস্কারসাধন মানে মৌলিকত্ব বিনাশ নয়। সংস্কার করতে হলে মৌলিকত্ব বজায় রেখেই সেটা করতে হবে। আর এই মৌলিকত্ব আমাদের সাহিত্যে এসেচে আজকের যুগে রবীন্দ্রনাথের যুগ থেকে, রবীন্দ্রনাথের যুগ এসেছে বঙ্কিমের যুগ থেকে যেটা এসেছে বিদ্যাসাগরের আমল থেকে। তাই 'গল্প-গুচ্ছে'র 'গল্পভারতী'র যুগে নাম করা হচ্ছে 'কথামালা', 'মণিমঞ্জুষার'। কথামালার যুগও সন্ধান নিয়ে গেছে 'হিতোপদেশ' 'পঞ্চতন্ত্রে'র যুগের। সুতরাং মৌলিকত্বের খোঁজ পড়লে প্রাচীনের দিকেও দৃষ্টি যায় ক্ষেত্র

বিশেষে। তাই সংস্কৃত সাহিত্যেরও দাম আছে—এ হিসেবে যতই তার ভাষাকে 'ডেড ল্যাঙ্গোয়েজ' বলে মেরে রাখা যাক না।

সংস্কৃত সাহিত্য ঐশ্বর্য্যশালী হয়েছে প্রধানত নাটকের জন্যে। সংস্কৃত নাটকের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গদ্য আর পদ্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ। শব্দ-অলঙ্কার পূর্ণ গদ্যের সঙ্গে কাব্য মাখা ছন্দগাথা শ্লোকের প্রযোজনা তাকে দিয়েচে একটা স্বকীয় ভঙ্গিমা যার দরুণে সংস্কৃত নাটক আমাদের কাছে আজও এতটা প্রিয়। আর একটা লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, নাটকের সাধারণ অধিকাংশ সংলাপ লেখা হয়েচে প্রাকৃত ভাষায়—যে ভাষা প্রাথমিক কাব্যরূপ নেয় নানা রকম আখ্যান ও গল্পের ভিতর দিয়ে। 'কাদম্বরী' প্রমুখ ক-টা বিখ্যাত নাটক কাব্যেররূপে প্রকটিত হতে দেখা গেছে সহজ ও লোকপ্রিয় একরকম গল্প যার প্রভাবেই নাট্যে সংলাপের মাধুর্য্য। তাছাড়া নাটকের বিষয়বস্তু গঠনে যথেষ্ট প্রভাব পাওয়া গেছে প্রাচীন জনপ্রিয় গল্পগুলোর, যাদের স্রষ্টা ছিলেন বিজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলী। নাটক ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য গদ্য রচনাতেও এ রকম প্রভাব দেখা গেচে প্রাচীন লোকশ্রুত নানা রকম গল্পের।

সংস্কৃত সাহিত্যে গল্পের গোড়ার দিকে আমরা দেখি তিন রকম রূপ-এর। এক রকম হচ্ছে জাতীয় গৌরবময় কাহিনী অবলম্বনে বীরত্বের কাহিনী থাকে ইংরাজিতে বলা হয় 'লিজেণ্ড'। (Legend)। আর এক রকম হচ্ছে নীতি-শিক্ষার উদ্দেশ্যে উপমা ও তুলনা-মূলক সহজ গল্প যার ইংরিজি পরিচয় 'ফেবল' (fable)। তৃতীয়টা হল সহজ ও সাধারণ উদ্দেশ্যবিহীন আমোদদায়ক গল্প যাকে ইংরিজিতে বলে 'টেল' (tale)। দুঃখের বিষয় সংস্কৃতে এই তিন রকম গল্পের স্পষ্ট কোন সংজ্ঞার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবে এদের পরিচয় আমরা যথেষ্ঠ পাই বিখ্যাত গল্পগুলোতে।

প্রথম রকমের গল্পগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে সেগুলোকে, যেগুলো পাওয়া যায় 'বৃহৎ কথামঞ্জরী' ও 'কথাসরিৎসাগরে'। বৃহৎ কথামঞ্জরী প্রকাশিত হয়েছিল ১০৮৬ থেকে ১০৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। রচনা করেছিলেন তখনকার কাশ্মীরের বিখ্যাত পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র। কাশ্মীরের প্রাচীন জনশ্রুত কাহিনীগুলোকে সুন্দরভাবে গল্পের আকারে সাজিয়ে গ্রন্থরূপ দেওয়ায় ক্ষেমেন্দ্রের যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখা যায়। সরল প্রাকৃত ভাষার সরস রচনার একটা ভঙ্গী ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর একটা বড় দান। 'কথাসরিৎ-সাগরে'র রচয়িতা সোমদেব। রচিত হয়েছিল 'বৃহৎ-কথামঞ্জরী' রচনার প্রায় পঁচিশ বছর পরে। পর পর আঠারোটি লম্ভকে একশ' চব্বিশটি ভাগে ভাগ করে একটা মনোরম গল্পধারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই এর নাম কথার স্রোত সাগর। গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে রাজা উদয়নের পদ্মাবতী হরণের কাহিনী খুবই সুখপাঠ্য। পঞ্চম ভাগ চতুর্দারিকায় সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে রাজপুত্র শক্তিভোগের বিজয়াভিযান ও রাজা বিদ্যাধরের রাজ্যে প্রবেশ করে চারজন সুন্দরী যুবতীকে হরণ।. এখানে বিন্ধ্য পর্ব্বতের প্রাকৃতিক বর্ণনা সত্যি উপভোগ্য। ষষ্ঠ ভাগে আছে বীর নরবাহন দত্তের সিংহাসন লাভের আগের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী। এ রকম অন্যান্য ভাগেও আছে

বিভিন্ন রকমের কাহিনীর সুন্দর বর্ণনা। 'কথাসরিৎসাগরে'র বৈশিষ্ট্য রয়েছে মূল গল্পের সঙ্গে বহু সংখ্যক অন্য বিভিন্ন রকমের ছোট গল্পের সুচতুর সংযোজন। গল্পগুলোর দাম শুধু সরল বর্ণনাভঙ্গী ও দুরূহ ভাবপ্রবণতা অর্জ্জনের চেষ্টায় যার জন্যে সেগুলো এতটা প্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী। তবে এর দোষ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকৃতির কাহিনীর প্রাচুর্য্যে অনেক সময় মূল কাহিনীকে হরিয়ে ফেলতে হয়। বুদ্ধস্বামী-রচিত 'শ্লোক-সংগ্রহ' ও একই শ্রেণীভুক্ত একটা উঁচুদরের গল্পগ্রন্থ। রচনা হয়েছিল নবম শতাব্দীতে নেপালে। এতে আছে আটাশটি অধ্যায়ে চার হাজার পাঁচশ' চব্বিশটি শ্লোক। প্রাচীন জাতীয় বীরগাথা লেখা হয়েছিল এতে সরল সংস্কৃত ভাষায়। বুদ্ধস্বামীর রচনার বিশেষত্ব হচ্ছে অলঙ্কার-বর্জ্জিত সরল শ্লোক প্রয়োগে সম্পূর্ণ কাব্যভাব ফুটিয়ে তোলা। সংক্ষিপ্ত কটা উপমাদির সাহায্যে একটা বিরাট ভাব ব্যক্ত করার অদ্ভুত ক্ষমতা আমরা পাই তাঁর গ্রন্থে।

শিক্ষামূলক নীতিযুক্ত গল্পগুলো অর্জ্জন করেছে আরও বেশী লোকপ্রিয়তা। কারণ এগুলোর রচনার উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীকে গল্পের ছলে সৎপথে চালিত করা। প্রত্যেক গল্পকে হৃদয়গ্রাহী করার জন্যে সহজ ভাবে উপমা ইত্যাদির সাহায্যে সুবোধ্য করা হয়েছিল। গল্পের শেষে প্রযুক্ত হত একটা নীতিকথা পাঠকদের মনে গল্পের বিষয়বস্তু ও তার শিক্ষণীয় বিষয় গ্রথিত করে রাখতে। এ রকম গল্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাধারণ জীবজন্তুর চরিত্রাঙ্কণে তাদের কথোপকথনের ভিতর দিয়ে গল্পাংশ সৃষ্টি করা। এদিক থেকে গল্পগুলো একটা অভিনবত্ব দিয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যে। জীব জন্তুর চরিত্র অবলম্বনে সুন্দর ছোট গল্প রচনা সংস্কৃত সাহিত্যের একটা স্বীয় বৈশিষ্ট্য। যেটা ইংরিজি সাহিত্যে একটু পাওয়া গেছে ঈশপের 'ফেবল'স-এর মত গল্পগুলোতে। সংস্কৃত গল্পগুলোতে আবার প্রযুক্ত হয়েছে ছোট ছোট শ্লোক, যেগুলোর লোকপ্রিয়তা আজও হারায়নি, দৈনন্দিন জীবনযাপনে পথ প্রদর্শকের কাজ করে আসচে। জীবজন্তুর চরিত্র সৃষ্টি করে নীতিগত গল্প রচনার একটা কারণ আমরা পাই সমালোচকদের কাছে। গল্পগুলোর রচনাব যুগে ভারতবাসী প্রধানতঃ বাস করত মুক্ত গ্রাম্য আবহাওয়ায়। তাই তাদের জীবন ও চরিত্র গঠনে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের দান ছিল অনেকটা। একই প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় পুষ্ট নানা শ্রেণীর জীবও মানুষের প্রিয় হয়ে উঠেছিল ও অনেক ক্ষেত্রে তাদের সহচরও হয়ে পড়েছিল—যা আমরা আজও দেখি কুকুর, বেড়াল, গরু, ঘোড়া ও নানা রকম পাখী পোষার প্রবৃত্তিতে। মানুষের এই রকম জীবন যাত্রা প্রতিফলিত হয়েছিল তখনকার সাহিত্যে ও কাব্যে। ঋকবেদেও আমরা পেয়েছি বর্ষারম্ভে ভেকের ডাক ঘোষণা করত ব্রাহ্মণদের পূজা উপাসনার সময়। উপনিষদেও আছে কুকুরের 'উদ্গীত' যা নির্দেশ দিত নাকি ঋষিদের তপ-জপের। তাছাড়া রাজনীতি ক্ষেত্রেও জীবজন্তুর চরিত্রের উপমার সাহায্য নেওয়া হত কূটনীতি সহজভাবে বুঝতে। সোনার বিষ্ঠাত্যাগী পাখীর গল্পের সাহায্যে বিদুরকে দেখা যায় ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিতে পাণ্ডবদের বিষয়। বৌদ্ধ-জাতকেও পাওয়া যায় পশু-পাখীদের গল্পের ভিতর দিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহজ আলোচনা করতে। এই রকম যে সব নীতি-গল্প অমরতা পেয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যে তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে 'পঞ্চতন্ত্রাখ্যায়িকা' 'হিতোপদেশ'।

'পঞ্চতন্ত্রাখ্যায়িকা' বা 'পঞ্চতন্ত্র' রচিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায় যে ভাষা দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজদরবারের ভাষা বলে পরিচিত হয়েছিল। এর রচয়িতা ছিলেন পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মা। মহিলারোপ্যের রাজা অমরশক্তির মূর্খ পুত্রদের তন্ত্রশাস্ত্রে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে বিষ্ণুশর্ম্মা যে পাঁচটি তন্ত্র রচনা করেছিলেন তাই পঞ্চতন্ত্র নামে খ্যাত। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাজকার্য্য চালনার নীতি ও উপায়গুলো সহজভাবে গল্পের মধ্যে দিয়ে বোঝাবার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল পঞ্চতন্ত্র। রচনা সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যেও আবার দেখা যায় মতদ্বৈধ। একদল বলেন, রচনার গোড়ায় যার প্রভাব ছিল সেটা হচ্ছে খৃষ্টপূর্ব্ব তিনশ' অব্দের আগে কাশ্মীরি ভাষায় লিখিত 'তন্ত্রাখ্যায়িকা' নামে গ্রন্থটি। আর এক দলের মতে এতে খানিকটা প্রভাব পাওয়া যায় কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রের'। তন্ত্রাখ্যায়িকা' পাঁচটা ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে করতক ও দমনক নামে দুই শৃগাল, একটি সিংহ ও ষাঁড়ের মধ্যে যে বৈরিতা এনে দিয়েছিল তা দেখান হয়েছে বেশ যুক্তির অবতারণা করে। দ্বিতীয় ভাগে আছে পাঁচটা মজার গল্প— যাদের চরিত্রগুলো হচ্ছে ঘুঘু, কাক, পেঁচা, ইঁদুর, কচ্ছপ ইত্যাদি। জীব-জন্তুর চরিত্র অঙ্কন ও তাদের কথোপকথন প্রয়োগের কুশলতাই লেখকের বৈশিষ্ট্য। ক্ষুদ্রবুদ্ধি শৃগাল কর্ত্তৃক পশুরাজ সিংহকে কূপে নিক্ষেপাদি নীতিগত গল্পগুলোর জন্যে এর দাম আজও আছে। এ সব ছাড়াও মহাত্মা শিবির দেহদানের গল্পের মত শিক্ষনীয় গল্পও আছে অনেক। তাছাড়া প্যাঁজ চোরের প্যাঁজ খেয়ে শাস্তি পাওয়া, বোকা অপরিণামদর্শী ব্রাহ্মণের আকাশকুসুম কল্পনার শোচনীয় পরিণামের মত গল্পগুলোর মধ্যে লেখকের রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় যথেষ্ট। পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলো প্রধানতঃ 'তন্ত্রাখ্যায়িকা' থেকে নেওয়া। বিষ্ণুশর্ম্মার কৃতিত্ব শুধু বৃহৎ আকারের গ্রন্থকে কৌশলে পাঁচটা ভাগে ভাগ করে মৌলিকতা বজায় রেখে একটা শিক্ষা-মূলক গ্রন্থ রচনার ক্ষমতায়। সরল গদ্যের সঙ্গে মাঝে মাঝে ছোট শ্লোকের প্রয়োগে সংস্কৃত গল্প রচনায় এ একটা বিশেষত্ব আরোপ করেছে। শ্লোকগুলোর উৎস হচ্ছে প্রধানতঃ সংস্কৃত মহাভারত ও পালি ভাষায় রচিত জাতকের শ্লোক। গল্পাংশে এদের নিষ্ঠুর প্রয়োগে গল্পের বর্ণনাকে একটা মাধুর্য্য দেওয়াই এদের বড় কাজ। এটুকুর জন্যেই বিশেষ করে পঞ্চতন্ত্রের লোকপ্রিয়তা আজও। সংস্কৃত সাহিত্যের পাঠ্য পুস্তক হিসেবে তাই এ ইংরেজ টিপ্পনীকারদের কাছে 'textus simplicior' বলে পরিচয় পেয়েছে। 'হিতোপদেশে'র খ্যাতি পঞ্চতন্ত্রের পাশেই। 'হিতোপদেশ' আলাদা কোন বিষয়ের গ্রন্থ নয়। পঞ্চতন্ত্রকেই পরিবর্ত্তিত করে নতুন আকারে নতুন ভঙ্গীতে সাজাবার একটা চেষ্টা হয়েছে এতে। এর গল্পগুলো পঞ্চতন্ত্রেরই মত পেয়েচে জনপ্রিয়তা। হিতোপদেশ রচনা করেন নারায়ণ তখনকার একজন বাংলাদেশের বড় পণ্ডিত ধবলচন্দ্রের সাহায্যে। তাই তখন এর খ্যাতি বাংলাদেশেই ছিল বেশি।

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের জনপ্রিয়তা শুধু প্রাচ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিস্তৃত প্রচার এদের লোকপ্রিয়তাকে নিয়ে গেছে সুদূর প্রতীচ্যেও। মূল সংস্কৃত থেকে 'পঞ্চতন্ত্র' অনূদিত হয়েছিল ৫৭০ খৃষ্টাব্দে সিরিয়া ও আরবি ভাষায়। অনেক পরে ১২৫২ সালে অনুবাদ করা করেছিলেন স্পেনের কোন পণ্ডিত। তার পর একে অনুবাদ করা হয় হিব্রু ভাষায়। হিব্রু

থেকে ল্যাটিনে অনুবাদ করেন ক্যাপুর্য়ার জন সাহেব যার অনুবাদ আমরা পাই ইটালী ভাষায় ১৫৫২ খৃস্টাব্দে। তারই প্রথমভাগটা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ১৫৭০ খৃস্টাব্দে স্যার টমাস নর্থ। এইভাবে অষ্টম থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলো যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল প্রায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র। ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে ঈশপ প্রভৃতি সাহেবরা 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' অনেকটা ধার করেছে গল্প, ভঙ্গী ও চরিত্রসৃষ্টিতে। কবি কিপলিং-এর 'Jungle Book' নামে বিখ্যাত গল্পগ্রন্থে জীব-জন্তুর চরিত্রাঙ্কন ও কথাবার্ত্তায় পঞ্চতন্ত্রের প্রভাব অনেকটা লক্ষ্য করা যায়।

পঞ্চতন্ত্র ও 'হিতোপদেশে'র মত নীতিমূলক গল্পগ্রন্থ ছাড়াও আরও অনেক গল্পগ্রন্থ আছে, যেগুলোর দাম আছে যথেষ্ট আনন্দদায়ক ও সুখপাঠ্য হিসেবে। তাদের রচনার উদ্দেশ্য কোন রকম নীতির অবতারণা লোকশিক্ষা দেওয়া নয়। তাদের গল্প শুধু গল্পেরই খাতিরে। তাদের লক্ষ্য কেবল গল্প ও রস রচনার ভিতর দিয়ে পাঠকের মনকে আমোদ দেওয়া। সাহিত্যিক বিচারে তাদের দাম চরিত্রসৃষ্টি, অলঙ্কার-বৈচিত্র্য, শ্লোক-পাণ্ডিত্য ইত্যাদির বিচক্ষণতায়। এই শ্রেণীর গল্পগুলোকে ইংরিজি tale বলে পরিচিত করলেই বোঝা যাবে স্পষ্ট। এ রকম গল্পগ্রন্থ হিসেবে 'বৃহৎকথা' ও 'বেতালপঞ্চবিংশতিকা' শ্রেষ্ঠ স্থান নেয়। 'বৃহৎকথা' কথা রচনা করেন মহাপণ্ডিত গুণাঢ্য পঞ্চম শতকের গোড়ার দিকে। 'বৃহৎকথা'য় গুণাঢ্য অধিকাংশেই ব্যবহার করেন পৈশাচি ভাষা। পৈশাচি ছিল তখনকার বিন্ধ্য পর্ব্বতের পার্ব্বত্য জাতিদের জাতীয় ভাষা। এ ভাষা প্রয়োগে লেখকের পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় এর সঙ্গে প্রাকৃত ভাষা সংমিশ্রণে, যার থেকে সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধটা পাওয়া যায় খুব কাছাকাছি। এর প্রভাব খানিকটা পাওয়া যায় কালিদাসের বিখ্যাত নাটকগুলোতে প্রাকৃত সংলাপ প্রয়োগে। বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনের ভেতর দিয়ে গল্পাংশকে পুষ্ট করে তোলার অদ্ভুত এক ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায় 'বৃহৎকথায়' যার জন্যে গুণাঢ্য সংস্কৃত সাহিত্যে আজও অমর। মূল গল্পাংশে অনেকটা দেখা যায় রামায়ণের প্রভাব। রাজা নরবাহন দত্তের বীরত্বজীবন নিয়েই এর বিষয়বস্তু। নরবাহন দত্ত প্রথমে বেগবতী পরে গোমুখের সঙ্গে দীর্ঘ প্রবাসে যাত্রা করে হাজির হন এসে বিদ্যাধরের রাজ্যে। সেখানে তিনি রাজকুমারী মদনমঞ্জুকাকে বিবাহ করেন। সে সময়ে মদনমঞ্জুকার রূপে আকৃষ্ট হয়ে দুষ্ট চরিত্র মানসবেগ রাজার শত্রুতা অর্জ্জন করে, যেমন রামায়ণে দেখা যায় রাবণ আকৃষ্ট হন সীতার প্রতি। সীতার মতই মদনমঞ্জুকাকে লেখক দেখিয়েছেন সতী সাধ্বী করে। রাজা নরবাহন দত্তের বিবাহোত্তর বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী জীবন অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। মদনমঞ্জুকার চরিত্রেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব স্পষ্টকরে দেখান হয়েছে। তাই কজন টিপ্পনীকার মন্তব্য করেছেন 'বৃহৎকথা'য় গুণাঢ্য বৌদ্ধধর্ম্মই প্রচার করেছেন বেশী করে। কিন্তু সাহিত্যিক বিচারে তাঁদের এ মন্তব্য দাঁড়ায় না। কারণ গ্রন্থটাতে বর্ণনাভঙ্গী, চরিত্রসৃষ্টি, সংলাপ প্রয়োগ, শ্লোক সংযোজন এগুলোর মধ্যে দেখা যায় এমন এক বিশিষ্টতা যার জন্যে এ পাঠক মনে একটা গভীর ছাপ রাখতে পারে চিত্তাকর্ষী সুখপাঠ্য গল্প হিসেবে। গল্পের স্বচ্ছ গতির সঙ্গে এক একটা চরিত্রকে খাপ খাইয়ে তাকে

স্পষ্টতর করে পাঠকের মন অধিকার করতে একটা অদ্ভুত কৌশলের পরিচয় আমরা পাই গুণাঢ্যের মধ্যে। পরবর্তী কালের নাট্যকাররাও তাঁর কাছে মনে হয় এ বিষয়ে যথেষ্ট ঋণী। 'বৃহৎ-কথা'র নরবাহন দত্ত, গোমুখ, মদনমঞ্জুকার মতন চরিত্রগুলো সংস্কৃত সাহিত্যে হয়ে থাকবে অমর।

আমোদদায়ক গল্প হিসেবে 'বৃহৎকথা'র পরই আসে 'বেতাল পঞ্চবিংশতিকা'। 'বৃহৎকথা' রচিত হয়েছিল গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে। 'বেতাল পঞ্চবিংশতিকা' রচিত হয়েছিল প্রধানতঃ সরল গদ্যে। তবে এতে শ্লোক যে নেই একেবারে তা নয়, যা আছে তা খুবই কম আর গুণে 'বৃহৎকথা'র শ্লোকগুলোর তুলনায় নিকৃষ্ট। লেখকের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। তবে শিবদাস যে লেখক ছিলেন তা পণ্ডিতেরা স্বীকার করে নিয়েচেন। গল্পগুলো রচিত হয়েছিল সরল সংস্কৃত ভাষায়। পঁচিশটি গল্প পর্য্যায়ক্রমে এমনভাবে সাজান হয়েচে যে প্রত্যেকটি গল্পের সঙ্গে আর একটার যোগসূত্র পাঠককে খুঁজে বার করতে হয় না কষ্ট করে। গল্পের শেষে একটা অদ্ভুত অনুসন্ধিৎসা ভাব পাঠককে পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত থাকে। এই অনুসন্ধিৎসা ভাব সৃষ্টি করার মুন্সিয়ানাতেই লেখকের কৃতিত্ব। মহারাজ বিক্রমাদিত্য শ্মশানে মৃতদেহ আনতে গিয়ে প্রেতাত্মার অদ্ভুত গল্পের অবতারণায় তাঁকে বিব্রত করার কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী নিয়েই 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র রচনা। কাহিনী খুব চিত্তাকর্ষক ও আবালবৃদ্ধবণিতা সব পাঠকের প্রিয় পাঠ্য।

এই সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে 'শুকসপ্তুতি' নামে আর এক গল্প গ্রন্থের। 'শুকসপ্তুতি'র রচয়িতা ও রচনাকাল অজ্ঞাত। একটা শুক পাখীর মুখে সত্তরটা চিত্তাকর্ষক গল্প এর বিষয়-বস্তু। রচনায় অনেকটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায় 'বেতাল পঞ্চবিংশতিকা'র। বিশেষত্ব এই যে সত্তরটা গল্প এমনভাবে পর পর রচিত হয়েছে যে পাঠকের ধৈর্য্য কখনও ভেঙ্গে যায় না বরং গল্পের পরবর্ত্তী অবস্থা জানবার জন্যে জাগিয়ে রাখে একটা আগ্রহ। সহজ সংস্কৃত ভাষায় গল্পের পর গল্প সুন্দর ভাবে প্রকাশ করে সুখপাঠ্য ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে বিশেষ বর্ণনা ও প্রকাশভঙ্গী লেখকের বিশেষত্ব।

গল্পের দিক থেকে সংস্কৃত সাহিত্য অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায় ততটা উন্নত না হলেও সংখ্যাল্পতার ভিতরেই পাওয়া যায় যথেষ্ট গুরুত্ব যেটাকে আমরা অন্তভাবে বলতে পারি বঙ্কিমচন্দ্রের মত, 'এর যা আছে তা এরই'। তাই এর স্বাতন্ত্র্য। গল্পগুলোর বৈশিষ্ট্য শুধু উপমা, অলঙ্কার, শ্লোক, চাতুর্য্য ও বর্ণনার স্বাভাবিক সরলতার মধ্যে। এতে একদিক থেকে যেমন প্রকাশ পেয়েছে গভীর পাণ্ডিত্য অন্য দিকে তেমনি পরিচয় পাওয়া গেছে গল্পগুলোর জনপ্রিয়তার। বিষয়বস্তুর ভিতর জটিলতা, তত্ত্বালোচনা মূলক কিছু দেখা যায় না। তাই সব শ্রেণীর পাঠকদের মন সহজেই আকৃষ্ট হয়। গল্পগুলোতে বিষয়বস্তুর সরলতার সঙ্গে তুলনামূলক চরিত্র সৃষ্টির দ্বারা গল্পাংশকে একটা সুষ্ঠু গতি দেওয়ার জন্যে সংস্কৃত গল্পের স্থান অনেকটা উঁচুতে। গল্প-বর্ণিত চরিত্রগুলো তাই এতটা পরিচিত আমাদের কাছে, যাদের উদাহরণ আজও আমাদের সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের যথেষ্ট কাজের। এখানে সংস্কৃত গল্পের জনপ্রিয়তা।

সাহিত্য ও সমাজ

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়, সাহিত্য শাখার সভাপতি মহাশয়, সমবেত ভদ্রমহিলাবৃন্দ ও বন্ধুগণ—প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে সমগ্র উত্তর ভারতের বাঙ্গালী সমাজের সাহিত্যিক প্রতিনিধি। আমার সৌভাগ্য যে, আজ বাংলা দেশ থেকে এই সুদূর মীরাটে এসে সেই সম্মেলনের উৎসব স্বচক্ষে দেখবার সুযোগলাভ করেছি।

আপনাদের সম্মেলনে (বঙ্গ-সাহিত্য শাখার) পৌরোহিত্য করতে আহ্বান করে আমাকে আপনারা যে সম্মান দান করেছেন, সেজন্য সর্ব্ব প্রথমেই আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। এই সম্মেলনে যোগদান করার একটি অন্তর্নিহিত তাগিদ আমার আছে; কারণ লেখকের প্রথম প্রয়োজন বৃহত্তর সমাজ ও গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসা। আপনারা এ সুযোগ দান করেছেন আমাদের, বাংলার সাহিত্যসেবিগণ সকলেই এর উপকারিতা সম্বন্ধে সচেতন।

বর্ত্তমানে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় সুসংবাদ, এ সাহিত্যে ক্রমশঃ সমাজ-চেতনায় মুখর হয়ে উঠচে। গত মন্বন্তরের পর থেকে বাংলা সাহিত্যে এই লক্ষণটি অতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেচে আরও বেশি করে। তারাশঙ্কর, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি লেখকগণ এ সম্বন্ধে পথপ্রদর্শক। তাঁদের বৈশিষ্ট্য একদিন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পৃথক অধ্যায় সৃষ্টি করবে। এই সমাজচেতনা ব্যক্তিবোধের সঙ্গে বিরোধিতা করেনি, বরং তাকে আরও বাস্তব ও আরও সক্রিয় করে তুলতে চেয়েচে। সেই সমাজবোধ অনিষ্টকর যা কিনা মানুষের দলবদ্ধ জীবনযাপনের দাবী নিয়ে ব্যক্তিবোধকে ক্ষুন্ন করে। সাহিত্যের সবচেয়ে বড় কথা এই ব্যক্তিবোধ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। মানুষ নিয়ে ইতিহাস, মানুষ নিয়েই সাহিত্য। আশা ও নিরাশার অনুভূতিতে সদাচঞ্চল কতকগুলি মানুষ নিয়েই যেমন সমাজ, তাদের প্রত্যেকের অনুভূতির চরিতার্থতা দিয়েই সমাজবোধের সার্থকতা। চরিতার্থ ব্যক্তিবোধের সমষ্টিতেই সার্থক সমাজ গড়ে ওঠে। অতএব ব্যক্তিবোধ সাহিত্যে অবান্তর নয়, মূল উপাদান। মানুষ আকাশে বাস করে না, সমাজে বাস করে; তাই নভোচারী সাহিত্য তাকে স্বপ্নালু করে তুলতে পারে, জীবনযাপনের সমস্যাসমূহের সমাধানে সাহায্য করতে পারে না।

বাংলাদেশ যখন এত বড় মন্বন্তরের সম্মুখীন হোল, বাংলার রসস্রষ্টা সাহিত্যিকদের মনে তা যথেষ্ট বেদনা ও আবেগের সৃষ্টি করে গেল। তাঁরা প্রথমে চোখ মেলে চেয়ে দেখার সুযোগ পেলেন। কল্পনার রসবিলাস নিয়ে সাহিত্য রচনা করলে তা আজ নিতান্ত অসার বলে পরিগণিত হবে জাতির উগ্র বেদনাবোধের সম্মুখে। জাতিকে তা সাহায্য করবে না। পথ দেখিয়ে দিতে পারবে না। দেশকে জাগাতে হবে। মন্বন্তরের করাল ধ্বংসলীলার মধ্যেও বহু নরনারীকে দিব্য আরামে সোনার পালঙ্কে শুয়ে রাজভোগ খেয়ে মোটরচারী বিলাস-ব্যসনের পঙ্কে নিমজ্জিত থাকতে দেখে তাঁরা বুঝলেন, দেশ সজাগ হয়নি। তাঁরা

ঘুম ভাঙানোর ভার নিয়েছিলেন। প্রবোধের 'অঙ্গার', মনোজ বসুর 'দ্বীপের মানুষ' প্রভৃতি সেই ঘুম ভাঙানোর গান। ঘুম ভাঙলো কিনা জানি না, কিন্তু লজ্জিত হোল অনেকে।

আজও অনেকে অভিযোগ করেন, বাংলা সাহিত্যে এখনো সমাজবোধ, রাষ্ট্রীয় চেতনা প্রভৃতি অঙ্কুর অবস্থায় মাটি থেকে উঁকি মারচে মাত্র। এত বড় আগস্ট আন্দোলন, জাতীয় আন্দোলন এতটুকু দোলা দেয়নি কথাসাহিত্যিকদের মনে। কোথায় এই বিপ্লবের সাহিত্য, যা দেশকে বল দেবে, দেশবাসীর মনে আশা ও উৎসাহ আনবে, পথ দেখিয়ে দেবে। দু-একজন উন্নাসিক সমালোচক এ নিয়ে সাময়িক পত্রে শুধু অভিযোগ করেই ক্ষান্ত হন নি, বাংলা সাহিত্যিকদের অক্ষমতার ইঙ্গিতও করেচেন।

বাংলার সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে কোন প্রত্যুত্তর দেওয়ার আবশ্যক নেই। লেখা আসে কবিমানসের অন্তর্নিহিত তাগিদ থেকে। কবিমানসের বিভিন্নমুখী গতি থেকে বিভিন্ন ধরনের লেখার সৃষ্টি। যেদিন বাংলার লেখকেরা দেশের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন, সেই প্রসারিত চেতনাই তাদের বাধ্য করবে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সমস্যা ও সমাজ সমস্যাকে আশ্রয় করে গল্প ও উপন্যাস লিখতে। এই ব্যাপক চেতনার লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেচে বহু শক্তিশালী লেখকের সাম্প্রতিক রচনায়। আমরা পেয়েছি দুর্ভিক্ষ, পেয়েছি আগস্ট আন্দোলন। একটি জীবন্ত সাহিত্য বিভিন্ন আঙ্গিক ও মাধ্যমে দেশের রাষ্ট্রীয় সমস্যাগুলি ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় করে রেখে দিচ্চে। বহু লেখার আবশ্যক কি? একখানি সার্থক রচনায় এক এক যুগকে অমর করে রাখে, যেমন সোভিয়েট রাশিয়ার দুঃখদুর্দ্দশার চিত্র ফুটে উঠেচে ওয়েলেস্কির 'দি রেনবো' নামক উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে ভারতব্যাপী বিরাট রাষ্ট্র আন্দোলনের চিত্রকে অমর করে রেখে গেলেন। এঁদের প্রতিভা ঐ সব রচনাকে অপূর্ব্ব আঙ্গিকের মধ্যে দিয়ে যুগ প্রয়োজনের উর্দ্ধে উন্নত করে দিয়েচে। গণ-চেতনা যে কিভাবে অমর সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে, তার খোঁজ নিতে গেলে ওগুলির সঙ্গে সম্যক পরিচয় হওয়া প্রয়োজন।

সাহিত্যের মাপকাঠি হচ্চে তার রসোত্তীর্ণতা। যুগের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে জীর্ণ পুঁথির পাতার মত অবহেলিত হয় যে রচনা মানব-মনের প্রয়োজন-সাম্য যা বজায় রাখতে পারে না, তার দুর্গতির কারণই হচ্চে রসোত্তীর্ণতার অভাব। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে সেই বিষয়টি রসোত্তীর্ণ করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে অনেক ক্ষেত্রেই। নিজের ব্যথাবোধ ও নিপীড়িত চেতনা কবিমানসকে যে রচনায় উদ্বুদ্ধ করে, তার প্রতি ছত্রে ফুটে ওঠে অনুভূতির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। আজ যে ব্ল্যাকমার্কেট, যে অসংযত অর্থলোলুপতা, যে বস্ত্রদৈন্য, অন্নকষ্ট দেশব্যাপী হয়ে উঠেচে তাতে নিছক কল্পনাবিলাসের সাহিত্য এখন অসার বলে পরিগণিত হবেই, সঙ্গে সঙ্গে লেখকদের মধ্যে ফুটে উঠচে নবচেতনা দৃষ্টিভঙ্গীর নবীনতা, দৃঢ় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শ। এসব যে এখনো দানা বাঁধেনি, এ খুব সত্য কথা। নূতন পরিপাক করতে সময় লাগে। সাহিত্য পরিপাক করতে সময় লাগে। সাহিত্য সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভের রচনা নয় বা রাজনৈতিক প্রচারপত্র নয়, মনের থেকে সত্য ও বাস্তব না হয়ে উঠলে লেখকের

হাত দিয়ে যে রচনা বেরোয়, তার রসোত্তীর্ণতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না—সুতরাং লোকের হাততালি, বাহবা বা পরামর্শদাতা সমালোচকদের বিজ্ঞ পরামর্শের প্রভাবে বা অতি আধুনিক যুগস্রষ্টা আখ্যায় ভূষিত হবার লোভে বা দুরাশায় যাঁরা এ পথে অগ্রসর হবেন, তাঁরা ঠকবেন। সাংবাদিকদের ধর্ম, সাহিত্যিকের পক্ষে পরধর্ম ; এটা তাঁরা জানেন এবং জানেন বলেই আজও আমরা বাংলা সাহিত্যে আশানুরূপ সন্ধান পাচ্চি না আধুনিক দিনের উগ্র সমস্যাগুলির। কিন্তু দিকচক্রবালে নব-বাহিনীর অশ্বখুরোত্থিত ধূলি দেখা দিয়েচে, ওদের শঙ্খধ্বনি দূর থেকে আমাদের কর্ণে এসে ধ্বনিত হচ্চে, ওরা আসচে, হতাশার কারণ নেই। বিজ্ঞ সমালোচকদের দীর্ঘশ্বাস এবং 'কিছু হচ্চে না, কিছু হচ্চে না' ধ্বনির উত্তর এরা দেবে।

আর একটা বড় লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাহিত্যে। আধুনিক বা পাশ্চাত্যের গণ্ডি বাংলার শ্যাম গ্রামাঞ্চল ছাড়িয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়েচে, বাংলার বাইরের বহুদেশের পটভূমিকে আশ্রয় করে। বাংলার বেণুকুঞ্জ ও বৃহত্তর বাংলার অরণ্য-পর্ব্বত, মরুদেশ, কঙ্করময় রুক্ষ মালভূমি সবই তার সমান আদরের বস্তু। মানুষের মধ্যে যে লেখক, যে শিল্পী বাস করে, তার কাছে দেশ বা জাতের কোনো সীমানা নেই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বড় লক্ষণ এই যে, আজ সে উদার মুক্তির ব্যাপ্ত নীলাকাশতলে এসে দাঁড়িয়েচে কি গল্পে, কি উপন্যাসে, কি কবিতায়। এ পথে খনিত্র ধরে আগুয়ান হবেন যাঁরা, তাঁদের কত দল মরু-প্রান্তরে বেঘোরে মারা যাবেন জানি কত লোকের পাত্তা খুঁজে পাওয়া যাবে না, তবু তাদেরই কপালের ঘামে পথের ধূলো দেবে ভিজিয়ে, একটা সুনির্দ্দিষ্ট পথরেখা ফুটে উঠবে ওদের গীতি-প্রাণ চরণ-ক্ষেপের ধ্বনির তালে তালে।

এই খনিত্র বাহিনী নতুন সাহিত্য রচনা করেচে, যে কোন মাসিকপত্র খুঁজে দেখলে এদের গল্প পাওয়া যাবে, কবিতা পাওয়া যাবে, উপন্যাস পাওয়া যাবে। বহু তিরস্কারের মধ্যে দিয়ে এদের সার্থকতা আসবে একদিন। বহু ব্যর্থতা এদের প্রাণশক্তিকে আরও দৃঢ়, আরও সংহত করে তুলবে। কিন্তু পরবর্ত্তী ইতিহাস হয়তো এদের সম্বন্ধে নীরব থাকবে, জয় বিজয়ের ইতিহাসে নাম থাকে সম্রাটদের, সেনাপতিদের, খনিত্র বাহিনীর লোকদের নাম তাতে লেখা থাকে না। তাতে কি ? আমরা আজ এদের অভিনন্দন জানাই। এদের ক্রমবিকাশের পারম্পর্য আজ আমাদের কাছে পরিস্ফুট নয়, কারণ আমরা এ যুগেরই অধিবাসী, এত নিকটে থেকে দেখতে গেলে অনেক সময় অনেক দুঃসাহসিক এক্সপেরিমেণ্টকে নিছক বাজে আধু-নিকতা বলে ভুল করার বিপদ আমাদের পদে পদে। বাংলার উপন্যাস সাহিত্য সত্যিই পেছনে পড়ে আছে অন্য দেশের উপন্যাসের তুলনায়। মননশীল উপন্যাসের কথা বাদই দিলাম, কিন্তু শুধু ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের ক্ষেত্রেই, যে ঘটনাপ্রধান উপন্যাস বহু আধুনিক সমালোচকের চক্ষুশূল এবং যে পর্যায়ে তাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি ফেলতে দ্বিধা করেন না, সেই ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের ক্ষেত্রেই বা টলস্টয়ের War and Peace বা ডস্টয়ভস্কির Brother Karamzov-এর মত উপন্যাস কোথায় ?

অবশ্য একটা আশার কথা এখানে বলে রাখি। বৈদেশিক সাহিত্যেও আদর্শস্থানীয় মনন-

প্রধান উপন্যাসের সংখ্যা হাতে গুণে ঠিক করা যায়। গত মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে ফরাসী লেখক ও সমালোচক জুলিয়ান বেন্দা এই মননপ্রধান কথাশিল্পের ক্ষেত্র তৈরী করেন, তাঁর আন্দোলনকে তখন অনেকে সাময়িক হুজুগ বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আজ এই শ্রেণীর উপন্যাস ইউরোপীয় সাহিত্যে ক্রমশঃ দেখা দিতে শুরু করেচে। যদিও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, নামজাদা ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে প্রায় সকলেই সাবেক পন্থী। ওদেশের পাঠক মনেরও গ্রহীষ্ণুতার প্রসারতা যে আমাদের দেশের চেয়ে বেশী নয়, বৃটিশ সাহিত্যের দরবারে জেমস জয়েসের মত খাঁটি মননপ্রধান লেখকের অভ্যর্থনা লক্ষ্য করলেই সেটি অনুমিত হয়।

শরৎচন্দ্রের কিছু পূর্ব্ব থেকে আমাদের সাহিত্যে একটা অস্পষ্ট ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুর ধ্বনিত হচ্ছিল। ব্যষ্টি সমষ্টির মুখ চেয়ে কেন নিজের সুখ-সুবিধার বিসর্জ্জন দেবে এই একটি কঠিন সমস্যামূলক প্রশ্ন ক্রমশঃ ঠেলে উঠছিল সাহিত্যে—শরৎ-সাহিত্যে সেই ব্যষ্টিকেন্দ্রের সুর অতি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এইটিই আসলে শরৎ-সাহিত্যের মূল সুর। সহৃদয়তা ও মানবতা শরৎ-সাহিত্যের আর একটি সুর।

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ বইগুলির রচনা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেচে তখন বাংলা সাহিত্যে একটি আন্দোলন শুরু হোল, এই আন্দোলনটি অতি উগ্রভাবে ব্যষ্টিকেন্দ্রিক। 'কালি-কলম' ছিল এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দিগের অন্যতম মুখপত্র। ব্যক্তিত্বের উদ্দাম সাধনাই এই সময়ের বহু গল্প ও কবিতার মূলতত্ত্ব। ঐ একই মূলতত্ত্বের অঙ্গ হিসেবে নানা যৌন সমস্যা বাস্তব বা কাল্পনিক, বিভিন্ন রঙে প্রতিফলিত হয়ে দেখা দিতে লাগলো পাঠকদের সামনে। এই আন্দোলন যথেষ্ট তিরস্কৃত হয়েছিল সে সময়, সে কথা সে যুগের পাঠকের অজ্ঞাত নয়, কিন্তু সেই নব আলোড়নের সংহত শক্তি বাংলায় একদল নতুন শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা তৈরী করেছিল। লেখকদের নব দৃষ্টিভঙ্গী অলক্ষ্যে আশ্রয় করেছিল পাঠকদের। সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বড় সুলক্ষণ এই যে, নব আন্দোলনের লেখকরা গ্রহীষ্ণু পাঠকদল সৃষ্টি করেন। যাদের রসবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ব্ব যুগের পাঠক সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক অগ্রসর। শরৎপূর্ব্ব বা রবীন্দ্রপূর্ব্ব যুগের উপন্যাস বর্ত্তমানের অতি তরুণ পাঠক-পাঠিকার কাছে জোলো এবং ফিকে ঠেকবে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অবিশ্যি এ পর্য্যায়ে পড়ে না—তিনি ছিলেন যুগপ্রবর্ত্তক আচার্য্য, তাঁর অসামান্য প্রতিভা সাধারণ লেখকদিগের দুরধিগম্য, তাঁর দুঃসাহসিকতা এখনও পর্য্যন্ত বাজালার লেখকদের নিকট আদর্শস্থানীয় হয়ে আছে এবং চিরকাল থাকবে।

কবি বা শিল্পী মানসের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ থেকে রসসৃষ্টি সম্ভব হয়। এবিষয়ে শিল্পীর স্বাধীনতা অনস্বীকার্য্য। অন্তর্নিহিত প্রেরণা ভিন্ন শিল্পী কখনও অগ্রসর হবেন না। বাইরের লোকের তাগিদে বা বিরুদ্ধ সমালোচনার ভয়ে বা সস্তা হাততালি পাওয়ার লোভে অতি আধুনিক হওয়ার যে চেষ্টা, লেখকের পক্ষে তা মৃত্যুর পথ। এই কথাটি আমাদের সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত এটি একটি বড সত্য সাহিত্য ক্ষেত্রে এবং এই সত্যটি না মানার দরুণ বহু

তরুণ আশাবাদী লেখকের ও লেখিকার ক্ষমতাকে বিপথে গিয়ে নষ্ট হতে দেখেছি। সাহিত্যের চক্ষেও অন্যান্য মত শক্তিকে ও অভিজ্ঞতাকে অর্জ্জন করতে হয় সাধনার দ্বারা। তখন অন্তর্দৃষ্টি আপনিই খুলে যায়, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী অপরের বই পড়ে লাভ করতে হয় না—আপনি এসে আশ্রয় করে শিল্পীকে। এ যেন যোগীর তৃতীয় নয়ন খুলবার মত ব্যাপার। কিন্তু যতক্ষণ সেই দুর্লভ ঘটনা ঘটবে ততক্ষণ শিল্পী যেন কারো প্রশংসার লোভে বা ধমকের ভয়ে স্বধর্ম ত্যাগ না করেন। এতে যদি তাঁর অদৃষ্টে হাততালি না জোটে, নাই জুটবে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—আত্মসংজ্ঞাহীন ভীরুচিত্ত শিল্পী নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ডেকে আনেন।

লেখক ও কবির মধ্যে একটি সহজাত নিঃসঙ্গতা আছে। দৈনন্দিন জীবনোত্তীর্ণ বৃহৎ আনন্দলোকের আবাহন তাঁদের লক্ষ্য, যার জন্যে লেখকের প্রয়োজন আপনার ভাবজগতের মধ্যে যত বেশীক্ষণ সম্ভব এবং যত গভীরতম রূপে সম্ভব বাস করা। নিরাসক্ত আনন্দের বা দুঃখের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি। আপনাকে প্রতি মুহূর্ত্তে পূর্ণ করে ও প্রতি মুহূর্ত্তে অতিক্রম করে তিনি অগ্রসর হন। চারিপাশের মানবহৃদয়ের অন্তরতম স্পন্দনটিকে তিনি প্রকাণ্ড ভাবের অনুভবের চেষ্টা করেন বলেই তো তাঁদের শ্রেষ্ঠ প্রেরণার ক্ষণে যখন কথা বলেন, তখন তাঁর মধ্যে বিশ্বমানবের কণ্ঠ বেজে ওঠে, জীবনের মূলতম রহস্যের আবেগ একান্তভাবে সঞ্চারিত হয়। বাস্তবকে বুঝতে হোলেও দূর থেকে তাকে দেখতে হয় লোকলোচনের অতি স্পষ্ট পাদপ্রদীপের সামনে অনুক্ষণ থেকে তা সব সময় সম্ভব হয় না। এর জন্যে চাই নির্জ্জনতা, খৃষ্টের চল্লিশ দিনের নিঃসঙ্গ অবকাশ, বুঝবার ও বোঝাবার প্রয়াসে তপস্যা। সৃষ্টির আনন্দ আসে যে বিরাট অনুভূতি থেকে—যাকে বলেছেন 'আনন্দ'—"আনন্দাদ্ধেব খলু ইমানি সর্ব্বানি ভূতানি জায়ন্তে"—সে আনন্দ সহজ প্রাপ্য নয়, সে আনন্দ আপন রস আহরণ করে বিশ্বের তাবৎ সৌন্দর্য্যরাজির মধ্যে থেকে, পুরাতন সৃষ্টির নব উদ্বোধনের দ্বারপথে তপস্যা ভিন্ন সে জগৎ, সে পথ চির অপরিচিতই থেকে যায়। এক শীতের নির্জ্জন অপরাহ্নে ছন্নছাড়া দরিদ্র সরাইখানা ও সরাইওয়ালীর দুঃখময় জীবন আলফাঁস দোদের মনে যে করুণ অনুভূতি, যে ব্যথা ও বেদনাবোধ জাগিয়েছিল, আমাদের মনেও সেই জীবনের ছবিটি রেখাপাত করে গেল, কারণ—লেখকের অনুভূতি তাঁর তপস্যাভূমি সেই সরাইখানার প্রাঙ্গনে একটি শীতের সন্ধ্যার জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। এযুগেই হোক বা সে যুগেই হোক, নিজের রচনা সম্বন্ধে প্রত্যেক লোক সচেতন থাকেন। কবিমানসের রসবোধ থেকে এ চেতনার উৎপত্তি। সর্ব্বপ্রথম তাঁর নিজের তৃপ্তির জন্যে লেখেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কমবেশী পরিমাণে একটি মানুষ আছে, যে নাকি স্বপ্ন দেখে, কোনো ক্ষণে আদর্শবাদের বা অভিজ্ঞতার অভিঘাতে তীব্র প্রেরণা অনুভব করে, জীবনের ধ্যানে সহসা হয় উন্মনা। রস-সাহিত্যের প্রধান কথা হচ্ছে এই স্বপ্নালু লোকটির তৃপ্তিবিধান করা। পাঠকের কথা ওঠে তার পরে। সাংসারিক সামাজিক প্রশ্ন ওঠে তার পর।

কিন্তু সহানুভূতিসম্পন্ন শিল্পী মানস যুগের স্পর্শ এড়িয়ে চলতে পারে না। যে সময়ে যে

যুগে তিনি জন্মেছেন তার সার্বিক অভিজ্ঞতা তাঁর নিজেরও। লোকান্তরিত ছবি আঁকবার সাধ্য তাঁর নেই। রাষ্ট্রনীতিক বা সামাজিক অভাববোধ বা অভিজ্ঞতা তাঁকে সুদৃঢ়ভাবে আত্মপ্রত্যয়ী হতে দেয় না। আধুনিক বঙ্গসাহিত্য এক শ্রেণীর শ্রেণীচেতনাকে আশ্রয় করে স্থির পথে অগ্রসর হচ্ছে, যে শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে শ্রেণীচেতনা জড়িত, তাদের মধ্যে লেখনী ধরবার যদি কেউ থাকে, ভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের মধ্যে যাদের জন্ম তাঁদের রচনায় পুর্ব্বোক্ত শ্রেণীর বক্তব্য ফুটে উঠবে কি না তা সার্থক বা পরিপূর্ণ কি না, এসব মূল্যবিচার বর্ত্তমানে করে কোনো লাভ নেই। সময়ের কষ্টিপাথরে এ সবের মূল্য নির্ধারিত হবে একদিন। তবে একটা কথা, দলের হুজুগে বা মতবাদের হুজুগে কেউ যেন এ শ্রেণীর সাহিত্য রচনা করতে না যান। তিনি ঠকবেন।

আত্মসমাহিত শিল্পী মানসের অন্তর্নিহিত প্রেরণা থেকে যে সাহিত্য রচিত হয় না, তার মূল্য বড় কম। দুদিনের হাততালির পরে তা নিঃশব্দে যায় মিলিয়ে। এ দায়িত্ব তাঁর নিজের কাছে নিজের, পাঠক গোষ্ঠিকে সচেতন করবার পূর্ব্বে তাঁকে বিচার করে দেখতে হবে তিনি নিজে এসম্বন্ধে কতদূর সচেতন। তাঁর কবিমানস তৃপ্ত হয়েছে কি না। আমার নিজের কাছে এ কথাটি সবচেয়ে বড় মনে হয়, যিনি যাই নিয়েই লিখুন না কেন, প্রত্যেক রস-সাহিত্যিকের একটা নিজস্ব ধর্ম্ম আছে। তাঁর নিজের কাছে যা পরিস্ফুট নয়, যা তাঁর কবি-মানসকে তৃপ্ত করে না, জনসাধারণের কাছে প্রশংসা পাওয়ার লোভেই হোক বা সমালোচকের ভয়েই হোক, তেমন সৃষ্টিতে তিনি কখনো হাত দেবেন না। তাঁর মন তখনই সক্রিয় হয়ে উঠবে, যখন তিনি বুঝবেন তাঁর সমগ্র ব্যক্তি সত্তাকে আশ্রয় করে এ লেখা তৈরী। এ কঠিন আত্মস্বাতন্ত্র্যের জন্যে চান সাহস, যা প্রত্যেক সত্যিকার সাহিত্যিকেরই আছে। নতুবা তিনি লেখক হোতেই পারতেন না। সাহিত্য ও আর্টের মস্তবড় কাজ সমসাময়িক সমস্যার উল্লেখ করা, সমাজসচেতন হওয়া, জনগণের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়া নবদৃষ্টিভঙ্গীর আবাহন—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে তাদের অপর উদ্দেশ্য হচ্ছে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, যা সমসাময়িক সমস্যারও অতীত। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করা অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের ন্যায় আর্টের ক্ষেত্রেও ভয়াবহ।

গভীর রহস্যময় এই মানবজীবন। এর সকল বাস্তবতাকে, এর বহু বিচিত্র সম্ভাব্যতাকে রূপ দেওয়ার ভার নিয়েছেন কথাশিল্পী। তাঁকে বাস করতে হবে সেখানে মানুষের হট্ট-কোলাহল যেখানে বেশী, মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের সুখদুঃখকে বুঝতে হবে। যে লেখক পাশের বাড়ীর প্রতিবেশীর সত্য চিত্র এঁকেচেন, তিনি সকল যুগের সকল মানুষের চিত্রই এঁকেচেন।

এত বড় মন্বন্তর ঘটে গেল বাংলাদেশে, অথচ চিত্রে ও রঙ্গমঞ্চে আমরা তার কি ছবি পেলাম? আমরা পেলাম নায়িকার নাকেকান্না প্যানপ্যানানি গান, মিষ্টি মিষ্টি কথায় নায়কের প্রেমনিবেদন আর মান্ধাতার আমলের যাত্রার পালার ট্রাডিশনে কতকগুলি পৌরাণিক নাটক। অথচ যাঁরা পুরাণ রচয়িতা জনগণকে বাদ দিয়ে তাঁরা চলেন নি। পুরান দিনের গনমনের কত ব্যথা-বেদনার ইতিহাস ব্যাস-বাল্মিকীর অমর মহাকাব্যগুলির মধ্যে

অক্ষয় হয়ে আছে—কত গাথা, কত কাহিনী কত কথা। সে যুগের পটভূমিকায় রচিত কথাশিল্প হচ্চে ও গুলি, যে কথা ভুলে গেলে চলবে না। সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল কত গাথা, কত কাব্য—রাজসভায় মহাকবি সেগুলির আবৃত্তি করে যেতেন শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে।

এইজন্যে পুনরায় বলি সমাজ-সচেতনতা লেখকের মস্তবড় গুণ। যিনি দেশের অভাব-অভিযোগের প্রতি উদাসীন থেকে সাহিত্য রচনা করেন, তিনি নিজের কবিমানসের প্রতি অবিচার করেন। জীবনবোধের দায়িত্ব তিনি কিছুতেই এড়াতে পারেন না, জনসাধারণের প্রতিঘাত মুখর জীবনধারা হইতে বহুদূরে একটি কল্পলোক সৃষ্টি করে তিনি কল্পনাবিলাস চরিতার্থ করতে পারেন, কিন্তু জীবনের ওপর তার কোন স্থায়ী ফল ফলে না।

গল্পে ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের হতাশার কারণ নেই, নবতর অশ্ববাহিনীর অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলি দিকচক্রবালে দেখা দিয়েচে, আগেই বলেছি। আর একবার সেই আশার বাণীটি উচ্চারণ করে আমি বক্তব্য শেষ করবো। এই তরুণ লেখকের অভ্যুদয়কে আমি অভিনন্দন জানাই। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করচি কয়েকজন শক্তিধর নবীন পূজারীর আবির্ভাব। এতে এই প্রমাণ হোল যে, বাংলার প্রাণশক্তির উৎস আজও তেমনি সজীব যেমন, তা ছিল মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের যুগে, যেমন ছিল ভারতচন্দ্রে যুগে, যেমন ছিল নব বাবু বিলাসের ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগে, যেমন ছিল বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্রনাথের যুগে। কলালক্ষ্মীর অর্ঘ্য এঁরা নিপুণহস্তে রচনা করেচেন, এঁরা নব্যবাংলার প্রাণস্পন্দন শুনতে পেয়েচেন, এঁদের লেখার মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠেচে সে প্রাণস্পন্দনের সুর। যে মাটিতে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন, সে মাটি অজর অমর। ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাব্যতাকে তা নিজের মধ্যে বহন করচে।

আর একটা কথা। সাহিত্য আমাদের পরিচিত করবে নিগূঢ় বিশ্বরহস্যের সঙ্গে, জীবনের চরমতম প্রশ্নগুলির সঙ্গে, দেবে আমাদের উদার, মৃত্যুঞ্জয় দৃষ্টি, সকল সুখ-দুঃখের উর্দ্ধে যে অসীম অবকাশ ও তৃপ্তি, আমাদিগকে পরিচিত করবে সেই অবকাশের সঙ্গে—এও সাহিত্যের একটা মস্তবড় দিক। তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। যে জ্যোতির মধ্যে বিশ্বদেবের কল্যাণতম মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত, আমরা যেন দেবতার সেই জ্যোতিকে, দৈনন্দিন জীবনোত্তীর্ণ বৃহত্তর ভাবকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দর্শন করি। জীবনের দুঃখের দিনে যে সাহিত্যরসিক অচঞ্চল থাকেন, শোকের মধ্যেও যিনি নিজেকে শান্ত রাখতে পারেন, দারিদ্র্যের মধ্যে যিনি নিজেকে হেয় জ্ঞান করেন না, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস রাখেন—সাহিত্য পাঠ তাঁরই সার্থক। সাহিত্য শুধু রসবিলাস নয়, জীবন সমস্যার সমাধানের গূঢ় ইঙ্গিত থাকবে। যে সাহিত্যের মধ্যে তাঁরই মধ্যে আমরা পাবো কলালক্ষ্মীর কল্যাণতম মূর্ত্তিটির সন্ধান।

জাত লেখক যিনি, তিনি কখনো নিজের আদর্শ ত্যাগ করে পরমধর্ম্মকে আশ্রয় করেন না, একথা ঠিকই। তাঁর শিল্পীমানস যে রচনাদ্বারা তৃপ্তিলাভ করবে না, সে লেখা তিনি কখনো লিখতে পারেন না। সাহিত্যের বিশাল উদারক্ষেত্রে সব শ্রেণীর লেখার স্থান আছে, সব রকম মতবাদের স্থান আছে। অমুক লেবেলে আঁটা সাহিত্যই আসল সাহিত্য, আর সব অপাংক্তেয়—

এমন গোঁড়ামি সাহিত্যের ক্ষেত্রে মারাত্মক। সাহিত্যিকের চাই সেই সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, সেই উদার সহানুভূতি, যার ফলে জীবনকে অখণ্ডরূপে তিনি বুঝতে ও জানতে পারেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গী ও সেই সহানুভূতিই তাঁর স্থাপন-ক্ষমতার মোড় ফিরিয়ে দেবে। সমাজ, দেশ, রাজনীতি সবকিছুরই রূপ সাহিত্যে ফুটে উঠবার অধিকার আছে, যদি তা রসোত্তীর্ণ হয়। রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের একমাত্র মাপকাঠি, এ কথা যে কোন সাহিত্যিক জানেন, যে কোন শিল্পী জানেন।

পরিশেষে যাঁরা অনুগ্রহ করে আমায় এ সভায় এনে আমার বক্তব্যটি বলবার সুযোগ দিয়েচেন, তাঁদের আর একবার ঐকান্তিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করচি। বন্দে মাতরম্।*

*অভিভাষণ

পত্রাবলী

[বিভূতিসাহিত্যে বিভূতিভূষণের লিখিত ব্যক্তিগত পত্রগুলি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। বিভূতি-রচনাবলী ১০ম খণ্ডে বিভূতিভূষণের কিছু পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে বিভূতিভূষণের একান্তই ব্যক্তিগত কয়েকটি পত্র প্রকাশিত হইল। এই সকল পত্রে ব্যক্তি-বিভূতিভূষণের একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। —সম্পাদক]

(নীচের ছয়খানি পত্র পত্নী শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত)

১

প্রিয়তমাসু,

আজই বনগাঁ থেকে এসেচি সকালের ট্রেনে। কাল তোমাদের বাড়ী বদল করা হোল—কানুমামা সেজন্যে গিয়েছিল, জিনিসপত্র সব নিয়ে যাওয়া হোল, রাত নটার পরে আমরা জগহরি শা'র কন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণ খেতে গেলাম, যতীনদা মন্মথদা ও আমি। শনিবারে গিয়ে দেখি গুটকে এসেচে, সে কাল ছিল। সে গিয়েছিল খোকা, বাদু ওদের সঙ্গে। খেয়ে এসে আমরা বাড়ী বদল করলুম, অর্থাৎ শুতে গেলাম নতুন বাসায়।

যাবার আগে আমাদের ছোট্ট ঘরটিতে এসে একা দাঁড়ালাম একবার। জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরে, নির্জ্জন বাড়ীটা,—কারণ বেলু, তুনু, খোকা ইত্যাদি সকলে জগহরির বাড়ী থেকে তখনো ফেরেনি। আমার কেবল মনে হচ্ছিল, যে বালিকার সঙ্গে এই ছোট্ট ঘরটির অতি ঘনিষ্ঠ ও মধুর সম্পর্ক, যার কতদিনের কত কথাবার্ত্তা, ঝগড়া, বকুনি, আদর ভালবাসা, হাসি ও কান্না এই ঘরের হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে আছে—সে যেন এইমাত্র এখানে ছিল, কোথায় গিয়েচে, এখুনি এল বলে। কতক্ষণ তার নীরব প্রতীক্ষায় একা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম জ্যোৎস্নার আলোয়, আধ-অন্ধকারে খাবারের ঘরের মেজেতে তার পদশব্দ শুনবার প্রত্যাশা করছি যেন প্রতিমুহূর্ত্তে—কিন্তু সে কই এল না তো? সত্যিই এত কষ্ট হল মনে! যেন কাকে ছেড়ে যাচ্চি এই বাড়ীতে—গত একটি বৎসরের কতদিন, কত রাত্রির উদ্বেগ বিহীন আসরে যার ডাগর চোখের দৃষ্টি আমার নিঃসঙ্গতাকে দূর করেছে, —মনে আনন্দ পরিবেশন করেচে—এই বাড়ীতে তার আঠারো বৎসরের যৌবন ও নববিবাহিতার বহু অনভিজ্ঞ সাধ-আহ্লাদকে ফেলে গেলাম চিরকালের জন্যে—এই বাড়ীতেই তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনগুলি আনন্দপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, বিবাহের পরে বহু বিনিদ্র রজনীর মধুময়ী স্মৃতিতে এই গৃহাভ্যন্তর অবেশাতুর, আজ সে পরিবেশ ত্যাগ করে যেতে হচ্ছে। আমার দীর্ঘ নিঃশ্বাস কেউ দেখেনি, কিন্তু আমার মনে যে বেদনার সুর বেজেছিল, কারো মনে কি সে সুরের প্রতিধ্বনি নিজেকে মুখর করে নি?

কল্যাণী, পরশু আমাদের বিবাহের দিনটি। আমার মনে আছে। কাল চিঠি ডাকে দিলে, আমাদের বিবাহের দিনের প্রভাতে চিঠি তোমার হাতে পড়বে। বহুদূরের যন্ত্রসঙ্গীতের মত ধ্বনিত হোক তার মধ্যে আমাদের গত এক বৎসরের হাসি গল্প ও গান, প্রত্যাসন্না মিলনযামিনীর মত অনন্দে মুখরিত হয়ে উঠুক তার প্রতিটি ছত্র—যে আনন্দ সৃষ্টির আরম্ভ থেকে নর ও নারীর পরস্পরের পরিচয়ের পথে বিচিত্র সেতু রচনা করে রেখেচে, যা আলস্যকে বহন করে আনে না, মনে জাগায় শক্তি ও উৎসাহ।

আজ স্কুলে পদত্যাগপত্র দিয়েছি। তোমাকে বোধ হয় বলেছি, বনগ্রামে মেয়ে-স্কুলে হেডমাস্টারের পদ নেবার জন্যে হরিদা বলেছেন আমায়। এদিকে পদ্মপুকুর স্কুলের হেডমাস্টার সুশীল মজুমদার সজনীকে বলে রেখেচেন জানুয়ারী মাস থেকে আমি যেন

তাঁদের স্কুলে চাকরি নিই। বোধ হয় ওঁরা কিছু বেশি মাইনে দেবেন—অবিশ্যি তার পরিমাণ আমার বলেন নি—কিন্তু আজ আমি ডি. এম. লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম কিছু আগে—তারা বলে চাকরি ছেড়ে যখন দিলেন, তখন ও আর করবেন না। বই লিখে আপনার বেশ চলেই যাবে। আমাদের হেডমাস্টার খুব দুঃখিত হয়েচেন আজ আমি নোটিশ দিতে।

মিত্তের সঙ্গে কাল বনগাঁয়ে দেখা। অনেকদিন পরে দেশে গিয়ে তার খুব আমোদ হয়েছিল, কিন্তু দুপুরে একটু গুরু-ভোজনের পরে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভাল হজম হয়নি বলে বনগাঁয়ের জলের বড় নিন্দে করলে লিচুতলার আড্ডায়। ঘাটশিলার জলের গুণে সেখানে অত নেমন্তন্ন ইত্যাদিতে যথেষ্ট খেয়েও শরীর খারাপ হতে দেখা যায়নি।

বনগাঁয়ের আর খবর ভাল। তবে বীরেশ্বরের বড অসুখ—পেটের পীড়া, হজম হয় না, শূলবেদনা—রক্তাল্পতা, চোখ হলদে—শরীর জীর্ণ। উনি ঘাটশিলা যেতে চান—আমি বলেচি দেবীপ্রসাদরা যে ঘরে ছিল, ওই ঘরদুটোর কথা। শরীরে একটু বল পেলে এবং শীত কিছু কমলে বোধ হয় যাবেন। আদিত্য দেবকে চেন? তুমি যদি না চেন, উমাকে বলো, আদিত্যের ছেলে সুখদার কাল বিয়ে হয়ে গেল কোঁড়ার বাগানে। জ্ঞানদা, সব্যসাচীর সম্পাদক আমার কাছে এসে তোমার আর একটা গল্প চেয়ে গিয়েচে—তোমার যে দুটো গল্প এখানে আছে—তার মধ্যে একটা দিয়ে দেব?

আমি যশোহরে যাই নি—গেলে বড্ড ঠাণ্ডা লাগিয়ে সেই রাত্রের ডাউন মেলে ফিরতে হত—সে বড় কষ্ট। বিষ্ণুপুরের ওরা আবার চিঠি লিখেচে, দেখি কি হয়। আমি ১৭ই থেকে ১৯শের মধ্যে ঘাটশিলায় যাচ্চি। তার আগে মেসের দ্রব্যাদি ও বই বনগাঁয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে—কিছু বই তোরঙ্গ ভর্ত্তি করে ঘাটশিলায় নিয়ে যাব। এই মাসের পর আর মেসে থাকব না।

আজ কলকাতায় বড় একটা ঘটনা হয়ে গিয়েচে। দুপুরে ক'খানা এরোপ্লেন 'War Savings Week' উপলক্ষে উড়নের ও ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শনের মহড়া দিচ্ছিল, তার মধ্যে একখানা হঠাৎ dive করতে গিয়ে বড়বাজারে আমড়াতলা গলির মধ্যে পড়ে চূর্ণ হয়ে গেছে। শুনছি নাকি দুজন পাইলট মারা গিয়েচে। দেখতে গিয়ে দেখি পুলিশ ও সার্জ্জেণ্ট দাঁড়িয়ে, লোকে লোকারণ্য—পুলিশ কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না—ব্যাপার বুঝে চলে এলুম। আর একটা খবর, হক্ মন্ত্রিমণ্ডলী আজ পদত্যাগ করেচে। এই দুই ব্যাপারে শহর তোলপাড়। ট্রামে করে দলে দলে ছাত্রেরা চীৎকার করে slogan উচ্চারণ করতে করতে যাচ্চে, খুব চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েচে এই উপলক্ষে।

আজ আসি। খেতে যাব…চাকর ডাকতে এসেচে দুবার। আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ কোর। ছুটু, বৌমা, উমা, শান্তি ও রাজেনকে স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিও।

ইতি

পুঃ। রেণু ও তার দাদা ঘাটশিলায় যেতে চেয়েছিল বড়দিনের সময়। যদি ওরা যায়

তবে কি ঘরদোরের কোন অসুবিধে হবে? অবিশ্যি ওরা থাকবে মোট ৪।৫ দিন। খুটুকে বোলো।

ঠিক হয়েছে আমরা সবাই একত্র হলে এখানে…অর্থাৎ তুমি বনগাঁয়ে এলে বারাকপুরে ঠিক সেই রকম পিক্‌নিক্ করব। সেই বনশিমতলার ঘাটে, সেই জায়গায়। জগদীশবাবুও নাকি আবার আসবেন। মায়া কি কানুমামা, বেলু, দুনু, বাচ্চু…জগদীশবাবু, আমি ও তুমি …ভারী মজার পিক্‌নিক্। বছর বছর বনশিমতলায় আমরা একবার রেঁধে খাব, বারাকপুরে আসবার সময়েও…কেমন তো? ওটা করতেই হবে আমাদের। আর কেউ না আসে, বারাকপুরে এসেই তুমি আর আমি, আর অবিশ্যি আসবে গুটকে ও ইন্দু এবং বুধো ও মানী ·· আমরা একদিন ওখানে পিক্‌নিক্ লাগাব।

সোমবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ। ১লা ডিসেম্বর '৪১।

২

৪১ নং মির্জ্জাপুর স্ট্রীট কলিকাতা।

কল্যাণীয়াসু,

কাল যথা সময়ে এসে পৌঁছেচি, অতএব কিছু ভেবোনা। এখন সেদিনকার সেই ভ্রমণ আমার কাছে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে—তুমি ওখানে আছ, সামনে এখনও পাহাড় দেখতে পাচ্ছ—কিন্তু আমার সামনে শুধু ইটকাঠের স্তূপ আর ধোঁয়া, প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য চোখের সামনে থেকে মুছে গিয়েচে। মনের অবকাশ মানুষের জীবনে যে কতবড় দরকারী জিনিস, তা এই কর্ম্মব্যস্ত, যন্ত্রযুগের অত্যন্ত হিসেবী ও সময়নিষ্ঠ মানুষেরা কি বুঝবে? এতে মানুষকে টাকা রোজগার করায়, ভাল খাওয়ায়, ভাল পরায়, ভাল গাড়ী ঘোড়া চড়ায়—কিন্তু জীবনকে মরুভূমি করে রেখে দেয়। প্রকৃতির শ্যামল বন পত্রসম্ভার নীল আকাশ, পাখীর কুজন, নদীর কলমর্ম্মর, অস্ত দিগন্তের সান্ধ্য মায়া এসব থেকে বহুদূরে এক জলহীন, বৃক্ষলতাহীন মরু।

তাই এখানে এসে আজ বেশী করে মনে পড়চে সেদিন দুজনে পাহাড়ে, ঝর্ণার ধারে ও বনাঞ্চলে যে সুন্দর প্রভাতটি একত্রে বেড়িয়ে ছিলুম—সেই কথা—এখানে কেউ কল্পনা করতে পারে তেমনতর গোলগোলি ফুলের শোভা? Sir Richard Hooker একজন বিখ্যাত উদ্ভিত্তত্বজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ১৭৭৬ সালে ভারতে এসে বহু বনপ্রদেশ থেকে এদেশের গাছপালার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে Himalayan Journal—৫।৬ ভলুমে সম্পূর্ণ বিরাট বই। এই বইয়ের মধ্যে গোলগোলি ফুলের শোভার খুব প্রশংসা করে গিয়েছেন Hooker, তাঁর নিজের হাতে আঁকা এই ফুলের রঙিন ছবিও আছে ওই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে। আমি তাঁর হাতে আঁকা এই ছবি দেখেই প্রথম বুঝতে পারি উনি কোন ফুলের কথা বলছেন।

…আমি শিবরাত্রির আগের দিন যাবো—এবং নিয়ে আসবো। খুটুকে বোলো যদি গাড়ী

যোগাড় করতে পারে তবে একবার যেন তোমাদের মুসাবনী ঘুরিয়ে নিয়ে আসে।

কেন, তোমার চিঠি পড়ে দেখলুম তুমি ঘাট শিলাতেই তো থাকতে চেয়েছিলে—তবে? ঘাটশীলা সত্যই ভাল জায়গা। বৌমাও খুব ভাল। থাক না দুদিন।

তোমরা আর একদিন ফুলডুংরি বেড়াতে যেও বিকেলের দিকে। অমন Space-এর রূপ আর কোথাও দেখবে না। বাংলাদেশে তো নয়ই। বনগাঁয়ে কি আছে, বনগাঁয়ে?

বেশি লিখবার সময় পেলুম না। সাড়ে ন'টা বেজেচে। এতক্ষণ অনেক লোকের ভিড় ছিল—একটু সময় করে চিঠিখানা লিখলুম। অনেক দিন পরে এসেচি বহুলোক দেখা করতে আসচে।

'যুগান্তরে' সেদিনকার মিটিংএর খবর বেরিয়েচে দেখলুম। আমার বক্তৃতাও বার হয়েচে। বনগাঁয়ে দেখচেন সবাই নিশ্চয়ই।

সামনের শনিবারে ভাবচি বারাকপুর যাবো, রবিবার দুপুরে খেয়ে দেয়ে হেঁটে বনগাঁ যাবো। রাত্রিটা থেকে সকালে কলকাতা আসবো। তবে এখনো কিছু পাকাপাকি ঠিক নেই।

প্রীতি ও ভালবাসা নিও। পত্রের উত্তর কালই চাই কিন্তু… বৌমা, উমা, শান্ত, দুটুকে স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিও।

প্রীতিবদ্ধ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চঃ শিবরাত্রি সোমবারে, সুতরাং দুটুকে বলো শনিবার ২২শে ফেব্রুয়ারী বম্বে মেলের সময় স্টেশনে থাকতে। ফেব্রুয়ারী ১৯৪১? যদি কোন কারণে বম্বে মেলে না যাওয়া হয়, তবে রাঁচি এক্সপ্রেসে নিশ্চয়ই যাবো।

৩

Cambala Hills

বম্বে, আলটামণ্ট রোড

রবিবার, ২৮।১২।৪৭

কল্যাণীয়াসু,

খোকার নামে একখানি চিঠি ইতিপূর্ব্বে দিয়েছি। আজ ৪ দিন হয়ে গেল বোম্বাই সহরে। খুব একজন বড়লোকের বাড়ী আছি। খাওয়া-দাওয়ার রাজসূয় ব্যবস্থা। যেখানে আছি, সেটি বম্বে সহরের এক প্রান্তে একটি দ্বীপ, তার ওপর একটি পাহাড়। পাহাড়ের ওপর বাড়ীটা। ঘরে তেতলার জানলা থেকে শুয়ে শুয়ে সমুদ্র দেখা যায়। কি সুন্দর সহরটি! যখন সমুদ্রতীরে সারি সারি আলো জলে বড় বড় পাহাড়ের মত বাড়ীগুলিতে তখন অনেক রাত্রে উঠে কি মায়াময় যে দেখায়! তোমার কথা মনে হয় তখন। এখান থেকে সভাস্থল ৭ মাইল, রোজ এঁদের মোটরে যাতায়াত করি। দু বেলাই। অনবরত সভা হচ্চে।

এখানকার দ্রষ্টব্যস্থান বহু, তবুও মালাবার উদ্যান, মহালক্ষ্মী মন্দির, এপোলো বন্দর, Gateway of India ইত্যাদি দেখা হয়েচে। আজ গজেনরা নাসিক গেল মোটরে, ওরা অনেক দূরে থাকে, ৭ মাইল দূরে। সকালে ফোন করেছিল কিন্তু যেতে পারিনি। প্রবোধ সান্যাল ও আমি এইমাত্র সভাস্থলে বসে পরামর্শ করলুম, কাল এলিফ্যাণ্টা যাবো। ফিরবার পথে ঘাটশিলা নামবো। তুমি ভেবো না আমার জন্যে।

কাল জ্যোৎস্না রাত্রে মালাবার হিল এর উদ্যান থেকে দূরের আরব-সমুদ্রের দিকে চেয়েছিলুম। সঙ্গে ছিল প্রবোধ, গজেন ও সুমথ। তোমার কথা এত বেশী করে মনে পড়ছিল! ভাবছিলুম বারাকপুরের বাড়ীর পিছনে ঘরে জ্যোৎস্নালোকিত বাঁশবনের কথা— তুমি আর আমি গভীর রাত্রে কতবার জানলা খুলে চেয়ে চেয়ে দেখতাম সে কথা মনে পড়লো। বোম্বাই সহরে তোমাকে একবার নিয়ে আসবো বাবলু বড় হোলে। যাঁদের বাড়ী আছি তাঁরা তোমাকে নিয়ে আসতে বলেচেন এখানে। নাসিকে ওঁদের বাড়ী আছে সেখানেও থাকতে বলেচেন। একদম শীত নেই এখানে। কখনো নাকি শীত পড়ে না এখানে। এখানকার আবহাওয়া নাকি এই রকম। দুপুরে রোদের বড় তেজ। সহ্য করা যায় না এত গরম। রাত্রে গায়ে একখানা পাতলা চাদরও লাগে না—শেষরাত্রেও না। বড় সুন্দর সহর। সমুদ্র ও পাহাড়ের এমন সমাবেশ এক জায়গায় কখনও দেখি নি। যেদিকে চাই সে দিকেই নীল সমুদ্র। ইলেকট্রিক ট্রেন চলে, তার কত যে স্টেশন—গ্রাণ্ট রোড, ওয়াডেলা, বোরিভিলি, চার্চগেট, দাদর, মাতুঙ্গা—আরও কত স্টেশন শুধু সহরের মধ্যেই।

তুমি আশীর্ব্বাদ নিও। বাবলুকে স্নেহাশীর্ব্বাদ দিও। বাবলুর নামে যে চিঠি দিয়েচি তা বোধ হয় এতদিনে পৌঁছেচে। মাকে সভক্তি প্রণাম জানিও। বালক-বালিকাদের আশীর্ব্বাদ দিও। ভাল আছি। ঘাটশিলায় নামবো। কাল বোম্বাইয়ে সাধারণ ধর্ম্মঘট। রেল, বাস, ট্রাম, কুলি, দোকান সব বন্ধ। কাল এলিফ্যাণ্টা যাওয়া হবে কিনা কি জানি। স্টীমারে চড়ে আরবসমুদ্র দিয়ে ৩।৪ ঘণ্টার পথ ঐ দ্বীপটি। ওখানকার পাহাড়ের গায়ে হিন্দু দেব-দেবীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর তৈরি। ঐতিহাসিক ডাঃ সুরেন সেন আমার সঙ্গেই আছেন, তিনিই বললেন পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর আগেকার নয় এ শিল্প।

বোম্বাইয়ে মারহাট্টা ও গুজরাটি বুলি সবাই বলে। হিন্দিও বলা হয় তবে খুব কম। হিন্দি বললে অনেকে বুঝতে পারে না। বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা চমৎকার মারহাট্টি বলচে।

তুমি ঘাটশিলার ঠিকানায় এর উত্তর দিও। কেমন তো? এখন বেলা দুটো। গাড়ী তৈরি, এখুনি আবার ৭ মাইল দূরবর্ত্তী সভায় যেতে হবে। পথে কি সুন্দর আরবসমুদ্র পড়ে রাস্তার ধারে। ওর্লি বলে একটা জায়গায়। তার ডান পাশে মহালক্ষ্মী Race course— ঘোড়দৌড়ের জায়গা।

বারাকপুরে ফুচুর মাকে একখানা চিঠি দিও। ইতি—শ্রীবিভূতি

৪

ছোটনাগরা ফরেস্ট বাংলো
(সারাণ্ডা)
২৬।১১।৪৯

কল্যাণীয়াসু,

আজ আমরা এখানে এসেছি, ঘন জঙ্গলের মধ্যে ক'দিন মোটরে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে থাকি। চারিদিকে শৈলশ্রেণী মণ্ডিত অপূর্ব্ব দৃশ্য। বন, খুব বন, যেমন বামিয়াবুরুতে দেখেছিলে। কাল এক জায়গায় বনে বেড়াতে গিয়ে ভালুকের ও বাইসনের পায়ের চিহ্ন অজস্র দেখেছি। এখানে বাঘের বড় উপদ্রব শুরু হয়েছে আজ ২।৩ মাস। গত ১৫ দিনের মধ্যে ৩ জন লোককে বাঘে নিয়েচে এই বাংলোর আশে পাশের জঙ্গল থেকে। ধনকুমার হো বলে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হোল কাল, সে বললে ২৩ ফুট লম্বা একটা পাইথন সাপ সে মেরেছিল আজ কয়েক মাস হোল এই জঙ্গলে। কি সুন্দর যে বনের শোভা, কত ফুল ফুটে আছে সর্ব্বত্র। কাল রাত্রে বাংলো থেকে ময়ূরের ডাক শুনেছি।

বাবলু কেমন আছে? আমার নাম করে কি না? আমি ৩০ তারিখে মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময়ে যে চক্রধরপুর লোকাল ট্রেন যায় ওখানে ৭টায়, ওতে ঘাটশিলায় পৌছুবো। যদি ও দিন না যাই, তবে পরের দিন নিশ্চয়। কেতো যেন স্টেশনে থাকে। আজ এখুনি আমরা এখান থেকে থলকোবাদ যাচ্চি। পথে বাবুডেরা নামক এক গভীর বনমধ্যস্থ বাংলোয় দুপুরের আহার সেরে নেবো। এখন বেলা নটা। চা খেয়ে বেরুচ্চি। হরদয়াল সিংয়ের গাড়ী—দু'খানা মোটর আমাদের সঙ্গে আছে। দুটু ও বৌমাকে আশীর্ব্বাদ দিও। দুটু এ সময় এখানে আসতে পারলে খুব ভাল হোত।

তুমি আশীর্ব্বাদ নিও ও কেতোকে দিও। ইতি—শ্রীবিভূতি

৫

কল্যাণীয়াসু,

রাগ মোটেই করতে পারবে না কল্যাণী। এবার কাজে বড়ই ব্যস্ত ছিলাম, মাসের শেষ, এসে দেখি এক রাশ কাজ জমে আছে হাতে, সেজন্যে চিঠি দিতে দেরি হয়ে গেল। কিন্তু কি আর এমন বেশি দেরি? চার দিন মোটে।

তোমাদের ওখান থেকে এসে প্রথম দু দিন বড় মন খারাপ হয়, এবারও হয়েছিল এবং দু দিনের চেয়ে বেশি স্থায়ী ছিল। এখনও যে নেই তা নয়। তোমার কথা যে কত মনে হয় তা কি বলব।

এর মধ্যে একদিন বঙ্কিম বলে একটি ছেলে আমার এখানে দেখা করতে এসেছিল। তোমার নাম করছিল, তোমার সম্বন্ধে অনেক ভাল কথা বললে। মায়াদের সঙ্গে পড়ে। একদিন মায়ার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, গত বুধবারে, সেদিন তোমার ছোট মামা কানুও সেখানে ছিল। কানুর মুখে 'রেবেকা' বলে একটা ছবির খুব প্রশংসা শুনে কাল স্কুলের ছুটির পর 'ছায়া'তে ওটা দেখতে গিয়েছিলাম—কিন্তু খুব ভাল লাগে নি। বইখানা অবিশ্যি Daphne Du Murrier নামে একজন বিখ্যাত লেখিকার রচনা।

সেদিন কানু বলছিল, কি বিশেষ কাজে বনগাঁ যেতে পারি নি, এবার শনিবারে নিশ্চয়ই যাবে।

সেদিনকার চালভাজা আর কলার বড়া এত ভাল লেগেছিল! ঠিক মনে হয়েছিল যেন আমার বাড়ীতে আছি। ও দুটো জিনিসই আমার প্রিয়, দেশ ছেড়ে এসে ওর মুখ বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না, আবার অনেকদিন পরে তোমাদের বাড়ীতে মা-বোনের যত্নের মধ্যে ওটা খেয়ে কি ভাল যে লাগলো!

কল্যাণী, সত্যিই আবার তোমাকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে এই মুহূর্তে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও কত জিনিস হয় না, তাই ইংরেজিতে বলেচে—"If wishes were horses beggars would ride."—নয় কি?

আমার সেদিনকার বিজ্ঞানের কথাগুলো মনে আছে তো? সময় কি করে মাপতে হয়, পৃথিবীর স্তর বিভাগ, তুষার যুগ ও তার কারণ নিশ্চয়ই ভুলবে না। আবার একদিন আরও বড় করে বলবার ইচ্ছে রইল।

এবার বেশ একদিন শরতের রৌদ্রালোকিত দিনে আমরা চাঁপাবেড়ের পথে বেড়াতে যাব। বারাকপুরেও যাবার মতলব রইল, এক-আধদিনের ছুটিতে হয় না, অন্ততঃ সোমবার ছুটি থাকলেও চলে। ভেবেছিলুম বেলুর জন্মদিনে যাব নিশ্চয়ই, কিন্তু ওদিন আমার অভিনন্দন পড়ে গিয়ে বড় মুস্কিল করেচে, তবে যদি কোন কারণে বা অতিরিক্ত বর্ষার দরুণ অভিনন্দনের দিন তারা পিছিয়ে দেন, তো নিশ্চবই যাবো বলাই বাহুল্য। তোমার দেওয়া সেই জিনিয়া ফুলটা এনে জল দিয়ে রেখেছিলাম, কাল রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখি একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে।

পূজোর সময় অনেকগুলো গল্প লিখবার তাগিদ এসেছে, লিখবার সময় হবে কিনা জানি নে—তবে আজ একটা লিখতে আরম্ভ করেচি। রত্নাদেবী কাল চাটগাঁ থেকে চিঠি দিয়েচেন এবং একটা গল্প পাঠিয়েচেন। গল্পটা মন্দ হয় নি। ওঁর স্বামী সম্প্রতি চাটগাঁয়ের মুন্সেফ, আমি রেণুর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম যখন ওঁরা প্রথম চাটগাঁয় যান, এখনও ওঁদের সে সুবিধে হয় নি—তার কারণ রত্না দেবী এতদিন ঢাকায় ছিলেন বাপের বাড়ী। আমি লিখে দিয়েছি, কেমন পিসি যে ভাইঝির সঙ্গে দেখা করতে দেরি হয়? বেলু যেমন বলে, "আহা, আপনার সবেধন নীলমণি একটা মাত্র মেয়ে!" বেলু বড় শান্ত মেয়ে।

কল্যাণী, তুমি কেমন আছ? নিশ্চয়ই আমার কথা তোমার মনে আর পড়ে না। না

পড়বারই কথা। কি আমার বিশেষ গুণ আছে যে সকলের স্মৃতিপথে থাকবার দাবি করতে পারি? তোমার কথা লোকে মনে রাখতে পারে তোমার স্নেহময় সরল হৃদয়ের জন্যে।

মিঠে পান কি রকম লেগেছিল বল? এবার আরও ভাল দেখে নিয়ে যাব। একটা ভাল মশলা সেদিন দেখলাম বাজারে, ওর নাম 'মুখবিলাস', তোমাকে খাওয়াব এবার।

পত্রের উত্তর শীগ্‌গির দিও। বেলু, খোকা, ধনু ও অন্যান্য খোকা-খুকীদের স্নেহাশীর্ব্বাদ দিও। তুমি আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো।

ভাল আছি।

১৭ই শ্রাবণ, ১৩৪৭ শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪১ মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পুঃ—হ্যাঁ, এবার বঙ্কিম বলেচে আমাদের সঙ্গে বারাকপুর বেড়াতে যাবে।

তোমার জন্মদিনে (১৭ই ভাদ্র না?) আমি নিশ্চয়ই বনগাঁয় যাবো। কোন ভুল হবে না।

৬

প্রিয়তমাসু,

তোমার ওখান থেকে এসে সর্ব্বদাই মনে পড়চে তোমার কথা। বনের শ্যামলতা ও পাখীর ডাক, বন-মরচে ফুলের সুগন্ধের সঙ্গে প্রথম হেমন্তের সমস্ত স্মৃতি আর বছরকার পিক্‌নিকের দিন থেকে তোমার সঙ্গে জড়িয়ে। তোমার কাছ থেকে দূরে সরে এলে মনেপড়ে তোমার কত কথা—সেদিনকরে আসবার দিনের চোখের জল। মনেহয় এখুনি ছুটে যাই। নিকটে যখন থাকি, তখন এতটা বুঝতে হয়তো পারি নে, কিন্তু একটু দূরে গেলে তুমি তোমার সমস্ত মণপ্রাণ দিয়ে আমার আকর্ষণ কর। ওখানে বলে এসেছিলুম তিন শনিবার যাবো না, এখন মনে হচ্চে এই শনিবারে ছুটে যাব।

আমি ওখান থেকে আসবার দিন খড়্গপুর ষ্টেশনে একটা লোক রেলে কাটা পড়লো। কুলী বোধহয়, লাইনের ধারে ছিল বসে, ট্রেন আসবার সময় লাইনে গেল পড়ে। মনটা খারাপ হয়ে গেল লোকটার মৃত্যু দেখে। মনে হোল কল্যাণীর কাছে ফিরে যাই।

এখনো সেই ধারাগিরির[১] গম্ভীর ও মহান অরণ্যভূমির সঙ্গে মিশিয়ে মনে পড়চে তোমার সেদিনকার রান্না, পর্ব্বতারোহণ—এই সঙ্গে গরু-র গাড়ীতে শালবনে খেয়ে শুয়ে রাত্রি যাপন। স্মৃতির আনন্দ এই ভাবেই মনকে সৃষ্টিমুখী করে তোলে। মনে ভেবে দেখ গত এক মাস ঘাটশিলায় কি আনন্দেই দিন কেটেচে! আজ তাই ভেবে বর্ত্তমানের দিনগুলোর মধ্যে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্যের স্মৃতিতে আনন্দ, তেমনি অন্য দিকে তোমার সঙ্গে যাপিত কত দিন রাত্রির স্মৃতির ব্যথা।

সত্যি কল্যাণী, তুমি আমার মনে খুব বড় আনন্দ বয়ে নিয়ে এসেচ। তোমার প্রেমপূর্ণ হৃদয় আমার মনের বহু খোরাক জুগিয়েছে, বহু অভাব পূর্ণ করেছে। তুমি নিজের বলে আমার মনকে যে কতখানি অধিকার করেচ, তা ভাল করেই বুঝতে পারি, তোমার কাছ ছেড়ে দূরে এলে। গৃহলক্ষ্মী তুমি আমাদের পূর্ণ গৌরবে চিরদিন অধিষ্ঠিতা থাকো গৃহ-মন্দিরে। তোমায় অভিনন্দনের ভাষা খুঁজে পাইনা। গত একমাস বড় আনন্দ দিয়েচ (অবিশ্যি শাড়ী কেনার কথাটুকু ছাড়া)।

একটা কথা লিখি, মিতে[২] কে বোলো ও মুটু[৩] কে বোলো। সারা কলকাতায় হাওড়ায়, বনগাঁর হাহাকার পড়েচে—বেগুন ।০ আনা সের, কাঁচকলা /১০ পয়সা সের, আলু ।০ আনা, মাছ ॥৵০ ৸০, শাক ।০ আনা সের। মূলো তিনটে দু পয়সা। সে হিসাবে ঘাটশিলায় জিনিসপত্র সস্তা। আমি এদিকের ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। ঝিঙে তিন আনা সের। ঘাটশিলায় ঝিঙে সের হিসেবে বিক্রি হয় না।

কলকাতা থেকে লোক সরাবার জন্যে মিটিং[৪] বসেচে। বোমা পড়বার ভয়ে বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক আগে সরাচ্ছে। যাদের পল্লীগ্রামে বাড়ী নেই তাদের বড় কষ্ট। দাঁড়াবার জায়গা নেই তাদের। কলকাতায় খুব গোলমাল পড়ে গিয়েচে।

আমি সেদিন মেসে এসে দেখি আমাদের স্কুলের[৫] সেই ছোট ছেলেটা আমার খোঁজ নিতে এসেছিল, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে, তার মুখে শুনলাম স্কুল মঙ্গলবার ও বুধবার জগদ্ধাত্রী পুজোয় বন্ধ—সুতরাং কাল স্কুলের ছুটি। ভেবে ভেবে ঠিক করলাম বারাকপুর যাবো। তখনি শেয়ালদ এসে রানাঘাট এলাম। কারণ বনগাঁ দিয়ে গাড়ী নেই। খিন্নু[৬] দের বাড়ী গেলাম, রাত তখন দুটো। কারণ পরদিন ভোরে ট্রেন। খেয়ে দেয়ে শুয়ে রইলাম—ভোরের ট্রেনে গোপালনগর হয়ে বারাকপুরে আসি। এসময় বারাকপুরের শোভা অপূর্ব্ব, বন-মরচে ফুলের সুবাস সমস্ত বনে ঝোপে—উঠোনের শিউলি গাছটায় অজস্র ফুল ফুটেচে। ছায়াস্নিগ্ধ হেমন্তের রূপ উছলে পড়ছে মাঠেঘাটে। সবাই বলতে লাগলো—কল্যাণী কোথায়? আমি ধারাগিরি যাওয়ার গল্প করলুম। নীরোদ বাবু[৭] দের বাড়ীর থিয়েটারের গল্প করলুম। বুধবার অর্থাৎ গতকাল নৌকা করে বনগাঁ এলুম।

বনগাঁয়ে সব ভাল আছেন। তোমার বাবা[৮] মফঃস্বলে গিয়েচেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হোল না। সুরেন[৯] আবার এখানে এসেচে, সত্য[১০] বদলি হয়েচে। জগদ্ধাত্রী পুজোর আগে দাদু এসেছিলেন, আমাদের না দেখে খুব দুঃখিত হয়েচেন। এঁরা আমাদের চিঠি না পেয়ে ব্যস্ত হয়ে টেলিগ্রাম করবেন ঠিক করেছিলেন, কিন্তু মঙ্গলবার যুগান্তর-এ গালুডি ও ঘাটশিলার সভার সংবাদ পড়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।···

আজ বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতা এসেচি সেকেও ট্রেনে। তোমার অভাব বনগাঁতে যথেষ্ট অনুভব করলাম, শূন্য শয্যায় একা শুয়ে। বেলু[১১] দিদি[১২] ও মার[১৩] কাছে আমাদের ধারাগিরি রওনা ও তোমাদের পাহাড়ে ওঠার গল্প করা গেল। কিছু বাদ দিই নি। খুকু[১৪] বেশ ভাল আছে ও বড় হয়েচে। মার শরীর বর্ত্তমানে ভাল। নিন্নুর মা[১৫] ও কাকীমা[১৬]

৺বিজয়ার দিন এখানে এসেছিল। দেবু[১৭] এসে খুকুকে[১৮] নিয়ে গিয়েচে কালীপূজার সময়—শুনলাম ওরা কাটোয়ায় বদলি হয়েছে।

দাদু[১৯] এখানে চারদিন ছিলেন—সেই সময়ে আমার সব বইগুলো অর্থাৎ তোমাদের বাড়ী যা আছে—সব পড়েচেন এবং শুনলাম উচ্ছ্বসিতভাবে বলেচেন—"জামাই একটা মানুষের মত মানুষ বটে। বিভূতি যে এত ভাল লেখে তা আগে আমার ধারণা ছিল না।" বেলু ও মায়াদিদি গল্প করল।

বনগাঁয়ে শীত তেমন পড়ে নি। কাল রাত্রে আমাদের সেই ছোট ঘরটায় শুয়ে গরম বোধ করছিলাম। এখানে জিনিস পত্রের দর খুব। বেগুন ৵১০ পয়সা, মাছ ৸৵০, ৸০ আনা, কুচো মাছ।৵০ আনা, কাঁচকলা /৫ পয়সা সের, আলু।১৫ পয়সা.—দুধ টাকায় ৬ সের সুতরাং ঘাটশিলায় আমি দেখচি এখানকার চেয়ে অনেক জিনিস কিছু সস্তা ছাড়া আক্রা নয় —হুটুকে কথাটা বোলো।

বিভূতিকে বোলো লিচুতলা[২০] ক্লাবে কাল সন্ধ্যায় খুব আড্ডা দিয়েচি। আমাদের সব ভ্রমণ ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা করেছি। মনোজ বাবু,[২১] জয়কৃষ্ণ,[২২] গোপাল,[২৩] যতীনদা ইত্যাদি উপস্থিত ছিলেন—মিত্তের কথা সকলেই জিজ্ঞেস করেচে। ওদের বাড়ীর কারো সঙ্গে সময়াভাবে দেখা করতে পারিনি। মন্মথদা মিত্তেকে চিঠি দিয়েচেন— প চিঠি মিত্তে তোমার এই চিঠি পাওয়ার দিনই পাবে। জিজ্ঞেস করে দেখো সে চিঠি পেলে কিনা। নিলুর কাকা তারাপদ ও আহমদ চালকীতে এক মস্ত বড় চুরি কেসের আসামী হয়েছিল—শান্ত ও উমাকে বোলো। ধান চুরি ও গরুর গাড়ীর লোহার খুরো চুরির মোকদ্দমা। মন্মথদা, অনিল, হরিদা—ওরা গিয়ে মিটিয়ে দিয়ে এসেছে।

এই গেল সব খবর। আজ সকালে বেলু খাবার দিয়ে গেল। আমি যখন পুকুরে স্নান করচি তখন শচীনবাবু[২৫] বলচে—এঃ এঃ, এ পুকুরে নাইচেন? রামোঃ। আমি বল্লুম— তা হোক এই ভালো। কাল সন্ধ্যাবেলা মার ঘরে বসে চা লুচি রসগোল্লা খেলুম। বেলু লুচি ভেজেছিল। সেখানে বসে খেতে খেতে খুব গল্প করা গেল। গুটুকে বারাকপুর থেকে আমার সঙ্গে নৌকোতে এসেছিল। খুড়ীমাদের বাড়ী যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বাড়ীটা যেন ফাঁকা, তুমি নেই, ঘরটাতে একা শুতে হোল—যেন মনে হচ্ছিল কি-একটা নেই বনগাঁয়ে— সব আছে—অথচ কি-একটা নেই। বনগাঁ টকি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পুষ্প[২৬] এখনও সেরে ওঠেনি, মাঝে মাঝে ফিট হয়। সুনীতি[২৭] আসে নি।

আজ এই পর্য্যন্ত। আমার প্রীতি ও ভালবাসা নিও। হুটু, শান্ত ও উমাকে আশীর্ব্বাদ দিও। মিত্তেকে আমার কথা বোলো। দেবীপ্রসাদ কেমন আছেন? সুবর্ণ দেবীরা আর ঘাটশিলা এসেছিলেন কি? ভালই আছি। পত্রের উত্তর দিও।—ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭

গোপালনগর পোঃ, বারাকপুর গ্রাম
৬ই কার্ত্তিক ১৩৫১

স্নেহের অরুণেন্দ্র,

তুমি নিশ্চয় আশ্চর্য হচ্চ এতদিন আমার চিঠি না পেয়ে। আমি এতদিন পুজোর ছুটিতে ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম, চাঁইবাসা হয়ে কেউনঝর স্টেটের জয়ন্তগড় (বৈতরণী নদীর ধারে) প্রভৃতি জঙ্গল-পাহাড়াবৃত স্থানে। ২।৩ দিন গেল বাড়ী এসে তোমার পত্র পেয়েছি, অভিনন্দনও পেয়েছি। দিল্লীর যাঁরা আমার জন্মদিনে আমাকে স্মরণ করেছিলেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরা আমাকে স্নেহ করেন তাই তাঁদের এই উদ্যোগ। বন্ধুপ্রীতি পাত্রাপাত্র বিবেচনা করে না জানি, তবু আমি ঈশ্বর-সমীপে এই প্রার্থনা করি আমাকে যেন তিনি এই সব স্নেহপ্রীতির উপযুক্ত করেন। দেশের ও দশের সেবায় যেন আমি আরও একাগ্র হোতে পারি, বঙ্গবাণীর পাদপীঠমূলে আমার দেওয়া বন্যপুষ্পটি যেন সমৃদ্ধতর অর্ঘ্য-চন্দনের ভিড়ে হারিয়ে না যায়। এ ছাড়া আমার আর কিছুই বলবার নেই এ সম্বন্ধে। আমি বহুদিন প্রবাসে কাল কাটিয়েচি, সমস্ত প্রবাসী বাঙালীকে আমি প্রতিবেশী বলেই ভাবি, দিল্লীস্থ প্রবাসী বন্ধুদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করচি। যদি বড়দিনের সময় কানপুরে যাওয়া ঘটে, তবে হয়তো দিল্লী পর্যন্ত গিয়ে তাঁদের সকলের সঙ্গে দেখাশুনো করে আসবো।

আশা করি তুমি ভাল আছ। তোমরা ৺বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ কর। দেরি হোল তাই কি ? হ্যাঁ, একটা কথা। তুমি লিখেচ এই অভিনন্দন সম্বলিত পত্র পাঠানোর আগে তুমি দুখানা পত্র আমায় লিখেচ, আমি কিন্তু তা আদৌ পাই নি। তোমার চিঠি অনেকদিন পাচ্চি না কেন বলে আমি একটু বিস্মিত হয়ে উঠেছিলাম। আমার ঠিকানা ওপরে দিলাম। তোমার বাবাকে নমস্কার জানিও। তাঁর শরীর কেমন আছে ? তোমার কাকীমার শরীর খুব ভাল যাচ্চে না, সেজন্যে একটু চিন্তিত আছি। আগামীকাল তিন দিনের জন্যে শান্তিনিকেতনে যাবো সজনী দাসের সঙ্গে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে কি জন্যে ডেকেচেন তা জানিনে—সজনীকে অনুরোধ করেছেন আমায় নিয়ে যেতে। কিছু বুঝতে পারচি নে। আচ্ছা দিল্লীতে নীরদ চৌধুরী আছে নিশ্চয়ই জানো। রেডিওতে যুদ্ধবিষয়ে বলে, খুব পণ্ডিত লোক। নীরদ আমার সহপাঠী ছিল রিপন কলেজে। আমার বিশেষ বন্ধু। ওর সঙ্গে দেখা হয় তোমার ? আমার কথা ওকে গিয়ে বোলো। চিঠি দিতে বোলো, আমার ঠিকানা দিও। ওর সংবাদ পেলে সুখী হবো।

‘দেবযান বেরিয়েচে আমার। পড়েচ ? বইটা ওখানে যদি গিয়ে থাকে লাইব্রেরীতে পড়ে দেখো। সজনী সেদিন বনফুলের কাছে আমার সামনেই বইখানার সম্বন্ধে অনেক ভাল

ভাল কথা বল্লে। 'পথের পাঁচালী'র ষষ্ঠ সংস্করণ বার হয়েচে দিন পনেরো। 'আরণ্যক'এর ও 'অভিযাত্রিক' এর ২য় সংস্করণ প্রেসে। 'অপরাজিত' ২য় সংস্করণ এই মাসে বেরুচ্চে।

আশা করি ভাল আছ। পত্র দিও।* ইতি

আশীর্ব্বাদক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮

বৃহস্পতিবার

ডাকঘরের তারিখ : গোপালনগর

২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫

প্রিয় গজেনবাবু,

আমার ভাগ্নের অসুখ পূর্ববৎ। সামান্য একটু ভালো। এ শনিবারে আসিবার অসুবিধা হইতেছে এই। আমি বোধ হয় শনিবার একবার কলিকাতা যাইতে পারি, তবে স্কুলের পর অর্থাৎ ৭টায় পৌছিব। প্রবোধ কেমন আছে? তাহার উপর রাগ করিয়াছি। ইতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ '... ... গুপ্ত'কে ' ... ' 'এর জন্য তাগাদা দিয়াছিলেন কি? You are my literary agent—যাহা করিবার করিতে বিলম্ব করিবেন না। আবশ্যক হইলে ছাপা বন্ধ করিতে হইবে। আমার স্কুলের বইগুলি এল কই? খুব তাড়াতাড়ি আসা দরকার। আগামী শনিবার, ৫৭ বলরাম বসুর ঘাট স্ট্রীটের বাড়িতে বিভূতি বঁধুর হাতে একখানা 'নবাগত' দিয়ে আসার ব্যবস্থা করবেন? 'কল্যাণী নববধূর হাতে' লিখে। যিনি যাবেন, তিনি ৭॥০ সময়ে আমায় ওখানে পাবেন। দুজনে খেয়ে চলে আসবো। বড়লোকের বাড়ি। গজেনবাবু, আপনি চলুন না কেন? খুব খাওয়া হবে। সে বাড়ি আমার নিজেরই।†

---

* পত্রটি সাহিত্যিক অপূর্ব্বমণি দত্তের পুত্র অরুণ্যমণি দত্তকে লিখিত ও তৎসৌজন্যে মুদ্রিত।

† পত্রটি শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রকে লিখিত।

গ্রন্থ পরিচয়

'ইছামতী'

'ইছামতী' বিভূতিভূষণ রচিত শেষ উপন্যাস। তাঁহার জীবৎকালেই ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারী 'ইছামতী' পুস্তক আকারে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। তাহার পূর্ব্বে উপন্যাসটি ধারাবাহিক রচনা হিসাবে কয়েকমাস 'অভ্যুদয়' মাসিক পত্রের পাতায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কোনো কারণে 'অভ্যুদয়'-এর প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেলে 'ইছামতী' সাময়িক পত্রের পাতায় অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের আগ্রহে বিভূতিভূষণ পুনরায় 'ইছামতী' রচনা শুরু করেন। এই বিষয়ে তাঁহার অপ্রকাশিত দিনলিপি এবং পত্রাবলীতে উল্লেখ পাওয়া যায়। 'ইছামতী' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ কাল : ইছামতী, প্রথম সংস্করণ, ১৫ জানুয়ারী ১৯৫০ (পৌষ ১৩৫৬)। ষোলপেজী ডবল-ক্রাউন সাইজ পৃ. ৪২৪ হার্ডবোর্ড কাগজের মলাট। প্রকাশক : মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাকে 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য মরনোত্তর 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' প্রদান করেন। ১৯৫০-৫১ সালের জন্য তাঁহাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। বিভূতিভূষণের পূর্ব্বে একমাত্র সতীনাথ ভাদুড়ী 'জাগরী' উপন্যাসের জন্য 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' পান।

বিভূতিভূষণ তাঁহার সাহিত্য জীবনের উষাকাল হইতেই 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' বাদে অন্ততঃ তিনটি উপন্যাস রচনা করিবেন এইরূপ কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। 'পথের পাঁচালী' রচনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 'আরণ্যক' 'দেবযান' ও 'ইছামতী' রচনার কথা ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম দিনলিপি 'স্মৃতির রেখা'তেও সে কথা পাওয়া যায়। তাঁহার 'উৎকর্ণ' ও 'হে অরণ্য কথা কও' দিনলিপিতেও 'ইছামতী' উপন্যাস রচনার সংকল্প প্রকাশ পাইয়াছে।

'ইছামতী' উপন্যাস রচনার জন্য বিভূতিভূষণ অনেক কাল ধরিয়া প্রস্তুতও হইতেছিলেন। ত্রিশ দশকের গোড়া হইতেই তিনি 'ইছামতী' উপন্যাস রচনার উপকরণ সংগ্রহ শুরু করেন। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি মোল্লাহাটি এবং তৎ-পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 'ইছামতী'র পটভূমি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ঘোরাঘুরি করেন। ১৯৪৬ সালের পুরা গ্রীষ্মকাল তিনি 'ইছামতী' উপন্যাস রচনার উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকেন। বিভূতিভূষণের দিনলিপিতেও অনেক জায়গায় এ বিষয়ের উল্লেখ আছে :

'পথের পাঁচালী' লেখার সময় হইতেই যে বিভূতিভূষণ 'ইছামতী' রচনার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে 'স্মৃতির রেখা'তে নিম্নরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় :

'...কলবলিয়াতে স্নান করতে এলাম। ঠাণ্ডা জলে নাইতে নাইতে ভাবছিলাম—ঐ আমাদের গ্রামের ইছামতী নদী। আমি একটা ছবি বেশ মনে করতে পারি—এই রকম ধূ ধূ বালিয়াড়ী, পাহাড় নয়, শান্ত, ছোট, স্নিগ্ধ ইছামতীর দু'পাড় ভ'রে ঝোপে ঝোপে কত

বনকুসুম, কত ফুলে ভরা ঘেঁটুবন, গাছপালা, গাঙ-শালিকের বাসা, সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট, আকন্দ ফুল। গত পাঁচশত বৎসর ধ'রে কত ফুল ঝ'রে প'ড়ছে—কত পাখী কত বনঝোপ আসছে যাচ্ছে। স্নিগ্ধ পাটা-শেওলার গন্ধ বার হয়, জেলেরা জাল ফেলে, ধারে ধারে কত গৃহস্থের বাড়ী। কত হাসি-কান্নার মেলা। আজ পাঁচশত বছর ধ'রে কত গৃহস্থ এল, কত হাসিমুখ শিশু প্রথম মায়ের সঙ্গে নাইতে এল—কত বৎসর পরে বৃদ্ধাবস্থায় তার শ্মশানশয্যা হ'ল ঐ ঠাণ্ডা জলের কিনারাতেই, ঐ বাঁশবনের ঘাটের নীচেই। কত কত মা, কত ছেলে, কত তরুণ তরুণী সময়ের পাষাণবর্ত্ম বেয়ে এসেছে গিয়েছে মহাকালের বীথিপথ বেয়ে। ঐ শান্ত নদীর ধারে ঐ আকন্দ ফুল, ঐ পাটা শেওলা, বনঝোপ, ছাতিম বন।

এদের গল্প লিখবো, নাম হবে ইছামতী।' (বিভূতি-রচনাবলী, প্রথমখণ্ড, 'স্মৃতির রেখা' পৃ. ৪১৯ (১।৩।১৯২৮)।...

'এই পল্লীগ্রামের যে জীবনযাত্রা, শতাব্দীর পর শতাব্দী এই রকম, এই বাঁশ শিমুল বনে অপরাজের শোভা এমনি ধারা দেখা যায়—ঝিঙে ক্ষেতে এমনি ফুল ফোটে—কত বনসিমতলার ঘাট, কত গ্রাম্য মেয়ে, কত হাসি কান্না প্রেম বিরহ—এই রকম চলবে। এদের নিয়ে একটা উপন্যাস লিখবো আজ মাথায় এসেছে...মহাকাল যেন এই উপন্যাসের পটভূমি—নায়ক নায়িকা গ্রাম্য নর নারী। Da Vinci-র শেষ জীবনের মত গম্ভীর তার আকৃতি।' (বিভূতি-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, 'উৎকর্ণ' পৃ. ৪৪৯)।...

'ইচ্ছে আছে এবার একটা বইয়ে হাত দেবো-নাম দেবো তার ইছামতী। বড় উপন্যাস। তাতে থাকবে ইছামতীর ধারের গ্রামগুলির অপূর্ব্ব জীবন প্রবাহের ইতিহাস - বন নিকুঞ্জের মরা-বাঁচার ইতিহাস। কত সূর্য্যোদয়, কত সূর্য্যাস্তের নিষ্কিঞ্চন, শান্ত ইতিহাস।' (বিভূতি-রচনবলী, সপ্তম খণ্ড, 'হে অরণ্য কথা কও' পৃ. ৪৭৫)।

'ইছামতী' প্রসঙ্গে প্রায় এই ধরণের বর্ণনাই তাঁহার প্রথম দিকের রচনা 'অপরাজিত' উপন্যাসেও পাওয়া যায় :

'ইছামতী এই চঞ্চল জীবনধারার প্রতীক। ওর দু'পাড় ভরিয়া প্রতি চৈত্র-বৈশাখে কত বন কুসুম, গাছ পালা, পাখি-পাখালি, গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত ফুল ঝরিয়া পড়ে, কত পাখির দল আসে যায়, ধারে ধারে কত জেলেরা জাল ফেলে, তীরবর্ত্তী গৃহস্থ বাড়ীতে হাসি-কান্নার লীলা-খেলা হয়, কত গৃহস্থ আসে, কত গৃহস্থ যায়—কত হাসিমুখ শিশু মায়ের সঙ্গে নাহিতে নামে, আবার বৃদ্ধাবস্থায় তাহাদের নশ্বর দেহের রেণু কলস্বনা ইছামতীর স্রোতোজলে ভাসিয়া যায়—এমন কত মা, কত ছেলে মেয়ে, কত তরুণ তরুণী মহাকালের বীথিপথে আসে যায়—অথচ নদী দেখায় শান্ত, স্নিগ্ধ, ঘরোয়া, নিরীহ।...'
(বিভূতি-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড 'অপরাজিত, পৃ. ১৮০)।

দিনলিপি গ্রন্থ 'স্মৃতির রেখা'র উদ্ধৃতির সঙ্গে 'অপরাজিত'র উদ্ধৃতির প্রায় আক্ষরিক মিল দেখা যায়।

বিভূতিভূষণ ভাগলপুরে থাকিতেই 'পথের পাঁচালী' রচনার সময়, অন্ততঃ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ তারিখ হইতে 'ইছামতী' উপন্যাস রচনা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাহার প্রস্তুতি হিসাবে বিভূতিভূষণের বিভিন্ন সময়ে লিখিত বিভিন্ন ডায়েরিতে মোল্লাহাটি ভ্রমণের এবং নীলকুঠি পরিদর্শনের কথা পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিক অংশ 'হে অরণ্য কথা কও' দিনলিপি হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:

'. ওখান থেকে বেরিয়ে গাঙের ধার দিয়ে কুঠীর কাছে এলুম। ভাঙা কুঠী দেখালুম কাপ্তেন চৌধুরীকে, যেমন বাল্যকালে আমাদের গ্রামে যে কেউ আসুক, তাকে কুঠী দেখাবোই। রামপদকে দেখিয়ে ছিলুম, বামনদাস মুখুয্যেকে দেখিয়েছিলুম। আজও দেখাচ্চি ১৩১০ সাল ১৩১১ সালের পরেও। কুঠী হয়ে গেলুম মোল্লাহাটি—বেলেডাঙা, নভিডাঙার পথ দিয়ে। অনেকদিন—প্রায় ৫।৬ বছর মোল্লাহাটি আসিনি। ডাকবাংলোটাতে গিয়ে বসলুম, মেম সাহেবের গোর দেখলুম—সাহেবদের নীলকুঠীর ধ্বংসস্তূপের ওপর প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় বেড়িয়ে বেড়ালুম—কোথায় আজ সেই লালমুরা, ফালমান সাহেবের দল, কোথায় তাদের দলদর্পিতা, গর্ব্বিতা মেমের দল। মহাকাল অন্ধকার আকাশে বিষাণ বাজিয়ে সব অবসান করে দিয়েচে।' (বিভূতি-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, 'হে অরণ্য কথা কও', পৃ. ৪৬৮)।

বিভূতিভূষণ 'ইছামতী' উপন্যাস রচনা করিবার পূর্ব্বে 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব' নামক একটি গল্প রচনা করেন।* নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব' গল্পটির পটভূমিও মোল্লাহাটি। 'ইছামতী' উপন্যাসের বিষয়বস্তুই বীজাকারে বিভূতিভূষণ গল্পটিতে বিধৃত করিয়াছিলেন। 'হে অরণ্য কথা কও' দিনলিপির উপরোক্ত উদ্ধৃতি পাঠ করিলে সহজেই গল্পের উৎসের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

'ইছামতী' উপন্যাসের আরম্ভে মুখবন্ধরূপে বিভূতিভূষণ কি লিখিবেন সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রাসঙ্গিক অংশ 'ইছামতী' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:

'সবুজ চরভূমির তৃণক্ষেত্রে যখন সুমুপ্ত জ্যোৎস্নারাত্রির জ্যোৎস্না পড়বে, গ্রীষ্ম দিনে সাদা থোকা থোকা আকন্দ ফুল ফুটে থাকবে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলবে নিকটবর্ত্তী বনঝোপ থেকে নদীর মৃদু বাতাসে, তখন নদীপথযাত্রীরা দেখতে পাবে নদীর ধারে পুরোনো পোড়ো ভিটের ইষ্টকচূর্ণ পোতা, বর্ত্তমানে হয়তো আকন্দ ঝোপে ঢেকে ফেলেচে তাদের বেশি অংশটা, হয়তো দু—একটা উইয়ের ঢিপি গজিয়েচে কোনো কোনো ভিটের পোতায়। এই সব ভিটে দেখে তুমি স্বপ্ন দেখবে অতীত দিনগুলির, স্বপ্ন দেখবে সেই সব মা ও ছেলের, ভাই ও বোনের, যাদের জীবন ছিল একদিন এই সব বাস্তুভিটের সঙ্গে জড়িয়ে। কত সুখ-দুঃখের অলিখিত ইতিহাস বর্ষাকালে জলধারাঙ্কিত ক্ষীণ রেখার মত আঁকা হয় শতাব্দীতে শতাব্দীতে এদের বুকে। সূর্য্য আলো দেয়, হেমন্তের আকাশ শিশির বর্ষণ করে, জ্যোৎস্না-পক্ষের চাঁদ জ্যোৎস্না ঢালে এদের বুকে।

* 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব' প্রথমে 'আচার্য কৃপালনী কলোনী' নামক গল্প গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় (প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৫৫)। পরবর্ত্তীকালে লেখকের ইচ্ছানুযায়ী গল্পটির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব' রাখা হয়।

সেই সব বাণী, সেই সব ইতিহাস আমাদের আসল জাতীয় ইতিহাস। মূক-জনগণের ইতিহাস, রাজা-রাজড়াদের বিজয়কাহিনী নয়।' (বিভূতি-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ইছামতী, পৃ. ৩)।

বিভূতিভূষণ ইতিহাসের ছাত্র এবং একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। পরিণত বয়সেও তাঁহাকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিতে দেখিয়াছি। ভাগলপুরের জঙ্গল মহালে জমিদারী কাছারি বাড়ীর তৃণ নির্মিত গৃহে বসিয়াও তিনি আগ্রহের সঙ্গে গীবন ও এমার্সন পাঠ করিতেন তাহা লেখকের দিনলিপিগুলি পাঠ করিলে জানা যায়। 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপি হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ তুলিয়া দিতেছি। বিভূতিভূষণ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ৩০ নভেম্বর ভাগলপুরের জঙ্গল মহালের ইস্‌মাইলপুর কাছারীতে বসিয়া লিখিতেছেন :

'মানুষের সত্যিকার ইতিহাস কোথায় লেখা আছে? জগতের বড় বড় ঐতিহাসিকগণ যুদ্ধ-বিগ্রহের ঝঞ্ঝনায় সম্রাট সম্রাজ্ঞী সেনাপতি মন্ত্রীদের সোনালী পোশাকের জাঁকজমকে দরিদ্র গৃহস্থের কথা ভুলে গিয়েছেন। পথের ধারে আম গাছে তাদের পুঁটুলি-বাঁধা ছাতু কবে ফুরিয়ে গেল, কবে তার শিশুপুত্র প্রথম পাখী দেখে সানন্দে মুগ্ধ হয়ে ডাগর শিশু চোখে চেয়ে ছিল, সন্ধ্যায় ঘোড়ার হাট থেকে ঘোড়া কিনে এনে পল্লীর মধ্যবিত্ত ছেলে তার মায়ের মনে কোথায় ঢেউ বইয়েছিল। দু হাজার বছরের ইতিহাসে সে সব কথা লেখা নেই—থাকলেও বড কম। রাজা যযাতি কি সম্রাট মেণ্টুহোটেপ, জুলিয়াস সীজর, থেয়োডোসিয়াস এবং তাবৎ সম্রাট পরিবারের শুধু রাজনৈতিক জীবনের গল্প আমরা শৈশব থেকে মুখস্থ করে এসেছি। কিন্তু গ্রীসের ও রোমের যব ও গমের ক্ষেতের ধারে ওলিভ্ বন্যদ্রাক্ষার ঝোপের ছায়ায় ছায়ায় যে দৈনন্দিন জীবন হাজার হাজার বছর ধরে সকাল—সন্ধ্যায় যাপিত হয়েছে—তাদের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার গল্প তাদের বুকের স্পন্দনের ইতিহাস আমি জানতে চাই। হোমার ভার্জিলের কবিতা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠত কিনা এদের তুচ্ছ কথায় আমি জানি না। কিন্তু উত্তর পুরুষের কৌতূহল, স্নেহ ও সম্মানের অধিকারী হ'ত তারা একথা ঠিক।

'কেবল মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ঐতিহাসিকদের পাতায় সম্মিলিত সৈন্যব্যূহের ফাঁকে সরে যায়, সারি বাঁধা বর্শার অরণ্যের ভিতর দিয়ে দূরের এক ভদ্র গৃহস্থের ছোট বাড়ী নজরে আসে, অজ্ঞাত কোন লেখকের জীবন কথা, কি কালের স্রোতে কূল-লাগা এক টুকরা পত্র, প্রাচীন ইজিপ্টের কোন কৃষক শস্য কাটবার জন্য তার পুত্রকে কি আয়োজন করবার কথা বলেছিল—বহু হাজার বছর পর তাদের টুকরো ভাঙ্গা ফাটা মাটির তলায় চাপা-পড়া মৃন্ময় পাত্রের মত পুরাতত্ত্বের কৌতূহলী পাঠকের চোখে পড়ে। তারপর কল্পনা—আর কল্পনা!

'প্রস্ফুট সর্ষে ক্ষেতের সুগন্ধের মধ্যে বসে প্রভাতের নীল আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে আবার সেই দূর কালের পূর্ব্বপুরুষদের কথা ভাবি।

'বর্ত্তমানে একদল লেখক উঠেছেন যাঁরা ইতিহাসের এই ফাঁক পূর্ণ করবেন। তাঁরা ছোট গল্প লেখক, ঔপন্যাসিক, জীবনচরিত লেখকদের মধ্যে যাঁরা খুব সূক্ষ্ম স্রষ্টা তাঁরা—দৈনিক

লিপি লেখক—এঁদের দল। শেখভ, এইচ্ জি.ওয়েলস্, গর্কি, ব্রেটহার্ট, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, শৈলজা মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র—এঁদের লেখা ভবিষ্যৎযুগের পুস্তকাগারে দেশের ও জাতির সামাজিক ইতিহাসের তালিকার মধ্যে স্থান পাবে—খুব সূক্ষ্ম খাঁটি বিস্তৃত এবং অত্যন্ত পাকা দলিল হিসাবে এদের মূল্য হবে। রোমানস লেখকগণও সম্পূর্ণ বাদ পড়ে যাবে না—তাঁদের কল্পনার উল্লাস, আবেগে অনেক সময় জীবনের সূক্ষ্ম দর্পণকে মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলেন বটে, কিন্তু তবুও স্কটের লেখা থেকে মধ্যযুগের ইউরোপের সম্বন্ধে যা জানতে পারি. কোন্ ঐতিহাসিক অতটা আলো সে সময়কার সমাজ, চিন্তাধারা, আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রা প্রণালীর উপর ফেলতে পেরেছেন ?

'কিন্তু আরও সূক্ষ্ম আরও তুচ্ছ জিনিসের ইতিহাস চাই। আজকার তুচ্ছতা হাজার বছর পরের মহাসম্পদ। মানুষ মানুষের বুকের কথা শুনতে চায়। কোটী কোটী মানুষ প্রলয় স্রোতে ভাসছে, ভবিষ্যতের সত্যিকার ইতিহাস হবে এই কাহিনী মানুষের মনের ইতিহাস, তার প্রাণের ইতিহাস। কাবুল যুদ্ধে কি ক'রে জয় করা হয়েছিল, সে সবের চেয়েও খাঁটি ইতিহাস।

'এই যুগ যুগ ব্যাপী বিশাল মানবজাতি—শুধু তাও নয়—এই বিশাল জীবজগৎ—কোন্ মহা ঔপন্যাসিকের কলমের আগায় বেরুনো উপন্যাস। অধ্যায়ে অধ্যায়ে ভাগ করা আছে। মহা সমুদ্রগর্ভে বিলীন কোন্ বিস্মৃত যুগের আটলাণ্টিক জাতির বিস্মৃত কাহিনীও যেমন এর কোন অধ্যায়ের বিবরণীভূত ঘটনা তেমনি আজ মাঠের ধারে বন্যশৃগালের নখদন্তে নিহত নিরীহ ছাগ-শিশুর মৃত্যুতে যে বিয়োগান্ত ঘটনার পরিসমাপ্তি হোল তাও এর এক অধ্যায়ের কথা। ঐ যে কচুঝাড় বাঁশবনের আওতায় শীর্ণ হয়ে হলদে হয়ে আসছে—ওর কথাও।

'কিন্তু এ উপন্যাস মানুষের পাঠের জন্যে নয়। মানুষ শুধু মাটি পাথর খুঁড়ে, এতে ওতে জোড়াতালি দিয়ে, দস্যু-বৃত্তি করে লুকিয়ে চুরিয়ে এর এক আধ অধ্যায় চাবি-আঁটা পেটরা থেকে দিনের আলোয় এনে পড়ছে—সব বুঝতেও পাচ্ছে না।' (বিভূতি-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, স্মৃতির রেখা, পৃ. ৩৯৩—৩৯৫)।

পুনরায় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর উক্ত ইস্‌মাইলপুরের কাছারীতে বসিয়াই বিভূতিভূষণ (রাত্রি ১২টার সময়) লিখিয়াছিলেন :

'গভীর রাত্রে নির্জ্জন কাশবনের মধ্যের কাছারী ঘরে শুয়ে শুয়ে গীবন পড়্‌ছিলাম। কত রাজা-রাণী সম্রাট মন্ত্রী খোজা সেনাপতি কত সুন্দরী তরুণী বালক যুবার আশা-নিরাশার স্বপ্নের কাহিনী। কত যুদ্ধ-বিগ্রহ উত্থান-পতন, কত অত্যাচার-উৎপীড়ন, হত্যা, পরের জন্যে কত প্রাণ দেওয়া—অতীতের ছায়ামূর্ত্তিরা আবার গীবনের পাতায় ফিরে এল। হাজার যুগ আগের কত অশ্রুনয়ন নিষ্কলঙ্কা তরুণী, কত আশাভরা বুক নিয়ে কত মা বাপ কোথায় সব চলে গিয়েছে! অনন্তকাল-মহা সমুদ্রে কোন অতীতকালে ছায়া হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে—কবে—কোথায়। এই গভীর রাত্রে তারা ফিরে এল।

'পড়্‌ছিলাম গিলডো, রুফাইনাস, খোজা ইউট্রোপিয়াসের অর্থলিপ্সার কথা, অর্থের জন্য

তারা কিনা করেছিল! বিশ্বস্ত বন্ধুর গুপ্ত কথা প্রকাশ করে তাকে ঘাতকের কুঠারের মুখে দিতে দ্বিধা করেনি, নানা ষড়যন্ত্র, নানা বিশ্বাসঘাতকতা—কোথায় তাদের অর্থের সার্থকতা—কোথায় তাদের সে বৃথা শ্রমের পুরস্কার?

'এই দেড় হাজার বছর পরে দাঁড়িয়ে এদের সে মূর্খতা দেখে আমি ইতিহাসের পাঠক—আমাকে করুণা প্রকাশ করবার জন্যেই কি রুফাইনাস কাউণ্ট জন অত করে নির্দ্দয়ভাবে উৎপীড়ন করেছিল! সে করুণা কাউণ্ট জনের জন্য নয়, উৎপীড়ক রুফাইনাস ও তার ধনলিপ্সার জন্যে। কারণ আমি জানি তার পরিণাম।

'বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাস গীবন ভ্রমশূন্য লিখেছিলেন কি বিউরি ঠিক লিখেছিলেন—সে বিষয়ে আমি তত কৌতূহল দেখাচ্ছি না—আমি শুধু কৌতূহলাক্রান্ত, এই মহাকালের মিছিলে। এই সম্রাট সম্রাজ্ঞী, খোজা-ভৃত্য সৈন্য-সেনাপতি—তৃণের মত স্রোতের মুখে ভেসে যাওয়ার দিকটা আমায় মুগ্ধ করে।

'দু হাজার বছর আগের সে সব মানুষের মত—তাদের ইতিহাস-লেখকও ছায়া হয়ে গিয়েছেন। ইংলণ্ডের কোন্ প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রে জীর্ণ তার সমাধি দীর্ঘ তৃণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে জানি না। আর একশত বছর পরে এই আমিও স্বপ্ন হয়ে যাবো।

"সন্ধ্যায় শান্ত বাঁশবনে, দেবদারু পাতার মাথায় রাঙা রোদে, বৈকালের ম্লান আলোয়, মাঠের ধারের কাশবনে, নদীর ধারে আমি কতদিন এই গতিচ্ছন্দের সত্যকে মনে মনে চিনেছি। এর স্বপ্ন আমাকে বড় মুগ্ধ করে।

'হাজার যুগ আগের এই ঐতিহাসিক ছায়ামূর্ত্তিদের মত সব মিলিয়ে স্বপ্ন হয়ে যাবে। যা কিছু বর্ত্তমান সব। এই অপূর্ব্ব গতিভঙ্গি, মহাকালের এই তাণ্ডবনৃত্য ছন্দ যুগ যুগ ধরে রাজা, মহারাজা, সাম্রাজ্য, কাহিনীকে উড়িয়ে ফেলে দিয়ে আপন মনে কোন বিশাল অন্তরের মৃদঙ্গের গম্ভীর বোলের সঙ্গে তাল রেখে চলছে—দিকে দিকে, যুগে যুগে, ইউট্রোপিয়াস, গিল্ডো, রুফাইনাসের দল ও তাদের কড়ির পুঁটুলি ফেনার ফুলের মত মিলিয়ে যাচ্ছে—জাতি, মহাদেশ মথিত হয়ে যাচ্ছে তাঁর বিরাট চরণ-পেষণে। মহাশূন্যে তাঁর মহাবিষাণ শুধু অনন্ত কাল ধরে এই চলে যাওয়ার উদাস ভেরীধ্বনি বাজাচ্ছে… অনাহত শব্দের মত তা সাধারণ মানুষের শক্তির বাইরে।

'যে ধ্বনি সম্রাজ্ঞী ইউডক্সিয়া শোনেন নি। শুনেছিলেন সাধু জন্ ক্রাইসোটিম্। তাই তুচ্ছ বিষয়লিপ্সা ফেলে দিয়ে দূর সিরিয় মরুভূমির নির্জ্জন পাহাড়ের মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি ধ্যান-জীবন যাপন করতেন। সান্ধ্য সূর্য্যচ্ছটায় সিরিয় মরুভূমির বালুকারাশিতে সাধু জন্ এই গতিলীলার স্বপ্ন দেখেছিলেন নিশ্চয়ই।' (বিভূতি-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, স্মৃতির রেখা, পৃ. ৩৯৬—৩৯৭)।

অতএব 'ইছামতী' বা অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে যে রাজা-রাজড়ার কাহিনী না লিখিয়া সাধারণ মানুষের কথা লিখিবেন তাহা তিনি দীর্ঘদিন পূর্ব্বেই ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন।

'ইছামতী' উপন্যাস রচনার ইচ্ছা 'পথের পাঁচালী' রচনার প্রাক্কালেই হৃদয়ে লালন করিতেন তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। নিজ গ্রাম বারাকপুরের প্রতি ভালোবাসার কথাও তাঁহার বহু রচনার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাঁহার 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের মধ্যে তাঁহার গ্রামের সৌন্দর্য্য ও রূপমুগ্ধ মনের পরিচয় ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'পথের পাঁচালী'তে তাঁহার নিজ গ্রামের কথা অমর করিয়া রাখিয়াছেন।

ভাগলপুরের 'বড় বাসা'য় বসিয়া ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর বিভূতিভূষণ লিখিয়াছেন :

'পরদিন বড-বাসার ছাদে বসে বসে সন্ধ্যাবেলা ভাবছিলাম অনেক কথা। জীবনে কত ভাল জিনিস পেয়েছি সে কথা—আগাগোড়া ভেবে দেখলাম। কি গ্রামেই জন্মেছিলাম। এই তো আরা জেলা, ছাপরা জেলা ঘুরে এলাম। কোথায় সেই পরিপূর্ণ, সুন্দর, স্নিগ্ধ শ্যামলতা, সেই বাঁশবন ঝোপ ঝাপ। বড ভালবাসি তাদের, বড় ভালবাসি, বড় ভালবাসি। কেউ জানে না কত ভালবাসি আমি আমার গ্রামকে—আমার ইছামতী নদীকে, আমার বাঁশবন, শেওলা ঝোপ, সোঁদালী ফুল, ছাতিম ফুল, বাবলা বনকে। সে ছায়া, সে স্নিগ্ধ স্নেহ, আমার গ্রামের সে সব অপরাহ্ণ—আমার জীবনের চিরসম্পদ হয়ে আছে যে।... তারাই যে আমার ঐশ্বর্য্য। অন্য ঐশ্বর্য্যকে তাদের কাছে যে তৃণের মত গণ্য করি।' (বিভূতি-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, স্মৃতির রেখা, পৃ ৩৯২)।

তাঁহার গ্রামের প্রতি পক্ষপাতের কথা 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপি গ্রন্থের নিম্নোক্ত মন্তব্যের মধ্যেও পাওয়া যায় :

'মনে মনে তুলনা করে দেখলুম এ ধরণের বৈকাল সত্যিই কোথাও দেখিনি—এই তো পাশেই চালকী, ওখানে এ রকম বৈকাল হয় না। এত পাখী সেখানে নেই, এ ধরনের এত বেলগাছ নেই, সোঁদালি ফুল নেই, বন জঙ্গল বড বেশী,...এতদিন তত লক্ষ্য করিনি, কাল লক্ষ্য ক'রে দেখে মনে হোল সত্যিই তো এ জিনিস আর কোথাও দেখিনি তো! দেখবোও না—কেবলমাত্র সেখানে দেখা যাবে যেখানকার অবস্থাগুলি এর পক্ষে অনুকূল। ইসমাইলপুর, আজমাবাদ লাগে না এর কাছে—সে অন্য ধরণের প্রাচুর্য্য, বৈচিত্র্য ও কারুকার্য্য কম—বিপুলতা বেশী, প্রখরতা বেশী।

'ভাগলপুর তো লাগেই না। কতকগুলো বিশেষ ধরনের পাখী, বিশেষ ধরনের বন-বিন্যাস, বিশেষ ধরনের গাছপালা থাকাতে এ অঞ্চলেই মাত্র ঠিক এই ধরনের বৈকাল সম্ভব হয়েচে। সোঁদালি ফুল তার মধ্যে একটা বড সম্পদ, মাঠে, বনে ওর ঝাড যখন ফুটে থাকে তখন বনের চেহারা একেবারে বদলে যায়—বনদেবীর সাজির একটা অযত্ন চয়িত বন ফুলের গুচ্ছের মত নিঃসঙ্গ মনে হয়—এই নিঃসঙ্গ সৌন্দর্য্য ওকে যে শ্রী ও মহিমা দান করেচে—সে আর কোনো ফুলে দেখলাম না।' (বিভূতি-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃণাঙ্কুর, পৃ. ১৭৭)।

বিভূতিভূষণ রচিত উপন্যাস ও দিনলিপি এবং পত্রাবলীর মধ্যে নীল কুঠির কথা পাওয়া

যায় পূর্ব্বেই সে কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'পথের পাঁচালী'তে 'নীল কুঠির' কথা প্রসঙ্গক্রমে অনেকবার আসিয়াছে। প্রাসঙ্গিক অংশ লক্ষ্যণীয়: "তাহার পর অনেকদিন হইয়া গিয়াছে। শাঁখারী পুকুরে নাল ফুলের বংশের পর বংশ কত আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। চক্রবর্ত্তীদের ফাঁকা মাঠে সীতানাথ মুখুজ্যে নতুন কলমের বাগান বসাইল এবং সে সব গাছ আবার বুড়া হইতেও চলিল। কত ভিটায় নতুন গৃহস্থ বসিল, কত জনশূন্য হইয়া গেল, কত গোলোক চক্রবর্ত্তী, ব্রজ চক্রবর্ত্তী মরিয়া হাজিয়া গেল, ইছামতীর চলোর্ম্মি-চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা অনন্তকাল-প্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কুটারমত, ঢেউয়ের ফেনার মত, গ্রামের নীল কুঠির কত জনসন টমসন্ সাহেব, কত মজুমদারকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল।' (বিভূতি-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, 'পথের পাঁচালী,' পৃ. ৫)।

অপুর প্রথম নীলকুঠি পরিদর্শনের কথাও এখানে উল্লেখ্য: '...নদীর ধারের বাবলা ও শ্যাওলা গাছের আড়ালে একটা বড় ইটের পাঁজার মত জিনিস নজরে পড়ে, ওটা পুরানো কালের নীলকুঠির জ্বালঘরের ভগ্নাবশেষ। সেকালে নীল কুঠির আমলে এই নিশ্চিন্দিপুর বেঙ্গল ইণ্ডিগো কন্‌সার্নের হেড কুঠি ছিল, এ অঞ্চলের চৌদ্দটা কুঠির উপর নিশ্চিন্দিপুর কুঠির ম্যানেজার জন্ লারমার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিত। এখন কুঠির ভাঙা চৌবাচ্চাঘর, জ্বালঘর, সাহেবের কুঠি, আপিস্, জঙ্গলাকীর্ণ ইটের স্তূপে পরিণত হইয়াছে। যে প্রবল প্রতাপ লারমার সাহেবের নামে এক সময় এ অঞ্চলে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খাইত, আজকাল দু' একজন অতি বৃদ্ধ ছাড়া যে লোকের নাম পর্য্যন্ত কেহ জানে না।' (বিভূতি-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পথের পাঁচালী, পৃ. ২৮)।

* * *

'হরিহর বলিল—কুঠি কুঠি বলছিলে, ঐ ছাখো খোকা সাহেবদের কুঠি—দেখেচো?

নদীর ধারের অনেকটা জুড়িয়া সেকালের কুঠিটা যেখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় হিংস্র জন্তুর কঙ্কালের মত পড়িয়াছিল, গতিশীল কালের প্রতীক নির্জ্জন শীতের অপরাহ্ণ তাহার উপর অল্পে অল্পে তাহার ধূসর উত্তরচ্ছদ-বিশিষ্ট আস্তরণ বিস্তার করিল।

'কুঠির হাতার কিছু দূরে কুঠিয়াল লারমার সাহেবের এক শিশু-পুত্রের সমাধি পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। বেঙ্গল ইণ্ডিগো কন্‌সার্নের বিশাল হেড কুঠির এইটুকু ছাড়া অন্য কোনও চিহ্ন আর অখণ্ড অবস্থায় মাটির উপর দাঁড়াইয়া নাই। নিকটে গেলে অনেক কালের কালো পাথরের ফলকে এখনও পড়া যায়—

Here lies Edwin Lermor
The only son of John & Mrs. Lormor.
Born May 13. 1853. Died April. 27. 1860.

'অন্য অন্য গাছ পালার মধ্যে একটি বন্য সোঁদাল গাছ তাহার উপর শাখাপত্রে ছায়া বিস্তার করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, চৈত্র বৈশাখ মাসে আড়াই বাঁকীর মোহনা হইতে প্রবহমান জোর হাওয়ায় তাহার পীত পুষ্পস্তবক সারা-রাত ধরিয়া বিস্মৃত বিদেশী শিশুর ভগ্ন-

সমাধির উপর রাশি রাশি পুষ্প ঝরাইয়া দেয়। সকলে ভুলিয়া গেলেও বনের গাছ পালা শিশুটিকে এখনও ভোলে নাই।' (বিভূতি-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, 'পথের পাঁচালী', পৃ. ৩০)।

'তাহার পরে সকলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হয়, ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাসে হেমন্তের আঁচ-লাগা শিশিরার্দ্র নৈশ বায়ু ভরিয়া যায়। মধ্য রাত্রে বেণুবন শীর্ষে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না উঠিয়া শিশির-সিক্ত গাছ পালায়, ডালে-পাতায় চিক্ চিক্ করে। আলো আঁধারের অপরূপ মায়ায় বন প্রান্ত ঘুমন্ত পরীর দেশের মত রহস্য ভরা। শন্ শন্ করিয়া হঠাৎ হয়তো এক ঝলক হাওয়া সোঁদালির ডাল দুলাইয়া, তেলাকুচা ঝোপের মাথা কাঁপাইয়া বহিয়া যায়।

'এক-একদিন এই সময় অপুর ঘুম ভাঙিয়া যাইত।

'সেই দেবী যেন আসিয়াছেন, সেই গ্রামের বিস্মৃতা অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষী।

"পুলিনশালিনী ইছামতীর ডালিমের রোয়ার মত স্বচ্ছ জলের ধারে, কুচা শেওলা ভরা ঠাণ্ডা কাদায় কতদিন আগে যাহাদের চরণ-চিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তীরের প্রাচীন সপ্তপর্ণটাও হয়তো যাদের দেখে নাই, পুরানো কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরে তারাই এক সময়ে ফুল ফল নৈবেদ্যে পূজা দিত, আজকালকার লোকেরা কে তাঁহাকে জানে?' (বিভূতি-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড 'পথের পাঁচালী.' পৃ. ৯৭)।

বিভূতিভূষণের জন্মের ৪০।৫০ বৎসর আগে বারাকপুর গ্রামে নীলকুঠি ছিল। বিভূতিভূষণ অবশ্য বারাকপুর তথা নিশ্চিন্দিপুরে বেঙ্গল ইণ্ডিগো কনসানের হেড কুঠি ছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (দ্রঃ 'পথের পাঁচালী', বিভূতি-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩০)। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বারাকপুর গ্রামের সন্নিকটে মোল্লাহাটিতে 'বেঙ্গল ইণ্ডিগো কন্সার্নে'র হেড কুঠি ছিল। মোল্লাহাটি গ্রাম বিভূতিভূষণের পৈতৃক আবাস বারাকপুর গ্রাম হইতে অতি নিকটেই। এই মোল্লাহাটি নীলকুঠিকে কেন্দ্র করিয়াই প্রখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করেন। দীনবন্ধু মিত্রের জন্মস্থান চৌবেরিয়া গ্রাম মোল্লাহাটি ও বারাকপুর গ্রামের অতি নিকটেই অবস্থিত। বিভূতিভূষণের দিনলিপি 'উৎকর্ণ'-এ তাঁহার ১৯৩৯ সালে দীনবন্ধুর জন্মস্থান চৌবেরিয়া গ্রামে দীনবন্ধুর জন্ম ভিটা পরিদর্শনের কথা পাওয়া যায়। বারাকপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী নীলকুঠি সমূহ মোল্লাহাটি নীলকুঠির অধীনে অবস্থিত ছিল। দীনবন্ধু 'নীলদর্পণে' মোল্লাহাটি নীলকুঠির অত্যাচারেরই বর্ণনা করিয়াছিলেন। 'নীলদর্পণ' ১৮৬০ খৃস্টাব্দে ঢাকা হইতে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথমে নাট্যকার হিসাবে কাহারো নাম ছিল না। এই 'নীলদর্পণ' রচনার পরেই নাটকের পাণ্ডুলিপিসহ তাঁহার জলমগ্ন হইয়া মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা ঘটে এবং এই নাটকের জন্যই দীনবন্ধু সরকার কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হন—পাদরী লং সাহেব-এর জেল ও জরিমানা হয়—এবং ইংরেজি অনুবাদ কর্ম্মের জন্য মাইকেল মধুসূদনের কর্ম্মচ্যুতি এবং সীটনকারের পদাবনতি ঘটে। বাংলা দেশের সাধারণ নাট্যমঞ্চের সূচনায়ও দীনবন্ধু রচিত 'নীলদর্পণ' নাটক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর 'নীলদর্পণ, নাটক মঞ্চস্থ করিয়াই সাধারণ রঙ্গালয়ের

সূচনা হয়। রোগ্ সাহেবের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির অভিনয় আজিও অবিস্মরণীয় হইয়া আছে। বিভূতিভূষণ বহু বৎসর পরে এই মোল্লাহাটি নীলকুঠিকে প্রধানত আশ্রয় করিয়া চির প্রবহমান ইছামতী নদীর কূলে কূলে যে জনপদ ও জনসাধারণ এবং জন জীবন তাহাদের লইয়া তাঁহার জীবৎ-কালে রচিত ও প্রকাশিত শেষ উপন্যাস 'ইছামতী' রচনা করেন।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি 'ইছামতী' উপন্যাস রচনার পিছনে বহুদিনের চিন্তা ও ভাবনা এবং তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহের প্রচেষ্টা কার্য্যকরী ছিল। আমরা আরও দেখিয়াছি 'পথের পাঁচালী' রচনার সমসাময়িক কালেই 'ইছামতী' উপন্যাসের কথা ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। সিকি শতাব্দী কাটিয়া যাইবার পরে তাঁহার এ আশা বাস্তবে রূপায়িত হয়। কিন্তু এই দীর্ঘকাল তিনি 'ইছামতী' রচনার তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহের জন্য তাঁহার চোখ ও কান খোলা রাখিয়াছিলেন।

১৯৪৬ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি 'ইছামতী' উপন্যাস রচনা করিবার কথা প্রথমে বলেন। সেই সময়েই 'অভ্যুদয়, কাগজে ধারাবাহিক রচনা হিসাবে 'ইছামতী' উপন্যাস বাহির হইবে বলিয়া স্থির হয়। তখন তিনি উপন্যাসটির তথ্য সংগ্রহের জন্য নিয়মিত বারাকপুর গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে ঘোরাঘুরি করিতেন। তিনি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান নিবন্ধকারকে শ্রীযুক্ত অমল হোমের সংগ্রহে কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যাণ্ট-এর রচিত 'Anglo Indian life in Rural Bengal' গ্রন্থটি দেখিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছিলেন। চিত্রশিল্পী কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যাণ্ট-এর এবং তাঁহার রচিত 'Anglo-Indian life in Rural Bengal'—এর কথা তাঁহার 'ইছামতী' উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যাণ্ট ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে জলপথে মোল্লাহাটি নীলকুঠিতে আসিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করেন। সেই সময়েই তিনি ইংল্যাণ্ডে ভগ্নীদের কাছে পত্রাকারে তাঁহার মোল্লাহাটি পরিদর্শনের কথা লিখিয়া জানান। সেই সঙ্গে তিনি মোল্লাহাটি নীলকুঠির এবং আশপাশের অজস্র স্কেচ করেন। গ্রন্থটি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড হইতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মোল্লাহাটি নীলকুঠির নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায়। কাল মোল্লাহাটি নীলকুঠির উপরে হস্তাবলেপ করিলেও গ্র্যাণ্ট সাহেব-এর গ্রন্থের সাহায্যে আজও অনেক কিছু জানিতে পারা যায়। সাহেবরা মোল্লাহাটি কে 'মূলনাথ' বলিতেন। কেন বলিতেন তাহা অবশ্য জানা যায় না।

সম্প্রতি কৃষ্ণনগর কলেজ-এর রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য আমাদের একখণ্ড কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যাণ্টের বই দেখিতে দিয়াছিলেন। বইটিতে মোল্লাহাটি নীলকুঠি ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বিস্তৃত অঞ্চলের খুঁটিনাটি বিশদ বিবরণ আছে। বাংলাদেশের নীলচাষ ও নীল বিদ্রোহ এবং সেই সঙ্গে প্রায় ১২৫ বৎসর আগেকার পল্লী বাংলার নিখুঁত চিত্র ঐ বইটিতে পাওয়া যায়। বিখ্যাত চিত্রকর—লেখকের হাতে—আঁকা

অসংখ্য স্কেচ বইটির মূল্যবৃদ্ধি করিয়াছে। লেখক কলিকাতা হইতে নৌকা করিয়া মোল্লাহাটি নীলকুঠিতে গিয়াছিলেন। নদীর দুই ধারের নিসর্গ রূপ যেমন দেখিয়াছিলেন—বইতে অনুরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। বিভূতিভূষণ যদিও গ্র্যান্ট সাহেব তিলু ও ভবানী বাঁড়ুয্যের ছবি আঁকিয়াছিলেন বলিয়া 'ইছামতী' তে উল্লেখ করিয়াছেন—কিন্তু তেমন কোনো ছবি বইটিতে আমার চোখে পড়ে নাই। (দ্রঃ বিভূতি-রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, পৃ. ১৯) ১। বইটিতে অবশ্য নীলকুঠির দেওয়ান, আমলা, কর্মচারী ও নীল নিষ্কাষণ সম্বন্ধে অনেক ছবি আছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র মিত্র তাঁহার রচিত 'যশোহর—খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'নীলের চাষ ও নীল—বিদ্রোহ' শীর্ষক অধ্যায়ের ৭৮০ পৃষ্ঠার পাদ টীকায় গ্রাণ্ট সাহেব ও 'Rural lifo in Bengal' গ্রন্থটির উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত পাদটীকা হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ তুলিয়া দিতেছিঃ 'মোল্লাহাটিতে করল' ও লারমুর সাহেবের সময় রাজার মত বাড়ী ছিল, উহার ছবি দিলাম। জনৈক চিত্র-শিল্পী গ্র্যাণ্ট সাহেব 'Rural life in Bengal' গ্রন্থে মোল্লাহাটির বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন। প্রাচীর বেষ্টিত হাতার (কমপাউণ্ড) মধ্যে প্রকাণ্ড বাবুর্চিখানা, আস্তাবল, পথিকশালা, স্কুল, হাসপাতাল, ফলের বাগান, লোকজনের বাড়ী ছিল। হাতার বাহিরে বাঁওড়ের ধারে আবদ্ধ উদ্যানে হরিণ চরিত। এখনও কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ আছে। তন্মধ্যে করলং—পত্নীর সমাধি স্তম্ভটি উল্লেখযোগ্য।' (যশোহর খুলনার ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড, সতীশচন্দ্র মিত্র, দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ১৯৫৫ কলিকাতা)।

বিভূতিভূষণ 'ইছামতী' উপন্যাসে কোল্‌সওয়ার্দি গ্র্যাণ্ট সম্পর্কে কিছু কিছু মন্তব্য করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতীয় ও ইংরেজদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে লেখকের প্রখর জ্ঞানের পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিক অংশ 'ইছামতী' হইতে তুলিয়া দিতেছি :

'কোল্‌সওয়ার্দি গ্র্যাণ্ট বিকেলে পাঁচ-পোতার বাঁওড়ের ধারে রাস্তা ধরে বড় টম্ টমে বেড়াতে বার হোলেন। সঙ্গে ছোট সাহেব ডেভিড ও শিপ্‌টন্ সাহেবের মেম। রাস্তাটি সুন্দর ও সোজা। একদিকে স্বচ্ছতোয়া বাঁওড় আর একদিকে ফাঁকা মাঠ, নীলের ক্ষেত, আউশ ধানের ক্ষেত। গ্র্যাণ্ট সাহেব শুধু ছবি-আঁকিয়ে নয়, কবি ও লেখকও। তাঁর চোখে পল্লীবাংলার দৃশ্য এক নতুন জগৎ খুলে দিলে। বন্ধহীন উদাস মাঠের মধ্যে ফুল-ভর্ত্তি সোঁদালি গাছের রূপ, ফুল—ফোটা বন-ঝোপে অজানা-বন পক্ষীর কাকলী—এসব দেখবার চোখ নেই ওই হাঁদা মুখো ডেভিডটার কি গোঁয়ার-গোবিন্দ শিপ্‌টনের। ওরা এসেচে গ্রাম্য ইংলণ্ডের চাষাভূষো পরিবার থেকে। ওয়েস্টার্ন মিডল্যাণ্ডের ব্লাই ও ফেরাবিং কোর্ড গ্রাম থেকে। এখানে নীলকুঠির বড় ম্যানেজার না হোলে ওরা প্যান্টিকস্ ম্যানরের জমিদারের অধীনে লাঙল চষতো নিজের নিজের ফার্ম হাউসে। দরিদ্র কালা আদমীদের ওপর এখানে রাজা সেজে বসে আছে। হায় ভগবান! তিনি এসেছেন দেশ দেখতে শুধু নয়, একখানা বই লিখবেন বাংলাদেশের এই জীবন নিয়ে। এখানকার লোকজনের, এই চমৎকার নদীর, এই অজানা বন দৃশ্যের ছবি আঁকবেন সেই বইতে। ইতিমধ্যে সে

বইয়ের পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এসে গিয়েচে। নাম দেবেন, 'Anglo Indian life in Rural Bengal'। অনেক মাল মসলা যোগাড় করেও ফেলেচেন।' (বিভূতি-রচনাবলী, 'ইছামতী, দ্বাদশখণ্ড, পৃ. ১৩)।

* * *

'সুন্দর বিকেল সেদিন নেমেছিল পাঁচ পোতার বাঁওড়ের ধারে। বন্য পুষ্প সুরভিত হয়েছিল ঈষত্তপ্ত বাতাস। রাঙা মেঘের পাহাড় ফুটে উঠেছিল অস্ত-আকাশ পটে দূর বিস্তৃত আউশ ধানের সবুজ ক্ষেতের ও-প্রান্তে। কিচমিচ করছিল গাঙ্ শালিক ও দোয়েল পাখীর ঝাঁক। কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যাণ্ট কতক্ষণ একদৃষ্টে অস্ত দিগন্তের পানে চেয়ে রইলেন। তাঁর মনে একটি শান্ত গভীর রসের অনুভূতি জেগে উঠলো। বহুদূর নিয়ে যায় যে অনুভূতি মানুষকে। আকাশের বিরাটত্বের সচেতন স্পর্শ আছে সে অনুভূতির মধ্যে। দূরাগত বংশী ধ্বনির সুস্বরের মত করুণ তার আবেদন।

'গ্র্যাণ্ট সাহেব ভাবলেন, এইতো ভারতবর্ষ। এতদিন ঘুরে মরেচেন বোম্বাই, পুনা ক্যাণ্টন্‌মেণ্টের পোলো খেলার মাঠে আর অ্যাংলোইণ্ডিয়ানদের ক্লাবে। এরা এক অদ্ভুত জীব। এদেশে এসেই এমন অদ্ভুত জীব হয়ে পড়ে যে কেন এরা! যে ভারতবর্ষের কথা তিনি 'শকুন্তলা' নাটকের মধ্যে পেয়েছিলেন (মনিয়ার উইলিয়ামের অনুবাদে), যে ভারতবর্ষের খবর পেয়েছিলেন এড্‌উইন আর্নল্ডের কাব্যের মধ্যে, যা দেখতে এত দূরে তিনি এসেছিলেন— এতদিন পরে এই ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদী তীরের অপরাহ্নটিতে সেই অনিন্দ্যসুন্দর মহাকবিস্বময় সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের সন্ধান পেয়েচেন। সার্থক হোল তাঁর ভ্রমণ।' (বিভূতি-রচনাবলী 'ইছামতী' দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ১৫)।

* * *

'আজও তিনি ধ্যানে বসলেন। একটা সন্ধ্যামণি ফুল গাছের খুব কাছেই। খানিকটা সময় কেটে গেল। হঠাৎ একটা অপরিচিত ও বিজাতীয় কণ্ঠস্বরে ভবানী চমকে উঠে চোখ খুলে তাকালেন। একজন সাহেব গাছের গুঁড়ির ওদিকে একটা মোটা ঝুরি ধরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা'র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

'সাহেবটি আর কেউ নয়, কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যাণ্ট—তিনি বটগাছের শোভা দূর থেকে দেখে ভাল করে দেখবার জন্যে কাছে এসে আরও আকৃষ্ট হয়ে গাছের তলায় ঢুকে পড়েন এবং এদিক-ওদিক ঘুরতে গিয়ে হঠাৎ ধ্যানরত ভবানীকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন, An Indian yogi! সাহেবের টম্‌টম্ দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে কেউ নেই। ভজামুচি সহিস টম্‌টমেই বসে আছে ঘোড়া ধরে।…

'বটতলায় কি একটা ব্যাপার হয়েচে বুঝে ভজামুচি টম্‌টমের ঘোড়া সামলে ওখানে এসে হাজির হোল। সেও ভবানীকে চেনে না। এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—পেরনাম হই বাবা ঠাকুর! ও সাহেব ছবি আঁকে কিনা, তাই দেখুন সকালবেলা কুঠি থেকে বেরিয়ে মোরে নিয়ে সারাদিন বন-বাদাড় ঘোরচে। আপনাকে দেখে ওর ভালো লেগেচে তাই

বলচে। ভবানী হাত জুড়ে সাহেবকে নমস্কার করলেন ও একটু হাসলেন।

'গ্র্যাণ্ট ও দেখা দেখি সেভাবে নমস্কার করবার চেষ্টা করলেন, হোলো না।

'ভজা মুচিকে গ্র্যাণ্ট সাহেব হাত পা নেড়ে ছবি আঁকার ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

'ভজামুচি ভবানীর দিকে চেয়ে বললেন—ও বলচে আপনার ছবি আঁকবে। মুই জানি কিনা, এই সাহেবটা ওই রকম করে—একটুখানি চুপটি মেরে বসুন'—[বিভূতি-রচনাবলী ১২শ খণ্ড পৃ. ২০]

আরও কয়েক পাতা পরে কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যাণ্ট কর্ত্তৃক তিলুর ছবি আঁকার কথা পাওয়া যায়। গ্রামের লোকজন এবং গুরুজনদের চোখ এড়াইয়া সুমুখ জ্যোৎস্না রাত্রিতে তিলুকে ভবানী বাঁড়ুয্যে সাহেবের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। সাক্ষী শুধু ছিল ভজা মুচি। ভজা মুচিকে ভবানী বাঁড়ুয্যে বারণও করিয়া দিয়েছিলেন।

'গ্র্যাণ্ট সাহেব দূর থেকে তিলুকে দেখে তাড়াতাড়ি টুপি খুলে সামনে এসে সম্ভ্রমের সুরে বললেন—Oh, she is a queenly beauty! Oh! I am grateful to you, Sir,—তারপর তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তিলুর সলজ্জ মুখের ও অপূর্ব্ব কমনীয় ভঙ্গির একটা আল্‌গা রেখা চিত্র আঁকতে চেষ্টা করলেন।

'১৮৬৪ সালে প্রকাশিত কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যাণ্টের 'অ্যাংলোইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্‌ রুর‍্যাল বেঙ্গল' নামক বইয়ের চুয়ান্ন ও সাতান্ন পৃষ্ঠায় 'এ বেঙ্গলী উম্যান' ও 'অ্যান ইণ্ডিয়ান ইয়োগী ইন্‌ দি হাউস' নামক দুখানা ছবি যথাক্রমে তিলু ও ভবানী বাঁড়ুয্যের রেখাচিত্র।

"গ্রামের কেউ টের পায়নি। মুশকিল ছিল, রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। এ মাঠ দিয়ে ও মাঠ দিয়ে ঘুরে তিলু স্বামীকে নিয়ে এল; ভবানী বিদেশী লোক, গ্রামের রাস্তাঘাট চিনতেন না। ভজা মুচি সইস্‌কে ভবানী সব খুলে বলে বারণ করে দিয়েছিলেন।' (বিভূতি-রচনাবলী, 'ইছামতী' দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ২৩)।

বিভূতিভূষণের তথ্য সংগ্রহে যে কত নিপুণতা ছিল তাহার একটি পরিচয় দিতেছি। 'ইছামতী' উপন্যাসে আছে যে নীলকুঠির খানসামা বেহারা সইস্‌ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীগণ নিম্নবর্ণের বাঙালী হিন্দু, ডোম, মুচি, বাগদি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সংগ্রহ করা হইত। বিভূতিভূষণের বারাকপুর গ্রামে তো মুচি ছিলই। তাঁহার বিখ্যাত গল্প 'আমার ছাত্র' তো গ্রামের গণেশ মুচিকে লইয়া রচিত হয় (দ্রঃ বিভূতি-রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃ. ২৯৮)। এই প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণের 'ইছামতী'তে আছে:

১। '……নীলকুঠিতে কোনো অবাঙ্গালী চাকর বা খানসামা নেই। এই সব আশপাশের গ্রামের মুচি, বাগদি, ডোম শ্রেণীর লোকেরা চাকর খানসামার কাজ করে। ফলে সাহেব মেম সকলেই বাংলা বলতে পারে, হিন্দি কেউ বলেও না, জানেও না।' (বিভূতি-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৩৩)।
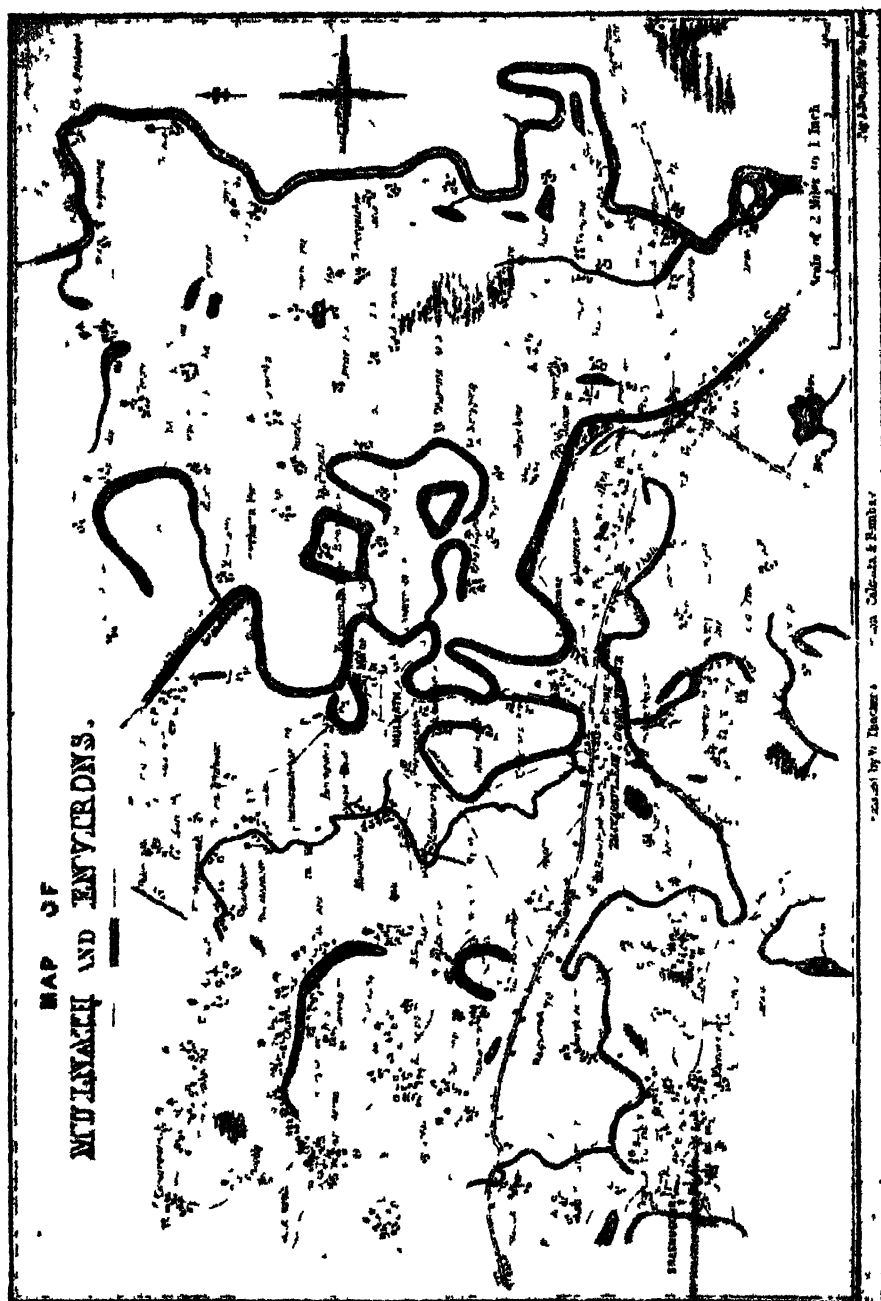
'Rural Life in Bengal' গ্রন্থে লেখক কর্তৃক অঙ্কিত মানচিত্রে মোল্লাহাটি এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উল্লেখ আছে—বিভূতিভূষণের গ্রাম ব্যারাকপুরের উল্লেখ নেই—কিন্তু গোপালনগরের উল্লেখ আছে। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকের এবং বিভূতিভূষণ তাঁর 'ইছামতী' উপন্যাসের উপাদান 'মোল্লাহাটি নীলকুঠি' থেকে পেয়েছিলেন।

around which are beds of flower-plants—jasmines, and small cypress trees, and neatly formed paths, is *a Tomb*. It bears the following inscription :—
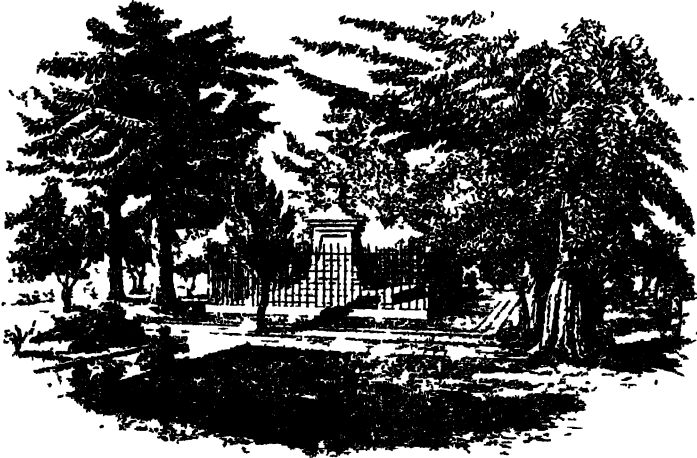
SACRED TO THE MEMORY OF
CHARLOTTE,
THE DEARLY BELOVED WIFE OF
JAMES FORLONG,
BORN THE 11TH NOVEMBER, 1820,
AND DIED ON THE 13TH MARCH, 1844

TO ALL THE HIGHER QUALITIES OF A WIFE AND MOTHER SHE ADDED A DEGREE OF GENTLENESS AND SWEETNESS OF DISPOSITION, SELDOM EQUALLED, AND PERHAPS NEVER EXCEEDED

TO SUCH OUR SAVIOUR SAID
'COME YE BLESSED OF MY FATHER,
INHERIT THE KINGDOM PREPARED FOR YOU'

On the reverse side is the brief but emphatic Scriptural motto :—

"BE STILL AND KNOW THAT I AM GOD"

'......প্রায় ৫।৬ বছর মোল্লাহাটি আসিনি। ডাক বাংলোটাতে গিয়ে বসলুম, মেম সাহেবের গোর দেখলুম—সাহেবদের নীল কুঠীর ধ্বংসস্তূপের ওপর প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় বেড়িয়ে বেড়ালুম......'

(দ্রঃ বিভূতি-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৪৬৮)

২। '......ভজা মুচির দাদা শ্রীরাম মুচি বেয়ারা সাহেবদের জন্তে কফি নিয়ে এল। সাহেবদের চাকর বেয়ারা সবই স্থানীয় মুচি বাদ্দী প্রভৃতি শ্রেণী থেকে নিযুক্ত হয়। তাদের মধ্যে মুসলমান নেই বললেই হয়, সবই নিম্ন বর্ণের হিন্দু। দু-একটি মুসলমান থাকেও অনেক সময়, যেমন এই কুঠিতে দাদার মণ্ডল আছে, ঘোড়ার সহিস।' (বিভূতি-রচনাবলী, 'ইছামতী' দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ১২)।

৩। 'নীলু পালের দোকানে খদ্দের এল। জাতে বুনো, এদের পূর্ব্ব পুরুষ নীলকুঠির কাজের জন্তে এদেশে এসেছিল সাঁওতাল পরগণা থেকে। এখন এরা বাংলা বেশ বলে, কালী পুজো মনসা পুজো করে, বাঙালী মেয়ের মত শাড়ী পরে।' (বিভূতি-রচনাবলী, 'ইছামতী' দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৪১)।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Tribal welfare Department কর্তৃক প্রকাশিত 'The Koras and some little known communities of West Bengal' নামক একটি গ্রন্থ আমাদের হাতে আসিয়াছে। গ্রন্থটির রচয়িতা Cultural Reseach Institute-এর Deputy Director শ্রীযুক্ত অমলকুমার দাস। ১৯৬২ সালের মে মাসে তিনি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম ডোম জাতির বিভিন্ন শাখায় সমীক্ষার কাজ করিবার জন্ত হুগলি জেলার বলাগড় এবং ২৪ পরগণা জেলার বনগ্রাম থানার মড়িঘাটা বাছিয়া লন। 'কালিন্দী ডোম' সম্পর্কে তাঁহার সমীক্ষার কথা এখানে তুলিয়া দিতেছি :

' "Kalindis" are a sub caste of Doms, a scheduled caste community of West Bengal. The name Kalindi is generally used by a section of Doms as they are mainly worshippers of Kali.' (P. 69)

* * *

'Kalindi Doms were brought over Bengal from Bihar a long time ago to work in the indigo plantation in different distircts of Bengal.' (P. 69)

* * *

'The highest concentration of Kalindi Doms is in 24 Parganas district where there about one hundred eighty families in Mallahati, Murighata, Jaypur-Matigonj Villages of Bangaon P.S. and Habra and Gobardanga. In 24 Parganas, Kalindi Doms were brought over to work in the indigo plantation of Mallahati Nilkuthi in Bangaon P.S.

'The above distribution pattern of the Kalindi Doms clearly shows that their present concentration is mainly in the areas where indigo plantation had once flourished' (P. 69 'The Koras and some little

known communities of West Bengal'—by Amal Kumar Das, Calcutta 1964)

'ইছামতী' হইতে উদ্ধৃত অংশ এবং উপরোক্ত ইংরেজি উদ্ধৃতি মিলাইয়া পাঠ করিলে দেখা যাইবে বিভূতিভূষণ উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহের ব্যাপারে কত তথ্য-নিষ্ঠ ছিলেন।

এ বিষয়ে আরও দু একটি উদাহরণ দিতেছি। 'ইছামতী' উপন্যাসের রামকানাই কবিরাজের চরিত্রের উৎসও আমরা ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাইব।

১। 'আজ অনেকক্ষণ দাসী পিসিমার সঙ্গে গল্প করলুম। সেকালের অনেক কথা হল। ওই সবই আমার জানবার বড় ইচ্ছে। ঠাকুমাদের চণ্ডীমণ্ডপের ভিটাতে দুর্গোৎসব হত, বড় উঠোন ছিল—আন্নাপিসি দু বেলা গোবর দিতেন, খুব লোকজন খেত—নারকেল গাছের পাশে ওই যে সুঁড়িগলিটা ছিল খিড়কির দোর—মেটে পাঁচিল ছিল ওদিকটা। গোলক চাটুয্যে ছিলেন বাবার মামাতো ভাই—পিসিমার মা ছিলেন ব্রজ চাটুয্যের পিসি। রাখালী পিসিমা ছিলেন চন্দ্র চাটুয্যের মেয়ে। প্রসঙ্গত বলা যাক যে আজই রাখালী পিসিমার মারা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গেল। যাবো যাবো করে আর ঘটে উঠল না। পিসিমার শ্বশুরবাড়ি ছিল চৌবেড়ে। নিবারণ রাখালী পিসিমার ভাই, ভারি সুন্দর দেখতে ছিল—কলেরাতে মারা যায় আঠারো বছর বয়সে।' ..(বিভূতি-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৭৮)।

২। 'বিকেলে একটু মেঘ করেছিল। গঙ্গাচরণের দোকানে কবিরাজ মশাইয়ের সঙ্গে গল্প করছিলুম। আমি বললুম—কি রাঁধলেন, কবিরাজ মশাই? কণ্টিকারীর ফলভাজা আর ভাত। এই কবিরাজটি বড় অদ্ভুত মানুষ। বয়স প্রায় সত্তর হবে, কিন্তু সদানন্দ, মুক্ত প্রাণ লোক। কোন্ দেশ থেকে এদেশে এসেচে কেউ জানে না। বিশেষ কিছু হয় না এই অজ পাড়াগাঁয়ে। তবুও আছে, বলে—এদেশের ওপর মায়া বসে গিয়েচে। সোঁদালি ফুল দিয়ে একটা বালিশ তৈরী করেচে, সেই মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকে।' (বিভূতি-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৮৯)।

৩। 'কবিরাজ ও গঙ্গাচরণ পথের ধারে মাদুর পেতে বট অশ্বত্থের ছায়ায় বসে গল্প করচে। কাপড় কেটে কবিরাজ নিজেই জামা সেলাই করচে। শুকনো ভেষজ পাতালতা কলকাতায় চালান দেবে, তারই মতলব আঁটচে। বড ভাল লাগল বিশেষ করে আজ ওদের গল্পসল্প। আসবার সময় ছাতা নিয়ে এলুম, তখন রাত হয়ে গিয়েচে, আমাদের ঘাটে যখন নাইতে নেমেচি, আকাশে অনেক নক্ষত্র উঠেচে।' (বিভূতি-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৯০)।

৪। 'সকালে উঠে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে আজ বড় আনন্দ পেলাম। দুপুরে পাট-শিমলে রওনা হওয়া গেল পায়ে হেঁটে। কবিরাজ মশায় পাঠশালায় ছেলে পড়াচ্ছেন, তাঁর কাছে বসে একটু গল্প করে বট অশ্বত্থের ছায়াভরা পথ দিয়ে মোল্লাহাটির খেয়াঘাটে গিয়ে পার হলাম।' (বিভূতি-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৯১)।

৫। '...কুঠীর মাঠের বাড়ির দুধারে বন কেটে উড়িয়ে দিয়েচে—সেই লতাবিতান, সেই ঝোপ-ঝাপ এবার কোথায় উড়ে গিয়েচে। দেশময়ই দেখচি এই অবস্থা। বেলেডাঙ্গায়

পথের ধারে একটা কামারের দোকানে দশ-বারো জন লোক বসে আছে—তার মধ্যে বিরাশি বছরের সেই হরমোতীও বসে আছে। বহু বছর আগের মোল্লাহাটী কুটীর সাহেবদের গল্প সে করলে।' (বিভূতি-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫২৭)।

৬। …'দুপুরের পর ইন্দু, আমি, গুটকে কুঠীর মাঠের পথ দিয়ে মোল্লাহাটি গেলুম। ইন্দু গেল আমডোবে। আমিও গুটকে মোল্লাহাটি কুঠী ও নীলের হাউজঘর দেখি এতকাল পরে। কি সুন্দর শ্যাম শোভা, অত্যুন্নত খেজুর গাছ, জলি ধানের ক্ষেত পথের দুপাশে, একটা সমাধি দেখলুম বাঁওড়ের ধারে মোল্লাহাটিতে।' (বিভূতি-রচনাবলী, চতুর্থখণ্ড, পৃ. ৪৪৯)।

৭। 'বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত দিনলিপিতেও 'ইছামতী' উপন্যাস রচনা সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। ১১।৬।১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের 'অপ্রকাশিত দিনলিপি'তে পাওয়া যায়: 'বারাকপুর। বহু পুরাতন গ্রাম বটে। রায়েরা এই গাঁয়ের আদি বাসিন্দা। ওদের ঘরের দৌহিত্র আনন্দরাম ও দুঃখীরাম রায়েরা। রায়েদের ঘরের দৌহিত্র বাঁড়ুয্যেরা। সুবর্ণপুরের ভবানী বাঁড়ুয্যে আনন্দ রায়ের তিন পিসীকে বিবাহ করেন। তাঁর ছেলে কার্ত্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়।'

* * *

১৩৭১ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে 'কথা সাহিত্য' মাসিক পত্রিকায় 'কয়েক দিনের স্মৃতিচিত্র' নামে বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত দিনলিপির কয়েকটি পাতা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতেও মোল্লাহাটি নীলকুঠির কথা পাওয়া যায়:

'মধ্যে একদিন কাপ্তেন চৌধুরীর গাড়ীতে আমরা মোল্লাহাটি ডাক বাংলাতে বেড়াতে যাই। নীলকুঠির সেই পুরনো সমাধিটার পাশে একটা ফুলে ভর্ত্তি বকাইন গাছ দেখে সেদিন খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। এ-গাছ এখানে কোথা থেকে এল? নীলকুঠির সাহেবরা এনেছিল নিশ্চয়।' (কথা সাহিত্য, পৌষ ১৩৭১)।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুরে অবস্থান কালে বিভূতিভূষণ 'হে অরণ্য কথা কও' দিনলিপির এক জায়গায় লিখিয়াছেন:'…বিশ্বের মহাশিল্পীর পরিকল্পনার মহনীয়তা আমার চোখের সামনে সুপরিস্ফুট। নীল আকাশের দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা করি—এই পটভূমি নিয়ে এদেশের একখানা Epic উপন্যাস লিখবো আমি। নীলকুঠির পুল থেকে শুরু করবো।' (বিভূতি- রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৩৯৪)।

'ইছামতী' প্রকাশিত হওয়ার কিছু পরেই বর্ত্তমান নিবন্ধকারের উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে বিভূতিভূষণের মুখে কিছু কিছু বক্তব্য শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। এই সম্পর্কে 'ইছামতী ও বিভূতিভূষণ' নামক একটি নিবন্ধও বর্ত্তমান নিবন্ধকার রচনা করিয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় অংশ উক্ত নিবন্ধ হইতে তুলিয়া দিতেছি:

"বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' উপন্যাস তাঁর জীবিত অবস্থায় প্রকাশিত সর্ব্ব শেষ রচনা। বিভূতিভূষণের দেহান্ত ঘটে ১৯৫০ সনের ১নভেম্বর আর 'ইছামতী' প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সনের জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে। 'ইছামতী' যেদিন প্রকাশিত হয়…সেদিন তিনি বালীগঞ্জ

সুইনহো স্ট্রীটে তাঁর মামা শ্বশুর গৃহে রাত্রিযাপন করেছিলেন। সেময় 'ইছামতী' উপন্যাস নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক অন্তরঙ্গ আলোচনা হয়েছিল। সে সব কথা আজ আর বিশেষ মনে নেই। বিভূতিভূষণের যে এত শীঘ্র জীবনাবসান হবে তখন ভাবিনি। সেজন্য সেদিনকার কোনো আলোচনা লিপিবদ্ধ করে রাখবার তাগিদ অনুভব করিনি। তবে এটুকু মনে আছে 'ইছামতী' উপন্যাস রচনা করে তিনি খুবই তৃপ্তিলাভ করেছিলেন এবং বইটি সম্পর্কে তাঁর খুবই উচ্চ ধারণা ছিল—তাঁর সঙ্গে কথা বলে সেদিন অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল।

মনে আছে ওই ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেরই শেষে আমাকে তাঁর স্বগ্রাম বারাকপুরে যেতে হয়েছিল। তখন বাঙালীর ব্যাঙ্কের খুবই দুরবস্থা। বিভূতিভূষণের কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর অনুরোধে তাঁকে এই খবরটা দিতে এবং সতর্ক করে দিতে আমাকে সে সময় বারাকপুর গ্রামে যেতে হয়েছিল। আমি যখন গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম তখন বিকেল হয়ে এসেছে। চারিদিকে সবুজের কানাকানি। গাছ গাছালিতে নতুন পাতার সমারোহ। এমন এক মনোরম স্নিগ্ধ বিকেলে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে শুনলাম—তিনি ইছামতীর নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছেন। আমি আর বাড়ীতে অপেক্ষা করলাম না—তক্ষুনি চলে গেলাম নদীর ধারে। দেখলাম সেই পড়ন্ত বিকেলে বিভূতিভূষণ নদীর ধারের একটি গাছের গুঁড়িতে বসে নিবিষ্ট মনে আকাশের নব নব মায়ারূপ দেখছেন। আমার আকস্মিক আগমনে তাঁকে খুব একটা বিচলিত হোতে দেখলাম না। পরে আমার কাছ থেকে যদিও সব কথা শুনেছিলেন কিন্তু সেদিন আমার বারবারই মনে হয়েছিল তাঁর সমস্ত মন পড়ে আছে 'ইছামতী'র ওপর—তিনি যেন ওই সময়ে উপন্যাসটির কথাই ভাবছিলেন। আমার তখন নিতান্তই অল্প বয়স। কিন্তু আমার সঙ্গে তিনি সেদিন রাম কানাই কবিরাজ, প্রসন্ন আমিন, গয়া মেম, শিপটন্ সাহেব প্রমুখ চরিত্রগুলির প্রসঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা করেছিলেন। আমি উপলক্ষ্য ছিলাম মাত্র—প্রকৃত পক্ষে নিজের সঙ্গে নিজেই আলোচনা করছিলেন। মনে আছে, বারবারই তিনি রাম কানাই কবিরাজের কথা—বিশেষ করে তাঁর মহত্ত্বের কথা বলেছিলেন। আলোচনা করতে করতে রাত হয়ে গেল। আমি তাঁকে একরকম জোর করেই বাড়ী নিয়ে গেলাম।

'ইছামতী' উপন্যাসটি রচনার পেছনে বিভূতিভূষণের অনেক দিনের সাধনা ও মনন রয়েছে। তাঁর দিনলিপিতে 'ইছামতী'কে নিয়ে একটা কিছু লেখার ইচ্ছা বারবারই প্রকাশ পেয়েছে। বিভূতিভূষণের জন্মের ৪০।৫০ বছর আগে এই অঞ্চলে নীলবিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। ইছামতী নদীর ধারে বিভূতিভূষণের স্বগ্রামেও নীলকুঠি ছিল। ১৯৫০ সন পর্য্যন্ত তার ধ্বংসাবশেষ দেখা গেছে। আমাদেরও তা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। বর্ত্তমানে ওই অঞ্চলে উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ে ওঠায় নীলকুঠির সেই ধ্বংসাবশেষ কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, 'মোল্লাহাটি ইণ্ডিগো কন্‌সার্ন' তাঁর স্বগ্রাম থেকে মাত্র ৫।৬ মাইল দূরে। দীনবন্ধু মিত্রের জন্মস্থান চৌবেরিয়া গ্রামও খুব কাছেই। আমার বাল্য ও কিশোর কালে দেখেছি—বিভূতিভূষণ যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে 'ইছামতী' উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করছেন। ৪০।৫০ বৎসর আগেকার ঘটনাবলী ও কিম্বদন্তী প্রাচীনাদের মুখ থেকে শুনছেন এবং নিজের

বুদ্ধির আলোকে সে সবের বিচার বিশ্লেষণ করছেন।

* * *

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 'ইছামতী' উপন্যাসের ভবানী বাঁড়ুয্যের চরিত্র আঁকতে গিয়ে বিভূতিভূষণ অজ্ঞাতসারে নিজের কথাই লিখে ফেলেছেন। পরিণত বয়সে বিবাহ, শিশু পুত্র লাভ এবং ভক্তিমতী ও সেবাপরায়না স্ত্রীর ভালোবাসা প্রভৃতির যে নিখুঁত চিত্র ওই উপন্যাসে আছে—মনে হয় সে সব কিছু কিছু তাঁর নিজের জীবন থেকেই নেওয়া। বলতে কি, 'ইছামতী' উপন্যাসের তিলু ও ভবানী বাঁড়ুয্যের সংসারে কথা পড়তে পড়তে আমাদের বিভূতিভূষণের নিজের সংসারের কথাই সবার আগে মনে পড়ে। রামকানাই কবিরাজ চরিত্রটিতে অলক্ষে তাঁর পিতামহ তারিনী চরণের প্রভাব পড়েছে। ভবানী বাঁড়ুয্যের ভবঘুরেমী ভাব বিভূতিভূষণ ও তাঁর পিতার ভবঘুরেমী স্বভাবের কথাই মনে করিয়ে দেয়। পরিশেষে একথাই বলবো—'ইছামতী' উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমিকায় যে অসংখ্য চরিত্র ক্রমে ভীড় করে এসেছে, তাঁরা কেউই কল্পলোকের বাসিন্দা নয়। অন্ততঃ আমরা যাঁরা তাঁকে একদিন খুব কাছে থেকে দেখেছি, তাঁদের একথা মনে না এসে যায় না।" ('বিচার' সাপ্তাহিক পত্রিকা, শুক্রবার ৩১ জুলাই ১৯৭০)

* * *

'ইছামতী' প্রকাশিত হওয়ার পরে বাংলা উপন্যাস জগতে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ঢেউ আসে। 'ইছামতী' প্রকাশের অনতিকাল মধ্যে অনেক ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস বিরচিত হয়। তন্মধ্যে কয়েকটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। প্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী', গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'বহ্নিবন্যা', 'সোহাগপুরা' বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' এবং রমাপাদ চৌধুরীর 'লালবাঈ, উপন্যাসের নাম প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়। এদিক হইতেও 'ইছামতী' উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের এক উষর পর্বে দিশারীর কাজ করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে রাশি রাশি বিদেশী উপন্যাসের অসার্থক অনুবাদে ও 'বেলে লেটার্স' নামক রচনায় বাংলা সাহিত্য ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময় 'ইছামতী' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। 'ইছামতী' প্রকাশের পরে অষ্টাদশ, ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের অনেক ইতিহাস-নির্ভর কাহিনী লইয়া বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস শাখা ক্রমশ সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিতেছে।

'ক্ষণভঙ্গুর'

'ক্ষণভঙ্গুর' বিভূতিভূষণের রচিত একাদশ গল্পগ্রন্থ। গল্পগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। 'ক্ষণভঙ্গুর' গল্প গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকাল : প্রথম

সংস্করণ, ২৯ ভাদ্র ১৩৫২ (ইং ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৫)। * পৃঃ. ১৩১ ষোলপেজী ডবল ক্রাউন সাইজ। বোর্ড বাঁধাই কাগজের মলাট। প্রকাশক : গুপ্ত প্রকাশিকা, ঢাকুরিয়া।

পুস্তকটির পরিবেশক ও প্রধান বিক্রেতা ছিলেন প্রসিদ্ধ প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ।

সূচী : সিঁদুরচরণ, একটি কোঠাবাড়ীর ইতিহাস, বুধোর মায়ের মৃত্যু, ছেলে ধরা, রামতারণ চাটুজ্যে—অথর, দুটি মস্তর, ফড় খেলা, হাট, অরণ্যাকাব্য।

'ক্ষণভঙ্গুর' গল্প-গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে প্রতিটি গল্পই বিভিন্ন সাময়িক পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গল্পগুলির শুধু প্রকাশকাল জানা যায় সিঁদুরচরণ (গল্পভারতী, বৈশাখ ১৩৫২), একটি কোঠাবাড়ীর ইতিহাস (দেশ, বৈশাখ ১৩৫২), হাট (দেশ, শ্রাবণ ১৩৫২) প্রভৃতি।

'সিঁদুরচরণ' বিভূতিভূষণ রচিত একটি বিখ্যাত গল্প। গল্পটি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইবার পরে উচ্চ প্রশংসালাভ করে। গল্পটি 'বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠগল্প' গ্রন্থেরও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। 'ক্ষণভঙ্গুর' গল্পগ্রন্থ 'গল্প-পঞ্চাশৎ-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবার সময়ে 'সিঁদুরচরণ' গল্পটি উক্ত সংগ্রহ হইতে বর্জ্জিত হয়।

'একটি কোঠাবাড়ীর ইতিহাস'-এর মত গল্প বিভূতিভূষণের আরও আছে। এই প্রসঙ্গে 'জ্যোতিরিঙ্গণ' গল্প-সংগ্রহের 'দুইদিন' নামক গল্পটির উল্লেখ করিতে হয়। 'বিভূতি-রচনাবলী'র একাদশ খণ্ডে 'জ্যোতিরিঙ্গণ' গ্রন্থটি স্থানলাভ করিয়াছে। 'বুধোর মায়ের মৃত্যু' গল্পটি বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত। বুধো মণ্ডল বারাকপুর গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ। বিভূতিভূষণ ১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে বারাকপুর গ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে প্রকৃতই ধানের গোলায় ধান রাখিবার জন্য বুধোর মাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ১৯৪৩ সালের মে মাসে বিভূতিভূষণ স্ত্রী শ্রীযুক্তা রমা বন্দোপাধ্যায় (কল্যাণী) ও ভাগিনেয়ী উমাকে লইয়া প্রথমবার পুরীতে বেড়াইতে যান। সে ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার 'হে অরণ্য কথা কও' দিনলিপির গোড়ার দিকে উল্লিখিত আছে।

দ্বিতীয়বার পুরী ভ্রমণের উল্লেখও 'হে অরণ্য কথা কও' দিনলিপিতে আছে। সেবার মহাদেব রায়ের সঙ্গে তিনি ভুবনেশ্বর হইতে গোরুর গাড়ীতে উদয়গিরি খণ্ডগিরি দেখিতে যান। সেই ভ্রমণের উল্লেখও উক্ত দিনলিপিতে আছে।

বাল্যকালে বিভূতিভূষণ কেওটা-সাগঞ্জে প্রসন্ন গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় পড়িতেন। তারপর ৬ বৎসর বয়সের সময় দেশে আসিয়া হরিরায়ের পাঠশালায় ভর্ত্তি হন। এই পাঠশালায় উল্লেখ ও বর্ণনা 'বুধোর মায়ের মৃত্যু' গল্পটিতে পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিক অংশ গল্পটি হইতে তুলিয়া দিতেছি :

'অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ে। হরিরায়ের পাঠশালায় আমি তখন পড়ি।

---

* বিভূতিভূষণের জীবিত কালে ২৯ ভাদ্র তাঁহার জন্মদিনের উৎসব উদ্‌যাপিত হইত। বঙ্গাব্দ ১৩৫২ সালের ২৯ ভাদ্র জন্মোৎসবের প্রাক্কালে 'ক্ষণভঙ্গুর' গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। জন্মদিনের আসরে প্রকাশকের তরফে গ্রন্থটি বিভূতিভূষণকে উপহার দেওয়া হয়।

বিকেল বেলা, তেঁতুল গাছের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে হরিরায়ের ক্ষুদ্র চালাঘরের সামনেকার সারা উঠোন ছেয়ে ফেলেছে। ছুটি হয় হয়, নামতা পড়ানো শুরু হবে এখন। এমন সময় কালীপদ রায় আর চণ্ডীদাস মুখুজ্যে এসে হরিরায়ের সঙ্গে গল্প জুড়লেন।' (বিভূতি-রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, পৃ. ২৯০)। উপরোক্ত উদ্ধৃতি পাঠ করিলে 'পথের-পাঁচালী' উপন্যাসের প্রসন্ন গুরু মহাশয়ের পাঠশালার সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে।

'বুধোর মায়ের মৃত্যু' গল্পের সঙ্গে বিভূতিভূষণের পুরী ও ভুবনেশ্বর পরিভ্রমণের অনেক মিল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে 'হে অরণ্য কথা কও' দিনলিপি হইতে প্রথম বারের পুরী ভ্রমণের বিবরণ দিতেছি :

'পুরী স্টেশনে গজেনবাবু ও সুমথ এসে আমাদের নামিয়ে নিয়ে যেতে যেতে গল্প করচে—হঠাৎ সামনে দেখি অকূল সমুদ্রের নীল জলরাশি সে কি পরম মুহূর্ত্ত জীবনের! সমস্ত দেহে যেন কিসের বিদ্যুৎ খেলে গেল। কল্যাণী দেখি হঠাৎ অবাক হয়ে হাঁ করে চেয়ে আছে। সমুদ্র দেখেছিলুম বহুকাল আগে কক্সবাজারে—আর এই ২০।২১ বছর পরে আজ পুরীর সমুদ্র দেখলুম।' (বিভূতি-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৩৯৭)।

* * *

'সেই পথেই পুরুষোত্তম মঠে গিয়ে পেছনের একটি অতি সুন্দর স্থানে বস্লুম। ডাইনে দূর প্রসারী ঝাউবন, পাশেই টোটা গোপীনাথের বাগানে অজস্র কাঁঠাল গাছ, সামনে বিস্তৃত বালুচরের পারে অপার নীলাম্বু রাশি সফেন ঊর্ম্মিমালা বুকে নিয়ে তটভূমিতে আবার আছড়ে পড়চে। সে দৃশ্য দেখে আর চোখ ফেরাতে পারিনে, উঠতে ইচ্ছে হয় না। এই তো বিশ্বরূপের মন্দির, এই আকাশ, এই ঝাউবন, এই অপার নীল সমুদ্র। এ ছেড়ে কোথায় যাবো?' (বিভূতি-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮)।

দ্বিতীয়বার মহাদেব রায়ের সঙ্গে পুরী ও ভুবনেশ্বর ভ্রমণের বর্ণনা দিতেছি :

'সকাল তখনও ভাল করে হয়নি, ভাইজাগ প্যাসেঞ্জার এসে ভুবনেশ্বরে দাঁড়ালো। আমি অন্ধকারের মধ্যে নেমে গিয়ে গাড়োয়ানদের সঙ্গে দর দস্তর চুক্তি করে মহাদেব বাবুকে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে তুললাম। অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে গাড়ী চলচে, পথের দুধারে নক্স-ভমিকার জঙ্গল। একটু পরে ফর্সা হোল, গাড়োয়ান বল্লে—এই নালাটা ছাড়িয়ে এক মাইল গেলেই উদয়গিরি খণ্ডগিরি। একটু পরেই সাদা জৈন মন্দিরটি চোখে পড়লো সামনের পাহাড়টির ওপরে। গরুর গাড়ীও গিয়ে দাঁড়ালো পাহাড়ের তলায়। ঘড়িতে দেখলাম ভোর সাড়ে পাঁচটা।

সুন্দর পরিবেশটি। সামনে বনাবৃত পাহাড়, মাটির রং লাল, বড় বড় প্রস্তর যেন মাকড়া পাথরের চত্বর। পথের ধারে একটি জৈন ধর্ম্মশালা। নিচে থেকেই দেখলুম পাহাড়ের গায়ে কাটা সরু সরু থামওয়ালা দর-দালান মত—অনেকদিন আগে নির্ম্মল বসুর তোলা ফটো অ্যালবামে উদয়গিরির এইসব গুহার ছবি যেমন দেখেছিলুম। কিন্তু পাহাড়ের ওপর গিয়ে চারিদিকে চেয়েই মনে হোল এ পাহাড় দুটির সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমাকে কেউ কোনো কথা

বলেনি এর আগে। পাহাড়ের ওপরটা সমতল পাষাণ বেদিকার মত। বনে বনে পাখী ডাকচে, বন্য যুথিকা ফুটে সুবাস বিতরণ করচে, মেঘ মেদুর আকাশ, দূর প্রসারী প্রান্তর, দূরে দূরে ছোট বড় পাহাড়। কত মুনি ঋষির তপস্যাপূত মনোরম স্থানটি। ব্যাঘ্র গুমফাটি বড় চমৎকার, ঠিক একটি বাঘের মুখ খুদে বার করচে আস্ত পাহাড় কেটে। আমরা অনেকক্ষণ একটা পাথরের চাতালে বসে তারপর নেমে এলাম নীচে। একটা বৃদ্ধা বসে আছে একটা বাড়ীতে, ধর্ম্মশালার পাশে, সে বল্লে, আমি আচার, মুড়ি বিক্রি করি।

বল্লাম—কুলের আচার আছে?

—আছে।

তারপরে যে আচার আনলে তা নুন মাখানো শুকনো কুল—তাকে আচার বলা চলে না। নিলুম না সে কুলের আচার। খণ্ডগিরিতে উঠলাম তারপরে সেখানে নামবার পথে বনের দৃশ্য বেশ উপভোগ্য।...'

'আবার ভুবনেশ্বর? রওনা হলাম গরুর গাড়ীতে। পথের ধারে শুধুই নক্স-ভমিকার বন, আর একটা গাছ—তার নাম মহী গাছ।...'

* * *

ভুবনেশ্বর পৌঁছুতেই ছোট বিশ্বনাথ পাণ্ডার খপ্পরে পড়ে গেলুম! সে বিন্দু সরোবরের ধার থেকে আমাদের নিয়ে এল, তুললে এক ধর্ম্মশালায়। গৌরী কুণ্ডে আমাদের স্নান করাতে নিয়ে গেল—স্নানান্তে দুধকুণ্ডের জল পান করে যেমন পিছু ফিরেছি, অমনি পাণ্ডার দল ফেউয়ের মত পিছু লাগলো। কোন ক্রমে তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ধর্ম্মশালায় মধ্যাহ্নভোজন করা গেল। তারপর মন্দির দেখতে বার হই। বহু অতীত দিনের আনন্দচ্ছন্দ যেন পাথর হয়ে জমে আছে সে শিখালকায় পাষাণ দেউলের বুকে। একটি নর্ত্তকী মূর্ত্তির কি ত্রিভঙ্গ দেহ, কি মুদ্রার সুষমা! পাষাণে খোদাই লিরিক কবিতা।...

(বিভূতি-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৪৬৯)।

পুরী স্টেশন থেকে ফিরবার পথেই বনগাঁর হরিবাবু ও তাঁর ছেলে বামনের সঙ্গে দেখা হোল। আমরা ধর্ম্মশালায় জিনিসপত্র রেখে জগন্নাথের মন্দিরে গেলুম দর্শন করতে। ঠাকুরের শিঙার বেশ দেখলুম। মন্দিরে বাইরের চত্বরে খোলা হাওয়ায় সুমথবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। আর-বছর আর এ-বছর। সেই মন্দিরের নানা স্থানে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠকের সম্মুখে কৌতূহলী ও ধর্ম্মপিপাসু শ্রোতার ভিড়।' (বিভূতি-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৪৭০)।

ইহার সঙ্গে 'বুধোর মায়ের মৃত্যু' গল্পের উদ্ধৃতি মিলাইয়া পাঠ করিলে গল্পের উৎসের সন্ধান মিলিবে বলিয়া মনে হয়:

'এর পরের ইতিহাসটা আমার সংগ্রহ করা বুধো মণ্ডলের শালীর বড় ছেলে ও তার খুড় শাশুড়ীর কাছ থেকে। আর ওপাড়ার খুড়িমার কাছ থেকে। আমি নিজে জ্যৈষ্ঠ মাসে পুরী থেকে এসেছি, চটক পাহাড়ের ওপাশের নির্জ্জন সমুদ্র-বেলায় ঝাউ বনের সঙ্গীত ও

উদয়গিরি খণ্ডগিরির শ্যামশোভা, প্রাচীন যুগের তপস্বীদের আশ্রমগুলির ছবি আমার মনে যে স্বপ্ন এঁকে দিয়েছে তখনও তাতে বিভোর হয়ে আছি, এমন সময় ওবাড়ির খুড়িমা এসে বললেন—ওমা, পুরী থেকে চলে এলে তুমি, আমি যে যাচ্ছি রথ দেখতে।

—তা কি করে জানব খুড়িমা, চিঠি দিলেন না কেন পুরীর ঠিকানায় ?

—তখন কি ঠিক ছিল বাবা ? কাল বসে ঠিক করলাম। আমি যাব আর বোষ্টম-বৌ।

—আমার সঙ্গে যদি যেতেন। আপনারা কখনও পুরী যান নি, বিদেশেও বেরোননি, একা যাওয়া এতদূর। বিপদে না পড়েন।

—তুমি বাবা তোমার জানাশুনো লোককে চিঠি লিখে দাও। পাণ্ডাদেরও চিঠি লেখ।

* * *

একদিন কুমোর পাড়ার পথ দিয়ে বিকেলে আসছি, হঠাৎ সামনে পড়ে গেল বুধো মণ্ডল আমি বললাম—কি রে, তোর মা ভাল আছে ?

—প্রাতো পেন্নাম। অজ্ঞে বাবু, মা তো ছিক্কেত্তর গিয়েছে।

—সে কি! তোর মা গিয়েছে ? কই জানি নে তো ? কার সঙ্গে ?

—আমার শালীর ছেলে আর এক খুড়-শাশুড়ি গেল কিনা রথে, তাদেরই সঙ্গে। (বিভূতি-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ২৯৩)।

‘ভুবনেশ্বরে বিন্দু সরোবরের তীরে বাঁধা ঘাটের সোপানে খুড়িমা সিক্ত-বসনে কাপড় ছাডবার ব্যবস্থা করছেন, হঠাৎ অল্প দূরে কাকে দেখে তিনি অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলেন। পাশেই ছিল বোষ্টম-বৌ, তাকে বললেন—হ্যাঁগা বোষ্টম বৌ, ও কে দেখ তো ? আমাদের গাঁয়ের বুধোর মা না ?

শশী বৈরাগীর বৌ চোখে কম দেখে। সে বললে—না মা ঠাকরুণ বুধোর মা এখানে বসে থেকে আসবে ? আপনি যেমন!

—এগিয়ে দেখ না বৌ, আন্দাজে মারলে হয় না। ও ঠিক বুধোর মা। যাও গিয়ে দেখে এস।

বুধোর মা হঠাৎ সামনে স্বগ্রামের বোষ্টম—বৌকে দেখে হাঁ করে রইল।’ (বিভূতি-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ২৯৪)।

* * *

‘পরস্পর আলাপ আপ্যায়নের পর বিস্ময়ের প্রথম বেগ কেটে গেলে সবাই পরামর্শ করে ঠিক করলে, এখন থেকে ওরা এক সঙ্গে থাকবে সবাই। সেদিন একই ধর্মশালায় সবাই গিয়ে উঠল, মন্দির দর্শন করলে, পরদিন সকালে একত্র গরুর গাড়িতে খণ্ডগিরি উদয়গিরি যাত্রা করলে।’ (বিভূতি-রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, পৃ. ২৯৪)।

‘খুব সকালে রওনা হয়ে ওরা বেলা সাতটার সময় খণ্ডগিরি উদয়গিরির পাদদেশে বন-নিকুঞ্জে পৌছে গেল। খুড়িমা লেখাপড়া জানতেন, দু-একখানা মাসিক পত্রিকায় খণ্ডগিরির বিবরণও পড়েছিলেন। তিনি সঙ্গিনীদের সব বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।·····

খুড়িমার মুখে এ গল্প শুনতে শুনতে আমি চোখ বুজে অনুভব করবার চেষ্টা করছিলুম—মাত্র এ'কদিন আগে যে উদয়গিরির ওপরকার নির্জ্জন বনভূমিতে আমি আমার এক সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে অমনি এক সুন্দর মেঘ মেদুর প্রভাতে বসে বসে বনবিহঙ্গ কাকলীর মধ্যে বহু শতাব্দী পারের সঙ্গীত শুনেছিলাম—সেখানে গিয়ে বুধোর মায়ের মনের সে ভার্জিন আনন্দ।

সমতল পাষাণ চত্বরের মত শৈলশিখর, যেন প্রকৃতির তৈরি পাষাণ বেদী। কত বন্য লতাপাতা, কুচিলা গাছের জঙ্গল, কত গুহা, কত কারুকার্য্য, কত যক্ষ—যক্ষিনী, কত নাগ—নাগিনী, পাষাণে পাষাণে মৌন অতীতের কত মুখরতা।......

নামবার পথে একটি ফর্সা স্ত্রীলোককে এক ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওরা সেখানে গেল। খুড়িমা বললেন—আপনার এখানে ঘর?

স্ত্রীলোকটি উড়িয়া ভাষায় বললে—হ্যাঁ। নিজের ঘর। তোমরা কোথায় যাবে?

—রথ দেখতে এসেছি বাংলাদেশ থেকে। এখানে খাবার কিছু পাওয়া যায়?

—আমি মুড়ি বিক্রি করি। আর আচার আছে—লঙ্কার, আমের কুলের।

—কি রকম আচার দেখি?

স্ত্রীলোকটি ঘরের ভিতর থেকে যা হাতে করে এনে দেখালে, সে কতকগুলো নুন—মাখানো আমের টুকরো এবং কুল। খুড়িমা বা তাঁর সঙ্গিনীরা সে সব পছন্দ করলে না। পথে আসবার সময় খুড়িমা বললেন—ওমা, ওর নাম নাকি আচার। আমসি আর শুকনো কুল, ওর নাম নাকি আচার! এখানে আচার তৈরী করতে জানে না বাপু।......

বুধোর মা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সমুদ্রের ধারে। নীল সমুদ্র ধূ ধূ করছে যত দূর চোখ যায়। ফেনার ফুল মাথায় বড় বড় ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে বালু বেলায়। দক্ষিণে বামে সামনে অকূল জলরাশি। খুড়িমা, বোষ্টম বৌ, বুধোর মা সকলেই নির্ব্বাক নিস্পন্দ। খুড়িমার যেন কান্না আসছে। কতক্ষণ পরে ওদের চমক ভাঙল।' (বিভূতি-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ২৯৬)।

* * *

'বুধোর মায়ের মৃত্যু' গল্পটির উৎস প্রসঙ্গে আর বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নাই। বিভূতিভূষণ তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের শেষপর্ব্বে পতিতা ও ভ্রষ্টা নারীদের কাহিনী অবলম্বনে কয়েকটি উৎকৃষ্ট গল্প রচনা করেন। তন্মধ্যে বর্ত্তমান গল্পটি বাদে 'বিপদ', 'হিংয়ের কচুরী' গল্প দুইটিও 'গিরিবালা' প্রভৃতি গল্পের নাম উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত এই পর্য্যায়ের গল্পের মধ্যে 'বুধোর মায়ের মৃত্যু' গল্পটিই বিভূতি ভূষণ সর্ব্ব প্রথম লিখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণের আরও একটি গল্পের উল্লেখ করিতে হয়। 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' নামক বিখ্যাত গল্পটির সহিত বর্ত্তমান গল্পটির ক্ষীণ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। দুইটি গল্পেই একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ ধর্ম্মপ্রাণা মহিলার উল্লেখ দেখা যায়। তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সঙ্গিনীদের মন্দির দেখাইয়াছেন—ধর্ম্মকথার আসরে লইয়া গিয়াছেন। সম্ভবত বিভূতিভূষণ এইরূপ কোনো

মহিলাকে দেখিয়া এই চরিত্রটি আঁকিয়াছেন।

'ছেলেধরা' গল্পটির উৎস অজ্ঞাত। গল্পটি কোনো শিশুপাঠ্য সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। গল্পের পটভূমি বিহারের অরণ্য কিন্তু কাল্পনিক নয়।

'রামতারণ চাটুজ্যে, অথর' গল্পটিতে একজন বৃদ্ধ ও একদা খ্যাতিমান লেখকের কাহিনী তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। বিভূতিভূষণের এই জাতীয় গল্প তাঁহার অজস্র সৃষ্টির মধ্যে আরও কয়েকটি আছে। 'লেখক' '(জন্ম ও মৃত্যু' গল্প-গ্রন্থ)। 'বেণীগির ফুলবাড়ি'র ললিত বাবু 'কবি কুণ্ডু মশায়' '(বিধু মাস্টার' গল্প-গ্রন্থ), 'জনসভা '(বেণীগীর ফুলবাড়ি' গল্প-গ্রন্থ) গল্পের ভূষণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী 'শাবল তলার মাঠ' '(উপলখণ্ড' গল্প-গ্রন্থ) গল্পের উমাচরণ মাস্টার এবং বর্ত্তমান গল্পের রামতারণ চাটুজ্যের নাম উল্লেখ করিতে হয়।

'রামতারণ চাটুজ্যে, অথর', গল্পটির রামতারণ চাটুজ্যের সহিত 'বেণীগির ফুলবাড়ি' গল্পের ললিতবাবুর অনেক মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। রামতারণ চাটুজ্যে ও ললিত বাবুর দোসর আরও একজনের পরিচয় বিভূতিভূষণের 'অনুবর্ত্তন' উপন্যাসে পাওয়া যায়। 'অনুবর্ত্তন' উপন্যাসের এই চরিত্রটির সহিত উপরোক্ত চরিত্র দুটির আক্ষরিক মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

আরও একটি ব্যাপারে 'রামতারণ চাটুজ্যে, অথর' গল্পটি উল্লেখযোগ্য। বিভূতিভূষণ রচিত বিভিন্ন দিনলিপিতে ও ছোট গল্পে 'রাখাল মাস্টারের স্কুল', 'হাঁড়ি বেচা মাস্টারের স্কুল' এবং 'তুঁতত‌লার স্কুল'-এর কথা পাওয়া যায়। 'হাঁড়ি-বেচা মাস্টারের স্কুল'-এর এবং 'তুঁততলা স্কুল'-এর কথা বিভূতিভূষণ তাঁহার 'উর্ম্মিমুখর', 'উৎকর্ণ', 'হে অরণ্য কথা কও' দিনলিপিতেও উল্লেখ করিয়াছেন। বিভূতিভূষণ আনুমানিক ১৯০১।১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রাখাল মাস্টারের স্কুলে ভর্তি হইয়াছিলেন বিভূতিভূষণের 'উৎকর্ণ' দিনলিপিতে পাওয়া যায়—তিনি ৬ বৎসর বয়সের সময় কেওটা হইতে বারাকপুর গ্রামে ফিরিয়া আসেন। (দ্রঃ 'বিভূতি-রচনাবলী,' চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪০২)।

এবার 'তুঁততলার স্কুল' সম্পর্কে 'রামতারণ চাটুজ্যে, অথর' গল্প হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

'একটু পরে খান-দুই মোটা পুরনো বাঁধানো খাতা এবং এক-বোঝা কাগজ নিয়ে রামতারণবাবু আবার এসে বসলেন আমার কাছে। একখানা খাতা খুলে আমায় দেখাতে লাগলেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রিকায় তাঁর বই সম্বন্ধে যে সব সমালোচনা বার হয়েছিল, সে গুলোর কাটিং আঠা দিয়ে মারা। কাটিংগুলো হলদে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। বহুকাল আগের জিনিস, সে সব সাময়িক পত্রিকার মধ্যে একখানারও নাম আমি শুনি নি, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তাদের অস্তিত্ব ছিল, বহু কাল তারা মরে ভূত হয়ে গিয়েছে।' (বিভূতি-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৩১০)।

* * *

'কিন্তু এসব অতীত যুগের কাহিনী। আমি তখন নিতান্ত বালক, যখন রামতারণবাবু বঙ্কিমের কলম কেড়ে নিই—নিই করছিলেন ; যদিও উক্ত ব্যক্তি সে দুর্ঘটনা ঘটার পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। কত যত্নে রামতারণবাবু খাতা খানা রেখে দিয়েছেন আজও।

কত কাল আগের যে সব কাগজ, যাদের নামও আজকাল কেউ জানে না। বিবর্ণ হলদে হয়ে গিয়েছে কাটিংগুলো। কত যত্নে কাটিং গুলোর ওপরে নিজের হাতে তারিখ লিখেছিলেন সেখানে, ১৯শে জানুয়ারী ১৯০২, ২রা মে ১৯০৫, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯০৪। ১৯৩৪ সালে বসে সে সব তারিখকে যেন বহুযুগ পূর্ব্বের কথা বলে মনে হচ্ছিল আমার। আমি তখন ছেলেমানুষ, হয়তো তুঁতলায় রাখাল মাস্টারের পাঠশালায় পড়ি। কত কাল কেটে গিয়েছে তারপরে, কত ঘটনা ঘটে গেল আমার জীবনে, তবে এসেছে ১৯৩৪ সাল আজ। আর উনি সেই সব দিনের নামজাদা লেখক।' (বিভূতি-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৩১১)।

'ছুটি মন্তর' গল্পটির উৎস অজ্ঞাত। সম্ভবত নদীয়া যশোহর সীমান্ত অঞ্চলের কোনো লোকশ্রুতি শুনিয়া গল্পটি রচনা করিয়া থাকিবেন। 'পায়রা গাছির ফকির'-এর কথা বর্ত্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত গল্প 'বুধোর মায়ের মৃত্যু' নামক গল্পেও উল্লেখ পাওয়া যায় :

'…অজ পাড়াগাঁয়ে বাড়ি, কে ওঁদের নাম শোনাচ্ছে ? সে জানে পায়রা গাছির ফকিরের নাম। পায়রা গাছির ফকিরও মস্ত সাধু। সেবার তার একটা গাই গরু কি খেয়ে হঠাৎ মরে যায় আর কি, সবাই বললে পায়রা গাছির ফকিরের খুব ক্ষমতা। বুধোকে সেখানে পাঠানো হল। ফকির সাহেবের সামান্য কি ওষুধে গরু একেবারে চাঙ্গা হয়ে উঠল। ওরা সবাই ভাল, সবাই বড়। সেই কেবল পাপী।

বুধোর মা-ও দুহাত জুড়ে পায়রা গাছির ফকির সাহেবের উদ্দেশে প্রণাম করে। (বিভূতি-রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, পৃ. ৩০০)।

'ফড়খেলা' ও 'হাট' গল্পের উৎস অজ্ঞাত। সম্ভবত অভিজ্ঞতা প্রসূত তাঁহার এই গল্প দুইটি স্থানীয় কোনো গ্রাম্য মেলা ও হাট ভ্রমণ করিয়া তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

বিভূতিভূষণ বিহার বন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য অধিকর্ত্তা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সিন্‌হার সঙ্গে সস্ত্রীক ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম বিহারের ছোটনাগপুর বিভাগের সারাণ্ডা অরণ্য ভ্রমণ করেন। সে ভ্রমণ কাহিনী তাঁহার 'হে অরণ্য কথা কও, দিনলিপি এবং 'বনে পাহাড়ে' ভ্রমণ কাহিনীতে লিপিবদ্ধ আছে। 'অরণ্যকাব্য' গল্পটিতেও সে কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'অরণ্যকাব্য' গল্পটির আরম্ভও মাঠাবুরু ফরেস্ট বাংলোতে শুরু হয়। গল্পটির পটভূমি-কাল যে ১৯৪২।৪৩ সাল তাহার ইঙ্গিত 'অরণ্যকাব্য' গল্পের মধ্যে পাওয়া যায়।

'…আর আছেন বাঘমুণ্ডি সার্কেলের ভারপ্রাপ্ত ইনজিনিয়ার মিঃ সরকার, ইনি নতুন চাকরি পেয়ে কাজে যোগ দিতে যাচ্ছেন ন মাইল দূরবর্ত্তী বাঘমুণ্ডি নামক বনবেষ্টিত ক্ষুদ্রগ্রামে ; কয়েক মাস হল বর্ম্মা থেকে অতি কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন, জাপ অভিযানের তোড়ের মুখে।' (বিভূতি-রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, পৃ. ৩১৫)।

বিভূতিভূষণের 'বনে পাহাড়ে' ভ্রমণ কাহিনীতে 'অরণ্য কাব্য' গল্পের উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়—প্রাসঙ্গিক অংশ যেখান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি : 'দেড় ঘণ্টা মোটর চালানোর পর বন একটু পরিষ্কার হোল। দূরে দেখা গেল লালটালির দু-চারখানা ঘর বাড়ী। মিঃ সিংহ বললেন —ওই হোল পোংসা—

* * *

'একদিকে একটা লম্বা খড়ের ব্যারাক-মত বাড়ী। একটি বাঙালী বিধবা মহিলা একখানা ঘর থেকে বার হয়ে এলেন মোটরের আওয়াজ পেয়ে। শুনলাম ও বাড়ীখানা কেরাণীদের থাকবার জায়গা। এতদূরে এই বনের মধ্যে দু-একটি বাঙালী পরিবার কি ভাবে নির্জ্জন জীবন যাপন করচেন চাকুরীর খাতিরে—ভাবতে ভালো লাগে।

* * *

'আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছিল এই মুহূর্ত্তে গাড়ী থেকে নেমে ওই বাঙ্গালী বাবুদের বাড়ীতে চলে যাই, ওদের সঙ্গে গল্পগুজব করে ওদের নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে দিই—ঠিক বলতে পারি ওরাও খুব খুশী হবেন আমাকে পেয়ে।

'পোংসা থেকে কিছুদূর এসে আবার আমরা ঘন বনের পথে ঢুকে পড়লুম, বাঙালী বাবুদের বাসা ও সাহেবদের বাংলো অনেক পেছনে পড়ে রইল।'...(বিভূতি-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড ৪৪৮)।

'প্রবন্ধাবলী'

গ্রন্থের এই অংশের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি বিভূতিভূষণের 'আমার লেখা' সংকলন গ্রন্থে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। 'আমার লেখা' সংকলনে এই প্রবন্ধগুলির সহিত "আমার লেখা" রচনাটিও ছিল। 'আমার লেখা' রচনাটি ইতিপূর্ব্বে প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

'আমার লেখা'র গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ : ২৮শে ভাদ্র ১৩৬৮ (ইং সেপ্টেম্বর ১৯৬১) পৃ. ৯৬ ষোলপেজী ডবল ডিমাই সাইজ। অর্দ্ধেন্দু দত্ত অঙ্কিত প্রচ্ছদ পট, কাগজের মালাট। প্রকাশক : বিভূতি প্রকাশন, ২২এ, কলেজস্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২।

সূচী : আমার লেখা, রবীন্দ্রনাথ, রবি-প্রশস্তি, প্রথম দর্শন, সাহিত্যে বাস্তবতা, সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প, সাহিত্য ও সমাজ, পরিশিষ্ট (পত্রাবলী)।

বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পরে বহুদিনের চেষ্টায় ও যত্নে বর্ত্তমান নিবন্ধকারের আগ্রহে এই প্রবন্ধগুলি সংকলিত হইয়া বিভূতিভূষণের জন্মদিন ১৩৬৮ সালের ২৮শে ভাদ্র প্রকাশিত হয়। লেখাগুলি প্রধনত সংগ্রহ করিয়া দেন' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-এর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সনৎ কুমার গুপ্ত। বর্ত্তমান নিবন্ধকারের সংগ্রহেও কিছু লেখা ছিল। পরিশিষ্ট অংশে মুদ্রিত পত্রাবলী বেশির ভাগ বিভিন্ন সংখ্যা 'কথাসাহিত্য' ও 'তরুণের স্বপ্ন' মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। 'আমার লেখা' গ্রন্থে বিভূতিভূষণের সাহিত্য ও সাহিত্য সম্পর্কিত রচনাই স্থান পাইয়াছে। 'আমার লেখা' মুদ্রণের মুখ্যত লক্ষ্য তাঁহার সাহিত্য সম্বন্ধে কি দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাঠক-সাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরা। এতদরিক্ত কিছু কিছু রচনা এখনো বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়াইয়া আছে। সেজন্য শরৎচন্দ্র ('শরৎবন্দনা', ৩১শে ভাদ্র ১৩৩৯) তারাশঙ্কর ('শনিবারের চিঠি', শ্রাবণ ১৩৫৪, কথা সাহিত্য ; শ্রাবণ

১৩৫৭) মহাত্মা গান্ধী * ('শনিবারের চিঠি', মাঘ ১৩৫৪) জাতীয় প্রশস্তি মূলক রচনা 'আমার লেখা' সংকলনে বর্জ্জিত হয়।

'আমার লেখা' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক ও বিভূতিভূষণের বন্ধু সজনীকান্ত দাস একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখিয়া দেন। ভূমিকাটি নানা কারণে বিশেষ মূল্যবান। সেজন্য ভূমিকাটি এখানে তুলিয়া দেওয়া হইল :—

"বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ও প্রতিষ্ঠা আজ বঙ্গ-সাহিত্যে সর্ব্বজন-স্বীকৃত। রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী সাহিত্যিক সমাজে তিনি প্রায় পুরোভাগেই স্থান পাইয়াছেন। উপন্যাসে, গল্পে, বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনীতে এবং দৈনন্দিন দিনলিপি রচনায় তিনি যে বিপুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সহধর্মিনী কল্যাণীয়া শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৎ সহোদর শ্রীমান চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় তাহারও অধিক কিছু এই গ্রন্থে পরিবেশণ করিয়া তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার আর একদিক উদ্‌ঘাটিত করিলেন। সেই দিক আত্ম পরিচয় ও মননশীলতার। কল্পনা-প্রবণ বিভূতিভূষণ তথ্যমূলক বাস্তবধর্মী প্রবন্ধ রচনায় কুণ্ঠিত ছিলেন। তথাপি খ্যাতির বিড়ম্বনায় সভাসমিতিতে ভাষণ দেওয়ার উপলক্ষে ঐ কার্য তাঁহাকে কয়েক বারই করিতে হইয়াছে। এই গ্রন্থে তাহার মধ্য হইতে সাতটি নির্ব্বাচিত রচনা স্থান পাইল। ইহাতে বিভূতিভূষণের চিন্তার প্রবলতা ও দূরদৃষ্টি পাঠক মাত্রকেই মুগ্ধ ও বিস্মিত করিবে। এই সঙ্গে কয়েকটি পত্রও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পত্রগুলি ব্যক্তিগত হইলেও বিভূতিভূষণের জীবন রহস্য উদ্‌ঘাটনে মূল্যবান। 'আমার লেখা' রচনাটি ইতিপূর্ব্বে অন্য গ্রন্থে স্থান পাইলেও এই রচনাবলীর সূচনা স্বরূপ এইটি পূর্ণমুদ্রিত হইল। শ্রীমান সনৎ কুমার গুপ্ত রচনা ও প্রকাশের যে ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল।

প্রবন্ধ :

১। আমার লেখা—গ্রন্থকারের প্রাথমিক রচনা কি ভাবে প্রকাশিত হয়, ঘটনার বিবৃতি।

২। রবীন্দ্রনাথ—২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র-জন্মদিবসের ভাষণ। লেখকের নিজের গ্রামে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

৩। রবি-প্রশস্তি—২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র-জন্মদিবসে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত সভার সভাপতির ভাষণ।

৪। প্রথম দর্শন—লেখকের প্রথম রবীন্দ্র-দর্শন বিষয়ে স্মৃতিকথা।

৫। সাহিত্যে বাস্তবতা—কুচবিহারে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভার সভাপতির ভাষণ।

৬। সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প—কি ভাবে সংস্কৃত সাহিত্যে ছোট গল্প প্রসার লাভ করে তাহার আলোচনা।

৭। সাহিত্য ও সমাজ—মীরাটে অনুষ্ঠিত প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ।

পত্রাবলী :

(ক) ১ ও ২ এই পত্র দুইটি বিবাহের পূর্বে ভাবী পত্নীকে লিখিত।

(খ) ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ পত্নী রমা দেবীকে লিখিত।

* রচনাটি প্রকৃত পক্ষে 'বাপুর্জী' নামে প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল।

(গ) ১ শাশুড়ী সাধনা দেবীকে লিখিত পত্র।

(ঘ) ১ ও ২ গজেন্দ্র কুমার মিত্রকে লিখিত পত্র।

(ঙ) খলকোবাদের চিঠি—বনগ্রাম নিবাসী মন্মথ নাথ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বর্জিত পত্র।

(চ) পত্নী রমা দেবীকে লিখিত আরো দুইটি পত্র।

(ছ) বিভূতিভূষণের একমাত্র প্রকাশিত কবিতা 'নবযুগের কবি'। এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও পত্রাবলী বিভিন্ন সময়ে বিবিধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বিভূতিভূষণকে সমগ্রভাবে জানিতে হইলে এই গ্রন্থে যে বিশেষ সহায়ক হইবে ইহা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। আনন্দের সঙ্গে তাঁহার শুভ জন্মদিনে বাঙালী পাঠককে এই রচনার্ঘ নিবেদন করিবার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া যে আনন্দ পাইতেছি তজ্জন্য কল্যাণীয়া রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশীর্বাদ জানাইতেছি।

২৮শে ভাদ্র ১৩৬৮ শ্রীসজনীকান্ত দাস

৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭

'আমার লেখা' রচনাটি প্রথমে 'নবাগত' গল্প সংকলনে মুদ্রিত হয়। পরে বিভূতিভূষণের 'গল্প-পঞ্চাশৎ-এর মুখবন্ধ স্বরূপে মুদ্রিত হয়। একই কারণে 'আমার লেখা' রচনাটি 'বিভূতি-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের 'পুস্তক-পরিচয়' অংশে রচনাটির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

'বিভূতি-রচনাবলী'র দশম খণ্ডে বিভূতিভূষণ লিখিত ১৭টি পত্র মুদ্রিত হয়। তন্মধ্যে ৯টি পত্র তিনি খ্যাতনাম্নী লেখিকা শ্রীযুক্তা বাণী রায়কে লিখিয়াছিলেন। তদতিরিক্ত ৮ খানি পত্র 'আমার লেখা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে ৫টি তিনি পত্নী শ্রীযুক্তা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিয়াছিলেন। বাকী তিনটির মধ্যে একটি শাশুড়ী সাধনা চট্টোপাধ্যায়কে ও অন্য দুইটি বন্ধুবর সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গজেন্দ্র কুমার মিত্রকে লেখেন। 'আমার লেখা'র আরও একটি পত্র 'খলকোবাদের চিঠি' বিভূতি-রচনাবলী'র পঞ্চম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। 'আমার লেখা' গ্রন্থে ও 'কথা সাহিত্য' পত্রিকায় শারদীয় সংখ্যায় ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বর্জিত হইয়া 'খলকোবাদে এক রাত্রি' নামে প্রকাশিত হয়। 'বিভূতি-রচনাবলী' পঞ্চমখণ্ডে সম্পূর্ণ পত্রটি মুদ্রিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত 'বিভূতি-রচনাবলী'তে সন্নিবিষ্ট রচনাগুলি ছাড়া 'আমার লেখা' গ্রন্থের বাদবাকী রচনাগুলি বর্ত্তমান খণ্ডে মুদ্রিত হইল।

'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক রচনাটি 'রবীন্দ্রনাথের দান' নামে ১৩৩৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। 'সাহিত্যে বাস্তবতা'—কুচবিহারে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভায় সভাপতির ভাষণ—প্রথমে ১৩৫৩ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'কুচবিহার দর্পণে' এবং ১৩৬৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'তরুণের স্বপ্ন' পত্রিকায় পুণর্মুদ্রিত হয়।

'প্রথম দর্শন' সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। 'শনিবারের চিঠি' মাসিক পত্রের ১৩৪৮ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হয়।

'আমার লেখা' প্রকাশিত হওয়ার পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে পাঠকের প্রশংসা লাভ করে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়ও উচ্চ প্রশংসা বাহির হয়। বর্ত্তমান যুগের খ্যাতিম্যান সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'বিভূতিভূষণ—প্রকৃতি প্রেমিক প্যান' শিরোনামায় ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ২৫ মার্চ-এর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'আমার লেখা'র দীর্ঘ সমালোচনা করেন। উক্ত রচনা হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ-বিশেষ তুলিয়া দিতেছি :

'একটি মাত্র অস্ত্র নিয়ে রাজ্য করতে এসেছিলেন এবং সাম্রাজ্য জয় করেছিলেন। সেই অস্ত্রের নাম সরলতা। সকলেই ভেবেছিলেন—সরলতার যুগ শেষ হয়ে গেছে, সাহিত্য হবে মানুষের জীবনের মতই জটিল, ইচ্ছা বা অনিচ্ছা হোক, সব লেখকই চলেছেন বুদ্ধির লক্ষ পাকের মধ্যে। বিভূতিভূষণ এসেছিলেন দ্বিধাহীন। যে অপকট কবিত্বের কথা এখন লেখকরা বলতে লজ্জা পান, সাধারণ বিস্ময়, দুঃখ, আনন্দের কথা হয়তো আর বলার দিন নেই যখন ভেবেছিলেন সকলে, তখন বিভূতিভূষণ আরেকবার প্রমাণ করে দিলেন যে, সাহিত্যের বিষয়ের জন্য কোথাও কোনো বাধা নেই, সমস্ত জানা জিনিসই চিরকালের অজানা। বিভূতিভূষণের লেখা চরিত্র নদীয়া যশোহরের সীমারেখায় একটি গাছতলায় দাঁড়িয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে, সেখান দিয়ে কতলোক দু'বেলা হেঁটে যাচ্ছে—কারুর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, অথচ সেই লোকটি অভিভূত, এখানে দুটো জেলা আলাদা হয়ে গেছে, এর মধ্যে কি অফুরন্ত বিস্ময় সে পেয়েছিল, যে-লোক প্রথম প্রথম চন্দ্রগ্রহে পৌঁছবে তার বিস্ময়ও ঐ লোকটির চেয়ে বেশী হবেনা।

বড় ভয়ংকর সময়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের আসরে এসেছিলেন। একদিকে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজয়ী খ্যাতি এবং তাঁর অনুকারক আত্মঘাতী লেখকদল, অপর দিকে তরুণ লেখকদের বিদ্রোহ। রবীন্দ্রনাথ যে যে বিষয় স্পর্শ করেছেন যেন সেদিকে সব অভিযান সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, মনে করেছিলেন অনেকে। এবং রবীন্দ্রনাথ যে-দিকে অগ্রসর হতে চাননি, সেই দারিদ্র্য, রক্ত মাংস এবং মৃত্যু প্রেম নিয়ে চলছিলো চূড়ান্ত হৈ-হৈ। সেই সময় বিভূতি-ভূষণ কি করে এক-রঙা পশরা নিয়ে আসতে সাহস করলেন, ভাবতে অবাক লাগে। তাঁর প্রথম রচনার ইতিহাস পড়লে কিছুটা বুঝতে পারা যায়। তিনি ও-সব আন্দোলনের কথা ভাবেন নি, যা মনে করেছেন—শহর থেকে বহুদূরে পল্লী অঞ্চলে বসে তাই লিখেছেন। তাঁকে বলতে ইচ্ছে করে গীফটেড্ লেখক বা পসেস্‌ড্, শাস্ত্রোক্ত সেই সব অবতারদের মত, যাঁরা নিজেদের চিনতে পারেন না। ভয় হয়, হয়তো বিভূতিভূষণই এই ধারার শেষ প্রতিনিধি লেখক।

* * *

সবচেয়ে উপভোগ্য রচনা "আমার লেখা" এবং চিঠিপত্রগুলি। কি করে তিনি প্রথম লেখা শুরু করলেন এবং এক আধ্‌পাগলা লেখকের পাল্লায় পড়েছিলেন সে বিবরণী যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি মজার। তবু আমরা ধন্যবাদ জানাবো সেই কবি পাঁচুগোপালকে, যে বিভূতিভূষণকে সাহিত্য-রচনার জন্য উত্তেজিত করেছিল। যদিও একথা ঠিকই, ও রকম ভাবে উত্তেজিত না করা হলেও বিভূতিভূষণকে লিখতেই হতো,—যার মধ্যে কবিত্বের দুঃখ আছে, লেখা ছাড়া তাঁর জীবনের অন্য কোন অর্থ ই থাকেনা।

চিঠিগুলি প্রধানত প্রেমপত্র। কোন কোন চিঠিতে দু'তুবার পুনশ্চ আছে। দু-একখানি আছে আলাদা, প্রকাশককে লেখা। চিঠিগুলিতে কোথাও কোন গোপনতা নেই, একেবারে বুকের ছবি, অসচেতন, অনেকটা-অসাহিত্যিক—তাই আরও আকর্ষণীয়।

দু-একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না।

"তোমার চিঠিতে 'পুজোর ছুটিতে যে আপনি—' এই পর্যন্ত লিখে বলেন 'থাক সে বলবো না' ও কথার মানে কি? সত্যি, কিছু বুঝতে পারিনি। পুজোর ছুটিতে আমি কি করবো বলেছিলুম? বলবে না কল্যাণী। আমি বুঝি রাগ করতে জানিনে, না? আমার ভারি কষ্ট হয়েচে ও কথা কেন লিখেচ—'আমার মত সামান্যা মেয়ে কি জন্ম আপনাকে তার কথা জানাবে' ইত্যাদি। কি কথা বলতো? কিছুই বুঝলাম না। কি করবো বলেছিলুম বলো তো? লক্ষীটি, না যদি বলো রাগ করবোই।' (রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা)

"আমি বোধহয় পূর্বে জন্মেছিলাম ঐ রকম উষ্ণ কটিবন্ধের অরণ্য প্রদেশে একটি ম্যাকাও পাখী হয়ে। মানুষের বাস যেখানে ঘিঞ্জি, সেখানে আদৌ মন টেকে না কেন্ন কি জানি।

I am most happy when I am in lonely primeaval forest."

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়" ('রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ মার্চ ১৯৭২)।

'পত্রাবলী'

(পত্নী শ্রীযুক্তা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত)

প্রথম পত্র

তোমাদের বাড়ী॥ বিভূতিভূষণের শ্বশুর ষোড়শীকান্ত বনগ্রামে বিচুলীহাটায় 'ব্রজেন্দ্র ভবন' নামক বাড়ীতে ভাড়া থাকিতেন। তিনি আবগারি বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। 'ব্রজেন্দ্রভবনে'র নাম পরিবর্তন করিয়া বর্তমানে 'বসন্তস্মৃতি' নাম রাখা হইয়াছে। এখানেই ১৩৪৭ সালের ১৭ অগ্রহায়ণ (ইং ৩ ডিসেম্বর ১৯৪০) বিভূতিভূষণের দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়।

কানুমামা॥ মামাশ্বশুর শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন চক্রবর্তী।

জগহরি শা॥ বনগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও আবগারি ভেণ্ডার জগহরি সাহা।

যতীনদা॥ বনগ্রামের হোমিওপ্যাথ ডাক্তার এবং বিভূতি-সুহৃদ স্বর্গত ডাঃ যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মন্মথদা॥ বনগ্রামের প্রধান আইনজীবী ও সুকবি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়। 'লিচুতলা ক্লাবে'র প্রতিষ্ঠাতা।

গুটকে॥ বারাকপুর গ্রামের প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত অজিতকুমার রায়।

খোকা ও বাদু॥ শ্যালক শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস চটোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়।

ছোট্টঘর॥ 'ব্রজেন্দ্র ভবনে' বিবাহের পরে যে ছোট্ট ঘরটিতে বিভূতিভূষণ ও পত্নী শ্রীযুক্তা

রমা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকিতেন—পত্রে বিভূতিভূষণ সেই ঘরেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

বেলু ও দুহু ॥ শ্যালিকা শ্রীমতী বেলা গোস্বামী ও শ্রীমতী রেবা আচার্য্য।

কল্যাণী ॥ বিভূতিভূষণের পত্নী শ্রীযুক্তা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকনাম।

বনগ্রামে মেয়ে-স্কুল ॥ বনগ্রাম কুমুদিনী বালিকা বিদ্যালয় তখন অষ্টম মান পর্য্যন্ত ছিল—

হরিদা ॥ বনগ্রামের প্রসিদ্ধ আইনজীবী হরিপদ মুখোপাধ্যায়।

সজনী ॥ 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস।

ডি. এম. লাইব্রেরী ॥ কলিকাতার প্রসিদ্ধ প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা।

মিতে ॥ মিতা শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (চাল্‌কী)।

বীরেশ্বর ॥ বনগ্রামবাসী জনৈক ভদ্রলোক।

দেবীপ্রসাদ ॥ বনগ্রামবাসী জনৈক ভদ্রলোক।

আদিত্যদেব ॥ বনগ্রামবাসী আদিত্যদেব চট্টোপাধ্যায়।

উমা ॥ বিভূতিভূষণের ভাগনেয়ী—শ্রীমতী উমা বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী।

সুখদা ॥ আদিত্যবাবুর পুত্র।

জ্ঞানদা ॥ জ্ঞানদা মজুমদার—'সব্যসাচী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক।

বিমান দুর্ঘটনা ॥ সম্ভাব্য জাপ আক্রমণের আশংকায় তখন মাঝে মাঝেই বিমান বহরের মহড়া হইত। সেই সম্পর্কে কোনো বিমান দুর্ঘটনার কথা বিভূতিভূষণ লিখিয়াছেন।

হক্‌ মন্ত্রিমণ্ডলী ॥ মৌলভী এ. কে. ফজলুল হক্‌-এর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা।

নুটু ॥ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৌমা ॥ ভ্রাতৃবধূ শ্রীযুক্তা যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শান্ত ॥ ভাগনেয় শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

রাজেন ॥ গৃহভৃত্য।

রেনু ॥ বিভূতিভূষণের ধর্ম্মমেয়ে।

বনশিমতলার ঘাট ॥ স্বগ্রাম বারাকপুরে অবস্থিত। 'ইছামতী' নদীর তীরবর্ত্তী ঘাট—বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে ও রচনায় 'বনশিমতলার ঘাটে'র অজস্র উল্লেখ পাওয়া যায়।

সেই রকম পিক্‌নিক্‌ ॥ বিভূতিভূষণ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূজার ছুটিতে বনগ্রামে আসিয়া একদিন বারাকপুর গ্রামে পিক্‌নিক্‌ করিতে যান। ইহা বিভূতিভূষণের দ্বিতীয়বার বিবাহের অল্প কিছুকাল পূর্ব্বের ঘটনা। 'উৎকর্ণ' দিনলিপিতেও এবিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়: '…একদিন কল্যাণীদের সঙ্গে নৌকো করে বারাকপুরে গেলুম পিক্‌নিক করতে। আমাদের পাড়ার ঘাটে কাশিমতলায় কল্যাণী রান্না করলে। গ্রামের ঝি-বৌয়েরা আলাপ করতে এল। ওরা আমার বাড়ীতে বসে গান করলে। সব এল শুনতে। ইন্দু রায়ের বাড়ী গেল সবাই মিলে। জ্যোৎস্নারাত্রি, বাঁশবনের মাথায় আমাদের বাড়ীর পিছনে বৃহস্পতি ও শনি জ্যোৎস্নাভরা আকাশেও যেন জলজ্বল্‌ করচে। নৌকো ছাড়লুম। কল্যাণী আমার সঙ্গে

গল্প করলে নৌকোর বাইরে বসে। ঘাটে-ব্রাওড়ের এপারে জ্যোৎস্নাভরা মাঠের মধ্যে চা করলে। কি চমৎকার লাগছিল। একটা বড় উল্কা সে সময় বেগনি ও নীলরঙের আলো জ্বালিয়ে আকাশের জ্যোৎস্নাজাল ঘিরে প্রজ্বলন্ত হাউই বাজির মত জ্বলতে জ্বলতে মিলিয়ে গেল।' (বিভূতি-রচনাবলী', চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৭০)।

বাড়ী পরিবর্ত্তনের কথাও 'উৎকর্ণ' দিনলিপিতে পাওয়া যায় :

'গত সপ্তাহে গিয়েছিলুম বনগাঁ, বাড়ী বদল করে আমরা গিয়েচি বিনয়দার শ্বশুর হুটু মুন্সেফ যে বাসায় থাকত—সেই বাসাটায়।' (বিভূতি-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৩)

জগদীশবাবু॥ শ্রীযুক্ত জগদীশরঞ্জন গুপ্ত।

মায়া॥ অধ্যাপিকা শ্রীমতী মায়া মুখোপাধ্যায়—বিভূতিভূষণের শ্যালিকা।

ইন্দু॥ স্বগ্রাম বারাকপুরের প্রতিবেশী ইন্দুভূষণ রায়।

বুধো ও মানী॥ বুড়ী পিসিমার (কুসুমকুমারী দেবী) ছেলে ও মেয়ে।

[বিভূতিভূষণের এই পত্রটি নানা কারণে অত্যন্ত মূল্যবান। পত্রটির মধ্যে বিভূতিভূষণের অন্তরের অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ বিভূতিভূষণের হৃদয়ের উষ্ণ উত্তাপের স্পর্শ পত্রটির প্রতি ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া আছে।

বিভূতিভূষণের কলিকাতার স্কুল পরিত্যাগের তারিখটিও এই পত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১ ডিসেম্বর তিনি কলিকাতার খেলাতচন্দ্র ইনস্টিটিশনের সহকারী শিক্ষকের পদ পরিত্যাগ করিয়া পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন।]

দ্বিতীয় পত্র

সেদিনকার ভ্রমণ॥ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর (১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪৭) বিভূতিভূষণের দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া বিভূতিভূষণ ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে ঘাটশীলায় যান। ঘাটশীলা হইতে বিভূতিভূষণ একা কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং পত্নীকে এই পত্রটি লিখিয়াছিলেন। নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া তিনি ঘাটশীলার আশপাশে ধারাগিরি প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে যান। তাঁহার 'উৎকর্ণ' দিনলিপিতে এবিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায় :

'......গত অগ্রহায়ণ মাসে আমি বিবাহ করেচি। সম্প্রতি স্ত্রীকে নিয়ে ঘাটশীলায় গিয়েছিলুম। একদিন সুবর্ণরেখা পার হয়ে পাহাড়-জঙ্গলের পথে চললুম ওকে নিয়ে। বনের মধ্যে একটা ঝর্ণা আছে, তার ধারে বড় বড় পাথর পড়ে আছে—এক ধরণের কি ঘাস গজিয়েচে। গোলগোলি ফুল (coclo sperma govripium) ফুটেচে তামা পাহাড়ে। দুজনে একটা পাহাড় ডিঙিয়ে ছোট পাথরে বসলুম ছায়ায়। তারপর ঝর্ণার জল খেয়ে চললুম পাহাড়ের দিকে। ওপরে যখন উঠেচি, তখন বেলা দুটো। ও গোলগোলি ফুল নিয়ে খোঁপায় পরলে। আমরা নেমে এলুম। তখন বেলা তিনটে।

তারপর শিব রাত্রির ছুটিতে ওকে আনতে গিয়ে বৈকালে দুজনে গেলুম ফুলডুংরিতে।

চারিধারের পাহাড়ের শোভা এই বৈকালে অপূর্ব্ব হয়েচে। অনেক রাত পর্য্যন্ত বসে থাকার পরে ফিরে এলুম।' (বিভূতি-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৭০)।

Sir Richard Hooker ॥ বিখ্যাত উদ্‌ভিদতত্ত্ব বিদ্। Hooker এর Himalyan journal বিখ্যাত বই। এই বই তিনি বর্ত্তমান National Libraryতে দেখিয়াছিলেন।

বনগাঁ ॥ বিবাহের পরে প্রায় এক বৎসর কাল পত্নী শ্রীযুক্তা রমা বন্দ্যোপাধ্যায় বনগ্রামে পিত্রালয়ে ছিলেন। বিভূতিভূষণের শ্বশুর ষোড়শীকান্ত তখন বনগ্রামে থাকিতেন।

মুসাবনী ॥ মুসাবনী তামার খনির জন্য বিখ্যাত। ঘাটশীলা হইতে যাইতে হয়।

(পত্রে তারিখ নাই—পত্রটি পাঠ করিলে শিবরাত্রির পূর্ব্বে—১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে পত্রটি লিখিয়া ছিলেন বলিয়া মনে হয়।)

তৃতীয় পত্র

বোম্বাই ॥ প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন—এ (বর্ত্তমানে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন) যোগ দিবার জন্য বিভূতিভূষণ সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সাহিত্যিক সুমথনাথ ঘোষ এবং 'আনন্দ মেলা'র মৌমাছি শ্রীযুক্ত বিমল ঘোষের সঙ্গে বোম্বাই গমন করেন। বিভূতিভূষণ সম্ভবত কথাসাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ধনী শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে বিভূতিভূষণের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

প্রবোধ ॥ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল।

গজেন ॥ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র।

সুমথ ॥ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুমথনাথ ঘোষ।

বাব্‌লু ॥ পুত্র শ্রীমান্ তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মা ॥ শাশুড়ী সাধনা চট্টোপাধ্যায়।

ডাঃ সুরেন সেন ॥ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ সুরেন্দ্র নাথ সেন।

ফুচুর মা ॥ বারাকপুর গ্রামে বিভূতিভূষণের প্রতিবেশিনী।

চতুর্থ পত্র

বামিয়া বুরু। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বিভূতিভূষণ প্রথমবার সস্ত্রীক ছোটনাগপুরের গভীর বন সারাণ্ডা অরণ্য ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সে ভ্রমণের কথা তাঁহার 'হে অরণ্য কথা কও' দিনলিপি এবং 'বনে পাহাড়ে' ভ্রমণ কাহিনীতে লিপিবদ্ধ আছে। বামিয়া বুরুর উল্লেখ সেখানে পাওয়া যায়।

দিনলিপিতে পাওয়া যায়: 'গত রবিবারে বনগ্রাম সাহিত্য-সম্মেলন হয়ে গেল। তার আগের দিন আমি, কল্যাণী, কান্তু ও বেলু সব বেরিয়ে চাঁপাবেড়েতে ঘেঁটুফুল দেখতে গেলুম —ওরা সব খাবার তৈরী করে নিয়ে গেল। কি সুন্দর ঘেঁটু ফুল ফুটেচে চাঁপাবেড়ের ঘন

জঙ্গলের মধ্যে মাঠের ধারে। বিকেল বেলা, আমরা বিলের মধ্যে দিয়ে মাঠের বনের ছায়ায় বসলুম। সবাই মিলে চা ও খাবার খেলুম। ওরা সব ছুটোছুটি করলে। কোকিল ডাকছে বনে, নীল আকাশ, ভারী আনন্দ পেলুম সেদিন।' (বিভূতি-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪১২)

মিঠে পান॥ বিভূতিভূষণ জৈত্রী ও যষ্ঠি মধু দেওয়া মিঠে পান খাইতে খুব ভালো বাসিতেন। কলিকাতা হইতে ছুটীতে তিনি একবার বনগ্রামে ষোড়শীকান্তের গৃহে মিঠে পান ও মশলা লইয়া গিয়াছিলেন। সে কথার উল্লেখ এ পত্রে পাওয়া যায়।

ধন্থ॥ শ্যালিকা শ্রীমতী রেবা আচার্য্যকে তিনি 'ধন্থ' বলিয়া ডাকিতেন। রেবার ডাকনাম 'তুন্থ' নামের নাকি কোনো অর্থ হয়না বলিয়া তিনি আদর করিয়া 'তুন্থ'কে 'ধন্থ' বলিয়া ডাকিতেন।

কেতো॥ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়—বিভূতিভূষণের স্বগ্রামবাসী হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র—কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ নুট বিহারীর কম্পাউণ্ডার।

থলকোবাদ॥ সারাণ্ডার গভীর অরণ্যের মধ্যে একটি বিখ্যাত—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত। থলকোবাদের Forest Rest House বিখ্যাত। (দ্রঃ বিভূতি-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, 'থলকোবাদে এক রাত্রি', পৃ. ৩১৪)

হরদয়াল সিং॥ বিহার বনবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সিন্হার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

পঞ্চম পত্র

বঙ্কিম॥ শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মায়া॥ বিভূতিভূষণের শ্যালিকা অধ্যাপিকা শ্রীমতী মায়া মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্তা রমা দেবীর জ্যেষ্ঠা ভাগিনী।

ছায়া॥ কলিকাতার বিখ্যাত চিত্র গৃহ।

রত্না॥ শ্রীমতী রত্না দেবী। রত্না দেবীর কথা বিভূতিভূষণের 'উৎকর্ণ' প্রভৃতি দিনলিপিতে উল্লিখিত আছে। তিনি পিরোজপুর এবং চট্টগ্রামে শ্রীমতী রত্না দেবীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন।

'এই মাত্র সকালের ট্রেনে চাটগাঁ থেকে এলাম। ১৯৩৭ সালের পরে আর যাইনি। রত্না দেবীর স্বামী সমরবাবু ওখানে মুন্সেফ। রেণুরা হয়তো শহরের বাড়ীতে নেই ভেবে ওঁর ওখানে গিয়ে উঠলুম। প্রকাণ্ড সাততলা বাড়ী—অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায় সাততলার ওপর থেকে—কর্ণফুলির দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। পরদিন সকালে রেণুদের বাড়ী গিয়ে দেখা করলুম। রেণু বল্লে—এইমাত্র আপনার কথা হচ্ছিল। আমার হাতের নখ কেটে দিলে বসে বসে। কতক্ষণ ধরে কত গল্প হল।' (বিভূতি-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬৭)।

রেণু॥ বিভূতিভূষণের ধর্ম্ম মেয়ে। মেয়েটি বিভূতিভূষণকে 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিত। রেণুর কথা বিভূতিভূষণের 'উৎকর্ণ' দিনলিপিতে উল্লিখিত আছে।

চাঁপাবেড়ে॥ বনগ্রামের উপকণ্ঠে একটি গ্রাম। বর্ত্তমানে বনগ্রামের একটি উপকণ্ঠ হিসাবে পরিগণিত। সম্ভবত বিভূতিভূষণ কিছুদিন পরে 'চাঁপাবেড়ে' পরিদর্শনে যান। সে কথার উল্লেখ তাঁহার 'উৎকর্ণ' দিনলিপিতে পাওয়া যায়॥

ধারাগিরি॥ ধারা গিরি ঘাটশীলার কাছে ঘন জঙ্গল ও পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত একটি ঝরনার নাম। বিভূতিভূষণ ঘাটশীলায় থাকিলে সেখানে মাঝে মাঝেই বেড়াইতে ও বনভোজন করিতে যাইতেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের পূজার অবকাশে বিভূতিভূষণ সস্ত্রীক ঘাটশীলায় ছিলেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের ভাইপোর সঙ্গে তাঁহারা সস্ত্রীক ধারাগিরি ভ্রমণ ও বনভোজনে যান। (বিভূতি-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮১)।

মিটিং॥ ১৯৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দের সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণের আশংকায়।

আমাদের স্কুল॥ কলিকাতার খেলাতচন্দ্র ইনস্টিটিউশন। বিভূতিভূষণ ১৯৪১ সালের শেষ পর্য্যন্ত এ স্কুলে সহকারী শিক্ষক ছিলেন। স্কুল ছাড়িয়া দিবার কথা বিভূতিভূষণের 'উৎকর্ণ' দিনলিপিতে পাওয়া যায়। (বিভূতি-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৩)। বিভূতিভূষণ খেলাতচন্দ্র ইনস্টিটিউশন থেকে পদত্যাগ করেন ১ ডিসেম্বর ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ। (বিভূতি-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, 'পুস্তক-পরিচয়' পৃ. ৫০৬ এবং বর্ত্তমান দ্বাদশখণ্ডের প্রথম পত্র দ্রষ্টব্য)।

খিনু॥ ১৯১৩।১৪ খ্রীষ্টাব্দে বিভূতিভূষণ প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্ব্বে বনগ্রামের তদানীন্তন সরকারী ডাক্তার ডাঃ বিধুভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের গৃহে গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। খিনু ডাঃ বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা।

নীরোদবাবু॥ গড়িয়াতে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার ও 'সুশান্ত সা' উপন্যাসের রচয়িতা নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত বাড়ী করেন। সেখানে কোজাগরী পূর্ণিমার দিন রবীন্দ্রনাথের 'শেষ রক্ষা' অভিনয় উপলক্ষ্যে এবং নীরোদবাবুর বাড়ীর গৃহপ্রবেশ উপলক্ষ্যে বিভূতিভূষণ সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন। (বিভূতি-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮০)।

তোমার বাবা॥ বিভূতিভূষণের শ্বশুর স্বর্গত ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বিভূতিভূষণের শ্বশুর বনগ্রাম হইতে বদলী হইয়া মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটে চলিয়া আসেন।

সুরেন ও সত্য॥ ষোড়শীকান্তের আর্দালী পিয়ন।

দিদি॥ শ্রীযুক্তা রমাদেবীর বড় বোন—অধ্যাপিকা শ্রীমতী মায়া মুখোপাধ্যায়।

মা॥ বিভূতিভূষণের শাশুড়ী।

খুকু॥ বিভূতিভূষণের ছোট শ্যালিকা শ্রীমতী শ্যামা ভট্টাচার্য্য।

নিলুর মা ও কাকীমা॥ বিভূতিভূষণের ভাগনেয়ী উমার জেঠিমা ও কাকীমা।

দেবু ও খুকু॥ বিভূতিভূষণের বারাকপুর গ্রামের প্রতিবেশী ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী খুকুর কথা বিভূতিভূষণের একাধিক দিনলিপিতে উল্লেখ আছে।

দাদু॥ বিভূতিভূষণের দাদাশ্বশুর সারদাকান্ত চক্রবর্ত্তী। তিনি শেষ জীবনের পাথুরিয়া ঘাটার জমিদার 'খেলাত চন্দ্র ঘোষ এস্টেট'-এর ম্যানেজার ছিলেন। বিভূতিভূষণ তাঁর অধীনে

কিছুকাল জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিয়াছিলেন।

লিচুতলা ক্লাব ॥ বনগ্রামের প্রবীন আইনজীবী ও সুকবি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বহির্বাটীতে 'লিচুতলা ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাহিরের উঠানে আজও একটি লিচু গাছ আছে —গ্রীষ্মের দিনে গল্পগুজবের জন্ম অনেক সময় সদস্যরা লিচুতলায় বাহিরেও বসিতেন। সেই হইতেই 'লিচুতলা ক্লাব' নামের উৎপত্তি। সম্ভবত বিভূতিভূষণই আড্ডার 'লিচুতলা ক্লাব' নামকরণ করিয়াছিলেন।

মনোজবাবু॥ মনোজ কুমার রায়। তদানীন্তন বনগ্রামের সাপ্তাহিক পত্র 'পল্লীবার্ত্তা পত্রিকার সম্পাদক।

জয়কৃষ্ণ ও গোপালদা॥ বিভূতিভূষণের বন্ধু। 'লিচতুলা ক্লাব'-এর সদস্য।

যতীনদা॥ বনগ্রামের হোমিওপ্যাথ ডাক্তার এবং বিভূতি সুহৃদ ডাঃ যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শচীনবাবু॥ বনগ্রামে বিভূতিভূষণের শ্বশুর বাড়ীর প্রতিবেশী ভদ্রলোক।

পুষ্প ও সুনীতি॥ বনগ্রামে বিভূতিভূষণের শ্বশুরবাড়ীর প্রতিবেশিনী ভদ্রমহিলা॥

সপ্তম পত্র

কানপুর॥ বিভূতিভূষণ ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কানপুর অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন। সে সময়ে দিল্লী যাইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। পত্রে সে কথাই তিনি লিখিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার শাশুড়ী সাধনাদেবীকে লিখিতপত্র দ্রষ্টব্য। (বিভূতি-রচনাবলী, দশম খণ্ড, 'পুস্তক পরিচয়', পৃ. ৩৮৭)।

তোমার বাবা॥ বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙালী—সাহিত্যিক অপূর্ব্ব মণি দত্ত।

তোমার কাকীমা॥ পত্নী শ্রীযুক্তা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সজনীদাস॥ 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর॥ বিশ্বকবির পুত্র রথীন্দ্রনাথ। বিভূতিভূষণ ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে শান্তি নিকেতন গমন করেন। সে সময়ে শান্তি-নিকেতনে থাকিয়া অধ্যাপনার জন্ম কোনো কোনো মহল হইতে প্রস্তাব উথাপিত হয়। যে কোনো কারণেই হোক বিভূতিভূষণ সে প্রস্তাবে রাজী হন নাই। বিভূতিভূষণ শান্তি-নিকতনে আলাপআলোচনায় এবং বিভিন্ন বৈঠকে যোগ দিয়াছিলেন।

নীরদ॥ 'বাঙালী জীবনে রমনী'র বিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী। পত্রেই বিভূতিভূষণের সহিত নীরদচন্দ্রের সম্পর্কের কথায় উল্লেখ আছে।

বনফুল॥ সাহিত্যিক ডাঃ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

অষ্টম পত্র

গজেনবাবু॥ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র।

ভায়ে॥ শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। সে সময়ে 'টাইফয়েড' রোগে শয্যাশায়ী।

স্কুল ॥ গোপালনগর 'হরিপদ ইনস্‌টিটিউশন'—বিভূতিভূষণ শেষ জীবনে এখানে শিক্ষকতা করিতেন।

প্রবোধ ॥ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্ন্যাল।

বিভূতিভূষণ বসু ॥ বিভূতিভূষণের প্রথম শিক্ষক-জীবনের ছাত্র। খেলাত ঘোষের বাড়ীর দৌহিত্র।

এই ক্ষুদ্র পত্রটির ভিতরে মানুষ বিভূতিভূষণের আন্তরিক আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিভূতিভূষণের সহৃদয় এবং সরস মনের পরিচয় এই পত্রটির মধ্যে পাওয়া যায়।

সংযোজন ও সংশোধন

একাদশ খণ্ডে প্রকাশিত 'অথৈজল' উপন্যাস পাটনা হইতে প্রকাশিত 'প্রভাতী' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক রচনা হিসাবে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। 'প্রভাতী' মাসিক পত্রে চৈত্র ১৩৫০ সাল থেকে পৌষ ১৩৫৩ সাল পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে 'অথৈজল' প্রকাশিত হইয়াছে। পাটনা হইতে অধ্যাপিকা শ্রীমতী মীনা সেন আমাদের এ তথ্য জানাইয়াছেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

একাদশ খণ্ডে 'পুস্তক-পরিচয়' অংশে উল্লিখিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধার্ঘ 'অপরাজিত বিভূতিভূষণ' প্রকৃতি পক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল 'যুগান্তর'-এ। (৩রা নভেম্বর ১৯৫০ বঙ্গাব্দ ১৭ই কার্ত্তিক ১৩৫৭ শুক্রবার)।

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

দ্বাদশ খণ্ড সমাপ্ত